এই তার পুরস্কার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ—১৩৬৩

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
এ. ও. পি. (ইণ্ডিয়া) প্রা. লি.
১২৭/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোড
কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

দীপঙ্কর
তীর্থঙ্কর-কে

॥ ১ ॥

ঠিক করতে পারছিল না সে? এখন ঠিক হয়ে গেছে। দেয়ালে পেরেক ঠুকে ছবিটা ঠিক করে দিয়েছে, এখন আর নড়ছে না দুলছে না। ঘুড়িটা বার বার গোঁত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ছিল? কানাভারি হয়ে কাত হয়ে হয়ে চরকির মতন আকাশে ঘুরছিল? সুতো ছিঁড়ে দিয়েছে সে। আপদ গেল। এবার হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশের ঘুড়ি যেখানে খুশি উড়ে যাক। অস্থিরকে পেরেক ঠুকে স্থির করে দেওয়ার মতন চঞ্চলকে বাধন ছিঁড়ে আলগা করে দেওয়াও এক ধরনের ঠিক করে দেওয়া।

হুঃ, ঘড়ি দম নিচ্ছে না? স্প্রীং কেটে গেছে? ঘড়িওয়ালার কাছে গিয়ে সারিয়ে নাও। নয়তো জলে ফেলে দাও, বরং হামানদিস্তার মধ্যে রেখে ওটাকে গুঁড়িয়ে ছাতু করে দিতে পার। এ-ও একরকম ঠিক করা। এ-ও মন্দ না।

ঘড়ি ঠিক হোক বা না হোক, তোমার মন ঠিক হয়ে গেল। স্প্রীং কেটে 'ওয়া অচল ঘড়ি হাতে রেখে অস্বস্তি পোহানো, 'কি-করা-যায়' 'কি-করা-যায়' করে মনের অশান্তি বাড়ানো—সব এখন পরিষ্কার। ঘড়ির দুর্ভাবনা আর তোমাকে পাচ্ছে না। কানা-ভারি বেয়াড়া ঘুড়ির বেআদবী সহ্য করতে না পেরে রাগী ছেলে সুতো ছিঁড়ে দিয়ে লাটাই গুটিয়ে নতুন ঘুড়ি কিনতে দোকানে চলল, অথবা ঘুড়ি উড়ানো বন্ধ রেখে মাছ ধরতে ছুটল।

তার মানে তার মন ঠিক হয়ে গেল।

এই মন ঠিক করার ব্যাপারটা ঠিক করতেই সময় নেয়, তখনই যত গোলমাল। তারপর ঠিক হয়ে গেলে আর কিছু না, লম্বা পা ফেলে শুধু এগিয়ে যাওয়া। রাগী গিন্নী পেরেক খুঁজে না পেয়ে নড়বড়ে ছবিটা দেওয়াল থেকে তুলে নিয়ে উনুনের দিকে ছুটে গেল, কানের কাছে অষ্টপ্রহর খসখস ঘষঘষ সহ্য করবে ক'দিন? ছবি পুড়িয়ে শেষ করে দিল। যেমন রাগী পুরুষ বাড়ি মেরে হাতের ঘড়ি গুঁড়িয়ে দিল। যেমন রাগী ছেলে মাছ ধরতে চলল।

চমৎকার চমৎকার উপমা তার মনে পড়তে লাগল। ক'দিন ধরেই মনে পড়ছিল। আজ নতুন করে মনে পড়াতে তার রাগটা ফেটে পড়ছিল। সে-ও এখন রাগী, 'অ্যাংরী' অর্থে রাগী না, 'হাংরী' অর্থে রাগী না, সত্যিকারের রাগ নিয়ে রাগী। কাপের হাতলটা দু আঙুলে টিপে ধরে আঙুল দুটো সে শক্ত করে ফেলল, হাতের স্নায়ুগুলি এমন খিঁচিয়ে রাখল, যেন মট করে হাতলটা ভেঙে দিয়ে কাপটাকেই কানা করে দেবে। তার মানে এই কাপে করে মোহনবাবুর কোনো খদ্দেরকে আর চা দেওয়া চলবে না। মোহনবাবুর মুখটা মনে পড়তে অথবা অদূরে নিজের চেয়ারে বসে এই ফাল্গুনের দুপুরেও গরম চাদরটা গায়ে জড়িয়ে মোহনবাবু গালভরতি খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে নিবিষ্ট মনে দোকানের হিসেব-পত্র দেখছে চোখে পড়তে, হাতের স্নায়ু সে ঢিলে করে দিল, আঙুল দুটো শিথিল করে ফেলল, বরং হঠাৎ তার কষ্ট হতে লাগল মোহনবাবুর জন্য। নিরিবিলি ঠাণ্ডা মানুষ, তারা দোকানে এলে কত খাতির করে, কত দীর্ঘসময় তারা এখানে আড্ডা দেয়, হই হই করে। মুখ ফুটে মোহনবাবু কোনোদিন কিছু বলে না, ওই

চেয়ারটায় চুপচাপ বসে অনবরত রাস্তার গাড়িঘোড়া মানুষজন দেখে, এবং হঠাৎ মনে পড়ে গেলে হিসাবের খাতাটা খুলে মাথা গুঁজে হিসাবপত্র দেখে।

বরং তার কষ্ট হচ্ছিল 'মোহন রেস্টুরেন্ট'-এ এই তার শেষ চা খাওয়া, ঠাণ্ডা মেজাজের ভাল মানুষ মোহনবাবুকে এই শেষ দেখা। মোহনবাবুর রং জ্বলে যাওয়া পশমী আলোয়ান, কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, নোংরা মলাটের হিসেবের খাতা, নড়বড়ে টেবিল চেয়ার, স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়াল, মাথার ওপর টিমটিমে হলদে বালব্—সব কিছুর ওপর শেষ চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে গভীর নিশ্বাস ফেলল।

উঁহু, তার রাগ বহির্মুখী না। অন্তর্মুখী। গরম সীসার মতন গলে গিয়ে কলজে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

বাইরের দিক থেকে সে প্রশান্ত নির্বিকার। তবে ক'দিন ধরে দাড়ি কামাচ্ছে না, চুল বড় হয়েছে, চুল কাটছে না, নখ বড় করেছে, নখ কাটছে না। ক'দিন ধরে কি, গত এক মাস ধরে এই সব করছে। কেননা পুরো একটা মাস লেগেছে তার মন ঠিক করতে।

চুল দিয়ে বোঝা যায় না, দাড়ি বড় হওয়ার পর বয়সটা বেশ বোঝা যায়। এখন সবাই বুঝতে পারবে রামানন্দ সেন কোন্ বয়সে এসে পৌঁচেছে, মেঘে মেঘে কত বেলা করে ফেলেছে। দাড়ির প্রায় চার আনা ধবধবে সাদা, কাজেই চলতি হিসাব অনুযায়ী, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। আরো বেশি হবে। অন্তত পূরবী তাই মনে করে। রামানন্দ পঁয়তাল্লিশ পার করে দিয়েছে।

পূরবী তাই মনে করে। কোনো কীর্তি নেই, কোনো সাফল্য নেই, কর্মহীন জীবন নিয়ে রামানন্দ খামকা পঞ্চাশ বছর বেঁচে রইল। স্কুলমাস্টারী একটা জীবন? একটা চাকরি?

পূরবী মনে করে পঞ্চাশ পার করে রামানন্দ কাল সকালেই ঘাটের ঘরে পা দিচ্ছে। কেবল কবিতা লিখে এবং একটা পচা স্কুলে বছরের পর বছর ছেলেদের ইতিহাস ভূগোল পড়িয়ে রামানন্দ সেন বুড়ো হয়ে গেল। এই মানুষের কাছ থেকে, স্বামী নামধারী এক জড় অপদার্থের কাছ থেকে সে কী আশা করতে পারে? কিছুই আশা করে না। দশ বছর আগে, আরও বেশি, পনেরো বছর আগেই সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে পূরবী, যাকে বলে মানে মানে, চাকরি নিয়ে একটা মার্চেণ্ট অফিসে ঢুকে পড়ে।

পনেরো বছর আগেই পূরবী বুঝে নিয়েছে রামানন্দ কী, রামানন্দ কে, রামানন্দ কেমন।

কলেজ স্ট্রীট পাড়ার প্রায়ান্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে মোহন রেস্টুরেণ্টে আজ সাতাশে ফাল্গুন, দুপুরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভাল মানুষ মোহনবাবুর মুখটা খুঁটিয়ে দেখার পর সে তার নাকের সামনের শূন্য চেয়ার দুটো এবং চেয়ারের মাথা কালো করে মাছির ঝাঁক কেমন শান্ত হয়ে বসে দোকানের নৈঃশব্দ্য উপভোগ করছে, মনোযোগ সহকারে দেখল। দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই জীবনে মোহনবাবুর দোকানে চেয়ার-টেবিল, মাছির ঝাঁক আর দেখা হবে না।

পনেরো বছর আগেই পূরবীর কাছে সে বিস্বাদ হয়ে গেছে; সে, তার কবিতা, তার সাহিত্যপ্রীতি। এমন কি তার লেখার কাগজ-কলম, আলমারীর বইগুলিও। যেন জামা-জুতোও।

হুঁ, তার জামা-জুতো, ঢোলা হাতা লম্বা ঝুল খদ্দরের হলদে পাঞ্জাবি, কোলাপুরী চপ্পল, ধুতি, অর্থাৎ যে পোশাকটি নিয়ে সে স্কুলে পড়াতে যায়, বা যে পোশাক পরে রোজ বিকেলে এখানে এই দোকানে চা খেতে আসে।

এটা সত্য কথা, আজ শেষ দিন সে আর অস্বীকার করবে না, মোহনবাবুর দোকানের সর্বনাশ করেছে তারা, দোকানের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ, বছরের বারো মাস, মাসের ত্রিশটা দিন, বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ন'টা, ছুটির দিন সকালে, সকাল দুপুর যখন খুশি আড্ডা আড্ডা। এই চেয়ারে সে রামানন্দ সেন, নাকের সামনের শূন্য চেয়ার দুটোর একটায় শুভেন্দু একটায় বিকাশ, উঁহু, শুধু তিনজন হলে মোহনবাবু বেঁচে যেত, দোকানে অনেক জায়গা থাকত, হুহু করে খদ্দের আসতে পারত, কিন্তু তাদেরই যে আরও অনেক, দেখতে দেখতে দোকানের সব ক'টা চেয়ার এই টেবিলটার চার পাশে টেনে টেনে জড়ো করা হয়। কাল পর্যন্ত তাই করা হয়েছে।

মোহনবাবু এত ভাল, এত ভদ্র ঠান্ডা আর সহিষ্ণু। কেবল এক কাপ চা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোদ্দ পনেরোটা চেয়ার দখল করে রাখা—

অন্য কোনো রেস্টুরেন্টের মালিক হলে কী করত ঈশ্বর জানে। রামানন্দ কবিতা পড়ছে ভক্তরা শুনছে, শুভেন্দু কবিতা পড়ছে ভক্তরা শুনছে, বিকাশ কবিতা পড়ছে ভক্তরা শুনছে, তারপর আলোচনা, তারপর তর্ক। আলোচনা তর্ক ঝগড়া। তারপর সন্ধি। আবার কবিতা পাঠ। আবার আলোচনা, টেবিল চাপড়ানো।

মোহনবাবু নীরব। রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখছে, মানুষ দেখছে, নয়তো ঘাড় গুঁজে হিসাবের খাতায় চোখ রাখছে।

কুড়ি বছর ধরে রোজ সকাল বিকাল, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এই আবর্জনা দোকানে জড়ো হতে না দিলে তাঁর দোকান আজ ঝলমল করত, হই হই কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত, কলেজ স্ট্রীট পাড়ার মতন জায়গা। বিয়াল্লিশ সাল থেকে দোকান। চাট্টিখানি কথা! অথচ মানুষটা নিঃশব্দে বুড়ো হয়ে গেল, মাথার চুল পাকা হয়ে গেল, চোখ দুটো ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তাঁর ওই রঙ-জ্বলে-যাওয়া পশমী আলোয়ানের মতন এমন চমৎকার দোকানটাও বিবর্ণ চেহারা নিয়ে ভর দুপুরে একটা টিমটিমে বালব্ জেলে স্তব্ধ শূন্য হয়ে থাকল। রামানন্দ এবং তার দলের লোকেরা মোহনবাবুর কী অপূরণীয় ক্ষতি করল মোহনবাবু কি বুঝতে পারছে না! না কি বুঝতে পেরেও যাকে বলে অমানুষিক ভদ্রতা করে চুপ থেকে বড়-লোকের বাড়ির চেয়ারের ছারপোকার কামড় সহ্য করার মতন দিনের পর দিন রামানন্দের কবিতার অত্যাচার সহ্য করল, নির্বিবাদে সর্বনাশা ক্ষতিটা মেনে নিল।

কোনো মানে হয় না, নিজের মনে সে বিড়বিড় করে উঠল, বুদ্ধিমানেরা কখনও এভাবে নিজের ক্ষতি হতে দেবে না, বুদ্ধিমতী পূরবী পনেরো বছর আগেই ক্ষতির সম্ভাবনা বুঝতে পেরে চাকরিতে ঢুকে পড়ে। কেবল পূরবী? হেম মজুমদার কি করল, রামানন্দদের আড্ডায় ভিড়েছিল না? রোজ মোহনবাবুর দোকানে আসত। হুঁ, কবিতার নেশা। ফরসা ছিপছিপে চেহারা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছোঁড়া বুঝে গিয়েছিল পদ্য লিখে কিছু হবে না, পদ্য কিছু দেয় না, সোজাসুজি গদ্যে চলে গেল। গল্প, উপন্যাস লিখে হেম মজুমদার আজ বাংলা সাহিত্যের কেউকেটা। আকাদমী পুরস্কার পেয়েছে। বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে। গায়ে-গতরে ফুলে উঠেছে। ছ'টা বই সিনেমা হয়েছে এবং শোনা যাচ্ছে আরও গোটা চারেক বই কন্ট্রাক্ট হয়ে আছে।

উত্তরপাড়া থেকে একগাদা লিট্‌ল ম্যাগাজিন বগলে করে আসত না শশাঙ্ক? পাগল হয়ে গিয়েছিল কবিতার জন্য। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে জার্মানী চলে গেছে। আজ কিন্তু আর একছত্র কবিতা লিখছে না। বুঝে গেছে কবিতা দিয়ে

কিছু হয় না। শুভেন্দুর বন্ধু। জার্মানী থেকে শুভেন্দুকে চিঠি দিয়ে জানিয়েওছে সে কথা। এখানে এসে আমার দুটো ক্রনিক অসুখ সেরে গেল। কবিতা লেখা এবং আমাশয়—অ্যামিব্যাসী। সাহিত্য করছি, সাহিত্য ছাড়িনি। প্রোজ্।

রামানন্দ এবং রামানন্দর বন্ধুরা শশাঙ্কর সাহিত্যকর্ম নিয়মিত দেখতে পাচ্ছে বৈকি। যে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা ওল্টালেই রগরগে গদ্যে লেখা তার 'বার্লিনের পত্র', 'পশ্চিম জার্মানীর চিঠি' চোখে পড়ে। হুঁ, পত্র-সাহিত্য। শুভেন্দু বলে রম্য-পত্র। কিন্তু ঠাট্টা করলে হবে কি। শুভেন্দুর কাছে শশাঙ্ক যে চিঠি দিয়েছে তাতেই জানা গেল, এক একটা চিঠির জন্য কাগজওয়ালারা তাকে যে পরিমাণ টাকা দেয়, সারা বছর এই কাগজে সেই কাগজে কবিতা লিখে তার সিকি-ভাগও পাওয়া যেত না। অতীতে সে পায়নি।

কাজেই পুরবী যেমন কবিতা পড়া ছেড়ে দিয়েছে, কবিতার নাম শুনলে তার গা-বমি করে, কবি ও কবির পোশাক-আশাক এমন কি কবির চুল নখও তার চোখে বিবর্ণ-বিস্বাদ ঘেন্নার জিনিস হয়ে গেছে, তেমনি পৃথিবীর বুদ্ধিমান কবিরা কবিতা লেখা ছেড়ে দিচ্ছে এবং 'বিনা নোটিশে' কবিগোষ্ঠী থেকে খসে পড়ছে, নিতান্তই সাহিত্যের নেশা ছাড়তে না পারলে কেউ কেউ গদ্য লিখছে।

তা-ও সেই সব গদ্যকর্ম যা সুখ দেয়, শান্তি দেয়, পয়সা দেয়, পত্নীপ্রেম অটুট থাকে, সন্তানের ভক্তি-ভালবাসা নষ্ট হয় না।

বেহালার সীতেশ? সীতেশ চৌধুরী? বাপের বাক্স ভেঙে টাকা এনে কবিতা-পত্র বার করেছিল। আজ ক্রাইম বই লিখছে। বাংলা ক্রাইম নভেলের বাজারে এখন সে বেস্ট সেলার। ভি আই পি রোডের ওপর দশ কাঠা জমি নিয়ে তার নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। রোজ সন্ধ্যায় 'প্রিন্সেপে' বসে আকণ্ঠ সুরা পান করে।

হুঁ, গৃহ-জীবনের সুখ-শান্তি, সেই সঙ্গে অবারিত সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্মান প্রতিপত্তি। সব একচেটিয়া তাদের পাওনা।

সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে তাদের নেমন্তন্ন করা হয়, চৌরঙ্গী পার্ক সার্কাসের শিল্পমেলা দেখতে তাদের ডাকা হয়, এই সেমিনারে সেই সেমিনারে তাদের আসন বাঁধা। কলকাতা শহর, বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। ট্রাম পোড়ানো, পট্কা ফাটানো, গ্যাস, গুলি, মিছিল এবং চূড়ান্ত বিক্ষোভের মধ্যেও শিল্পমেলা সাহিত্য-সভা সংস্কৃতি-অনুষ্ঠানে ভাঁটা পড়ে না। এই তো সেদিন কত জাঁক করে এত বড় একটা অল ইণ্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্স হয়ে গেল। উহুঁ, রামানন্দদের ডাকা হয়নি। আর সুদূর বার্লিনে বসে পত্র-সাহিত্যিক শশাঙ্ক দত্তও নেমন্তন্ন পেল। শুভেন্দুর কাছে লেখা চিঠিতে তা-ও জানা গেছে।

না, রামানন্দদের ডাকবে কেন। তারা যে 'নিশ্চেতনা'র কবি, 'অবচেতনা'র অন্ধকারে হামাগুড়ি দিচ্ছে। এই বালখিল্য কবিদের, যদিও বয়সে অনেকে বুড়িয়ে গেছে, আজও 'পরীক্ষা-নিরীক্ষার' পর্ব শেষ হল না, এখনও 'আত্ম-অনুসন্ধান' নিয়ে মেতে আছে। তার মানে শিল্পসৃষ্টি করতে নেমে তারা নিজেদেরই আজ পর্যন্ত চিনে উঠতে পারল না—তারা কী তারা কে! যে কারণে তাদের কাব্য কবিতাও দুর্বোধ অস্পষ্ট থেকে গেল, নেবুলাস অবস্থা কাটিয়ে উঠে একটা নির্দিষ্ট আকার পেল না, অবয়ব পেল না। শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে এই নীহারিকা পুঞ্জের জায়গা কোথায়!

আকাদমী বিজয়ী ঔপন্যাসিক হেম মজুমদার সম্প্রতি একটি সাহিত্য সভায়

'আধুনিক কবিদের' সম্পর্কে এই ধারার উক্তি করেছিল না?

কিন্তু রামানন্দ ও রামানন্দর অনুগামী কবিগোষ্ঠী এত বড় সত্যটা কি বুঝল? আজও বুঝতে পারেনি। তাই এই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার চায়ের দোকানে বসে রামানন্দর কবিতার 'বিশুদ্ধ ইমেজ' দেখে শুভেন্দু হই-চই করে, শুভেন্দুর কবিতার 'মেজাজী ভাব', তার নিজস্ব 'অ্যাটিচিউড' 'স্মার্টনেস' লক্ষ্য করে বিকাশ আত্মহারা, আবার বিকাশের 'খাঁটি সুররিয়ালিস্ট' কাব্য পড়ে তরুণ ভক্তের দল মুগ্ধ, বিমোহিত।

হুঁ, তারা নিজেরাই নিজেদের দেখছে, একজন আর একজনের পিঠ চুলকোচ্ছে, পৃথিবীর কেউ তাদের কথা শুনছে না, তাদের কবিতা পড়ছে না, কবিতাই আর মানুষ পড়ছে না, পৃথিবী এখন রাজনীতি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, জনসংখ্যার চাপ নিয়ে অস্থির চঞ্চল, তার ওপর ক্ষণে ক্ষণে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার রোমহর্ষক চমক—

আর এই অবস্থায় কিনা মূর্খের দল, রামানন্দ ও তার শিষ্যেরা কবিতা নিয়ে মুহুর্মুহু আস্ফালন করছে, আন্দোলন করছে, গাঁটের পয়সা খরচ করে 'মিনিটের কবিতা' 'সেকেণ্ডের কবিতা' 'শুক্লপক্ষের কবিতা' 'কৃষ্ণপক্ষের কবিতা'—উদ্ভট আজগুবি সব নাম দিয়ে পত্র-পত্রিকা বার করছে, আর পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে।

রামানন্দ এক এক সময় চিন্তা করে, যেন তুমুল ঝড়জল আরম্ভ হয়েছে, বাগান জলে থই থই, আর সেই গলা-জলে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ঝড় মাথায় করে ক'টি দোপাটি চারা, ক'টি আধুনিক কবি ফুল ফোটাবার অবোধ আনন্দ নিয়ে হি-হি করে হাসছে। শুভেন্দু-বিকাশদের ডেকে এই কথাটাই জোর গলায় আজ তার বলতে ইচ্ছা করছিল।

হুঁ, পড়ে পড়ে তারা মার খাচ্ছে তাদের হুঁস নেই, তা না থাক, কিন্তু বেচারা ঐ মোহনবাবু? রোজ দুবেলা করে চার ঘণ্টা চার ঘণ্টা, আট ঘণ্টা, ছুটির দিন আরো বেশি, বারো ঘণ্টা—বারোটা চেয়ার দখল করে রেখে এক ডজন কবির অনর্গল কবিতা পাঠ আর টেবিল চাপড়ানো—দোকানটা একেবারে শেষ হয়ে গেল; মোহন-বাবু মরে গেল।

তাই, আজ শেষ দিন এখানে চা খেতে বসে রামানন্দর বার বার মনে হচ্ছিল, কবিতার জন্য লড়াই করে তারা যদি শহীদ হতে চলল, কবিদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে বেচারা মোহনবাবু শহীদের শহীদ হয়ে রইল। 'তোমাকে নমস্কার মোহন পাল।' বিড় বিড় করে বলল সে, তারপর শূন্য কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

'চলি মোহনবাবু!'

'কোথায় চললেন?' মোহনবাবু হিসাবের খাতা থেকে চোখ তুলল।

তাই তো, এই প্রশ্নের সদুত্তর মোহনবাবুকে কি দেওয়া যায়। ক্যাশ বাক্সের সামনে চায়ের পয়সাটা রেখে দিয়ে মশলার থালা থেকে এক চিমটি মৌরী তুলে সে মুখে পুরল। তারপর মিষ্টি করে হাসল। মোহনবাবুর চোখ দেখে সে বুঝল তার গন্তব্যস্থল নিয়ে মোহনবাবু মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না, অন্য কিছু ভাবছে, ফ্যাকাশে চোখের তারা রীতিমত ধারালো করে ঘনঘন তাকে দেখছে।

স্বাভাবিক, চিন্তা করল সে, একলা হয়ে কেউ তারা মোহনবাবুর সামনে দাঁড়ায় না, তাঁর সঙ্গে এভাবে বিষণ্ণ গলায় কেউ কথাও বলে না, দলবদ্ধ হয়ে সব দোকানে ঢোকে, চা খায় আড্ডা দেয় হই-হই করে টেবিল-চেয়ার ভাঙে, তারপর দোকানের ছোকরা বয়ের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে আবার দল বেঁধে

বেরিয়ে পড়ে।

না, মোহনবাবু কি করে ভাববে, এই শেষবারের মতন রামানন্দবাবু তাঁর দোকানে বসে চা খেয়ে গেল, শেষ দিনের মতন তাঁকে দেখে গেল, শেষবার মশলার পাত্র থেকে মৌরী তুলে মুখে ফেলে গেল। মোহনবাবু ধরে রেখেছে, এখন একা-একা চা খেয়ে গেলেও বিকেল পড়তে রামানন্দবাবু দলবল নিয়ে আবার এসে ঢুকবে।

উহুঁ, মোহনবাবু কি করে জানবে, আর কোনোদিন কবি দলের মধ্যমণি হয়ে রামানন্দর এখানে আসা হবে না, দল থেকে সে খসে পড়েছে।

না, বেচারা মোহনবাবুর জানবার কথা না, রামানন্দ চিরদিনের মতন কেবল কবিগোষ্ঠী ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে না, এই জন্মের মতন তার কবিতা লেখাও শেষ হয়ে গেছে।

'কি দেখছেন?' একটু বেশি সময় মোহনবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাই একটু কৌতূহল নিয়ে সে হাসল।

'হুঃ, নু—নাঃ।' থতমত খেল মোহন পাল, নিরীহ ঠান্ডা মানুষ। যেন লজ্জা পেল। তৎক্ষণাৎ হিসাবের খাতায় চোখ রাখতে গেল, কিন্তু পারল না, চোখ তুলে রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখতে গিয়ে তা-ও দেখা হল না; অগত্যা সারা মুখে একটা বিনয়ের হাসি ছড়িয়ে দিল।

'মনে হয় আপনি বীট্ হয়ে গেছেন রামানন্দবাবু।'

'বট্! ঠিক ধরেছেন।' এবার রামানন্দ বেশ শব্দ করে হাসল, এত জোরে হাসল যেন তার চোখে জল এসে গেল।

ফলে মোহনবাবু আর একবার থতমত খেল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়েও ফ্যাকাশে মুখে লজ্জার একটা লাল আভা দেখা দিল। কেননা এমন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেউ এত প্রাণ খুলে মোহনবাবুর সঙ্গে হাসে না, দু' বেলা তাঁর দোকানে এসে অত্যাচার করে, অথচ ভদ্রলোকের সঙ্গে কেমন এক ধরনের ঠান্ডা দূরত্ব রেখে চলে কবিরা।

মোহনবাবু যাতে লজ্জাটা তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলতে পারে এই জন্য তাঁর রোমশ শুকনো খসখসে হাতটা মুঠো করে সে ধরে ফেলল। 'আমার বেশভূষা চেহারা দেখে ভাই মনে হয়, আমি বীট হয়ে গেছি, কেমন না?' মোহনবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে সে টেনে টেনে হাসল।

মোহনবাবুও এবার মিটিমিটি হাসছিল। কবিতা বোঝে না, কিন্তু কবিদের কথা তো ধরতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই কানে আসছে। কাজেই তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ 'হাংরি' 'অ্যাংরি' কি 'বীট' বেরিয়ে পড়লেও রামানন্দের অবাক হওয়া কি চটেমটে চোখ লাল করে কড়া করে দু-কথা শোনানো মোটেই বাঞ্ছনীয় না। বিশেষ করে রামানন্দ তো আজ কারো ওপর রাগ করতেই পারে না। আজ সকলকেই তার ভালবাসার দিন। শেষ দিন। পারলে মোহন পালের ঐ খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরতি গালে তার চুমো খাওয়াই উচিত ছিল। হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'চলি।'

'বড় সকাল সকাল উঠে পড়লেন?' আত্মীয়ের মতন চেহারা করল মোহন পাল। 'একটু পরেই শুভেন্দুবাবু বিকাশবাবুরা আসবেন।'

'আসুক।' গলার স্বর শুকনো করে ফেলল সে। 'আমার একটু তাড়া আছে, একটা কাজ আছে।'

'কাজ!' এমন চোখ করল মোহন, যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না।

শনিবার স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, এখন তো এক কাপ চা নিয়ে রামানন্দবাবুর ঠায় এখানে বসে থাকার কথা, আস্তে আস্তে কবির দল এসে ভিড় করবে, তারপর রাত ন'টা পর্যন্ত চুটিয়ে কবিতা নিয়ে কচলাকচলি চলবে, টেবিল চাপড়ানো হবে, বগল বাজানো হবে।

'কেন, আমার কি হাতে আর কাজ থাকতে নেই', রামানন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'আমি কি মানুষ না!'

আধখানা জিভ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল মোহন পাল। লজ্জার খপ্পরে পড়ে নতুন করে মুখটা লাল করে ফেলল। তৎক্ষণাৎ জিভ গুটিয়ে নিয়ে বড় করে একটা ঢোক গিলল।

'ছি ছি, আমি এমন কথা বলব, রামঃ। হুঁ, মানুষ, নিশ্চয় মানুষ, একশবার মানুষ, কবিতা লিখলেই মানুষ কিছু অমানুষ হয়ে যায় না, কবিদেরও সুখ-দুঃখ আছে লাভ-লোকসান আছে, কাজকর্ম আছে তাড়াহুড়ো আছে, হুঁ, থাকতেই হবে —নিতান্তই অন্য কোনো রসে সুখ পান না বলে, আর কোনো জায়গায় যেতে চা'ন না বলে, কারো মেজাজে মেজাজ মেলাতে পারেন না বলে আপনারা এখানে আসেন বসেন, চা খান, কাব্য চর্চা করেন—দেখে আমি কত সুখ পাই, কত আনন্দ লাগে মনে।'

আহ্, মোহনবাবু কবিদের দেখে সুখ পায়, এক নাগাড়ে কুড়ি বছর দৌরাত্ম্য চালিয়ে এমন চমৎকার দোকানটা তারা প্রায় লাটে তুলে দিল, এতৎসত্ত্বেও বেচারা ভাল মানুষ মোহন পাল তার চোখে চোখ রেখে মেয়েমানুষের মতন মদির হাসি হাসছে। রামানন্দর রাগ জল হয়ে গেল। আর ইতস্তত না করে ঝুঁকে পড়ে মোহন পালের খোঁচা খোঁচা গালে চুমু খেতে গেল।

মোহনবাবু মুখটা পিছনে সরিয়ে নিয়ে অল্প শব্দ করে হাসল। রামানন্দ বুঝতে পারে। তার মুখে গন্ধ পেয়ে মাথাটা সরিয়ে ধরে মোহন লাজুক হাসি হাসছে।

'পেটে দু'এক পাত্তর পড়েছে বুঝি।'

রামানন্দ শব্দ করল না। এই অবস্থায় রাজা-মহারাজ থেকে শুরু করে কীটাণুকীট কবিটি পর্যন্ত চুপ থেকে ঘাড় হেঁট করে স্থান ত্যাগ করে। লম্বা পা বাড়িয়ে রামানন্দ রাস্তায় নেমে এল।

কয়েক পা এগোবার পর সে ঘুরে দাঁড়াল। সত্যি তার বুকের ভিতর টন টন করছিল। চিরকালের মতন মোহন রেস্টুরেন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঐ তো দোকানটা, ডাইনে জিলিপি গজার দোকান 'প্রসাদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার', বাঁয়ে মনোহারী দোকান 'কালীমাতা স্টোর্স', মাঝখানে 'মোহন রেস্টুরেন্ট' ত্রিশ বছরের পুরোনো রংচটা সাইন বোর্ড মাথায় ঝুলিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে। বড় নির্জন নিঃশব্দ। ভিতরটা শ্মশানের মতন খাঁ খাঁ করছে। এমন চমৎকার নিরিবিলি অন্ধকার একটা চায়ের দোকান রামানন্দ কবে আবিষ্কার করেছিল মনে করতে পারছে না, তবে এটা তার পরিষ্কার মনে আছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়া ঝকঝকে একটি মেয়ে দুপুরবেলা টুপ করে ওখানে চলে আসত, তারপর রামানন্দর হাত থেকে কবিতার খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে এক নিশ্বাসে নতুন পুরোনো সব কবিতা পড়ে শেষ করত। হুঁ, বিয়ের আগে এক বছর এবং বিয়ের পরে দু' বছর, রামানন্দর লেখা হেন কবিতা ছিল না পুরবীর মুখস্থ ছিল না। তার পরেই কবিতার নাম শুনলে তার গা-বমি আরম্ভ হয়।

'চলি মোহনবাবু, চললাম।' মোহন রেস্টুরেন্টের ওপর শেষ দৃষ্টি বুলিয়ে

নিয়ে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

এক মাসের ওপর পূরবী আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে গেছে। আপত্তি করেনি সে। কার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় কে হাত দেয়! তবে একদিন সে সাধতে গিয়েছিল। পূরবী তার মুখে থুথু ছিটোতে বাকি রেখেছিল। রাগ করেনি সে। কার রুচিতে কে বাধা দেয়! তবে কিনা আড়াই শ' টাকা বাড়ি-ভাড়া ঐ মহিলা তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেল। তা-ও অবশ্য রামানন্দ গ্রাহ্য করছে না। এক চমৎকার আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেছে। মন ঠিক করতে পারছিল না এই যা। এই জন্যই যত গোলমাল ছিল। তারপর মন ঠিক হয়ে যাবার পর এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। মাত্র মাসের মাঝামাঝি। কিছু খুচরো নিয়ে আড়াই টাকা পকেটে ঝুলছিল। চা ও ট্রাম-বাসের পয়সা রেখে ওই থেকে দু' পাত্র দিশি গিলে আসার পর মাথাটা আরও সাফ হয়ে গেছে। হুঁ, দারুণ সুন্দর এক আস্তানার দিকে সে যাচ্ছে।

এই জন্য তার এত ভাল লাগছিল। পৃথিবীর সব কিছু তার ভাল লাগছে, সকলকে ভালবাসতে ইচ্ছা করছে। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঘেন্না কিছুই আজ মনে নেই; কেবল পূরবী না, কারো ওপরই সে রাগ করতে পারছে না। কাউকে ঘেন্না করতে ইচ্ছা করছে না, যে কারণে হোঁতকা বিদঘুটে চেহারার মোহন পালকেও রামানন্দ চুমু খেতে গেল। তখন মোহন রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময় কী দেখল! রাস্তার ওপাশে ডাস্টবিন ঠুকরে ঠুকরে একটা মরা ইঁদুর ঠোঁটে তুলে নিয়ে কাকটা উড়ে গেল। প্রায় প্রেমিকের দৃষ্টি নিয়ে রামানন্দ পেটফোলা পচা ইঁদুর ও কাকটাকে দেখল। দৃশ্যটা এমন মুগ্ধ করেছিল তাকে!

এখন আবার কী দেখছে! ফাল্গুনের আধখানা রোদে দগদগে ঘেয়ো পা-টা ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা ফুটপাতে শুয়ে আছে, কুকুরটা কাছে আসছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার আসছে, তারপর আর ভাবনা-চিন্তা না, চকচক শব্দ করে পায়ের ঘা চাটতে আরম্ভ করল।

উঁহু, রামানন্দ চোখ ফেরাল না। ঘেন্নায় শিউরে উঠল না। চোখ ভরে ছবিটা দেখল। হাসল মনে মনে। 'ইমেজ', নতুন 'ইমেজ' খুঁজে পেয়েছে সে! রামানন্দর কবিতায় এমন ছবি দেখতে পেলে ভক্তরা, শুভেন্দু বিকাশরা কতটা খুশী হতো?

হুঁ, এমন দিনে এই ফাল্গুনের দুপুরে রাস্তায় বেরোলে কোন্ পার্কের গাছে কচি-পাতা এসেছে সতর্ক চোখ মেলে সে তাকিয়ে দেখত। হুঁ, এমন দিনে এই ফাল্গুনের দুপুরে কোন্ ঋতুমতী বালিকার গালে বসন্তের রং লেগেছে অবাক হয়ে সে খুঁজত।

কিন্তু সব কবিতা সব 'ইমেজ' শুভেন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে সে অন্য জগতে চলে যাচ্ছে। শুভেন্দু বিকাশ এবং তাদের তরুণতম শিষ্যরা গালে হাত দিয়ে ভাববে, তাই তো, রামানন্দ এমন করল কেন!

হুঁ, কেন। কেন আমরা কবিতা লিখি আর মোহন পাল কেবল হিসাবের খাতা দেখে? যদুবাবু কেন রাতদিন ছবি আঁকে আর মধুবাবু কেবল কালো-বাজারে ঘোরে? কেন মানুষ চাঁদে পাড়ি দেয়? ধানকাটা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে কেন? শ্রীমতী কেনেডি কেন বুড়ো ওনেসিসকে বিয়ে করে? পূরবী কেন স্বামীর ঘর ছেড়ে আলাদা ঘর ভাড়া করে? মুকুন্দবাবু, ধরা যাক্ মুকুন্দবাবুই মানুষটার নাম, রাত জেগে পাঁচশ পৃষ্ঠার ঢাউশ উপন্যাস পড়ে কেন, কেনই বা লিটল ম্যাগাজিনের কবিতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে সেফটি রেজারের সাবানের ফেনা ও

কাটা দাড়ি মোছে।

শুভেন্দুদের বোঝা উচিত; পৃথিবীতে মুহূর্তে মুহূর্তে কোটি কোটি 'কেন' মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। একটা 'কেন'রও কোনো উত্তর হয় না।

সিগারেটের দোকান সামনে পেয়ে রামানন্দ চট করে দাঁড়াল। সিগারেট খাওয়ার লোভের চেয়ে দোকানের আরশিটা তাকে বেশি টানল। একটা সিগারেট কিনল আর ততক্ষণ দাঁড়িয়ে আরশির মধ্যে নিজের পুরো ছবিটা দেখল। দেখে হাসল। মোহনবাবু ভুল করেছে। মোহনবাবু কেবল শব্দগুলি শিখে রেখেছে। কখন কোনটা প্রয়োগ করতে হয় জানে না। ভদ্রলোকের বলা উচিত ছিল, 'আপনি 'হিপি' হয়ে গেছেন, রামানন্দবাবু।' 'বিট' না, রামানন্দকে 'হিপি' দেখাচ্ছে। বড় বড় চুল কানের দুপাশে ঝুলছে, এক মুখ দাড়ি, চার আনা সাদা হয়ে গেছে, যে জন্য পূরবীর চোখে তার বয়স এখন ষাট সত্তর আশী হয়ে যাওয়াও বিচিত্র না। অবশ্য পূরবীর সামনে গিয়ে সে এখন দাঁড়াচ্ছে না, যাচ্ছে অন্য জায়গায়। বিছানার চাদরটা গায়ে জড়ানো, হলদে ঢোলা হাতের পাঞ্জাবিটা ক'দিন থেকেই ঘরের হুকে ঝুলছে, ওটা গায়ে চড়ালেই গিন্নী নাক সিঁটকাত না? হুঁ, 'আলখাল্লা', কবির 'আলখাল্লা', বাউণ্ডুলের পোশাক। চপ্পল জোড়ও তক্তপোষের তলায় ঢুকিয়ে রেখে ক'দিন থেকে সে খড়ম পরে হাঁটছে, কেননা, ওই ভারি সোলের মোটা মাথার চপ্পল পূরবী সহ্য করতে পারত না, ওটা পায়ে উঠলে রামানন্দকে আরও বেশি বোকা বোকা দেখায়, হাঁদা স্কুল-মাস্টার, তার মানে গাধা, বারো বছরের বেশি মাস্টারি করছে, অকর্মার ঢেঁকী—কাজেই উজবুকের মতন খাতা ভরতি করে কবিতা লেখা ছাড়া এই মানুষের উপায় কি। অনেক ভেবেচিন্তে চপ্পল ও পাঞ্জাবি পরা ছেড়ে দিয়ে একদিন পূরবীর টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে গিয়ে সে উপস্থিত হয়েছিল, গিন্নীকে সাধতে গিয়েছিল যদি ঘরে ফিরে আসে। রামানন্দর মুখে থুতু ছিটোতে বাকি রেখেছিল শ্রীমতী। রামানন্দ রাগ করেনি। পৃথিবীর কারো ওপর তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, ঘেন্না নেই। আজ ভোরের দিকেও ঘুম ভাঙতে খাটের পায়ার কাছে পূরবীর একটা ছেঁড়া ময়লা ব্লাউজ পড়ে আছে চোখে পড়তে তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সেটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর বিছানায় শুয়ে থেকে ওটাকে কয়েকবার চুম্বন করে।

হুঁ, রাগ দ্বেষ হিংসা ঘেন্না সে জয় করেছে। কেননা তার মন ঠিক হয়ে গেছে। মন ঠিক হয়ে যাবার পর পৃথিবীর সব কিছু ভাল সুন্দর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কাকের ঠোঁটে পচা ইঁদুর, ঘেয়ো পা চাটা কুকুর। সব কিছুই কবিতা, গান।

মন ঠিক হয়ে গেছে বলেই আকাশের ঘুড়ি আকাশে ছেড়ে দিয়ে সে মাছ ধরতে যাচ্ছে, স্প্রীং কেটে যাওয়া ঘড়ি গুঁড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলতে চলেছে, দেওয়ালে ঘষা খাওয়া নড়বড়ে ছবি আগুনে পুড়িয়ে দেবে।

মুখের সিগারেটটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস এসে গেল। রামানন্দ লাফিয়ে উঠে পড়ল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে সে খুশি হল। সে বীট কি হিপি, অ্যাংরী কি হাংরী—কেউ তাকিয়েও দেখছে না। কলকাতা শহরের এই মজা। অসাধারণ আধুনিক দুর্ধর্ষ কবি বলে শুভেন্দুরা যতই তাকে মাথায় নিয়ে নাচানাচি করুক, রাস্তায় ঘাটে সে কিছু না, সাধারণের চেয়েও সাধারণ, এই মাত্র একটা লোক জুতো দিয়ে তার পা মাড়িয়ে গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। টুঁ শব্দটি সে করতে পারল না। সে তো রামানন্দ, সেদিন দিগ্বিজয়ী ঔপন্যাসিক হেম মজুমদারকে এক

রিকশাওয়ালা চড় মারতে চেয়েছিল না! বাড়ির গাড়ি খারাপ, ওদিকে ট্যাক্সি স্ট্রাইক. রিকশা করে মজুমদার পাবলিশারের দোকানে যাচ্ছিল, জায়গায় পৌঁছে পয়সা নিয়ে খিটিমিটি করার সংগে সংগে রিকশাওয়ালা চোখ লাল করে কলকাতায় ডাকসাইটে সাহিত্যিককে চড় তুলেছিল। অনেকেই দেখেছে, বিকাশ তো কাছেই দাঁড়ান ছিল, উঁহু, আকাদমী পুরস্কার পাওয়া মানুষটাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে যায়নি। বরং রিকশা থেকে নেমে নতুন জুতোর কামড় খেয়ে কালাপাহাড়ি শরীরটা নিয়ে হেম মজুমদার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে বইয়ের দোকানে ঢুকছিল দেখে রাস্তার একগাদা মানুষ হি হি করে হাসছিল। বিকাশের মুখে এই রসাল গল্প শুনে মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে রামানন্দরা কম হেসেছিল কি।

বাস এসে নির্দিষ্ট স্টপে দাঁড়াতে রামানন্দ টপ করে নেমে পড়ল। ফাল্গুনের বেলা ফুরিয়ে গেছে। সূর্য ডুবু ডুবু। জায়গাটা তার মুখস্থ। দুদিন এসে ঘুরে দেখে গেছে। সরকারী পাকা সড়ক ছেড়ে সে কাঁচা মাটির রাস্তায় নেমে এল। পায়ের নিচে শুকনো পাতার মচমচ শব্দ হচ্ছিল। গাছে গাছে কিচিরমিচির পাখি ডাকছে। বুনো গন্ধ নাকে লাগছে। খানিকটা এগোবার পর রেললাইনের উঁচু পাড় চোখে পড়তে সে থমকে দাঁড়াল। ওই পথ ধরে মানুষ দূর-দূরান্তে চলে যায়। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল সে। 'আমার কবিতা নির্জন নিঃসঙ্গ রেললাইন, দূরান্তের ইশারা'—কার কবিতা? অমলেন্দুর? ভাল মনে নেই। একটা গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। টলটলে লাল রোদটুকু এক সময় মুছে গিয়ে একটা ধূসর ছায়া নেমে আসছে। দূরে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের সবুজ বাতি এর মধ্যেই বেড়ালের চোখ হয়ে জ্বলছে। সামনের সরু নালাটা ডিঙিয়ে লাইনের উঁচু পাড়ে উঠতে হবে। তারপর হুসহুস করে ট্রেন ছুটে আসবে। ঐ ট্রেন তাকে আসল ঠিকানায় নিয়ে যাবে। শুভেন্দু বিকাশ ডজন ডজন খাম পোস্ট-কার্ড লিখেও উত্তর পাবে না। অবশ্য কবিরা কোনোদিনই চিঠি লেখে না, ভয়ানক আলস্য, রবিঠাকুর তাদের কিছুই শিখিয়ে যেতে পারল না।

রামানন্দ হঠাৎ কান পেতে থাকল। উঁহু, গাড়ির শব্দ না, গাড়ির হুইসেলও না, অনেক দূরে কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে, বাঁশের বাঁশী? বৃন্দাবনের বাঁশী? নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার। কার কবিতা? মনে নেই।

কবিতা জিনিসটাই আজ তার মেজাজে নেই। ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ রেখে সে যে মাছ ধরতে চলে এল।

তবে এটা ঠিক, সে চলে যাচ্ছে বলে বৃন্দাবন অন্ধকার হবে না, কলকাতার মাছিটাও কাঁদবে না। শুভেন্দুর মনে একটু লাগবে এই যা।

ওরা কি রামানন্দর জন্য শোকসভা-টভা মতন কিছু করবে? কোথায় করবে? হল ভাড়া করার পয়সা কই ওদের। মোহন পালের চায়ের দোকানে? ওটা এমনি শ্মশানের মতন সারাক্ষণ খাঁ খাঁ করে। শ্মশানে বসে শোকসভা হয় না। একটু জনসমাবেশ চাই। না হলে শোক জমে না।

এক কাজ করলে পারে ওরা। একদিন সন্ধ্যাসন্ধি খালাসীটোলা চলে গেলে পারে। পরিচিত জায়গা। একটা বোতল নিয়ে বসে গেলেই হল। হুঁ, সন্ধ্যার দিকে শুঁড়িখানা তখন জমজমাট থাকবে। ওখানে বসে ওরা যদি কবি রামানন্দর জন্য শোক করে দুটো ভাল কথা বলে, এক সঙ্গে অন্তত দুশো-আড়াইশ' মানুষ শুনতে পাবে, কাগজওয়ালারাও কেউ না কেউ উপস্থিত থাকবে। পরদিন তাহলে আপসে খবরটা সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে যায়।

ট্রেনের শব্দ? রামানন্দ আর একবার কান খাড়া করে ধরল। না, প্লেন। প্লেন দেখতে সে কষ্ট করে আকাশে চোখ তুলল না। তার দরকার রেলগাড়ির। অথবা ইঞ্জিনের। লোকোমোটিভ ইঞ্জিন। বগি ছাড়া শুধু ইঞ্জিনও সময় সময় এই লাইনের ওপর দিয়ে হুস হুস চলে যায়। একদিন এসে সে দেখে গেছে। ঠিক এই গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখে গেছে। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছে।

বিষ, গলায়-দড়ি, ছোরা ক্ষুর ব্লেড—কোনোটাই তার মনঃপূত না। বুলেট? ওটা মন্দ না। কিন্তু বন্দুক রিভলবার সে পাচ্ছে কোথায়। তা না হলে ঐ যে ইংরেজ ভদ্রলোক লিখে গেছে, বুলেটই সব চেয়ে ভাল দাওয়াই, তা-ও বুকে না পেটে না, দুই ভুরুর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় নল চেপে ধরে তারপর ট্রিগার টিপতে হবে। অর্থাৎ আগেভাগেই ব্রেনটা শেষ করে দাও, মগজটা থেঁতলে দাও, তবেই আর কিছু টের পাবে না। তা না হলে আত্মহননের জন্য যে পথই তুমি বেছে নাও, যন্ত্রণা আছেই, মৃত্যু-যন্ত্রণা তোমাকে পোহাতেই হবে। ওটা এড়াতে পারছ না।

সুন্দর কথা। তখনই রেললাইনের চিন্তাটা তার মাথায় ঢোকে। এই জন্য এত লোক বুদ্ধি করে লাইনের ওপর মাথা পেতে দেয়। শোঁ করে ট্রেন ছুটে যায়। বাস্, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ, কিছুই টের পাওয়া গেল না। যেখানে যন্ত্রণাবোধ, মগজ, তার কলকব্জাই সকলের আগে চুরমার হয়ে গেল।

কিন্তু ভয়ানক বিস্মিত হবে শুভেন্দু, বিকাশ, তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। খবরটা শুনে হতভম্ব হবে। এই ছিল রামানন্দের মনে? তারা বলাবলি করবে, এমন করে নিজেকে শেষ করল! কেন, তার মনে কী দুঃখ ছিল, কোন্ অভিমান বুকে নিয়ে রামানন্দ আমাদের ছেড়ে চলে গেল? বাংলা দেশের মানুষ তার কবিতা পড়ে না? তার কবিতার বই কেনে না? এতকাল কাব্যচর্চা করে মাত্র একখানা কাব্যগ্রন্থই তো ছাপিয়ে বের করেছিল, তা-ও পাবলিশারের দোকানে পড়ে থেকে উইয়ের কামড়ে নষ্ট হচ্ছে। হোক না নষ্ট। না পড়ুক কেউ তার কবিতা, হুঃ, দুর্বোধ অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন, আমরা পড়ছি, আমরা কবিরাই তার একমাত্র পাঠক, আর কারোও তো অধিকার নেই এই কবিতার ওপর, একমাত্র আমরাই জানি রামানন্দ কী ও কে, কেমন তার কবিতা, হৃৎপিণ্ডের আগুন ছড়িয়ে যে আকাশে তারা ফুটিয়ে গেল, বিন্দু বিন্দু রক্ত ছিটিয়ে যে কবিতার বৃষ্টি ঝরিয়ে গেল—সেই কবি, আমরা বলব মহাকবি, উইপোকা আর বাংলা দেশের পাঠকের কথা ভেবে বিষণ্ণ ক্লান্ত হতাশ হয়ে পড়েছিল? এ যে বিশ্বাস করা কঠিন। তবে আর আমরা তার কাছে কী প্রেরণা পেলাম, আকাশে ডানা ছড়িয়ে সমুদ্রের দিকে উড়ে যাবার আশ্চর্য মন্ত্র বার বার কে আমাদের এতদিন শোনাচ্ছিল? এই মানুষ এত সহজে হেরে গেল! কি বললে? স্ত্রী? পূরবী? পূরবী ঘর ছেড়ে গেছে বলে রামানন্দ হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল? এ যে আরও হাস্যকর, আরও অবিশ্বাস্য। তা হলে তো বলতে হয় রামানন্দর সব ইমেজ সব ছবি সমস্ত রূপকল্প একজায়গায় কেন্দ্রীভূত ছিল, একটি শরীর ও একটি রূপের মধ্যে তার কবিতা, তার স্বপ্ন আটকে ছিল, সেই রূপ চলে গেল আর রামানন্দও ভেঙ্গে পড়ল, ফুরিয়ে গেল। আকাশ বাতাস হাতড়ে সে আর ইমেজ খুঁজে পেল না। তাই ভগ্ন ব্যর্থ শূন্য হৃদয় নিয়ে ট্রেনের চাকার নিচে মাথা পেতে দিল। তা কি সম্ভব? একথা কে স্বীকার না করবে যে রামানন্দ সেন পূরবীর স্বামী যতখানি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল শিল্পী, কবি। কতকাল আগের এম-এ পাশ, কত বড় চাকরি করতে পারত, হুঃ, যদি ক্যারিয়ার

তৈরীর দিকে তার মন থাকত, বৌয়ের মনোরঞ্জন করতে এত এত টাকা উপায় করত সে ঠিকই, কিন্তু তা সে করেনি, নিজেকে ভেঙে ভেঙে গ‍ুঁড়িয়ে, রেণ‍ু রেণ‍ু করে কবিতার আবীর তৈরী করেছে, আর তাই দিয়ে প্রাণভরে রঙ খেলেছে। কাজেই শ‍ুধ‍ু একজন স্ত্রী না, একটি প‍ুরবী না, দিকে দিকে তার ছবি তার র‍ূপ তার গান আনন্দ, তার বেদনা জ্বালা ছড়ানো ছিল। একটি আনন্দেই তার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা না, একটি জ্বালা নিয়ে সে মরত না, অনেক যন্ত্রণা, অনেক আনন্দ, অনেক গান ও কান্না নিয়ে শিল্পীর কারবার। আর এ-ও সত্যি, যদি মেয়ের কথাই ধার যায়, প‍ুরবীর চেয়ে ঢের ঢের স‍ুন্দর ম‍ুখ, স‍ুন্দর শরীরের মেয়ে রামানন্দর চারপাশে ঘ‍ুরঘ‍ুর করত, অটোগ্রাফের জন্য এসেছে, কবিতার জন্য এসেছে। কবিতা ব‍ুঝতে বা কবিতা লিখে রামানন্দকে শোনাতে আসত কত। তার ইমেজের অভাব হতো না। তবে?

সেই এক প্রশ্ন, চিরকালের 'কেন'। রামানন্দ কেন চলে গেল!

এবং চোখের সামনে রামানন্দ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল মোহনাবাব‍ুর চায়ের দোকানে টিমটিমে হলদে বালবের নিচে বসে তারা মাথার চুল ছিঁড়ছে, আঙ‍ুল কামড়াচ্ছে, যত ভাবছে তত বেশি জটিল হয়ে প্রশ্নটা শ‍ুভেন্দ‍ু বিকাশ ও তাদের ভক্তদের চোখের সামনে ঝ‍ুলছে, যেন কোনোদিনই এর সঠিক উত্তর, সরল সমাধান তারা খ‍ুঁজে বার করতে পারবে না। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে এক একজন লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছে।

হ‍ুঁ, খেয়াল—শেষ পর্যন্ত বিকাশ মাথা ঝাঁকাবে, অদ্ভুত খেয়াল রামানন্দকে পেয়ে বসেছিল, তাই এভাবে সে নিজেকে ধ্বংস করল।

মরণের খেয়াল, শ‍ুভেন্দ‍ু তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করবে, জীবনকে দেখতে দেখতে ম‍ৃত্যুকে দেখবার সাধ জেগেছিল রামানন্দর, জীবনের আলোর ওপিঠে ম‍ৃত্যুর অন্ধকার কেমন, জানবার ও দেখবার দ‍ুরন্ত লোভ এমনই তাকে পেয়ে বসেছিল, তাই এভাবে শিল্পী নিজেকে শেষ করল। খেয়াল ছাড়া আর কিছ‍ু না।

তাই। এছাড়া আর কিছ‍ু না। এখন মাঠের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রামানন্দ আর একবার নিজে নিজে হাসল। কবি আর্টিস্ট যখন আত্মহত্যা করে তখন সেটা খামখেয়াল ছাড়া আর কিছ‍ুই অর্থ বহন করে না। খ‍ুন করলে লোকে তাই বলে। যদি প‍ুরবীকে সে কোনদিন গলা টিপে মেরে ফেলত তখনও সেটা একটা প্রকাণ্ড খেয়াল হয়ে আকাশে বাতাসে ঝ‍ুলত। তার কারণ বা অর্থ নিয়ে মান‍ুষ মাথা খ‍ুঁড়ে মরত না। শিল্পীদের এই স‍ুবিধে। অবশ্য আদালতের বিচার আলাদা। ঈশ্বরপ‍ুত্র যীশ‍ুর আদালতে বিচার হয়েছিল।

ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালের আলোটা এইমাত্র রক্তজবার মতন লাল হয়ে উঠে এখন আধপাকা কমলালেব‍ুর হলদে রং ধরেছে। যেন দ‍ূরে গ‍ুমগ‍ুম শব্দ শোনা যায়, ট্রেন আসছে।

অবশ্য তাড়াহ‍ুড়োর কিছ‍ু নেই। যদি এই ট্রেন রামানন্দ মিস্‌ করে আবার গাড়ি আসবে। পরেরটা চেষ্টা করবে। এই লাইনে ঘনঘন গাড়ি আসে।

ধীরে-স‍ুস্থে সে রেললাইনের উঁচু পাড়ের দিকে এগ‍ুচ্ছিল। চারদিকের ধ‍ূসর ছায়া ইতিমধ্যে বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। পাখির কিচিরমিচির থেমে গেছে। ঝিঁঝির ডাক বাড়ছিল। প‍ৃথিবীর শেষ সন্ধ্যা শেষ অন্ধকার দেখতে সে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে আকাশটা দেখল, তারপর ঘাড় সোজা করে বাঁয়ে ঝোপজঙ্গলের দিকে চোখ ফেরাল। তারপর ডাইনে তাকাল। এবড়ো-খেবড়ো জমি, মাঝে মাঝে শ্যাওলা আগাছা নিয়ে প‍ুরোনো জীর্ণ ইটের পাঁজা দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা

যায়, এককালে এটা ইটখোলা ছিল। পিছন দিয়ে গাঁয়ের কাঁচা রাস্তাটা চলে গেছে।

হঠাৎ রামানন্দর চোখে পড়ল একটা ই'টের পাঁজার গা ঘে'ষে একটা মানুষ চুপ করে বসে আছে। রেললাইনের দিকে মুখ করে বসে আছে ঠিকই, কিন্তু এইমাত্র খুব মনোযোগ দিয়ে রামানন্দকে দেখছিল। কখন এসে লোকটা এমন চুপচাপ ওখানে বসে আছে! না কি আগেই ছিল, সে লক্ষ্য করেনি? সার্ট ট্রাউজার্স পরা, দেখলে ভদ্রলোকের ছেলেই মনে হয়। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে হাওয়া খেতে এল, বেড়াতে এসেছে?

খাও বাবা, হাওয়া খাও। রামানন্দ এই নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাল না। রেললাইনের দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। দূরের গুমগুম শব্দটা মিলিয়ে গেছে। গাড়ি না। অন্য কিছু। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের আলোটা এখন গাঢ় সবুজ রং ধরে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু এতটা সময়ের মধ্যে একটা ট্রেন এসে পড়া উচিত ছিল যে, আপ ডাউন কোনো গাড়িই আসছে না। কোথাও গোলমাল-টোলমাল হচ্ছে? আজকাল তো এই লাইনে সেই লাইনে গণ্ডগোল লেগেই আছে, ভাবল সে। কি মনে হতে তৎক্ষণাৎ আবার ই'টের পাঁজার দিকে সে চোখ ফেরাল।

যা ভেবেছিল, বেশ মনোযোগ দিয়ে লোকটা তাকে দেখছে। কিন্তু যেই রামানন্দ তাকিয়েছে, চট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে, যেন কত ভালমানুষ, রেল-লাইন দেখতে আরম্ভ করল।

কি ব্যাপার! রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। আমাকে এত দেখবার কী আছে, আমি তো মেয়েছেলে নই রে বাবা।

জায়গাটা খারাপ। সেদিন সে যখন এখান থেকে ফিরছিল একটা গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সংগে ওই রাস্তার বাঁকটার কাছে দেখা। গাড়োয়ান তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, এভাবে লাইনের ধারে একলা যাবেন না বাবু, খুব ছিনতাই-টিনতাই হয়, খুন-জখমও হয়, পরশু ওই ই'টের পাঁজাটার কাছে একটা লাস পড়ে থাকতে দেখা গেছে। রামানন্দ গ্রাহ্য করেনি, কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল।

এখন মনে পড়ল। কিন্তু মনে পড়ল বলে কি সে ঘাবড়ে গেল। ভুরু দুটো একবার কু'চকাল মাত্র। একটু হাসল। আমি তো নিজের গরজেই মরতে এসেছি রে শালা, ট্রেনের চাকার নিচে গলা দিতে এসেছি, তোর আর কষ্ট করে খুন না করলেও চলবে, কিন্তু কি চাইছিস তুই আমার কাছে? টাকাকড়ি? পকেটে চার আনা পয়সা আছে, যদি বুঝি যে এদিক-ওদিক কোনো দিক থেকেই আজ আর ট্রেন-ফ্রেন আসবে না, কোথাও বড় রকম গোলমাল কি রেলওয়ে স্ট্রাইকই বেধে গেছে, হামেশা যা হচ্ছে, বাসে করে বাড়ি ফিরে যাব। এই জন্যই সিকিটা রেখেছি, এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই। হাতের ঘড়িটা পরশু বেচে দিয়েছি, ঘড়ি ফাউণ্টেন পেন ও আলমারীর কিছু বই। যে জিনিসগুলো আমার প্রিয় ছিল। আড়াই শ' টাকা বাড়ি ভাড়া একলা গুনতে হয়েছে, ইয়ার্কি! ইস্কুলের মাস্টার, ক' টাকা মাইনে পাই। কবি গাধা মাস্টার স্বামীকে বেশ ভাল মতন ডুবিয়ে দিয়ে গুণবতী গিন্নী আলাদা ঘর ভাড়া করে চলে গেছে। এই দ্যাখ, আমি হিপি হয়ে গেছি, ঢোলা পাঞ্জাবি, ভারি সোলের চপ্পল পরলে শ্রীমতী মুখ বে'কাত, 'উজবুক' 'অকর্মার ঢে'কি' 'বাউণ্ডুলে' বলে গালাগাল করত, সেসব পোশাক পরাও ছেড়ে দিয়েছি, কাজেই বুকে ছোরা মেরে বা গলা টিপে ধরে ক'গাছা কাঁচাপাকা দাড়ি আর একমাথা জটধরা লাল চুল ছাড়া কিছুই পাবি

না এখানে। নিজের মনে কথাগুলি বলে রামানন্দ ভিতরে ভিতরে বেশ একটু রসিকতাই অনুভব করল।

কিন্তু সে লক্ষ্য করছিল, মহাপুরুষটির মতলব সত্যি সুবিধের না। খুব ঘনঘন তাকে দেখছে। যেন একবার উঠে আসতেও চেষ্টা করল। ইচ্ছা করে রামানন্দ লাইনের দিকে মুখটা ফিরিয়ে রাখল, এবং সেই অবস্থায় ডান চোখের মণিটা আড় করে রেখে সবই দেখতে পাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষল সে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দাঁড়াও শালা, তোমায় মজা দেখাচ্ছি গুন্ডা, কবিতা লিখি বলে দরকার হলে আমরাও যে ষণ্ডামী-গুণ্ডামী করতে একেবারে না পারি তা ভেব না। সেবার সিনেমা দেখতে গিয়ে হাতিবাগানের মোড়ে ভিড়ের মধ্যে এক কুত্তার বাচ্চা কিনা শুভেন্দুর হাতের ঘড়ির বেল্ট কাটতে চেয়েছিল, পেছন থেকে দেখতে পেয়ে এমন লাথি মেরেছিলাম শালার কোমরে, হুঁ এই শর্মা, কবি রামানন্দ সেন, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গিয়ে বাছাধন চোখ উল্টে দেয়, আর তোমার ঐ তো ডিমপাড়া শালিকের মতন টিনটিনে শরীর, একটা ঘুষি মারলে আর একটা ঘুষি বসাবার জায়গা নেই—

এতটা ক্রুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। চারদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতা, এমন গভীর সুন্দর সন্ধ্যা। আকাশের ওপারে সোনালি তারাটা ঝলমল করছে, এপারে আর একটা সবুজ তারা হয়ে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের বাতিটা জ্বলছে, এই মুহূর্তে সে কত কি ভাবছিল, জীবনের শেষ সময়, মৃত্যুর অন্ধকার দেশে সে চলে যাচ্ছে, এখনই হয়তো একটা ট্রেন ছুটে আসবে—হুঁ, কবিতা, মৃত্যুর ওপর ভয়ংকর সুন্দর একটা কবিতা, খাতার পাতায় লিখে রেখে গেলে জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হতো, মগজের কোষে কোষে দু-একটা চমৎকার শব্দও খেলা করে উঠছিল, আর ঠিক এই সময়টায় কিনা চোস্ত প্যান্ট হাওয়াই সার্ট চড়িয়ে ভদ্রলোক সেজে শুয়ারের বাচ্চা ওখানে ঘাপটি মেরে বসে চালাকি খেলছে, ভেবেছে কিছু আমি টের পাচ্ছি না।

সঙ্গে ছোরা-টোরা আছে? ধারে-কাছে কোথাও পটকা-ফটকা লুকিয়ে রেখেছে? তা থাকলই বা ছোরা পটকা। আমি তো মরতেই এসেছি।

রামানন্দ অবশ্য সরাসরি সামনের দিকে এগিয়ে গেল না। ডাইনে মোড় নিয়ে কোণাকোণি হেঁটে, যেন সে ফিরে যাচ্ছে, একটু একটু করে, ভাঙ্গা ইঁট ও আগাছা পার হয়ে কাঁচা মাটির রাস্তা ঘেঁষে একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। মানে ইঁটের পাঁজাটার সম্পূর্ণ পিছন দিকে চলে এল। তিন চার সেকেন্ড সেখানে অপেক্ষা করল। লোকটা কিন্তু তখনি ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাচ্ছিল না, রামানন্দ সন্দেহ করতে পারে, তাই যেন সময় নিচ্ছিল, অর্থাৎ আর এক সেকেন্ড পরেই ওদিক থেকে ছুটে এসে রামানন্দর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে, এই মতলব বা পিছন থেকে বোমা-টোমা ছুঁড়ে মারত, কিন্তু রামানন্দ বাছাধনকে সেই সুযোগই দিল না, তৎক্ষণাৎ আবার বড় বড় পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ইঁটের পাঁজাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'আহা—হা! করেন কি, করছেন কি মশাই, উঃ।'

'তুই কে, এখানে কি করছিস?'

'ছাড়ুন ছাড়ুন, লাগছে, ভীষণ লাগছে।' লোকটা হাঁসফাঁস করছিল, রামানন্দ শক্ত হাতে তার গলা চেপে ধরেছে।

'তুই কে, কোথা থেকে এসেছিস, এখানে এভাবে বসে কেন?'

'আমি আ-মি আর্টিস্ট, ছ—ছ—ছবি আঁকি।'

'অ্যাঁ।' রামানন্দ চমকে উঠল। তৎক্ষণাৎ মানুষটাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'কিসের ছবি আঁকা হয়, মশায়ের নামটা জানতে পারি কি?'

'জগত মণ্ডল।'

রামানন্দ রীতিমত স্তম্ভিত, বিমূঢ় হয়ে গেল। জগত মণ্ডলকে সে কোনো দিন দেখেনি, মুখটা চিনত না, তরুণদের মুখে খুব নাম শোনে, গত পরশু মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে শুভেন্দুরা মণ্ডলের ছবি নিয়ে ভীষণ আলোচনা করছিল। সম্প্রতি তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী হয়ে গেছে, একটু অদ্ভুত ধরনের প্রদর্শনী যদিও, হাজরার মোড়ে একটা পার্কের গাছের ডালে তাঁর আঁকা তৈলচিত্র-গুলি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। শুভেন্দু বিকাশ ওরা দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিল।

'ও, আপনি জগত মণ্ডল, নমস্কার।'

কিন্তু মণ্ডল তখনও স্বাভাবিক হতে পারছিল না, যেন ভয়ে কাঁপছে, না কি ভয়ের চেয়ে বিস্মিত হয়েছে বেশি, বড় বড় নিশ্বাস ফেলছিল। আবছা অন্ধকারে চোখ দুটো কত বড় দেখাচ্ছে।

'মশাই, আমি তো কারো অনিষ্ট করিনি, ক্ষতি করিনি, পেছন থেকে ছুটে এসে যেভাবে অ্যাটাক করলেন—

'না না, আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা চাইছি, এক্সকিউজ মী, আমি অন্য কিছু মনে করেছিলাম, সেদিন ঠিক এখনটায় একটা গুণ্ডা আমার মনিব্যাগ কেড়ে নিতে চেয়েছিল কিনা।'

জগত চুপ।

'হালে আপনার প্রদর্শনী হয়ে গেল।' আত্মীয়ের মতন গলার সুর করল রামানন্দ।

'হুঁ, ঐ আর কি।' আকাশের দিকে মুখ তুলে জগত মণ্ডল লম্বা নিশ্বাস ফেলল। তারপর চোখ নামিয়ে কেমন করে যেন হাসল। 'গাছতলার প্রদর্শনী। কোনো আর্ট গ্যালারী বা হলের ব্যবস্থা করা গেল না।'

'কেন!'

'বুঝতেই পাচ্ছেন', আঙুলের টোকা দিয়ে জগত মণ্ডল টাকা পয়সার ইঙ্গিত করল। 'আমার ছবি লোকে একেবারে নিচ্ছে না, তাদের কাছে এই জিনিস একেবারে দুর্বোধ অস্পষ্ট, কারো কারো মতে এসব নাকি ছবি না, নিছক আবোল-তাবোল আঁকিবুঁকি পাগলামী।'

রামানন্দ অল্প হাসল। 'হুঁ, আমার বন্ধুদের মুখে শুনেছি, আপনার আশ্চর্য কম্পোজিশন, আপনার অ্যাটিচিউড, আপনার ঐ যাকে বলে বিমূর্ত অঙ্কনরীতি সাধারণ মানুষ এখনো ধরতে পারছে না, তাতে অবিশ্যি কিছু যায় আসে না, লোকমনোরঞ্জনের জন্য আপনি কিছু তুলি ধরছেন না, নগদ বিদায়ের আশায় কিছু করছেন না, শিল্পীর খেয়াল নিয়ে যা করার করে যাচ্ছেন, আমার বন্ধুরা তাই বলছিল, আপনি আজকের ছবি আঁকছেন না, যা দিয়ে যাচ্ছেন ভবিষ্যতের সম্পদ হয়ে থাকল, আগামী কালের মানুষ আপনার ছবির সম্মান দেবে, মূল্য দেবে।'

'আর আগামী কাল!' জগত মণ্ডল কি হতাশায় থই থই করছে, গলার সুর শুনে রামানন্দর তাই সন্দেহ হল। 'এ কালে কিছু হল না তো আগামীকাল দিয়ে করব কি।' কথা শেষ করে মণ্ডল অন্ধকার রেললাইনটার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে রইল।

কাজেই রামানন্দর সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হল। ভুরু কুঁচকাল সে। এ

কথা কি সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায়। ইতস্তত করছিল।

'যাই হোক,' রামানন্দ শেষটায় মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি আপনার সাধনা করে যান, একদিন ফল পাবেন ঠিকই—ইয়ে, ভাল কথা', রামানন্দ আর যেন লোভ সামলাতে পারল না। 'কিছু মনে করবেন না, আমাদের প্রত্যেকের একটা করে বাইরের জীবন যেমন আছে, তেমনি ঘরের জীবনও আছে, আপনি শিল্পী, তাই আরো বেশি জানতে ইচ্ছে করছে—আপনার এই শিল্পচর্চা নিয়ে বাড়ির লোক কি বলছে?'

'কে? আমার ওয়াইফ?' যেন অনেক দুঃখে জগত মণ্ডল হাসল। 'ছবি এঁকে এক পয়সা আয় নেই, নিয়মমত রেশন তোলা হয় না, বাড়িভাড়া জমে গেছে—কাজেই বুঝতে পারেন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।' একটু থেমে মণ্ডল আবার বলল, 'কেবল কি স্ত্রী, ছেলে মেয়ে দুটো পর্যন্ত খেপে গেছে, তিনজন মিলে প্রায় তেড়ে মারতে আসে, বাড়ি থেকে আমার পালিয়ে বেড়াবার অবস্থা।'

'তাই বুঝি এখানে চলে এসেছেন!' চোখ দুটো গোল করে ফেলল রামানন্দ।

জগত মণ্ডল হঠাৎ কথা বলল না।

কিন্তু রামানন্দ সেখানেই থেমে থাকল না।

'নিশ্চয় ট্রেনের অপেক্ষা করছেন, কখন একটা গাড়ি ছুটে আসবে, তাই না?'

'গাড়ি!' আকাশ থেকে পড়ার মতন সুর করল মণ্ডল। 'আমি তো গাড়ি চড়ে কোথাও যাচ্ছি না, তা ছাড়া এখান থেকে স্টেশনটা অনেক দূর, মাঠের ওপর ট্রেন দাঁড়াবে কেন।'

'অ—অ—' অপ্রস্তুত হল রামানন্দ, লজ্জা ঢাকতে বড় করে একটা ঢোক গিলল। 'এমনি বেড়াতে এসেছিলেন?' কিন্তু কথাটা সে খুব বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'হুঁ', জগত মণ্ডল অন্ধকারে মাথা নাড়ল। 'একটু আগে কেমন টকটকে রং ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল, আবার দেখতে না দেখতে চারদিক অন্ধকার—'

'মানে লাল আর কালোর কম্পোজিশনটা কেমন দাঁড়ায় স্টাডি করছিলেন?' রামানন্দ ইচ্ছা করে কতকটা বেহায়ার মতন হাসল।

'কিন্তু মশায়ের এখনো পরিচয় পেলাম না।' জগতও অল্প শব্দ করে হাসল।

'আমার নাম রামানন্দ সেন।'

'কবি রামানন্দ সেন! মাই গড! নমস্কার নমস্কার, ছেলেছোকরারা, হুঁ, তরুণীরাও শুনি আপনাকে মাথায় করে নাচে, দারুণ সব আধুনিক কবিতা বেরোচ্ছে আপনার হাত দিয়ে—হঠাৎ এদিকে?'

'এই একটু ঘুরতে ঘুরতে—' রামানন্দ ঘাড় চুলকাল। 'ভারি নিরিবিলি সুন্দর জায়গা।'

'হুঁ, কবি শিল্পীদের বেড়াবার পক্ষে আদর্শ, আসুন সিগারেট খাওয়া যাক।' পকেট থেকে একটা দুমড়ান সিগারেট বের করে ছিঁড়ে জগত মণ্ডল আধখানা নিজে রাখল, বাকি আধখানা রামানন্দর হাতে তুলে দিল।

'তারপর?' আধখানা সিগারেট পেয়ে রামানন্দ মন্দ খুশি হল না। 'এখন কোন্ দিকে যাওয়া হবে, না কি সোজা বাড়ি?'

দেশলাইটা পকেটে ঢোকাল জগত, এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল। 'আপনি?'

'আমি কিছু ঠিক করিনি।'

'চলুন তা হলে, ওদিকটা কেমন রোশনাই হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন? একটু

ঘুরে আসা যাক।' জগত মণ্ডল একদিকে আঙুল তুলে দেখাল।

রামানন্দ দেখল অন্ধকার গাছপালার ওপারে গাঁয়ের দিকে বেশ আলোটালো জ্বলছে।

'কি হচ্ছে ওখানে?'

'যাত্রা, ক'দিন ধরেই হচ্ছে, আজ শুনছি নবারুণ অপেরার মুসোলিনি পালা হবে।'

'বাঃ, চমৎকার, বেশ তো!' রামানন্দ খুশি হল। 'চলুন দেখে আসা যাক।'

'আর ঐ যে দূরে আর একটা আলো দেখতে পাচ্ছেন?' জগত আর একদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

'হুঁ', রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'ওখানে কি!'

'শতরূপা নাট্যগোষ্ঠীর মিনি নাটক থুড়ি নাটিকা হচ্ছে।'

'সে আবার কি!' রামানন্দ বিড় বিড় করে উঠল।

'বা-রে, আপনাদের যেমন দিনের কবিতা ঘণ্টার কবিতা মিনিটের কবিতা লেখা হয়, মিনি পত্রিকা মিনি উপন্যাস ছাপা হয়, তেমনি ওদেরও মিনি নাটক থুড়ি নাটিকা, হুঁ, এক মিনিটে একটা নাটক শেষ—একঘণ্টা বসলে এক সঙ্গে ষাটটা অভিনয় দেখে আসবেন।'

'চমৎকার!' রামানন্দ গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'দেশে শিল্প সংস্কৃতির বান ডাকছে, আমাদের এখনো একেবারে নিরাশ হবার কিছু হয়নি।'

'তাই', রামানন্দর কাঁধে হাত রাখল জগত। 'চলুন দু' জায়গায়ই একটু করে উঁকি দিয়ে দেখে তারপর ময়দানে সার্কাস দেখতে যাব, না কি বেশ্যাবাড়ি যাবেন? চলুন তা হলে, দু' ভাইয়ে মিলে আনন্দ করতে বেশ্যাবাড়ি চলে যাওয়া যাক।'

'রেস্ত?' রামানন্দ এবার হাসল। 'আমার পকেটে মাত্র একটা সিকি।'

'ঘাবড়াচ্ছেন কেন। আমার কাছে রেস্ত আছে। জগত মণ্ডলের ছবির ভবিষ্যৎ বুঝতে পেয়ে ভয় পেয়ে গিন্নী একটা কারখানায় ঢুকে পড়েছে, কাল গেল মাসের মাইনে নিয়ে ঘরে ফিরতে ওর ব্যাগ থেকে কুড়িটা টাকা চুরি করেছি।' অন্ধকারে দাঁত বার করে জগত হি-হি করে হাসল। 'তবে ওর টাকা আমি রাখব না, ফিরিয়ে দেব, এক কুড়ি এনেছি, পাঁচ কুড়ি ওর হাতে তুলে দেব এমন দিনের আশা রাখি, কি বলেন?'

রামানন্দ চুপ, কথা বলতে পারছিল না, তার মনে হল এই ব্যক্তি কোনোদিন লাইনের ধারে ছুটে যাবে না, ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ রেখে কোনোদিনই মাছ ধরতে আসবে না, বরং যেন এক সঙ্গে তিনটে ঘুড়ি ওড়াবার ক্ষমতা রাখে সে। সেই মেজাজ সেই প্রফুল্লতা নিয়ে, সেই বিক্রম ও হিংস্রতা নিয়ে বড় বড় পা ফেলে জগত মণ্ডল হাঁটছিল, রোগা টিনটিনে শালিক না, রামানন্দর মনে হল বাঘের সঙ্গে চলেছে সে, এক খাঁটি শিল্পীর দেখা পেল। মণ্ডল গলা খুলে গান গাইছিল।

॥ ২ ॥

যেন খানিকটা খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে। পায়ের বুড়ো আঙুলটা এমন টাটাচ্ছে, নখটা উল্টে গেল? উবু হয়ে সে দেখল। উল্টে যায়নি, তবে রক্ত বেরোচ্ছে, একটু চামড়া ছড়ে গেছে। কিন্তু এত ব্যথা লাগছিল, মনে হতে পারে আঙুলটা

বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বাস থেকে নামতে গিয়ে এই বিপত্তি। নেমেছিল ঠিকই, বাসের কিছু দোষ নেই, পিছনে রিকশা সামনে ট্যাক্সি, তাড়াতাড়ি গা বাঁচাতে রাস্তা ছেড়ে পেভমেণ্টে উঠতে গিয়ে কিনারার শানের গায়ে হোঁচট খেয়ে, ভাগ্যিস উল্টে পড়ে যায়নি, কিন্তু এমন লাগল আঙুলটায়। স্যাণ্ডেল পরে রাস্তায় চলার এই সুখ, যখন তখন আঙুলে চোট লাগতে পারে, যে কোনো জায়গায় খোঁচা-টোচা লেগে গোড়ালি জখম হতে পারে।

না রে দাদা, নিজের মনকে সে অবশ্য তৎক্ষণাৎ প্রবোধ দিল, পাম্পসু কি ডার্বি পরে হাঁটলেও যখন বিপদ আসার ঠিকই আসে, কপালে দুর্ভোগ থাকলে জুতো খুলে রেখে ঘরের বিছানায় বসে থাকলেও তা এড়ান যায় না। বলে কিনা দুর্বিপাকের ধরাবাঁধা কোনো সড়ক নেই যে মহাশয়টি ঠিক ওদিক দিয়ে কি এদিক ধরে আসবে, আর তুমি বর্মটর্ম পরে তৈরী হয়ে থাকবে যাতে তোমার কেশাগ্রটিও কিছুতেই স্পর্শ করতে না পারে। তবেই হয়েছিল আর কি। কে বলবে, সু পরা থাকলে নির্ঘাত হয়তো হুমড়ি খেয়ে সে পেভমেণ্টের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যেত, বরং পায়ে চটি ছিল বলে আঙুল ও গোড়ালির কিছুটা জোর ছিল, তার মানে খাড়া অবস্থায় ওরা কিছুটা কাজ করতে পারছিল, ডান পা-টা যখন পেভমেণ্টের উঁচু কার্নিশের গায়ে ঠোক্কর খেল তখন বাঁ পায়ের পাঁচটা আঙুল ও গোড়ালি দিয়ে শক্ত করে মাটি চেপে ধরে সে পড়তে পড়তেও সোজা হয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে তো রইল, পাম্পসু কি ডার্বি জুতোর বন্ধ খোলের ভিতর পা আটক থাকলে তা আর সম্ভব হতো না। সে পড়ে যেত, আর সঙ্গে সঙ্গে চর্তুর্দিক থেকে হাঁ-হাঁ করে সব ছুটে আসত, দৃশ্যটা কল্পনা করে তার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। হয়তো জখম তেমন কিছু না, কিন্তু রাস্তার হাজারটা মানুষ গলা বাড়িয়ে দিয়ে এমন সব জেরা আরম্ভ করত, হয়তো ওই অবস্থায় মাটিতে পড়ে থেকেই তাকে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো, উঁহু, কেবল উত্তর দিয়েই কাজ শেষ হতো না, তারা তার কাছ থেকে সদুত্তর আশা করত। সদুত্তর, এলোমেলো কিছু বললে কেউ কানেই তুলত না। তার মানে একটা মানুষ ধপাস্ করে এমন প্রকাশ্য রাস্তার ওপর পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বিচার আরম্ভ হয়ে যেত, তাকে টেনে তুলে সুস্থ করার আগেই তারা জেনে নিতে চাইত, নিজের দোষে ভদ্রলোক এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, না কি ওই রিকশাটা গায়ের ওপর এসে উঠতে চেয়েছিল, না কি ওই ট্যাক্সিটা, বলুন বলুন মশাই, এখনো সময় আছে, ট্রাফিক জ্যাম হয়ে ওই তো মোড়ে লাল বাতি জ্বলছে, এখনো শালা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পালিয়ে যায়নি. এমন শিক্ষা বেটাকে দেব, আপনি দেখবেন, বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব, বেটার লাইসেন্স কেড়ে নেব, গাড়িটা জ্বালিয়ে দেব—বলুন, না কি ওই কলার খোসাটায় আপনার পা পড়েছিল, ফুটপাথের ওপর শুয়োরের বাচ্চা কলার দোকান সাজিয়ে বসেছে, ওই কলা খেয়েই তো কেউ খোসা ফেলে গেছে, একবার ঠিক করে বলুন মশাই, রাস্তার ওপর দোকান নিয়ে বসার কেমন সুখ এখনি টের পাইয়ে দিই বাছাধনকে—

ভাগ্যিস সে পড়ে যায়নি, হাজারটা মানুষ এখনি তাকে ছেঁকে ধরত। আঙুলের ব্যথা নিয়ে চেহারাটা সে একটু বিকৃত করল মাত্র, হুঁ, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে, কিন্তু খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না, মনে মনে ঈশ্বরকে সে ধন্যবাদ জানাল, তারপর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে এদিক ওদিক তাকাল, একটু ডেটল কি আইডিন লাগাতে পারলে ভাল হয়। ওদিকে একটা ডিস্পেনসারী দেখা যাচ্ছে না? কলকাতা শহরে ডিস্পেনসারী ক্লিনিকের অভাব! টিটেনাস ইনজেকশন নিতে

হবে? না, সেই পয়সা আমার নেই। এমনি একটু ডেটল কি আইডিন দিতে হয় দিন, আঙুলটায় লাগিয়ে দিই। তারপর যা হবার হবে। তাই তো, সামান্য একটু রক্ত দেখে বা চামড়া ছড়ে যাওয়া দেখে যদি তার ধনুষ্টঙ্কারের ভাবনা ভাবতে হতো, তবেই হয়েছিল আর কি। অবশ্য সামান্য থেকেই অনেক কিছু হয়। শুভেন্দুদের অফিসের এক ভদ্রলোকের স্ত্রী নাকি ব্লেড দিয়ে নখ কাটছিল, একটা নখের কোণায় ব্লেডটা সামান্য বসে গিয়েছিল, আলপিনের খোঁচার মতন একটু ব্যথা লেগেছিল, এমন তো রাতদিন কতই হয়। বঁটি দিয়ে আনাজ কুটতে বসে কতশতো মেয়েদের আঙুল কাটে, নখের কোণা ছড়ে যায়, কাজেই ভদ্রমহিলাও ব্লেডের কাটা নিয়ে তেমন কিছু মাথা ঘামাননি, ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আঙুলের মাথায় জড়িয়ে রেখেছিল। তা-ও একটু সময়। ঘরে আইডিন-ডেটল কিছু ছিল না বলে লাগাতে পারেনি, ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল না বলে ঘরে চুন ছিল না, একটু চুন লাগিয়ে দিলেও কাজ হতো, কিন্তু চুন আইডিন বা ডেটল থাকলেও যে মহিলা মনোযোগ করে সেটা লাগাত তারও কিছু ঠিক ছিল না, অর্থাৎ সামান্য কাটা বলে তেমন একটা গুরুত্বই দেয়নি। বিকেলের দিকেই আঙুলের মাথাটা বেশ ফুলে ওঠে, সন্ধ্যার দিকে গায়ে জ্বর এল, রাত্রে হাতের দারুণ যন্ত্রণা, তবু বাড়ির লোকের হুঁশ নেই, বাড়ির লোক বলতে শুভেন্দুর বন্ধু—ভদ্রমহিলার স্বামী আর ভদ্রলোকের বুড়ি মা। বউ যন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখে শাশুড়ি নাকি সেই রাতদুপুরে পাশের বাড়ি থেকে একটু চুন যোগাড় করে এনে হলুদ বাটার সঙ্গে নরম করে বউ-এর আঙুলে লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তাতে কতটা কাজ হয়েছিল বলা মুশকিল, শেষরাত্রের দিকে মহিলা অচৈতন্য হয়ে পড়ে, ভদ্রলোক অগত্যা তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটে যায়, ডাক্তার এসেই মহিলাকে হাসপাতালে পাঠাবার পরামর্শ দেয়, কিন্তু হাসপাতাল তো আর বাড়ির কাছে না। শুভেন্দুর বন্ধু বেলঘরিয়া থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতার অফিসে এসে চাকরি করে—বেলঘরিয়া আর ধনুষ্টংকার চিকিৎসার হাসপাতাল কোথায়, কাজেই যেহেতু ওই অবস্থায় মহিলাকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া ও ট্রেনে তোলা সম্ভব ছিল না, ওখান থেকে একটা লরি যোগাড় করে কলকাতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু ওই পর্যন্ত, লরিতে তোলার আগেই মহিলা মারা যায়।

নিজের আঙুলের অবস্থা দেখে কথাটা হুট করে তার মনে পড়ল। কিন্তু সে তো আর জখম আঙুলের অবহেলা করছে না, নিতান্তই যদি ওই সামনের মহামায়া ফার্মেসীর লোকেরা ডেটল-আইডিন দিতে না চায়—না দেওয়াটা অবশ্য কাজের কথা না, রাস্তার ওপর ওষুধের দোকান, বিনিপয়সায় কেউ ফার্স্ট এইড চাইলে তাকে দিতে হয়, এটাই নিয়ম—হুঁ, সেরকম কিছু দেখলে সে কিছু খিচিমিচি করবে না, ঝগড়াঝাঁটি বাধাবে না ওদের সঙ্গে, ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পাশের পানের দোকানে একটু চুন চেয়ে নিয়ে আঙুলে লাগিয়ে দেবে, তারপর যা হয় হবে।

তাই তো, তারপর কপালে যা থাকে।—পায়ের এই থেঁতলান বুড়ো আঙুল ফুলে উঠবে, জ্বর হবে, সংজ্ঞা লোপ পাবে, তারপর আস্তে আস্তে ধনুকের মতন শরীরটা বেঁকে উঠে—সমুদ্রে যার শয়ন তার আবার শিশিরে ভয়! মরণের কথা চিন্তা করে রামানন্দ মনে মনে হাসল। ট্রেনের চাকার তলায় যে ব্যক্তি কিনা মাথা পেতে দিতে ছুটে যায়।

আসল কথা, টিটেনাস শব্দটা মনে হতেই শুভেন্দুর অফিসের বন্ধুর স্ত্রীর

কথাটা তার মনে পড়ল। শুভেন্দুর বন্ধুকে রামানন্দ চোখে দেখেনি, ভদ্রমহিলাকেও না, সেদিন মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে শুভেন্দু ওই শোচনীয় অকাল মৃত্যুর গল্প করছিল। এবং আবেগের আতিশয্যে শুভেন্দুর ঠোঁট থেকে সেদিন এত কথা বেরিয়ে পড়ে। ভীষণ সুন্দর ছিল মহিলা দেখতে, আর রান্নার নাকি যা হাত ছিল! শাক ছেঁচড়া থেকে আরম্ভ করে মাছের কালিয়া, মাংস, মুড়িঘণ্ট—দুদিন শুভেন্দু বন্ধুপত্নীর হাতের রান্না খেয়েছিল, তার একটা জিনিস অদ্ভুত তৈরি করতেন মহিলা—পুডিং। কলকাতায় কোনো হোটেল-রেস্তোরায় এমন পুডিং হয় না। অন্তত শুভেন্দু খায়নি। কাজেই বেলঘরিয়ার বন্ধুর স্ত্রীর হাতের রান্না তার জিভে লেগে আছে। খাওয়ার গল্প আরম্ভ করলে শুভেন্দু অবশ্য থামতে চায় না। রামানন্দর দলে শুভেন্দুর পেটুক বদনাম আছে, ভীষণ খেতে পারে সে, তার খাওয়ার ব্যাপারে লোভটাও বেজায়রকম; মোহনবাবুর দোকানের বাসি কাটলেট দেখলে, কি পচা ডিম দিয়ে যদি অমলেট ভাজা হয়, তাতেও তার জিভে জল আসে। এমনি ও অবশ্য বড়লোকের ছেলে, ঘরে খায়-দায় ভাল, হজম করতেও পারে খুব, টকটক করছে গায়ের রঙ, চওড়া বুক, মোটা কব্জি, চোখ দুটো বড় বড় এবং শুভেন্দু নিজেও স্বীকার করে কম খেয়ে বা খারাপ খেয়ে কোনোদিনই সে লিখতে পারে না, ভালমন্দ কোনোরকম আইডিয়াই তার মাথায় খেলে না—সেদিন সেই ভদ্রমহিলার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে তাঁর হাতের রান্নার সে এত প্রশংসা করছিল। রামানন্দ এবং তার বন্ধুরা ভেবেছিল, এই পর্যন্ত বলে শুভেন্দু থেমে যাবে, অর্থাৎ হঠাৎ বন্ধুপত্নী মরে গিয়ে তার হাতের ভাল ভাল রান্না খাওয়ার রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গেল বলে শুভেন্দু বুঝি মনমরা হয়ে গেছে, কিন্তু কেবল তা তো না, পরে দেখা গেল শুভেন্দু আবার বন্ধুপত্নীর গায়ের রঙ, শরীরের গড়ন, চুল চোখ ও ভুরুর ব্যাখ্যায় ফিরে গেছে, এবং সবাই অবাক হয়ে শুনল, বেলঘরিয়ার সেই রূপসীকে দেখেই নাকি সে তার বিখ্যাত 'সোনার শালিক' কবিতাটা লিখে ফেলেছিল। এবং অবাক হয়ে রামানন্দরা লক্ষ্য করল, শুভেন্দু সত্যি তখন হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছছে।

মহামায়া ফার্মেসীর কম্পাউন্ডারটি বড় ভাল। মুখ কালো তো করলই না, নিজের হাতে ডেটল ভেজানো তুলো এনে যত্ন করে রামানন্দর পায়ের আঙুলে লাগিয়ে দিল। লোকটাকে তখন মায়ের মতন মনে হচ্ছিল।

এখন সে নিশ্চিন্ত। রাস্তায় নেমে দেখল, যেন এই সে প্রথম দেখল, বৌবাজারের মোড় এটা, রোদ চড়ে গেছে, এতক্ষণ কানে কপালে রোদ লাগছিল, এবার ব্রহ্মতালুর ওপর গরম বল্লমের খোঁচা সোজাসুজি লাগছে। হয়তো লালগোলার গাড়ি শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকেছে, না কি বনগাঁর গাড়ি। উঁহু, মানুষ দেখা যাচ্ছে না, যাত্রী না, কেবল আনাজের ঝাঁকা, টমটো, কাঁচকলা, বেগুন, কড়াইশুঁটি, কপি, কুমড়ো—অ্যাঁ, এর মধ্যেই পটল বেরিয়ে গেল, কচি ঝকঝকে, কী সাংঘাতিক সবুজ রং, মোটে তো ফাল্গুন শেষ হল। ব্যস, আর কথা নেই, তিন টাকা কেজি ঠিক বিক্রী হবে তাও বাজারে পড়তে পারবে কি, চিলের মতন ছোঁ মেরে সব তুলে নিয়ে যাবে। না হলে আর ভাল করে শীত না ফুরোতে কষ্ট করে পটল ফলান! অবাক হয়ে কুলিদের মাথায় চাপানো আনাজের ঝাঁকাগুলি সে দেখছিল। এক দুই করে গুণে শেষ করা যায় না, এত আনাজ কোথা থেকে আসে, কেন আসে। তাই তো, কলকাতা শহরে তো আর দু'-চারটি মানুষ না। আনাজ খাইয়ে সকলের পেট ভরাতে হবে। অক্ষয় সমাদ্দারের মতো প্রোটিন সকলের কপালে জোটে! ঝাঁকা নিয়ে কুলির দল পিল পিল করে কোলে মার্কেটের জাহাজের

খোলের মতন প্রকাণ্ড বিল্ডিংটার ভিতর ঢুকে পড়ছিল। আরও আসছে, সেই শিয়ালদা স্টেশন থেকে আরম্ভ করে এতটা রাস্তা কেবল আনাজ আর আনাজ। উচ্ছে বেগুন পটল মুলো, বেতের বোনা ধামা কুলো—উঁহু, ধামা নেই, কিছু সাদা মুলো দেখা যাচ্ছে বটে, সবুজের ভাগটাই বেশি, সবুজের ওপর রোদ পিছলে পড়ে রীতিমত রাস্তার লাবণ্য বেড়ে গেছে। ট্রাম বাস ট্যাক্সি প্রাইভেট, দু' ধারে অসংখ্য দোকানপাট, হই-হল্লা, পেট্রোল ডিজেলের পোড়া গন্ধ, পথচারী অগুণতি মানুষের কালো কালো মাথা—হঠাৎ এই সবুজের মিছিল দেখতে কার না ভাল লাগে। কারো ভালো না লাগুক রামানন্দর ভাল লাগছিল। দেখ দেখ, কেমন নধর টুসটুসে লেডিজ ফিঙ্গার এসে গেছে, কি কাণ্ড, ঐ তো ঝিঙে এসে গেল। কলকাতার মানুষকে বসন্তেই বর্ষার তরকারী খাওয়াতে চাষীদের কী অদম্য উৎসাহ।

রামানন্দ মনে মনে হাসল এই জন্য, ট্রাম-বাসের ভিড়ের মধ্যে এই সবুজের মিছিল দেখে তার যেন কবিতাই মনে পড়ে গেল। যেমন কচি নেবুপাতার মতো নরম সবুজ ঘাস দেখে একদা এক কবির ইচ্ছা করছিল ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতন গেলাসে গেলাসে পান করতে, ঘাসের শরীর ছানতে, চোখে চোখ ঘষতে। শেষ পর্যন্ত কিনা ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাবার জন্য কবির আকুলতা। ঝাঁকা ভরতি কচি কাঁচা পটল ঝিঙে বেগুন কুমড়ো দেখে রামানন্দরও এখন ইচ্ছা করছিল হাত দিয়ে সেগুলি দু হাতে কচলায়, গন্ধ শোঁকে, কুলির মাথা থেকে এক একটা ঝাঁকা টেনে নামিয়ে থেঁতলে খানিকটা করে উচ্ছে পটল ঢেঁড়স ঝিঙের কাঁচা রস খেয়ে নেয়।

আমাদের কত রকম ইচ্ছে না হয়। শুভেন্দু এখন কাছে থাকলে ঠিক বলত, গরম গরম পরটা ও কচি পটল কি বেগুন ভাজা খেতে ইচ্ছে করছে। বিকাশ? না না, বিকাশের ভিতরটা প্রায় দু মাস ধরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, লিভার সহ্য করতে পারছে না বলে দেশী বিলাতী সবরকম একদম বন্ধ, অন্তত একটা বীয়ার খেতে পারলেও যেন বেচারা বেঁচে যেত, কিন্তু ইংরেজী মাসের মাঝামাঝি, মাইনে পেতে এখনও ঢের দেরি, এর মধ্যেই তার পকেট ফাঁকা হয়ে গেছে জানা কথা। মোহনবাবুর চায়ের দোকানে আমরা কবিরা যখন একত্র হয়ে কবিতা আলোচনা করেছি, কবিতা পাঠ করেছি, দেখতাম বিকাশ তখন দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বড় বড় হাই তুলছে, কপাল ভুরু কুঁচকোচ্ছে, বেশ বোঝা যেত তার খুব অসুবিধা হচ্ছে, কাব্য আলোচনায় মন দিতে পারছে না, এমন কি দু মাসের মধ্যে একটাও নতুন কবিতা লিখতে পারেনি বেচারা। জানি না এখন এখানে উপস্থিত থাকলে আমার মতন শুভেন্দুর মতন কপি বেগুন ঝিঙে পটল খেতে ইচ্ছে করত কিনা তার, না কি ঐ যে ঝাঁকা ভরতি করে কচি ডাব নিয়ে যাচ্ছে, যেহেতু তার ভিতরটা শুকিয়ে ফুটিফাটা হয়ে আছে, চোঁ চোঁ করে বিকাশ ডাবের জল খেতে চাইত। কিন্তু রামানন্দ তা যেন ভরসা করতে পারল না, কদিন থেকে এমন খিটখিটে মেজাজ হয়ে আছে ওর—বলা যায় না, ডাব খাওয়ার প্রস্তাব দিলে না চটেপটে কুলিদের ওই ঝাঁকা থেকে একটা ডাব তুলে নিয়ে বিকাশ রামানন্দর মাথায় ছুঁড়ে মারত।

এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করে রামানন্দ মজা পেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। তার কি খেয়াল নেই বৌবাজারের মোড়ে দারুন ভিড়ের রাস্তায় সে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় এখানে একা একা হাসছে দেখলে যে কেউ তাকে পাগল-টাগল কিছু একটা ঠাওরাত। কিন্তু রামানন্দর এটা ভাল জানা আছে, ভিড়ের মধ্যেই নির্জনতা

বেশি, কেউ কারো দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকায় না, এখানে অনেক শব্দ, অনেক ছবি; কাজেই যে কোনো একটা শব্দ, যেমন এইমাত্র যেভাবে সে শব্দ করে হাসল, যে কোনো ছবি, যেমন হাসতে গিয়ে তার পুরু ঠোঁট দুটো যেভাবে ফাঁক হয়ে গেল, আলজিভটা প্রায় বেরিয়ে পড়ল, তামাটে রঙের মার্বেলের গুলির মতন চোখের মণি দুটো একটু চ্যাপ্টা হয়ে বড় হয়ে উঠে প্রায় সারা চোখে ছড়িয়ে পড়ল—কেউ দেখল না।

আসল কথা, শুভেন্দু বিকাশ নবকিশোর উৎপলেন্দু অরুণাভ এবং তাদের কচিকাঁচা আরো ক'টি ভক্ত, অর্থাৎ তারা যে ক'জন কবি শিল্পী বন্ধু কলেজ স্ট্রীটে মোহন রেস্টুরেন্টে একত্র হয়ে রোজ আড্ডা দেয়, তাদের কারো সঙ্গে রামানন্দর আজ কতদিন দেখা হচ্ছে না। তার সম্পর্কে তারা কী ভাবছে কে জানে। হঠাৎ প্রত্যেকটা মুখ রামানন্দর মনে পড়ে গেল। চোখ তুলতে সে দেখল গীর্জার মাথার ঘড়িটায় কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। আজ তার স্কুল ছুটি। ছুটির দিন ছেলেরা যেমন সারাদিন খেলাধুলা করতে ভালবাসে, এখানে ওখানে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি মাস্টারমশাই রামানন্দরও খুব বেড়াতে-টেড়াতে ইচ্ছা করছিল। এ-বেলা অবশ্য তা সম্ভব হয়নি। ইচ্ছা আছে ওবেলা একবার কলেজ স্ট্রীটে ঢুঁ মারবে, মোহনবাবুর চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে যাবে। নিশ্চয় এই ক'দিনে সাহিত্যের বাজারে মেলা খবর বন্ধুদের পেটে জমা হয়ে আছে, রামানন্দ সেখানে পা দেওয়া মাত্র তারা বমি করতে আরম্ভ করবে।

আশ্চর্য, রামানন্দ বুঝতে পারছিল না, এই যে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কলকাতার কবিতার হাট বা সাহিত্যের বাজারের আর কোনো খোঁজখবরই রাখবে না, কোনো কবি বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করবে না, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যাবে সে, হুঁ, যতক্ষণ স্কুলে মাস্টারী করার করবে, বাকি সময়টা অক্ষয়ের হাঁস-মুর্গি নিয়ে কাটাবে। কোথায় গেল প্রতিজ্ঞা। ভাল করে সাতদিন পার হল না, এখনি আবার সে উসখুস করছে মোহনবাবুর দোকানের মধুর আড্ডায় ফিরে যেতে, না জানি কত কি খবর নিয়ে বন্ধুরা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

এই জন্যই কি কথায় বলে, সাহিত্যের রোগ। একবার যাকে ধরেছে তার আর রক্ষে নেই? নিমতলা পর্যন্ত ব্যারামটি সঙ্গে যাবে?

নিজের ওপর রামানন্দ অসন্তুষ্ট হল কম না। বিকেলে শুভেন্দুদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটা বাতিল করে দেবে কিনা নতুন করে সে ভাবতে আরম্ভ করল।

আনাজের মিছিল শেষ হয়ে রাস্তাটা একটু পাতলা হয়েছে। ট্রাম বাস পুরো দমেই চলেছে। রিকশা ঠেলারও কমতি নেই। কিছু লালবাজারের দিকে যাচ্ছে, কিছু এদিকে শেয়ালদার দিকে আসছে।

ওপারের রাস্তায় একটা বেশ বড়সড় দোকান দেখা যাচ্ছে, রামানন্দ যতদূর জানে চা কফি দুটোই রাখে ওরা। মাধুরী কফির কথা বলে দিয়েছিল। রামানন্দ ভুলেই গিয়েছিল। টিনের কফি মাধুরী খেতে পারে না। মদ্রাজের কফি বাগান থেকে পেটি ভরতি হয়ে যেসব দানা দানা কফি কলকাতায় চালান আসে প্যাকেটে করে, সেসব কফিই অক্ষয় মাধুরীর জন্য কিনে নিয়ে যেত। রামানন্দ দেখেছে টিনের কৌটোয় করে যেসব কফি বাজারে বিক্রী হয় সেগুলি ভয়ানক মিহি। পাউডারের মতন। গরম জলে ছেড়ে দিলেই হল। ছাঁকতে হয় না। কিন্তু সেই কফি খেয়ে মাধুরীর মোটেই নেশা জমে না। রামানন্দ অবশ্য তেমন কফির ভক্ত না। তার মানে কফি খেতে যে তার ভাল লাগে না এমন না, কিন্তু কফি না হলেই

চলে না এতটা নেশা তার নেই। সময়ে চা বা কফি, যে কোনো একটা পেলেই তার চলে। যে কোনো একটা খেয়ে সে সমান তৃপ্তিবোধ করে। পেটির দানা-কফি আর টিনের মিহি কফির পার্থক্যটা তার একেবারেই জানা ছিল না। কাল বিকেলে মাধুরীর মুখে শুনে সে ব্যাপারটা জানল।

দু' তিনদিন মুখ কালো করে থাকার পর কাল বিকেলে মাধুরীকে প্রথম হাসতে দেখা গেছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল হাসিটা। শ্রাবণ মাসে একটানা তিনদিন বাদলার পর হঠাৎ এক বিকেলে ঝিঙে ফুলের মতন হলুদ বরণ রোদ উঠলে যেমন দেখায়। তা ছাড়া কাল চুলটাও একটু ভাল করে বেঁধেছিল, ক'দিন না-তেল না-জল, কেমন রুখু লালচে দেখাচ্ছিল মাথাটা, অথচ প্রচুর ঘন কালো চুল ওর মাথায়, এক কথায় কেশবতী বলা যায়। কিন্তু ঐ যে, অক্ষয় খুব বমিটমি করল, পায়খানার সঙ্গে একটু রক্ত দেখা গেল, হাসপাতালে দেওয়া হল তাকে, সেদিন থেকে মাধুরী কেমন হয়ে আছে, ভাল করে খাওয়াদাওয়াও করছে না, মুখটা অস্বাভাবিক থমথমে করে রেখেছে, দেখে রামানন্দর তো ভয়ই করছিল। এক রুগী হাসপাতালে গেছে, আবার না আর একজন একটা কঠিন অসুখ বাঁধিয়ে বসে। রামানন্দ অবশ্য দু'বেলাই মেডিকেল কলেজে যাওয়া-আসা করছে, অক্ষয়ের খোঁজ খবর নিয়ে আসছে। ডাক্তারেরা বলছে, পেটে আলসারের মতন দেখা গেছে এবং প্রথমটা খুব জোর দিয়ে তারা বলেছিল অপারেশন করতে হবে। কিন্তু তারপর ভাল করে এক্স-রে নিয়ে পরীক্ষা করার পর যেন ডাক্তারবাবুদের মত পাল্টে গেল। কাল সকালে রামানন্দ পাকা খবর পেল, অক্ষয়ের অপারেশন করার দরকার পড়বে না, তবে কয়েকটা দিন হাসপাতালে তাকে থাকতেই হবে। রামানন্দর মুখে খবরটা শুনে মাধুরীর বুক থেকে একটা ভারি পাথর নেমে গেল, ওর চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছিল। এমনি তো এতবড় একটা অসুখ দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল ও, তারপর অক্ষয়ের পেট কাটতে হবে শোনার পর থেকে ওর গলায় যেন আর জল ছিল না, আজ পাঁচদিন অক্ষয় হাসপাতালে আছে, এই পাঁচদিনের মধ্যে পর পর পুরো দুটো দিন মাধুরী পেট ভরে ভাত খেয়েছে বলে মনে হয় না। না-স্নান না-খাওয়া, ক'দিনে কী চেহারা হয়েছে। কাল যাহোক মুখে একটু হাসি ফুটল। বিকেলে উঠোনে হরিতকী গাছটার নিচে একটা বেতের চেয়ারে বসে রামানন্দ কফি খাচ্ছিল। নিজে যেমন জিনিসটা খেতে খুব ভালবাসে তেমনি তৈরী করতেও মাধুরী ওস্তাদ। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কফি খেয়েছে রামানন্দ। মোহনবাবুর দোকানে অবশ্য কফির পাট নেই। কফি খাবার ইচ্ছে হলে শুভেন্দুদের নিয়ে রামানন্দ সোজা কফি হাউসে চলে গেছে। কিন্তু সেই কফি আর এই কফিতে যে আকাশ-পাতাল তফাত। মাধুরীর হাতের তৈরী কফির স্বাদ গন্ধ রং আলাদা। অক্ষয় অবশ্য কফি খায় না। চায়ের ভক্ত এবং বার বার তার চা চাই। কাল বিকেলে হরিতকী গাছের নিচে যে বেতের চেয়ারটায় বসে রামানন্দ কফি খাচ্ছিল সেই বেতের চেয়ারে সেই হরিতকী গাছের নিচে বসে অক্ষয়ও রোজ বিকেলে চা খেত। বিকেল থেকে রাত নটা পর্যন্ত তিনবার হয়ে যেত তার। রোজ আট-দশ কাপ চা খেয়েছে। কোনোদিন আরও বেশি হতো। এখন রামানন্দ চিন্তা করে, এত চা খাওয়ার ফলেই না অক্ষয়ের গ্যাস্ট্রিকের ব্যারাম হল।

হুঁ, ক'দিন মনমরা হয়ে থাকার পর কাল বিকেলে মাধুরী একটু ভাল করে কথাটথা বলল। হাসলও। মাধুরীর প্রকৃতি অবশ্য মোটেই গম্ভীর না, কথা বলতে ও ভালবাসে, এবং বেশ হাসিখুশিও, প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল রামানন্দ এখানে

আছে, মানুষটাকে তো দেখছে। কিন্তু অক্ষয়ের অসুখ হওয়ার পর থেকে হঠাৎ এমন বিষণ্ণ স্তিমিত হয়ে আছে ও। কাল বিকেলেই মাধুরী বলেছিল তার কফি ফুরিয়ে গেছে। এই ক'দিনের মধ্যে যা দেখা যায়নি, গা ধুয়ে চুলটুল বেঁধে একখানা ধোয়া শাড়ি পরেছিল, কপালে খয়েরী টিপ পরেছিল। দেখতে সুন্দর, সামান্য একটু সাজলেই এত ভাল দেখায় ওকে।

রাস্তা ক্রশ করে রামানন্দ চায়ের দোকানে ঢুকে একশ' গ্রাম কফি নিল। অক্ষয়ও একশ' গ্রাম করে কিনে নিয়ে গেছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তা পার হতে হবে বলে সে আর এই ফুটে এল না। ওদিকের ফুটপাথ ধরেই বেলেঘাটার বাস ধরতে শেয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে চলল।

রোদ চড়ে গেছে। তা হলেও রামানন্দর হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। পায়ের বুড়ো আঙুলের টনটনানিটা একটু কম লাগছিল। প্রায় সারাটা সকাল হাসপাতালে অক্ষয়ের কেবিনে বসে কাটিয়েছে সে। অক্ষয়ের সঙ্গে গল্প করেছে। পেয়িং ওয়ার্ডের এই সুবিধে। ভিজিটিং আওয়ারসের তেমন একটা কড়াকড়ি নেই। অনেকক্ষণ রুগীর কাছে থাকা যায়। অক্ষয়ের পয়সা আছে। মাধুরীর কথা মতন তাকে কেবিন ভাড়া করে রাখা হয়েছে।

হুঁ, এতটা সময় একটা বন্ধ জায়গায় ওষুধ-বিষুদের গন্ধের মধ্যে আটক থেকে এখন খোলা রাস্তার এই রোদ হাওয়াটা রামানন্দ রীতিমতন উপভোগই করছিল। তা না হলে দশ মিনিটের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে কেবল কুলিদের মাথার আনাজের ঝাঁকার দিকে তাকিয়ে থাকা! নতুন করে তার হাসি পেল।

বৌবাজারের রাস্তা শেষ করে সার্কুলার রোডের ওপর বিলিতি মদের দোকনটার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

খুবই অবাক হল সে। যুবতী তাকে দেখে ঠোঁট টিপে হাসল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতলতার মতন ছিপছিপে শরীরটা নুইয়ে রীতিমত তার পা ছুঁয়ে একটা প্রণাম সেরে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

রামানন্দর মুখে কথা সরছিল না। অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে মেয়েটির চোখ দুটো দেখল।

'চিনতে পারছেন না?' ছেলেদের মতন গলার স্বরটা একটু মোটা, মেয়েটি শব্দ করে হাসল।

'ঠিক মনে করতে পারছি না।' চোখ দেখা শেষ করে রামানন্দ যুবতীর থুঁতনি ও গলার দিকে চোখ রাখল।

'আমার নাম রেখা, রেখা চক্রবর্তী।'

'অ'—রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু তথাপি ভুরু কুঁচকে রইল। তার চেহারা দেখে যুবতী বুঝতে পারল রামানন্দ তাকে মনে করতে পারছে না। কাজেই রেখা একটু অপ্রস্তুত হল, এবং লজ্জা পেয়ে খানিকটা লাল হয়েও উঠল। চোখ ও চিবুক দেখা শেষ করে রামানন্দ বড় বড় চোখ করে রেখার বুকের দিকে তাকাচ্ছিল। এই অবস্থায় আর পাঁচটি যুবতী যা করে, আঁচলটা বুকের ওপর টেনে দেবার অছিলায় হাত দিয়ে ওখানটা একটু ছুঁয়ে রেখা তখনি আবার হাতটা নামিয়ে নিল।

॥ ৩ ॥

তিনবার তিনটা লোক পিছন থেকে রেখাকে ধাক্কা দিয়ে গেল, রামানন্দর গায়ে মুহুর্মুহু এই পথচারী সেই পথচারীর শরীরের ঘষা লাগছিল, ভিড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়। রামানন্দ খুব বিরক্ত হচ্ছিল। তার যেন ইচ্ছা করছিল, এমন এক রূপসী যুবতীর সঙ্গে একমাত্র নির্জন নদীতীরে কি কোনো নিরিবিলি মাঠের কিনারে গাছতলায় বসে কথা না বললে সুখ পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই মুহূর্তে কোথায় আর নদীতীর আর গাছতলা। অগত্যা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল।

অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে, খদ্দের নেই, কেবল মাছি ভন ভন করছে, টিমটিম করে একটা হলদে বাল্‌ব ফ্যাকাশে আলো ছড়িয়ে মাথার ওপর দুলছে—উঁহু, কলেজ স্ট্রীটের সেই 'মোহন রেস্টুরেন্ট' না, শেয়ালদার মোড়ের চায়ের দোকান। ভিতরটা ঝকঝক করছে, কেমন চমৎকার রং করা টেবিল, চেয়ার, বেলা বারোটায়ও খদ্দের গিজগিজ করছে। চপ কাটলেট খাচ্ছে, ডিম মাংস খাচ্ছে, চা খাচ্ছে। কফির গন্ধ পাওয়া গেল, বোঝা গেল এখানে কফিও পাওয়া যায়।

'ভিতরে ঢুকে পড়ুন, চার নম্বর কেবিন খালি আছে।' নীল পর্দা খাটানো একটা খুপরী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোকানের ছোকরা 'বয়' দাঁত ছড়িয়ে হাসল। সঙ্গে মেয়েছেলে দেখলেই ওরা পর্দা ঝুলানো খুপরী দেখিয়ে দেয়। এবং কেন জানি এমন দাঁত ছড়িয়ে হাসেও। কত চালাক চতুর এই বয়। মোহনবাবুর দোকানের বোকাসোকা ক্যাবলা চেহারার সেই ছেলেটাকে মনে পড়ল রামানন্দর। হুঁ, রমেশ।

'চলুন তাহলে ভেতরেই বসা যাক।' খুপরীর দিকে চোখ রেখে যুবতী যেন বিশেষ খুশি হল না। রামানন্দ শব্দ না করে ঘাড়টা শুধু কাত করল।

ভেতরটা নিরিবিলি সন্দেহ কি। একটু অন্ধকার মতন ছিল। দপ করে মাথার ওপর আলো জ্বলে উঠল। পাখা ঘুরতে লাগল। সেই চালাক ছেলেটাই চটপট হাত চালিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিল।

'কি খাবেন বলুন?' পর্দা ফাঁক করে মুখটা ভিতরে বাড়িয়ে ধরল ছোঁড়া এবার, কিন্তু তার দাঁত দেখিয়ে হাসছিল না, টিপেটিপে হাসছিল। রামানন্দ মনে মনে চটে গেল, মোহনবাবুর দোকান হলে এতক্ষণে নচ্ছারটার গালে বুঝি চড়টড়ই বসিয়ে দিত, এভাবে হাসবে কেন!

'চা।' গম্ভীর গলায় কেবল একটা শব্দই করল সে। তাছাড়া সে লক্ষ্য করছিল, যুবতীর মুখটা বেশ লাল হয়ে উঠে থমথম করছে। কপালে ঘামের ফুটকি দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি না বসে মুখোমুখি হয়ে দুজন দুটো চেয়ারে বসল।

'আর কিছু খাবেন না?' ছোঁড়া তখনও মুখটা বাড়িয়ে রেখেছে।

'না।' রামানন্দ ধমক দিতে পর্দার ওপারে ছেলেটা মাথাটা সরিয়ে নিল।

'আপনি কিছু খাবেন?' রামানন্দর হঠাৎ খেয়াল হল এঁকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই সে শুধু চায়ের কথা বলে দিল।

'না না,' রেখা মাথা নাড়ল। হয়তো এতটা নিরিবিলি বলেই রামানন্দর চোখে চোখ পড়তে চট করে মুখটা নামিয়ে হাতের ছোট ব্যাগটা খুলে কিছু একটা

খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'এ সময়ে কি কিছু খাওয়া যায়।' চাপা গলায় যুবতী কথা বলছিল।

রামানন্দ কতকটা নিশ্চিন্ত হল। দেখা গেল রেখা ব্যাগ থেকে একটা ছোট গোলাপী রঙের রুমাল বের করেছে। ভাঁজ করা রুমালটা কপাল ও গলার ওপর আস্তে আস্তে চেপে ধরে রামানন্দর মুখের দিকে তাকাল। হাসল।

'এখনই কেমন ঘামতে শুরু করে দিলাম। এই তো ফাল্গুন মাস।'

মাথার ওপর পাখাটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে রামানন্দও অল্প হাসল।

'অনেকটা সময় রোদে ঘুরেছেন মনে হয়।'

'আমায় আপনি বলবেন না, আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।'

রামানন্দ হঠাৎ কথা বলল না।

'সেই যে হাজরার মোড়ে এক ভদ্দর লোকের বাড়িতে গেল বর্ষায় কবি সম্মেলন হয়েছিল আপনার মনে আছে?' যুবতী একটু ঝুঁকে বসল।

'হুঁ, হুঁ', রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'মনে আছে বইকি। বিকাশ তো ওপাড়াতেই থাকে—কবি বিকাশ চাটুজ্যেকে চেন নাকি?' রামানন্দ আর তুমি বলতে ইতস্তত করল না। 'ওই তো ওখানে আধুনিক কবিদের কবিতা পড়তে ডেকেছিল—কেন বলো দিকিনি?' হাসি হাসি মুখে রামানন্দ ভুরু কুঁচকোল।

'আপনি সভাপতি হয়েছিলেন।'

'হুঁ, হয়েছিলাম, ওই বিকাশের পাল্লায় পড়ে—কোথাও সভাপতি-টতি হতে চাই না, খুব খারাপ লাগে আমার—' রামানন্দ হঠাৎ থেমে গেল। পর্দা সরিয়ে ছেলেটা চা নিয়ে ভিতরে ঢুকছে। তখনও মিটিমিটি হাসছে।

কাপ দুটো টেবিলে নামিয়ে রাখতে রামানন্দ কটমট করে তার মুখের দিকে তাকাল।

'কেক আছে? ভাল কেক?'

'চপ খান বাবু, মাংসের চপ, এই মাত্তর ভাজা হল, খুব গরম পাবেন।'

'বেশি কথা বলতে শিখেছ।' রামানন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার গলার রগ ফুলে উঠল। 'আমি কেক চাইছি, চপের কথা তো তোমায় বলা হয়নি।'

ছোঁড়া আর হাসল না। মুখটা কালো করে ফেলল।

'কদ্দিন এই দোকানে আছ?' কড়া সুরে রামানন্দ প্রশ্ন করল।

'এই তো গেল আশ্বিন থেকে।'

'যাও, ভাল কেক থাকে তো দুটো নিয়ে এসো—দেরি করলে চলবে না।'

সুবোধ ছেলের মত ঘাড়টা নেড়ে ছেলেটা বেরিয়ে গেল।

'আপনি একটা চপ খেলে পারতেন।'

'পাগল হয়েছ তুমি!' যুবতীর চোখে চোখ রেখে রামানন্দ ঈষৎ হাসল। 'আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না, তা হলেও কেকের কথা বললাম, একটু কড়া করে বেটাকে দুটো কথা শোনাবার খুব ইচ্ছে করছিল, ভয়ানক তেঁদড়, দুজন এখানে ঢুকেছি, সেই থেকেই কেবল হাসছে।'

'শেয়ালদার দোকান তো—' রেখা সামান্য হাসল। 'অনেক রকমের পুরুষ মেয়ে এখানে চা খেতে আসে।'

'তা আমি বুঝতে পেরেছি।' চায়ের কাপটা সামনে টেনে নিল রামানন্দ। 'হুঁ, কি বলছিলে তুমি—হাজরার সেই কবি সম্মেলন, তুমিও সেখানে ছিলে বুঝি?'

রেখা থুতনি নাড়ল।

'সেদিন আপনাকে প্রথম দেখলাম।'

'বিকাশ আমার বন্ধু—কিছুতেই তাকে এড়াতে পারলাম না, অথচ সে জানে ওসব সম্মেলন-টম্মেলন আমার একদম ভাল লাগে না।'

'আমি জানি, কবি রামানন্দ সেন যে সাহিত্য সভা-টভায় কোনোদিনই যান না, বিকাশদার মুখে শুনেছি। তা হলেও আমাদের খুব ইচ্ছা করছিল আপনাকে দেখতে, আমরা সবাই মিলে বিকাশদাকে চেপে ধরেছিলাম, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে—'

'তুমি বুঝি ওদিকেই থাক, হাজরার দিকে?'

রেখা মাথা নাড়ল।

'আমি ধারেকাছেই থাকি, ডক্টর্স লেনে। হাজরায় আমার মামাতো বোন অপর্ণারা থাকে। ওদের বাড়িতেই তো ফাংশনটা হয়েছিল।'

'হুঁ, দেখলাম খুব সাজানো গুছানো বাড়ি। মনে হল বেশ বড়লোক—'

রামানন্দ থেমে গেল। ছেলেটা ভিতরে ঢুকল। মুখটা বেশ বেজার। দুটো প্লেটে দুখানা কেক সাজিয়ে এনেছে। দুজনের সামনে প্লেট দুটো নামিয়ে রেখে তেমনি ঘাড় গুঁজে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

রেখার চোখে চোখ রেখে রামানন্দও নিঃশব্দে হাসল।

'এবার খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছে।' রেখা আস্তে বলল।

রামানন্দ কেক ভেঙে মুখে পুরল।

'সেদিন তোমাকে ওখানে দেখেছিলাম কিনা মনে করতে পারছি না।'

'বা—রে, গুচ্ছের মেয়ে একত্র হয়েছিলাম, ছেলের সংখ্যাও কম ছিল কি, অত ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একদিন কাউকে দেখে সেই মুখ মনে রাখা যায় বুঝি!'

'কিন্তু তুমি তো আমায় বেশ মনে রেখেছ. রাস্তায় দেখা হতেই ঢিপ করে প্রণাম করলে।'

যুবতী অল্প শব্দ করে হাসলো। মাথার তুলনায় খোঁপাটা বেশ বড় ছড়ানো। কাজল বুলানো চোখ দুটো দীঘির মতন টলটল করছে। এমনি বেশ ফরসা, তা হলেও গাল দুটো একটু রঙে ছোপানো হয়েছে। ঠোঁটে অবশ্য রং ছিল না। আর একটা জিনিস রামানন্দ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিল। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। সেই তুলনায় বুকের দিকটা কত বড় ও ভারি মনে হয়। এই জন্যই কি দোকানে ঢুকবার সময় শ্রীমতী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটছিল। স্তনভারাবনতা? শুভেন্দুদের পাড়ায় একবার সরস্বতী পুজোয় অবিকল এমন একটি আধুনিক সরস্বতী ঠাকরুণ আনা হয়েছিল। শুভেন্দুর জ্যেঠামশাই মূর্তি দেখে ভয়ানক রেগে গিয়েছিল। কিন্তু পাড়ার ছেলেদের ব্যাপারে ভদ্রলোক শব্দ করতে পারেনি। অনেকদিন পর কথাটা মনে হতে রামানন্দর ভিতরে ভিতরে হাসি পেল।

'হুঁ, হঠাৎ দেখা হতেই হুট করে পায়ে ধরে এতবড় একটা পেন্নাম, এমন ঘাবড়ে গেলাম আমি, ভাবলাম ভুল করে বুঝি তুমি কাউকে—'

'আপনাকে ভুলব?' অনবদ্য ভ্রূভঙ্গি করে রেখা চক্রবর্তী আবার হাসল। 'সেদিন অপর্ণাদের বাড়ি দল বেঁধে আপনাকেই যে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম, সেই আসরে আপনিই তো সব ছিলেন. এতবড় কবিকে অত সহজে ভোলা যায়? একদিন দেখার পর চিরকালের মতন মনে ছাপ থেকে গেছে।'

'বাস!' রামানন্দ প্রথম হাসল, তারপর ভুরু কুঁচকোল। 'এত বড় কবি! কার কাছে শুনেছ রামানন্দ সেন একটা সাংঘাতিক বড় কবি। বিকাশ বলছিল বুঝি?'

'তা বিকাশদার মুখে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি জেনেছি বইকি,

ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনি, কিন্তু আমরা কি জানতাম না যে, রামানন্দ সেন, বিকাশ চাটুয্যে, শুভেন্দু ভৌমিক, নবকিশোর চৌধুরী, উৎপলেন্দু গুপ্ত—মানে যাঁদের নিয়ে আজকের পদাবলী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, আপনি তাঁদের মধ্যমণি, আপনাদের পাক্ষিক কবিতাপত্র পদাবলীর নিয়মিত পাঠিকা আমি, গ্রাহিকা তো বটেই, কাগজ পেতে একদিনও দেরি হলে আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না, ভীষণ ছটফট করি, আমার মনে হয় আমার চারদিকের হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, আমি মরে যাব—আমি আর—'

রামানন্দ হো-হো করে হেসে উঠল। টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে হাসছিল। এত জোরে সে হাসল, মনে হল তার শরীর বেয়ে হাসিটা টেবিলের ওপর নেমে এসে কাপ ডিস কাচের গেলাসসহ টেবিলটাকে কাঁপিয়ে দিল। থ্যাবড়া মতন একটা নাক, কপালটা চওড়া এবং একটু উঁচুও বটে, লম্বাটে ধরনের মুখ হলেও মুখের আকৃতির তুলনায় চিবুকটা বেশ মোটা ভারি দেখায়, ফলে কারো কারো মনে হতে পারে মানুষটার সূক্ষ্ম বুদ্ধি যত না আছে, তার চেয়ে মনের মধ্যে আবেগ-টাবেগগুলি বেশি কাজ করে। শিল্পীদের যেমন হয়, রামানন্দর হাতের আঙুলের মাথাগুলি মোটেই সরু ছুঁচলো না, একটু গোল চ্যাপ্টামতন এবং আঙুলের গিঁঠগুলিও কেমন অসমান এবড়োখেবড়ো।

যুবতীর মুখের কথা থেমে গেছে, কেমন থমকে আছে ও, রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে করুণ চোখে রামানন্দকে দেখছিল, কেননা যত কথা ও বলছিল, ওর যেন মনে হল একটা ঝড়ো ঠাট্টার হাসি হেসে রামানন্দ সব উড়িয়ে দিল।

ময়লা রুমালটা পকেট থেকে তুলে রামানন্দ চোখের কোণা মুছল। সম্ভবত এত জোর হাসবার দরুন চোখের কোণা ভিজে উঠেছে।

যুবতী একটা অস্পষ্ট ঢোঁক গিলল, তারপর কেমন যেন কান্নার সুর করে বলল, 'আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না, আমি মিথ্যে বলছি?'

'আহা তা বলবে কেন।' রামানন্দ আর হাসল না, আস্তে মাথা ঝাঁকাল। 'খুব মজা লাগছে কথাগুলো শুনে, পাক্ষিক পদাবলী সময় মতন না পেলে কারো চোখে ঘুম আসে না, ছটফট যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তোমার মুখে এই প্রথম শুনলাম, শুভেন্দু, বিকাশ ওরা জানতে পারলে বেজায় খুশি হবে। না কি বিকাশকে বলেছ!'

একটু চুপ থেকে যুবতী হাতের রুমালটা নাড়াচাড়া করল, তারপর রামানন্দর দিকে চোখ তুলল।

'আমি আপনাকে কি করে বোঝাব রামানন্দ সেনের কবিতার কত বড় ভক্ত আমি। কবিতার চলতি ফর্ম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে এই বয়সেও যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন আপনি, রৌদ্র-ছায়ার মতন কখনো উজ্জ্বল আশা, কখনো বিষাদ অস্থিরতা, নিঃসঙ্গতার টুকরো টুকরো ছবি সাজিয়ে মাতিসের ছবির মতন যে আশ্চর্য ইমেজ আপনি সৃষ্টি করেন—না, আর কারো মধ্যে আমি এই জিনিস পাই না, রামানন্দ সেনের কবিতা পড়তে পড়তে আমি অবশ্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি—আমার সমস্ত কিছু কেমন ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়!'

'তোমার এটা ভুল ধারণা, ওগুলো আসলে কবিতাই নয়, রামানন্দ সেন কবিতা লিখতে পারে না, কিছুই হচ্ছে না ওসব।'

'এটা আপনার বিনয়, এত বড় কবি বলেই এসব কথা বলছেন, হুঁ, শুনুন, একমাত্র পদাবলী কবিতা-পত্রেই আপনার কবিতা পাই, অন্য কোথাও আপনি লেখেন না, এই জন্য ওই কাগজটা নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা, এত উদ্বেগ।'

'আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি।' রামানন্দ এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসেছিল, এবার পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসল। গত দু' সংখ্যায় পদাবলীতে আমার কবিতা নেই লক্ষ্য করেছ?'

'হুঁ, এটাই তো আমি জানতে চাইছি, কারণ কি, ক'দিন ধরে ছটফট করছিলাম, কোথায় গেলে আপনার দেখা পাই, পরশু বিকাশদার সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞেস করতে বলল, ক'দিন নাকি আপনি ওঁদের কলেজ স্ট্রীটের আড্ডায়ও একদম যাচ্ছেন না. এদিকে পুরোনো বাসায়ও আপনি নেই শুনলাম, ছেড়ে দিয়েছেন, আপনার নতুন ঠিকানাও বিকাশদা বলতে পারল না—'

'না, ওরা আমার নতুন ঠিকানা জানে না।'

'বলল বেলেঘাটার ওদিকে কোথায় যেন থাকেন।'

রামানন্দ 'হুঁ', 'হ্যাঁ' কিছু শব্দ করল না।

'আগামী সংখ্যার পদাবলীতে নিশ্চয় আপনার কবিতা দেখতে পাব।'

'মনে হয় না', রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'আমি আর কবিতার জগতে নেই।'

'আপনার রক্তের মধ্যে কবিতা, আপনার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কবিতা মিশে আছে—কবিতা না লিখে আপনি বাঁচবেন না যে।' এক ঝলক হেসে রুমালটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকাল রেখা। 'আজ যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে—হঠাৎ এভাবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।'

'কবিতা পড়তে এত ভালবাস, লিখছও নিশ্চয়?'

যুবতী কথা বলল না। আবার ব্যাগটা খুলে ঘাড় গুঁজে কিছু একটা খুঁজছিল। পেয়ে গেল। লাল টুকটুকে এইটুকুন একটা মনিব্যাগ বের করল।

চা খাওয়া শেষ. এবার উঠবার পালা. ওর হাতে মনিব্যাগ দেখে রামানন্দর হুঁশ হল।

'উহুঁ, আমি দেব।' রামানন্দ তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত ঢোকাল। অবশ্য খুব একটা জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারছিল না। কেন না সে সন্দেহ করছিল সবটা বিল মেটাবার মতন যথেষ্ট রেস্ত তার সঙ্গে আছে কিনা। 'বয়'। একটু কাঁপা গলায় ডাকল সে।

'আপনি চুপ করুন তো।' ধমকের সুর ছিল যুবতীর গলায়। 'এই নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

ছেলেটা ছুটে আসতে রেখা তার হাতে দু' টাকার একটা লাল নোট তুলে দিল।

'আর লাগবে?'

'না না, এই থেকেই তো আপনি মেলা চেঞ্জ ফেরত পাচ্ছেন। দাঁত ছড়িয়ে ছেলেটা আগের মতন হাসল।

'চট করে নিয়ে আয়।' রেগে গিয়ে রমানন্দ জোরে ধমক লাগাল। ছোঁড়া বেরিয়ে যেতে রামানন্দ রেখার দিকে চোখ ফেরাল। 'আমার প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দেওয়া হয়নি।'

'কি? কবিতা?' রেখার চোখের পালক নেচে উঠল। যেন গালেও সামান্য লজ্জা ও খুশির রঙ লাগল। 'রামানন্দ সেনের সামনে কি করে বলি যে আমিও একটা-আধটা কবিতা লিখছি।'

'খুব ভাল, চমৎকার—কোন্ কাগজে বেরোচ্ছে?'

'কাগজ তেমন কিছু না, হাওড়া থেকে দু' মাস অন্তর বেরোয়, লিট্‌ল ম্যাগাজিন

—সায়াহ্নের নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' রামানন্দ চোখ বড় করল। 'একবার একটা কপি আমার কাছে পাঠিয়েছিল ওরা। সেবার আমাদের শুভেন্দুর কবিতা ছিল।'

'আপনি দেবেন ওদের একটা কবিতা? আমায় একবার বলেছিল, পেলে ওরা এত খুশি হবে!'

'আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি।' এবার রামানন্দর মুখের চামড়া শক্ত হয়ে উঠল। যুবতী আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

চেঞ্জ নিয়ে বয় ফিরে এল। তার হাতে একটা সিকি তুলে দিয়ে রেখা বাকি পয়সা ব্যাগে পুরল।

'চলুন এবার ওঠা যাক।'

'ক'টা বাজে? রামানন্দ চেয়ার ছেড়ে উঠল।

'হুঁ, তা অনেক বেলা হল। ফরসা সরু কব্জি তুলে রেখা ঘড়িটা দেখল। 'পৌনে একটা।'

পর্দা সরিয়ে দু'জন বাইরে এল। তখনও খদ্দের গিসগিস করছে, যেন আগের চেয়েও সংখ্যায় বেড়ে গেছে। হবে, রামানন্দ চিন্তা করল, অনেকেই মধ্যাহ্নের আহার পর্বটা এসব দোকানে এসে সেরে নেয়, একটু আগে খুপরীর দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা চমৎকার খাদ্য তালিকাটা মনে মনে সে পড়ে ফেলেছিল, ভাত, মাংসের কারী, ডিমের ঝোল, মাছের কালিয়া—অনেক কিছু করে এরা, মোহনবাবুর দোকান না যে কেবল বাসী আলুর চপ আর চা খাইয়ে মানুষকে তুষ্ট রাখবে। অবশ্য বেচারা মোহনবাবুর দোষ নেই, তারা কবির দল ছাড়া সেখানে আর খদ্দের ছিল কোথায়। এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দোকানের চেহারাটা রামানন্দ দেখে নিচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই ফাজিল ছোঁড়াটা, কাউণ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে টলটল করে এদিকে তাকিয়ে আছে, রামানন্দকে দেখছে, রেখাকে দেখছে আর মুখ টিপে হাসছে। বেআদপির সীমা আছে! রামানন্দর দু' কান গরম হয়ে উঠল। রাগ সামলাতে না পেরে ছুটে গিয়ে বাঘের মতন থাবা তুলে ছেলেটার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে দোকানের ভিতরটা থমথমে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা অনেকের চোখেই পড়ল। তাদের হাতের কাঁটা চামচ থেমে গেলে, চা খাচ্ছিল, চা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, গল্প করছিল কেউ কেউ, কথা থেমে গেছে। উত্তেজনায় রামানন্দ থরথর করে কাঁপছিল, ছেলেটা কিন্তু শব্দ করছিল না, কাঁদছিলও না, ঘাড় গুঁজে চুপ করে আছে।

কিন্তু এই থমথমে ভাব বেশিক্ষণ থাকল না, তৎক্ষণাৎ কাউণ্টারের ওপাশ থেকে একজন বেরিয়ে এল, হয়তো দোকানের মালিক, হয়তো ম্যানেজার।

'কি হয়েছে মশাই, আমার কর্মচারীকে আপনি মারলেন কেন?' ঘাড়ে গর্দানে চর্বি নিয়ে দশাসই চেহারা মানুষটার। চোখ লাল করে রামানন্দর দিকে তাকাল।

'আপনার কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করুন না কি হয়েছে, কি করেছে ও?' রামানন্দও কড়া করে জবাব দিল।

'এই, কি করেছিস তুই?'

'আমি কিছুই করিনি ম্যানেজারবাবু। হাতের পিঠ দিয়ে ছেলেটা চোখ রগড়াতে আরম্ভ করল। 'চা চেয়েছিলেন উনারা চা দিয়ে এসেছি, পরে কেক্ চাইলেন, কেক্ দিলাম, তারপর বিল মেটাবার জন্য দু' টাকার একটা নোট দিতে আমি আপনার কাছে দাম রেখে খুচরো ফেরত দিয়ে এলাম, আমি তো কিসসু বলিনি বাবুদের।'

'কি হল মশাই? এবার আপনি বলুন আমার বয়ের অপরাধটা।' ট্রাউজার্সের দু' পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে রেখেছিল ম্যানেজার, পকেট থেকে দু' হাত এক সঙ্গে বের করল।

'আমাদের দেখে ও হাসছিল, জিজ্ঞেস করে দেখুন, এখানে ঢুকেছি পর থেকে কখনো দাঁত ছড়িয়ে, কখনো ঠোঁট টিপে হাসছিল। এমন বদমাশ কর্মচারী আপনি রাখেন কেন?'

'কেন, আপনাদের দেখে হাসবে কেন, কারণটা কি?' রামানন্দর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ম্যানেজার দরজার পাশে দাঁড়ানো সুন্দর চেহারার মেয়েটিকে দেখল। রেখাও ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। রামানন্দ হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করবে সে ভাবতে পারেনি। এবং তার ফলে যে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটবে প্রতি মুহূর্তে সে আশঙ্কা করছিল। এদিকে তার হাতে মোটে সময় নেই। এখনি তাকে ডালহৌসীর বাস ধরতে হবে।

'ইনি আপনার কে হন?' ম্যানেজার রামানন্দর দিকে মুখ ফেরাল।

'আমার কেউ হন না।' রামানন্দ গোঁয়ারের মতন উত্তর করল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে খদ্দেরদের মধ্যে একজন বিশ্রী গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল।

'আপনার কেউ হন না', ম্যানেজার গলার স্বরটা এবার বেশ চড়িয়ে দিল ও সেই সঙ্গে দু' হাত শূন্যে ছড়িয়ে নাচাতে লাগল। 'কিন্তু আপনার পরিচিত নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, একটু-আধটু পরিচয় হয়েছে বইকি। ইনি ধারেকাছেই থাকেন, ডক্টর্স লেনে বাসা, কবিতা-টবিতা লেখেন।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল।

এবার পিছন থেকে এক সঙ্গে দু'জন গলা খাঁকারি দিল।

মোটা গোঁফ সমেত পুরু ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে ম্যানেজার যেন হাসতে চাইল, কিন্তু কি ভেবে মুখের চামড়া শক্ত করে ফেলল।

'অ, তা হলে বলছেন, সদ্য পরিচয় হল, রাস্তার বন্ধুত্ব? তারপর এক সঙ্গে চা খেতে দু'জন আমার দোকানের ভেতর ঢুকে পড়লেন?' রামানন্দর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মোটা থুঁতনি নাচিয়ে ম্যানেজার এমন একটা ভঙ্গি করল, ডাইনে বাঁয়ে পিছনে প্রায় চার-পাঁচজন হো-হো করে হেসে উঠল, একজন এক কোণা থেকে মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে জোরে সিটি দিয়ে উঠল, আর একজন পিরিচের ওপর চামচ ঠুকতে লাগল। অন্য সময় দোকানে এমন হই-হই বিশৃঙ্খলা দেখলে ম্যানেজারের অবস্থা কি হতো বলা মুশকিল, কিন্তু এই ব্যাপারে যেন শব্দটব্দগুলি তার বেশ ভালই লাগল, উপভোগই করল।

এতক্ষণ রামানন্দ চড়া গলায় কথা বলছিল, হঠাৎ তার চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল, এত সব আওয়াজ উঠতে কেমন একটু থমকেও গেল, আর যেন সে মুখ খুলতে পারছিল না। রেখার অবস্থা আরও শোচনীয়। তার কান মাথা গরম হয়ে গেছে। মুখটা লাল টকটক করে ঘাড় গুঁজে জুতোর ডগা দিয়ে মেঝে ঠুকছিল। রামানন্দ যে-ভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছিল একটাও তার মনঃপূত হচ্ছিল না, মোটা বুদ্ধি হলে মানুষ এভাবে কথা বলে, এমন অঙ্গভঙ্গি করে, তা না হলে, রেখা চিন্তা করল, যেন কত নোংরামীর গন্ধ পেয়েছে, চারদিক থেকে সব নানারকম শব্দ করে টিটকিরি-ঠাট্টা আরম্ভ করেছে।

'কি হল মশাই চুপ করে গেলেন কেন, ওই চার নম্বর কেবিনে বসে বান্ধবীর সঙ্গে এমন কি ব্যাপার করছিলেন যে আমার বয় আপনাদের দেখে হাসছিল?'

'আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন, ভদ্রভাবে কথা বলবেন।' নতুন করে রামানন্দ

উত্তেজিত হয়ে উঠল, হুঙ্কার ছাড়ল।

'হে‌ঁ হে‌ঁ', বেগুনের মতন ফোলা ফোলা গাল দুটো ছড়িয়ে পানদোক্তার রসে ছোপানো ময়লা দাঁতের সারি বের করে এবং সেই সঙ্গে জালার মতন ভুঁড়িটা নাচিয়ে হেসে ম্যানেজার ভেংচি কাটল। 'আমি অভদ্র, আমি স্বীকার করছি আমি মোটেই ভদ্দর লোক নই, তবে কিনা আমায় দেখে কেউ হাসে না, আমি চায়ের দোকানে ঢুকে পর্দা খাটানো খুপরীর ভেতর বসে এমন কাজ করি না যে, একটা তের বছরের ছেলে আমায় দেখে হাসবে। কি হল, এবার কথার উত্তর দিন?'

আবার রামানন্দর মুখের কথা আটকে গেল। রাগে উত্তেজনায় হঠাৎ কি করবে ঠিক করতে পারছিল না, স্কাউন্ড্রেল, ইতর, ছোটলোক, পর পর কয়েকটা শব্দ দাঁতের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে উল্টে তাকেই যেন যন্ত্রণা দিচ্ছিল, একটা শব্দ সে মুখ দিয়ে বের করতে পারল না, কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

'বলুন দাদা, বলুন—' চিকন গলায় একজন টিপ্পনি কাটল। 'পর্দার আড়ালে বসে উনি বুঝি দাদাকে আমার কবিতা শোনাচ্ছিলেন।'

রেখার আর সহ্য হল না। দরজার কাছ থেকে সরে এসে ম্যানেজারের সামনে দাঁড়াল।

'আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন, একটা কেন, দশটা কথা বলুন, আমি শুনতে রাজী আছি।' মাথা পেতে দেওয়ার মতন ভঙ্গি করে ম্যানেজার ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে দিল।

'তাই তো, উনি বলতে পারবেন না, নেপ্‌লা কেন, হুঁ আমার ওই বয়ের নাম নেপ্‌লা, আপনাদের দেখে হাসছিল, এবার আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন দিকিনি।'

'বুঝিয়ে বলার কিছু নেই, তবে আপনার এই দোকানে কারা আসে আমি জানি না, কিন্তু আমাদের এখানে আসা ভুল হয়েছে।'

'হুঁ, বলুন, তারপর কি বলার আছে বলুন।' ম্যানেজারের গলার স্বর শক্ত হয়ে উঠল।

আঁচল দিয়ে রেখা কপালের পাশটা মুছে ফেলল। ঘামছিল ও।

'আপনার ওই কর্মচারীটি, অল্প বয়েস ওর আমি অস্বীকার করব না, কিন্তু এমন সব লোক দেখে এখানে অভ্যস্ত যে আগেও তাদের দেখে সে এভাবে হেসেছে, মনে হয় তার আজকের এই হাসি কিছু নতুন না।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না', মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে ম্যানেজার থুতনি নাড়ল। 'আমার লাইসেন্স করা দোকান, সতেরো বছরের দোকান, আপনাদের মতন ভদ্রমহিলারা ভদ্রলোকেরাই এখানে চা খেতে খাবার খেতে আসেন—অন্তত আমি তো তাই দেখছি, সকলেরই বেশ ভদ্র সাজপোশাক—অনেকেই বাইরে বসে খান, আবার যাঁদের ইচ্ছে হয়, হুঁ, উনাদের সঙ্গে অবশ্য জেনানা থাকবেনই, সরাসরি কামরায় ঢুকে পড়েন। এখন কামরার ভেতর বসে কে কি করেন আমি কি করে জানব বলুন।'

'তাই তো বলছি, এখানে আসা আমাদের ভুল হয়েছে।' দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণটা কামড়ে ধরে রেখা এক সেকেন্ড চুপ করে রইল। রামানন্দকে দেখল, দোকানের প্রত্যেকটা খদ্দের হাঁ করে এদিকে তাকিয়ে আছে, তা-ও সে লক্ষ্য করল। তারপর ম্যানেজারের দিকে ঘাড় ফেরাল।

'আপনি এঁকে চেনেন না, ইনি হলেন বিখ্যাত কবি রামানন্দ সেন—নাম শুনেছেন?'

'না ভাই, আমি রামানন্দ সেনের নাম শুনিনি,' ম্যানেজার মাথা ঝাঁকাল। 'আপনাদের মিথ্যা বলব কেন, আমি রবি ঠাকুরের নাম শুনেছি, তাঁকে স্বচক্ষে দু'বার দেখেওছি, কবি কালিদাস রায়ের নাম শুনেছি, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাম শুনেছি, ছেলে বেলায় পাঠবইয়ে তেনাদের কবিতাও ঢের পড়েছি, হুঁ, কামিনী রায়ের নাম শুনেছি—রামানন্দ সেনের নাম শুনিনি।'

রামানন্দ সেনের দুর্ভাগ্য, নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল রেখা, পরক্ষণে দেওয়ালের একটা রঙিন ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ রেখে ভাবল, তাই তো, এ আমি কাকে কি জিজ্ঞেস করছি, লেখাপড়ার সঙ্গে অনেকদিন সম্পর্ক শেষ, এখন একটা রেস্তোরা চালাচ্ছে মানুষটা, সারাদিন ওই চেয়ারটায় বসে খদ্দেরদের চপ্, কাটলেট, ডিম, মাংস খাওয়া দেখে, খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বিল দিয়ে তাদের কাছে থেকে দাম আদায় করে নেয়, আধুনিক কোন্ কবি কবিতা লিখে নাম করল, কোন্ গল্প লেখক নতুন ঢঙের গল্প লিখে চমক সৃষ্টি করল তা সে জানবে কেমন করে। রামানন্দ যদি মন্ত্রী কি উপমন্ত্রী হতো, কাগজে ছবি ছাপা হতো, নিদেন করপোরেশনের একটা কাউন্সিলার কি ডাকসাইটে গুন্ডা হতো, বা এমনও যদি হতো যে সিনেমার পর্দায় অন্তত এক-আধবারও তার মুখ দেখা গেছে কি রেডিওয় তার গানের গলা শোনা গেছে, তখন না হয় একটা কথা ছিল, কাজেই—

'শুনুন', রেখা ম্যানেজারের দিকে চোখ ফেরাল, 'গত জুলাই মাসে রামানন্দবাবুকে হাজরার একটা কবি সম্মেলনে সভাপতি করে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম, কবি রামানন্দকে সেদিন আমি প্রথম দেখি, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করার ইচ্ছে, তাঁর ঠিকানা জানা ছিল না বলে দেখা করার সুযোগ হয়নি। আজ হঠাৎ রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা, আমি তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয় না।'

'না, তা তো হয়ই না।' ম্যানেজার ভুরু পাকিয়ে মাথাটা একদিকে কাত করে ধরল। 'আপনিও যখন কবিতা লেখেন, কবির সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে একটু নিরিবিলির দরকার বইকি।'

পিছন থেকে আবার একজন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল।

'আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন না।' ম্যানেজারের গোঁফের আড়ালে একটা দুষ্ট হাসি উঁকি দিতে চাইছিল, তা হলেও গম্ভীর হয়ে খদ্দেরদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে তখনি আবার সুন্দর চেহারার মেয়েটির দিকে ঘাড় ফেরাল। 'হুঁ, বলুন, তারপর? দু'জনে চার নম্বর কেবিনে ঢুকলেন, ন্যাপ্‌লাকে ডাকতে ন্যাপ্‌লা চা নিয়ে গেল, তারপর? বেশ কিছুক্ষণ তো ছিলেন দু'জন ওখানে, আমি আমার হাতের ঘড়ি মিলিয়ে দেখেছি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট—'

'হুঁ, তা হবে, অনেক কথাই হল রামানন্দবাবুর সঙ্গে।' চোখ আড় করে রেখা রামানন্দকে দেখল, মুখটা কালো করে ঘাড় গুঁজে আছে। খাঁটি কবি শিল্পীরা বুঝি এমনই হয়, কি দরকার ছিল মাথা গরম করে ওই ছোঁড়াকে চড় মারার, তারপর আবার চটেমটে তার মনিবের সঙ্গে কথা বলার, এখানকার নোংরামী এখানে পড়ে থাকত, চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, আমরা বেরিয়ে পড়তাম, কিন্তু ঐ যে লোকে বলে শিল্পীদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মতন কান্ডজ্ঞান এ'রা অনেক সময় হারিয়ে ফেলেন। 'হুঁ, কবিতা নিয়ে সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হল আমাদের।' রেখা ম্যানেজারের দিকে চোখ তুলল। 'যাক, সে সব আপনাকে বলে বিশেষ লাভ নেই, কেননা আধুনিক সাহিত্য আপনি পড়েন না, আধুনিক কবিদের নাম জানেন না এবং আপনার দরকারও পড়ে না এসবের।'

'তা তো নয়ই। আমি রেস্টুরেন্ট চালাই, আমি ডিমের খোঁজ রাখি, মাংসের খোঁজ রাখি, লেটুস টমেটো বীট গাজর কড়াইশুঁটির খবর রাখি, আধুনিক সাহিত্য দিয়ে করব কি, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখেন না জানেন তো।'

'কিন্তু আমার পরিচয়টা আপনার জেনে রাখা উচিত, এখন পর্যন্ত কিন্তু সেসব কিছু জিজ্ঞেস করছেন না।'

'আহা, শুনলাম তো এই কবি ভদ্দরলোকের মুখে।' বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ম্যানেজার রামানন্দকে দেখায়। 'আপনিও কবিতা লেখেন, শুনলাম ডক্টর্স লেনে বাসা।'

'আমার বাবার নাম শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী, রিটায়ার্ড জজ।'

'খুব ভাল কথা, তারপর?'

'আমি টেলিফোন-ভবনে চাকরি করি।'

'বেশ তো, সুন্দর কথা, আপনারা আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা সবাই তো চাকরি করছেন। তারপর?'

'আমার দাদা রবিন চক্রবর্তী, পুলিস অফিসার, লালবাজার হেড কোয়াটার্সে আছেন।'

'অ—' একটা অদ্ভুত শব্দ মুখ দিয়ে বের করে হঠাৎ থেমে গেল। রামানন্দও খানিকটা চমকে উঠে মুখ তুলে যুবতীকে দেখল।

রেখা সেখানেই থেমে থাকল না।

'যদি বলেন, এখনি আমি তাঁকে রিঙ করে দেই, আপনার তো টেলিফোন রয়েছে, দাদা আসুক, স্কুটার নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে চলে আসবে।'

'না না, তিনি আসবেন কেন।' ম্যানেজারের চোখের রং, গলার স্বর বদলে গেল ও সেই সঙ্গে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আপনি এ কথা বলছেন কেন, আপনার দাদার তো কষ্ট করে এখানে আসার কিছু দরকার নেই—'

'না, তা হলেও—' তীব্র তীক্ষ্ম চোখে রেখা কাউন্টারের ওপরে টেলিফোনটা দেখল, যেন এখনি ছুটে গিয়ে ডায়াল করবে, খদ্দেরদের কারো মুখে শব্দ নেই, ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা সেই আগের মতন হঠাৎ থমথমে হয়ে আছে, হাঁ করে সবাই দেখছিল, কেবল রূপ না—রূপের সঙ্গে বুদ্ধি, বুদ্ধির সঙ্গে অসামান্য তেজ, ক্রোধ এবং যেন এক আঁজলা ঘেন্নাও বিদ্যুতের মতন যুবতীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝলক দিয়ে দিয়ে উঠছে। 'আপনার লাইসেন্স করা দোকান ঠিকই, তা হলেও আমি জানতে চাই দেখতে চাই, মেয়েছেলে নিয়ে কেউ আপনার দোকানে ঢুকলেই তাঁদের দেখে দাঁত ছড়িয়ে হাসবে এমন অসভ্য অশিক্ষিত কর্মচারী রাখার লাইসেন্স আপনাকে কে দিলে, দাদা এসে এর বিচার করুক—'

'আহা-হা-হা,' হাত দুটো বুকের কাছে তুলে ক্ষমা চাওয়ার মতন চেহারা করে ম্যানেজার জোরে কচলাতে লাগল এবং, যেমন জেদ চেপে গেছে যুবতীর, কিছুতেই যাতে টেলিফোনের কাছে যেতে না পারে তাই মোটা দেহটা নিয়ে কাউন্টারের ওদিকে যাবার রাস্তাটা সঙ্গে সঙ্গে আড়াল করে দাঁড়াল। 'শুনুন শুনুন, আমি বলছি এতক্ষণ আপনি বললেন, এবার আমাকে বলতে দিন,' তাড়াতাড়ি কথা বলার দরুন পুরু ঠোঁট বেয়ে খানিকটা পানের রস ম্যানেজারের জালার মতন প্রকাণ্ড ভুঁড়ির কাছে চমৎকার আকাশী রঙের শার্টের ওপর টুপ করে ঝরে পড়ল। 'আপনি আপনার পুলিস অফিসার দাদাকে ডাকবেন কেন, আমি কি ওই ছোঁড়ার বিচার করতে পারি না, আমার সতেরো বছরের দোকান, আজ অবধি সতেরো গণ্ডা বয় আপনাদের আশীর্বাদে এখানে চাকরি করে গেছে, কিন্তু এক-

আধদিন কোনোটা বেআদবি করেছে কি বেতমীজ কিছু দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে সোনারচাঁদকে কান ধরে দোকান থেকে বের করে দিয়েছি। এই যে আপনি বললেন, আপনাদের দেখে ওই হারামজাদা হেসেছিল, 'বাস্, আর তো কিছুরই দরকার পড়ে না, এখানেই হয়ে গেল, আপনি কিছু বেলঘরিয়া বারাকপুর নৈহাটি থেকে আসেননি, ধরতে গেলে এ-পাড়ারই মেয়ে, বউবাজার আর ডক্টর্স লেনে কতটা তফাত, আর এমন বিশিষ্ট ঘরের সন্তান, সুতরাং একবার আপনি আমার কানে দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট, এবার দেখুন শুয়ারের বাচ্ছার কী বিচার আমি করি, আপনার চোখের সামনে লাথি মেরে দোকান থেকে এখনি যদি তাড়িয়ে না দিচ্ছি—'

চোখ রগড়াবার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটা টলটল করে সব দেখছিল শুনছিল, খদ্দেরদের গলা খাঁকারি শুনে, সিটি শুনে দু-একবার যেন ফিক করে হেসেও ফেলেছিল, এখন ম্যানেজারের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে, মুখটা কাগজের মতন সাদা করে ফেলেছে।

'থাক, মেরে কাজ নেই।' বাঁ-হাত থেকে ব্যাগটা ডান হাতে নিয়ে রেখা নরম গলায় বলল, 'ওই তো বয়েস, এখনো বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি, বুঝিয়ে বলুন, সংশোধন হয়ে যাবে, মারধর করবেন না, আর এই বাজারে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে বেচারা খাবেই বা কি।' রেখা রামানন্দর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'চলুন।'

রামানন্দ আর একটা কথাও বলছিল না।

দুজনে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

'আপনি তো ওদিকের বাস ধরবেন?' যুবতী বেলেঘাটার দিকে আঙুল দেখাল।

রামানন্দ সামান্য হেসে ঘাড় কাত করল।

'আমি এদিকের বাস ধরব।'

'আচ্ছা।' রামানন্দ আর একবার ঘাড় কাত করল।

'কিন্তু একটা কবিতা আমার চাই, সায়াহ্নের ওরা বার বার আমায় বলছিল।'

রামানন্দ 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলল না। শেয়ালদার দিকে মুখ করে হাঁটতে আরম্ভ করে দিল।

॥ ৪ ॥

রামানন্দ তাই আন্দাজ করছিল। মাধুরী এখন স্নানের খেলা খেলছে। হুঁ, খেলা বইকি! আনন্দে বিভোর হয়ে তিরতিরে ঐ খালের জলে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে কুচকুচে কালো তালের গুঁড়ির ওপর কলসীর মতন গোলগাল নধর কোমরখানা বসিয়ে রাঙা শরীরে সাবান ঘষে দুধের মতন ধবধবে ফেনায় চুল থেকে নাভি পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে কেউ যদি গলা খুলে গাইতে আরম্ভ করে, নির্ঘাৎ যে-কোনো মানুষ এই দৃশ্য দেখলে এটাকে খেলাই বলবে। দুধের মতন ধবধবে ফেনা, পাকা কাঁঠাল কোয়ার রঙের অগাধ হলদে রোদ, এতবড় আকাশ, হাওয়ার মাতামাতি, ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কাচের মতন স্বচ্ছ ফিনফিনে ধুলোর ঘূর্ণি, আয়নার মতন চকচকে জল, ঘাট ছাড়িয়ে দূরের কচুরিপানার জঙ্গল ও হেলেঞ্চা দাম, সাদা ফুল, নীল ফুল, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, শামুক গুগলীর গন্ধ—উঁহু, আরও বাকি আছে, কেউ যদি ছবি আঁকতে চাইত, ইজেল, তুলি ও রঙের বাক্স কাঁধে ফেলে পঁয়ত্রিশ-বি বাস থেকে নেমে এতটা মেঠো রাস্তা কষ্ট করে

হে'টে রামানন্দর মতন এখানে পে'ৗছে যেত তো তার চোখের পাতা আটকে যেত, নিশ্বাস ভারি হয়ে আসত। কেবল কি মাধুরীর গানের গলা, কেবল কি ওর আগুনের রঙের কাঁধ বেয়ে পিঠ বেয়ে কিলবিলে সাপের মতন টাটা-টমকোর মিষ্টি সুগন্ধ তেজাল ফেনার ফুল-তোলা নয়নসুখ শায়ার তলায় লুকিয়ে পড়ার নরম ছবি! আর্টিস্ট আরও দৃশ্য দেখত, আরও শব্দ শুনত। হাজার হাজার বিঘা মেছোভেড়ি গঙ্গার বালুর নিচে চাপা পড়ে এখন গালভরা 'সল্টলেক জমি' নাম নিয়ে পাগলের মতন ধুলোর ঝড় তুলে কেমন হা-হা করে হাসছে, হাজার হাজার বিঘা বালুর নিচে মরে হেজে যাওয়া মাছের আঁষটে গন্ধ এখনও যেন একটি-দুটি চিলের নাকে লাগে, দূরের আকাশে উড়ে উড়ে তারা মরাকান্না কাঁদে। আকাশে চিলের কান্না, খালের কিনার ঘেঁষা মাদার ও মনসা গাছের বেড়া দেওয়া অক্ষয়ের পোলট্রির খাঁচার লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড ও পাঁচ রকম দেশী মুরগীর প্রহরে প্রহরে কুকড় চিৎকার, খালের জলে অক্ষয়ের তিন কুড়ি পাতি ও রাজহাঁসের প্যাঁক প্যাঁক—তাই তো, বালুর ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া দমকা হাওয়ার শব্দের সঙ্গে আরও অনেক শব্দ এখানে ভেসে বেড়ায়। তা ছাড়া এখন ফাল্গুন মাস। ঘাটের জলে পা ডোবানো মাধুরীর মনোহর ছবিটি বাদ দিয়েও চমৎকার রংদার ছবি অক্ষয়ের ঘরের সামনে পিছনে ফুটে উঠেছে। সব ক'টা মাদার গাছের মাথা লাল ফুলের আগুন হয়ে জ্বলছে।

বলতে কি, বসন্তের আগুন জ্বলে উঠতে মাধুরী ও মাদার গাছগুলি যেন আড়াআড়ি করে কে কত বেশি সুন্দর হবে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে।

কাজেই ইজেল ও রং তুলির বাক্স নিয়ে যদি কোনো বেটা এখানে ছবি আঁকতে আসত তো নাওয়া খাওয়াই ভুলে যেত। দিনভর কেবল ছবি আঁকত। কিন্তু রামানন্দ কোনো বেটা শিল্পীকে এখানে আসতে দেবে না। মাধুরীকে নিয়ে কবিতা লিখবে? কলসীর মতন ঢালু হয়ে আসা সুগোল নধর নিতম্ব, সুন্দরীর সরস স্তন, চিবুক, অন্ধকার চুল—এইসব নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কুটকচালে কাব্যচর্চা? আসুক না কোনো কবি। মাথায় চাটি মেরে রামানন্দ এখান থেকে যদি তাড়িয়ে না দেয়! মাধুরীকে নিয়ে, অক্ষয়কে নিয়ে গল্প লিখবে? এক জোড়া পায়রার সুখের জীবন, লাল টালি ছাওয়া ঘর, মাদার ও মনসা গাছের বেড়া, হাঁস-মুরগির ব্যবসা? মাছের ভেড়ি খুইয়ে বুদ্ধি করে ব্যবসাটা না ধরলে অনেক ভেড়িওয়ালার মতন অক্ষয় কোথায় ভেসে যেত। ঐ যেমন পরাশর। মাঠের ধারে একটা ছাতিম গাছের নিচে বসে এখন বেল শশা কলা বেচে। ক'টা মানুষ এখানে বেল কলা শশা খেতে আসে? সারা দিন দোকান সাজিয়ে বসে থেকে দু' টাকাও বেচতে পারে না। এখনও তার হাতে মাছের গন্ধ লেগে আছে। খোসা ছাড়িয়ে নুন লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে পরাশর যখন খদ্দেরকে শশা খেতে দেয়, শশার গায়ে মাছের আঁষটে গন্ধ পরিষ্কার টের পাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে এতটা রাস্তা রোদ মাথায় নিয়ে হে'টে দু'দিন রামানন্দর দারুণ তেষ্টা পেয়েছিল, ছাতিম তলায় দাঁড়িয়ে পরাশরের শশা খেয়েছিল। দু' দিনই গন্ধটা পেয়েছে। তা বলে রামানন্দ নাক সিঁটকায়নি বা থুতু-টুতু ফেলেনি। পাছে পরাশর মনে কষ্ট পায়। এখন আর রামানন্দ তেষ্টা পেলেও অবশ্য শশা কিনে খায় না। হুঁ, ভেড়ি বন্দোবস্ত নিয়েছিল কি কারো সঙ্গে ভাগে মাছের চাষ করত, কি জলে নেমে জাল ছেঁকে মাছ ধরত—এমন কত গণ্ডা মানুষ এখন কোথায় হারিয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না। কোন্ এক অনন্ত মণ্ডল নাকি কলকাতার রাস্তায় সাইকেল গাড়ি নিয়ে আইসক্রীম ফেরি করে পরিবার চালায়, কোন্ এক লক্ষ্মণ দাস, অক্ষয়ের মুখে

এসব শোনা, চটকলে ঢুকে পড়েছে। আবার কিছু মানুষ সরাসরি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের মজুর বনে গিয়ে কোমর বেঁধে ভেড়ি বুজানোর কাজে লেগে গেছে। এখনও মোটা পাইপ লাইন ধরে মা গঙ্গার গর্ভ থেকে ধকধক করে পবিত্র কাদার পিণ্ড এসে ছিটকে ছিটকে পড়ছে। এদিকের আর ক'টা ভেড়ি গেছে, কিন্তু ওদিকে এখনও নলবন, চার নম্বর নাটা, সাহেবমারা, সর্দার ভেড়ি, গোলতলার ভেড়ি রুই কাতল ও বাটা ফলুইয়ে বোঝাই হয়ে চকচকে বুকে নীল আকাশের ছায়া ধরে রঙ্গরসের ঢেউ তুলে হি-হি করে নাচছে। আস্তে আস্তে ওদের নাচ বন্ধ করা হবে, হাসি বুজিয়ে দেওয়া হবে, কাজেই কাজ চলছে, পাইপ লাইন তাল তাল বেলে মাটি টানছে, কোদাল চালিয়ে বালুর চাঁই টেনে টেনে মজুরেরা জমি সমান করছে।

অক্ষয় বলে, ভেড়ির ধারে ধারে, দূরের চড়ায় দু-দুটো খালের কিনারে ঘরবাড়ি নিয়ে কত মানুষ ঠাসাঠাসি করে ছিল, মাছেদের মতন আজ সব মরে হেজে ভূত হয়ে গেছে। ঘরছাড়া হয়ে অনেকেই পালিয়েছে, এখন আর ক'টা মানুষ, দয়া করে সরকার থেকে দু' কাঠা করে জমি দেওয়া হয়েছে, এধার ওধার লাল টালির ঘর তুলে কোনো রকমে বেচারারা মাথা গুঁজে আছে, ঠোঙ্গা বানায়, ডালের বড়ি শুকিয়ে শেয়ালদার বাজারে নিয়ে বেচে, নয়তো ধূপকাঠির বাণ্ডিল তৈরী করে পেট চালায়।

সব দেখেশুনে রামানন্দ ক'দিনই ভেবেছে, বাস্তুহারা হতভাগা মেছোদের নিয়ে মহাভারতের মতন একটা কিছু লেখা যায়। তা বলে সবাই তা পারবে না, একমাত্র আকাদমী বিজয়ী হেম মজুমদারই এই কাজের উপযুক্ত। পরিশ্রমের কাজ। সন্দেহ কি। দেশ নিয়ে সমাজ নিয়ে সর্বহারাদের নিয়ে হাজার পৃষ্ঠার গুরুগম্ভীর উপন্যাস বাংলা দেশে আর কে লিখছে! মাসিকে সাপ্তাহিকে কি দৈনিক কাগজে পাব্লিশাররা যখনই মজুমদারের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেয়, তাঁর নামের আগে 'মহৎ 'কালজয়ী উপন্যাস রচয়িতা' ইত্যাদি কয়েকটা দারুণ দারুণ বিশেষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রয়োগ করে। সস্তা জিনিস হালকা বিষয়, শুধুই প্রেম রোমান্স ইত্যাদি নিয়ে হেম মজুমদার গল্প উপন্যাস লেখে না। মানুষের ক্ষুধা বঞ্চনা নিপীড়ন অশিক্ষা বেকারত্ব অর্থাৎ যেসব সমস্যা নিয়ে দেশ জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে কেবল সেসব নিয়ে হেম মজুমদারের শিল্পকর্ম। সমস্যা যত গুরুতর হয় তত তাঁর কলম খোলে। শুভেন্দুরা ঠাট্টা করে হেম মজুমদারকে কখনও বাংলার 'টলস্টয়', কখনও 'ডস্টয়ভস্কি' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করে, কিন্তু ঠাট্টা করলে হবে কি, একমাত্র বইয়ের রয়্যালটির টাকায় নিউ আলীপুরে কোনো দিন তারা তার মতন বাড়ি করতে পারবে? না গাড়ি কিনতে পারবে? না কি ভিয়েনা ফেরত ডাক্তারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে! তবেই হয়েছিল আর কি। শুভেন্দুদের অ্যাবস্ট্রাক্ট লেখা, সুররিয়ালিস্ট কবিতা বানের জলে ভেসে যাবে। বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক, পণ্ডিত, মনীষী বলে সবাই যাঁকে একবাক্যে শ্রদ্ধা করে, ডক্টর হরিমাধব সেনগুপ্ত সেবার কলকাতার অল ইণ্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্সে, যাকে বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঠিক একথাটাই কি জানিয়ে দেননি যে, হেম মজুমদারের রচনাই কালের সীমানা অতিক্রম করে টিকে থাকবে। তার লেখার মধ্যে দেশের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, দেশের মানুষের হৃদস্পন্দনের শব্দ শোনা যায়।

সেদিন পায়খানায় বসে রামানন্দ তাই চিন্তা করছিল, একটা পোস্টকার্ড যদি মজুমদারের নিউ আলীপুরের ঠিকানায় কেউ লিখে দিত। মেছোভেড়ির মানুষেরা কী অমানুষিক সংগ্রাম করতে করতে হেরে গেল, মরে গেল। মরে হেজে যাওয়া মাছেদের সঙ্গে গঙ্গার বালুর নিচে তাদের কঙ্কালও চাপা পড়েছে। এই হাজার হাজার বিঘার বালু খুঁড়ে একটা মহৎ উপন্যাসের মালমশলা মজুমদার ঠিক পেয়ে যাবে। যা কিনা বাংলা দেশের আর কোনো লেখককে দিয়ে সম্ভব না। বলা যায় কি, এই উপন্যাসই হয়তো হেম মজুমদারকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাইয়ে দিত।

যাই হোক, এই তল্লাটের বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষদের নিয়ে মজুমদার, কি তার সমকক্ষ আর যদি কোনো সাহিত্যিক থেকে থাকে, পাঁচশ' হাজার কি দু' হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে যত বড় খুশি একখানা মহাকাব্য কি মহৎ উপন্যাস লিখে ফেলুক, রামানন্দ আপত্তি করবে না, কিন্তু কোনো বেটা কবি, চিত্রকর বা ঔপন্যাসিক যেন এখানে মনসা ও মাদারের বেড়া দেওয়া মাধুরীর এই ফুটফুটে আঙ্গিনার দিকে চোখ না দেয়।

উঁহু, অক্ষয়কে মাধুরীকে আলাদা করে দেখতে হবে। রামানন্দ তাই দেখছে। একটেরে জমি নিয়ে ওদের ছবির মতন ছিমছাম বাড়ি, দক্ষিণটা খোলা রেখে পূব উত্তর ও পশ্চিমের ভিটেয় বাঁশের বেড়া আর টালির ছাদ নিয়ে তিনখানা ঘর, মাঝখানে একফালি উঠোন, ওপাশে লাউ ঝিঙে কুমড়ো লতা, এপাশে তুলসী মণ্ড, আর উঠোনের সবটা পশ্চিম জুড়ে মুরগির খাঁচা, হাঁসের ঘর। এক নজর ওদিকে তাকালেই বোঝা যায় ভেড়ির ধারের কি খাল পাড়ের আর দশটা মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে অক্ষয়ের ভাগ্যকে মেলাতে গেলে ভুল হবে। ভগবানের দয়া? নাকি মানুষটার বুদ্ধি বিবেচনা কর্মক্ষমতা—সে যাই হোক, হাঁস-মুরগি দিয়ে অক্ষয় দু' পয়সা করে ফেলেছে। তার ঘরে সেগুন কাঠের খাট আলমারী হয়েছে, তারশি ফিট করা চমৎকার ড্রেসিং টেবিলও হয়েছে। ভাল ভাল সাবান গায়ে মাখে মাধুরী, গন্ধ তেল মাথায় দেয়, নয়নসুখ কাপড়ের ফুল-শায়া পরে। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রং-বেরঙের শাড়ি ব্লাউজ।

কিন্তু রামানন্দ সহ্য করবে না কোনো রকম কাব্যটাব্য এদের নিয়ে কেউ করুক। যে কারণে রামানন্দ আজ পর্যন্ত শুভেন্দুদের কাছে এখানকার ঠিকানা বলেনি। মরে গেলেও বলবে না। এই যে ঘাটে বসে জলে পা ডুবিয়ে মাধুরী গান গাইতে গাইতে গায়ে সাবান মাখছে, মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড আকাশ, ঘরের পিছনে মাদার বনে ফাল্গুনের শুরু থেকে আগুন লেগেছে, এখন অবশ্য অক্ষয় হাসপাতালে, তা না হলে সারাদিন হাঁস-মুরগির তদারক করা আর ফাঁকে ফাঁকে এসে মাধুরীর হাতের চা খাওয়া এবং ফাঁক পেলেই একটু আড়াল পেলেই, রামানন্দ এখানে আছে ক'দিন ধরে তাই, তা না হলে বেশ বোঝা যায়, রামানন্দ খুবই কল্পনা করতে পারে, আড়াল-টাড়ালের দরকারই হতো না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে অক্ষয় এক মুখে চা খেয়েছে আর এক মুখে বউকে বুকের কাছে ঠেসে ধরে কষে চুমু খেয়েছে, হুঁ, এদের এই গভীর দাম্পত্য প্রেম, চকচকে আকাশ, হলুদ রোদ, থোকা থোকা রক্তরাঙা মাদার ফুল, লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড ও পাঁচ রকমের দেশী মুরগি, খালের জলে রাজহাঁস ও পাতি হাঁসের চেঁচামেচি; অবশ্য মরা রোদও আছে, আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে ওঠা, অসুখ হয়ে অক্ষয়ের হাসপাতালে যাওয়া, মাধুরীর না-স্নান না-খাওয়া না-ঘুম, অক্ষয় একটু ভাল আছে শুনে মাধুরীর মুখে এক একদিন ঝলক দিয়ে ওঠা হাসির রোদ্দুর, স্নানের সময় গান—তাই তো, মেঘ রোদ, হাসি কান্না দুটোই থাকবে জীবনে—থাকুক,

যেমন আছে তেমন করে এদের থাকতে দাও—তা বলে এদের নিয়ে কবিতা লেখা, এদের ছবি আঁকা, গল্প, উপন্যাস ফাঁদতে বসা—রামানন্দ এর ঘোর বিরোধী।

সংসারে অনেক কিছু নিয়ে কবিতা লেখা হচ্ছে, ছবি আঁকা হচ্ছে। গল্প উপন্যাসও ঢের লেখা হচ্ছে।

কিন্তু একটা দুটো জিনিস বাদ রাখতে ক্ষতি কি। রামানন্দ কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে, সে এখন কোনোরকম ইমেজ-এর ধার ধারে না, তা না হলে বেতলতার মতন পাতলা ছিপছিপে শরীরটা কোমরের কাছে ভেঙ্গে দিয়ে খাঁচার সামনে ঝুঁকে অক্ষয়ের রূপসী গিন্নী মুরগির বাচ্চাদের যখন যবের ছাতু ভুট্টা চালের গুঁড়ো খেতে দেয়, ভোমরার চাকের মতন খোঁপাটা আধখানা খুলে গিয়ে পিঠের ওপর মুখ থুবড়ে থাকে, ওপর থেকে কামরাঙ্গা গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে সিকি আধুলির মতন টুকরো টুকরো গোল গোল রোদ ওর কাঁধে চুলে কোমরে পড়ে ঢেউ হয়ে নাচতে আরম্ভ করে—হুঁ, একটা দৃষ্টান্তই ধরা যাক, চমৎকার ছবি, রামানন্দর দারুণ লোভ হল কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতে, বা যদি জগত মণ্ডলের মতন রং তুলির কারবার করত সে, সেসব নিয়ে আঁকাজুঁকি শুরু করে দিত। কিন্তু সে জেনে গেছে, কবিতার মধ্যে বা তুলির টানের মধ্যে সব কিছু ধরা দেয় না, পৃথিবীর কিছু আশ্চর্য জিনিস কিছু রং রেখা ও কালির আঁচড়ের বাইরে থেকে যেতে চায়, শত সাধ থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের সবটা রূপ প্রকাশ করতে পার না, কিছুটা পার, বাকি চৌদ্দ আনা অংশই তোমার দৃষ্টি তোমার অনুভবের আড়ালে থেকে যায়। কাজেই রামানন্দ মনে করে, ওদের স্বভাব নিয়ে নিজস্ব রূপ নিয়ে, যেমন ওরা আছে ওদের থাকতে দেওয়া উচিত। এখানে শিল্পচর্চার কোনো মানে হয় না। ছবি বা গল্প উপন্যাস নিয়ে রামানন্দ যদিও খুব একটা কিছু বলতে চায় না, কেননা ওই দুটো শিল্প তার এখতিয়ারের বাইরে, তার চর্চা নেই, তাহলেও যতটা সে বোঝে, ওই যে হাসপাতালে শুয়ে অক্ষয় হলদে ফ্যাকাশে চোখ মেলে বেঁটে গোলগাল ফরসা চেহারার একটা নার্সের দিকে সময় সময় চেয়ে থাকে এবং ডিউটি শেষ করে নার্সটা বেরিয়ে যাবার পর ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে বাড়ির হাঁস মুরগি, ঝিঙে কুমড়ো লতা ও মাধুরীর কথা আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করে এবং এক সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেশি ডিম ফুটাবার জন্য একটা ইনকিউবেটার কেনা যায় কিনা চিন্তা করে, তাকে নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখলেও পুরোপুরি ঠিক ওই মানুষটাকে কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারবে বলে রামানন্দ ভরসা করে না।

তার চেয়ে মোহন রেস্টুরেন্টের মোহনবাবুকে নিয়ে গল্প লেখা সহজ, বা বৌবাজারের চায়ের দোকানের সেই দশাসই চেহারার ম্যানেজারকে নিয়ে। বা রেখা চক্রবর্তীকে বিদায় দিয়ে রামানন্দ পঁয়ত্রিশ-বি যে বাসটায় চড়ে এল সেই কণ্ডাক্টার দুটিকে নিয়ে।

ছবির বেলায়ও তাই। ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম, সুররিয়ালিজম, যে রীতি ধরেই কেউ অক্ষয় বা মাধুরীর ছবি আঁকুক না, সেই আঁকা খুব একটা সার্থক হবে না, রামানন্দর ধারণা। যাই হোক, গল্প লিখিয়ে, ছবি আঁকিয়েদের সম্পর্কে রামানন্দ এর বেশি কিছু বলতে পারে না, কিন্তু কেউ যদি কবিতার কথা বলে, এদের দুজনকে নিয়ে কবিতা লিখতে কোনো কবির হাত সুড়সুড় করছে রামানন্দ শোনে, তবে সে মারমুখো হয়ে উঠবে।

আর এ-ও সত্য, রামানন্দ চোখ বুজে বলতে পারে, কবিতা লিখতে বসে কবিরা শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কে বাদ দেবে, সে পুরুষ, তারা ভাববে অক্ষয়কে

নিয়ে শিল্পকর্ম করার সব দায় দায়িত্ব গদ্য লিখিয়েদের। তারা মাধুরীকে নিয়ে পড়বে। বাংলা দেশ। কবিরা রাধার কীর্তন করতে খুব ভালবাসে। শ্রীমতীকে নিয়ে গীত ও পদ্য রচনা আজও পুরোদমে চলেছে। তবে এখনও কেউ কেউ বেশ রেখে ঢেকে, রবিঠাকুর যে বুদ্ধি দেখিয়ে গেছেন, মানে শরীরটার দিকে একটু কম ঝুঁকে, হৃদয় মন এ-সবের ওপর জোর দিয়ে সেই সঙ্গে দক্ষিণের বাতাস, কৃষ্ণচূড়া ফুল, শ্রাবণের মেঘ, বৃষ্টি, ডাহুকের ডাক ইত্যাদি মিশিয়ে কবিতা ফাঁদছে, আসক্তি নিরাসক্তি দুটোই থাকছে, যাতে জিনিসটা মোটামুটি লঘুপাক হয়, পাঠকের হজমের গোলমাল না হয়। দেখা যাচ্ছে, তাতে ফল ভালই হচ্ছে, পাঠক তাদের চোখ বুজে পাতে নিচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য জীবনানন্দের মতন পৃথিবীর ঘাস ফড়িং নষ্টচাঁদ হলুদ জ্যোৎস্না লাল রক্ত, মদের গেলাস, রাত্রির গন্ধ ইত্যাদি নিয়ে চমৎকার প্রতীকী আবহ সৃষ্টি করে কুড়ি বছর পঁচিশ বছর বা যেন হাজার বছর পরে নায়িকার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছে, যেন নায়িকা আর মানুষী না, 'দূরতর কোনো দ্বীপ' বা নক্ষত্র অথবা যেন শুধুই স্মৃতি, যেন স্মৃতি এসে বর্তমানের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে—এভাবে কায়দা করে কবিতা লিখছে, অর্থাৎ নায়িকাও থাকছে শুচিতাও রক্ষা হচ্ছে, ফলে অনেকে গোগ্রাসে এদের কবিতা গেলে, অনেকে বুঝতে না পেরে অসহায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিন্তু কবিকে তারা গালাগাল করে না। বরং একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে তাদের দেখতে থাকে। বাদ বাকী যারা, যেমন শুভেন্দুদের মধ্যেও অনেকেই মাধুরীকে দেখলে এই মুহূর্তে 'নোংরা পাখি' হয়ে ওর শরীরটা ঠুকরে খেতে চাইত, কেননা ওখানে 'জলকেলি লোভ ও রক্ত' ছাড়া তারা আর কিছু দেখতে পেত না। কিন্তু তাতে কি সত্যিকার মাধুরীকে দেখা যেত, ওই কবিতায়? মোটেই না। এ সব কবিতার জন্য কলকাতা শহরে মেয়ে কম আছে কিছু! যেমন পূরবী। কবিতার নাম শুনলে যার বমি আসে। অথচ ওই কবিতা বিদ্বেষিণীকে দেখেও রামানন্দ কতদিন গুনগুনিয়ে বলেছে, 'কেশ করেছি আবোত তাবোল, চুম্বনে ঐ দগ্ধ গালের আধখানা খাই আধলা রাখি—' বা যেমন ওই রেখা চক্রবর্তী, একটু আগে রামানন্দ বৌবাজারের পর্দাঘেরা খুপরির ভিতর বসে যার সঙ্গে পুরো প'য়তাল্লিশ মিনিট কবিতা নিয়ে কথা বলছিল, হুঁ, কবিতার জন্য ধরতে গেলে যে একরকম উন্মাদিনী, আবার ওদিকে হাতের ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে অফিসে চাকরি করতে ছোটে, কোমরে কাপড় বেঁধে রীতিমত খান্ডারী হয়ে চায়ের দোকানের দুর্বিনীত ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করে, সেই যুবতীর 'ভেজা ওষ্ঠাধর', 'শীতের দেশের মত হাসাহাসি-পোশাক' দেখে রামানন্দর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'হায় মেয়েরা, তোমরা বিমানে আছ, মন্ত্রিত্বে বা আদালতে সিংহাসনে বিদেশ মিশনে, এমন কি ঘরেও আছ...শুধু কবিতায় নেই...' অর্থাৎ রামানন্দ বুঝে গেছে, যে মেয়ে কবিতার নাম শুনলে নাক সিঁটকায় বা যে মেয়ে নিজে কবিতা লেখে এবং কবি ও কবিতার গন্ধ পেলেই আহ্লাদে নাচতে আরম্ভ করে, আসলে তাদের ভিতরটা এক, তাদের কবিতা ভালবাসা বা না-বাসা, কবিতা লেখা কি কবিতার বই হাতের কাছে পেলে উনুনের আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া এক জিনিস। আসলে এগুলি তাদের অনেকটা ওপরের ব্যাপার, সাপের খোলসের মতন। কেননা তারা অন্যদিকে ব্যস্ত, পৃথিবীর আর দশটা গুরুতর জিনিস নিয়ে তাদের অষ্ট-প্রহরের ভাবনা। ঘড়ির কাঁটা ধরে ট্রাম বাস আপিস, দোকান বাড়ি গাড়ি, নিদেন একটা স্কুটার, একটা ভাল ফ্ল্যাট, ফ্রীজ, গ্যাসের উনুন, ভাল পোশাক (কেবল নিজের না, যে মানুষটির ঘরণী হয়ে আছে তাঁর পোশাক-আশাকের দিকেও শ্যেনদৃষ্টি,

রামানন্দর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি, ভারি সোলের চপ্পল পূরবীকে কী দুঃসহ যন্ত্রণাই দিয়েছে) ছেলেমেয়েদের জন্য কে জি ইংলিশ মিডিয়াম, বছর বছর বাইরে যাওয়া, সর্বোপরি ভাল ভাল খাদ্য। কবিতা পড়ুয়া মেয়ে আর যিনি কবিতা ভালবাসেন না—প্রত্যেকেই কিন্তু একটা করে সাত হাত লম্বা জিভের অধিকারিণী।

তবু কলকাতার কবির দল আজও চুটিয়ে এদের নিয়ে কবিতা লিখে চলেছে। কেউ যদি দশটা কবিতা লেখে, তার মধ্যে সাড়ে নটাই এইসব যুবতী গিন্নী কুমারীদের ওপব চোখ রেখে। কারো 'সবিতা' কারো 'সুনয়না' কারো 'কঙ্কাবতী' এবং এরা 'নক্ষত্র' হয়ে কখনও শুধু আকাশে থাকে, 'মাটিতে নামতে মানা', কেউ 'পাশ বালিশ' হয়ে বিছানা আঁকড়ে থাকে, শরীর 'সোনালী স্রোত', 'স্তনের বোঁটা চোখের তারার মতন কাঁপে'।।

ভাল কথা, কিন্তু তাদের কারো সঙ্গে যেন মাধুরীকে মেলানো না হয়। কেননা কবিতার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে মাধুরীকে তুষ্ট করা যাবে না, আবার কবিতার কাঁটা ফুটিয়ে তাকে চটানো কি কাঁদানো যাবে না। কবিতা জিনিসটাই তার জানা নেই। তাই ভাবে রামানন্দ, কোনো বেটা শিল্পী এখানে ঘেঁষতে চাইলে রামানন্দ পরিষ্কার জানিয়ে দেবে, মাধুরীর অন্য জগত, হাঁস-মুরগি মাদার ফুল হলুদ রোদ সাদা বালু, তিরতিরে খালের জল, কচুরীপানা, হেলেঞ্চা দাম আর তার অক্ষয়।

কেউ এদের নিয়ে কবিতা লিখবে কি ছবি আঁকবে শুনলে মাধুরী এমন চোখে তাকাবে, যেন গ্রীক জানে না এমন মানুষকে কেউ গ্রীক ভাষা শোনাচ্ছে, হাসপাতালে অক্ষয়ের কানে কথাটা দিলে অক্ষয়ও হাসবে, ভাববে কেউ তাদের সঙ্গে রসিকতা করতে চাইছে।

তাকে নিয়ে তার বউকে নিয়ে আলাদা কোনো শিল্পকর্ম হয় সে মরে গেলেও বিশ্বাস করবে না।

তারা নিজেরাই একটা শিল্প।

এবং রামানন্দ এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা আছে কি যা একটা গাছকে ঠিকঠিক চিনিয়ে দিতে পারে? আজ পর্যন্ত পারেনি। এমন কোনো রংও নেই যা কিনা তুলির আগায় নিয়ে গাছের টকটকে লাল ফুল কেমন কেউ হুবহু বুঝিয়ে দিতে পেরেছে! কি ঘাসের মাথায় শিশির ফোঁটা!

তেমনি অক্ষয় মাধুরী, তাদের হাঁস-মুরগি, তকতকে ঝকঝকে উঠোন, ঘরের পিছনের মাদার মনসার ঝোপ, ঝোপের ভিতরে ঝিঁঝির ডাক।

আকাশের মেঘের মতন, ঝিমধরা দুপুরের রোদ্রের মতন তারা আপন স্বভাব নিয়ে রূপ নিয়ে রং নিয়ে আছে, থাকুক। কবিতা লেখার নামে শুভেন্দুদের কোনোরকম ফাজলামি, ছবি আঁকা নিয়ে জগত মণ্ডলদের কোনোরকম ইয়ার্কি এখানে অচল। এই জন্য পূরবীরা আছে, রেখা চক্রবর্তীরা আছে। পূরবী ও রেখার মতন বুড়িরা আছে ছুঁড়িরা আছে। সত্যি কলকাতায় কী নেই, লাখ লাখ মানুষ অগুনতি গাড়িঘোড়া পার্ক ময়দান নালা নর্দমা পায়খানা প্রস্রাবখানা, চমৎকার সব ড্রয়িং রুম বেডরুম, বড় বড় বস্তি, শুঁড়িখানা, মোহনবাবুর চায়ের দোকান কফি হাউস, বেশ্যা দালাল গুণ্ডা অধ্যাপক উকিল ডাক্তার, তাদের স্ত্রীরা ছেলেমেয়েরা—কবিতা লেখার, ছবি আঁকার মালমশলার অভাব? আধুনিক কবিরা তাদের নিয়ে কবিতা লিখবে, ছবি আঁকিয়েরা ছবি আঁকবে, গল্প লিখিয়েরা গল্প তৈরি করবে। এজন্য শহরের সবাই আকুলিবিকুলি করছে, তাদের আশা গল্পের মধ্য দিয়ে তারা নতুন করে বেঁচে উঠবে, কবিতার মধ্য দিয়ে সুরভি হয়ে উঠবে, ছবির ভিতর দিয়ে বর্ণাঢ্য হবে। হুঁ, তাদের রং জ্বলে গেছে, চেহারা বিকৃত হয়ে

গেছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মুখের দিকে তাকাতে লজ্জা, তারা টের পায় তাদের নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, প্লীহায় যকৃতে ফুসফুসে পচন ধরেছে, সেই পচন আস্তে আস্তে চামড়ার ওপর ভেসে উঠবে। নখ খসবে, চুল খসবে, তারপর হাতে পায়ের আঙুল খসে খসে পড়বে। নিজেদের সেই বীভৎস বিকলাঙ্গ মূর্তি কল্পনা করে প্রতিমুহূর্তে সব শিউরে উঠছে। ওপরের রূপটা কিছু না। ভিতরটা বিষাক্ত হয়ে গেছে। পূরবী বুঝতে পারে, রেখা বুঝতে পারছে। এই জন্য তাদের অস্থিরতা, এই জন্য রেখা কাব্য চর্চা করছে, কবিতা লিখছে, কবির ছায়ায় বসে দুদণ্ড নিজেকে শীতল করে নিচ্ছে। আহা, বেচারা পূরবী, রামানন্দর স্ত্রী, নিজে এক লাইন কবিতা লিখতে পারে না। অথচ রামানন্দ, এখানেই তার বোকামী, এই জীবনে একদিন একটা কবিতা লিখল না বেচারাকে নিয়ে। হয়তো কবিতার মধ্য দিয়ে ঐ যুবতীও সুগন্ধি সুন্দর হয়ে উঠতে চেয়েছিল। বুঝতে না পেরে রামানন্দ কিনা কেবলই তাকে অর্ধাঙ্গিনী শয্যাসঙ্গিনী করে রাখতে চেয়েছে। তাই না কবিতার ওপর মহিলা এত চটা, রামানন্দর ওপর এত বিদ্বেষ! কবিতার মধ্যে নিজেকে দেখল না সেই রাগ অভিমান। তারপর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া।

হুঁ, সবাই এমন চাইছে। সোনাগাছির সরযূ? জগত মন্ডলের সঙ্গে রামানন্দ যার ঘরে সেদিন গিয়েছিল? এক পয়সা কর দিতে হয় না জগতকে এখন সেখানে। জমি নিষ্কর হয়ে গেছে। মনের আনন্দে আর্টিস্ট সেখানে লাঙল চালাচ্ছে। কারণ? কারণটা পরে বোঝা গেছে, যখন আলো জ্বালল, ধূপ-কাঠি জ্বেলে আদর করে সরযূ দুজনকে ধবধবে বিছানার ওপর বসাল। এই দেওয়ালে সেই দেওয়ালে খাটের মাথায়, টেবিলের ওপর, ওয়াড্রোবের পাশে, আলমারীর মাথায় কেবল একটি মুখ, একটা মানুষ। সরযূ। চুল বাঁধছে, স্নান করছে, বই পড়ছে, সেতার বাজাচ্ছে, নাচছে, ঘুমোচ্ছে, স্বপ্ন দেখছে, হাই তুলছে, হাসছে, গান গাইছে—তৈলচিত্র রেখাচিত্র, পেন্সিলের কাজ সসের কাজ, চারকোলের আঁকা ছবি, গুণে শেষ করতে পারেনি রামানন্দ, কত ছবি আঁকা হয়েছে ঐ একটা মুখের।

রামানন্দর অপলক চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে সরযূ মিটিমিটি হাসছিল।

'সব জগতবাবুর আঁকা, দেখুন কত এঁকেছে আমাকে।' মেয়েটার দুই চোখে খুশি ধরছিল না।

'কিন্তু আর একটি গুণীকে তোমার ঘরে আনলাম, চিনে রাখ, মস্ত বড় কবি, রামানন্দ সেন।' জগত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল।

শুনে সরযূর মুখের হাসি দপ করে নিবে গেল। এত বড় একটা ঢোক গিলল: তারপর, রামানন্দ যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জগতের আঁকা ছবি দেখছিল, সরযূ চোখ ছোট করে রামানন্দর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। কবিকে দেখল।

'আপনাকে একটা কথা বলব?' রামানন্দর হাঁটুর ওপর হাত রেখেছিল সরযূ।

'হুঁ, হুঁ, বলবে, কেন বলবে না।' জগত তাকে সাহস দিচ্ছিল। 'রামানন্দ সেন জাত কবি, খুব ভাল মানুষ, তোমার ভয় নেই, আমার সঙ্গে যেভাবে ফ্রিলী কথা বলছ এঁর সঙ্গেও বলবে বইকি।'

'তা হলে এবার বলি, আমায় নিয়ে আপনি একটি কবিতা লিখুন।' আদুরে ঢঙে রামানন্দর হাঁটুর ওপর থুঁতনি রেখে সরযূ পায়ের কাছে মেঝের ওপর চোখ রেখেছিল।

'নিশ্চয় লিখবে', দরাজ গলায় জগত তৎক্ষণাৎ তাকে আশ্বাস দিয়েছিল। 'একটা কেন, দশটা কবিতা লিখে দেবেন, আমি যেমন তোমার ছবি এঁকেছি, তেমনি রামানন্দবাবু তোমায় নিয়ে অনেক কবিতা লিখবেন। এমন ঢলঢল চাঁদ-

মুখ নিয়ে কবিতা লিখবেন বলেই তো তোমার ঘরে আজ এ'কে নিয়ে এলাম। কি বলেন রামানন্দবাবু?'

রামানন্দ ঘাড় কাত করেছিল। জগত মণ্ডলের আঁকা এত এত ছবির মধ্যে নিজেকে দেখার পরেও সোনাগাছির সরযূর তৃপ্তি ছিল না। কবিতার মধ্যে নিজেকে নতুন করে দেখতে সেদিন মেয়েটা কী ভয়ানক আকুল হয়ে উঠেছিল, আজও রামানন্দ ভুলতে পারছে না। সেদিন এক পয়সা তাদের মাশুল লাগেনি। দুজনে আনন্দ করে সরযূর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রামানন্দ সময় সময় চিন্তা করে, তাকে নিয়ে একদিন রামানন্দ কবিতা লিখবে এই উল্লাস উত্তেজনা নিয়ে মেয়েটা হয়তো আজও জ্বলছে।

মোহন রেস্তোরাঁর মোহনবাবু? তারা কবির দল আড্ডা দিয়ে দিয়ে দোকানটাকে ফেল পড়ার পথে নিয়ে এসেছে। তবু মোহনবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। কেননা ভদ্রলোক সার কথাটা বুঝে গেছে। অনেকদিন আগে টের পেয়েছে তার ভিতরটা পচে পচে খুলে পড়ছে। ভাল করে দোকান চালিয়ে এত টাকা পয়সা জমিয়েও কিছু লাভ নেই। বরং কবিদের ছায়ায় বসে তাদের গায়ের আঁচ লাগিয়ে শান্তি। উ'হু, তা হলেও মোহন পাল বুঝি এত চুপ থেকে কবিদের অত্যাচার সহ্য করত না। ফি শনিবার বিকেলে বিকাশ একটা করে মোহনবাবুকে নিয়ে নতুন কবিতা লিখে মেনু-বোর্ডের ওপর টাঙিয়ে দিত। যেন দেখছে না, সেদিকে মোটেই চোখ নেই এমন ভান করে মোহন পাল মাথা গুঁজে এক মনে হিসাবের খাতা দেখত।

কিন্তু আসলে কি তাই? রামানন্দরা টের পেত, রাত নটার পর যখন দোকান থেকে তারা বেরিয়ে আসত, যখন দোকানের দরজায় তালা দেবার সময় হতো, ঠিক তখন মোহন পাল হিসাবের খাতাটি বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে মেনুবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াত এবং একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে কবিতাটা পড়ত। পড়ে মোহন পালের ফ্যাকাশে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় চুল বলতে পাটের আঁশের মতন পাতলা ফিনফিনে কিছু লোম, বৈশাখের দুর্দান্ত গরমেও গায়ের সেই রোঁয়া-ওঠা বিখ্যাত পশমী আলোয়ান, রং জ্বলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যেটা ছাল-ওঠা কুত্তার গায়ের চেহারা ধরেছিল, মাথার ওপর টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলছে, সামনের গলি থেকে ডাস্টবিনের গন্ধটা সরাসরি এসে নাকে ঢুকছে, দোকান ঘরের ভিতরটা তখন শ্মশানের মতন শূন্য খাঁ খাঁ করছে—ঐ অবস্থায় বড় রাস্তায় ট্রামের ঘড়ঘড়, রিকশার ঠুনঠুন শুনতে শুনতে তার নিজেকে নিয়ে লেখা বিকাশবাবুর কবিতাটি দু'তিনবার পড়ার পর মোহনবাবু যে এক ধরনের অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করত তাতে সন্দেহ ছিল কি। এভাবে ফি শনিবার কবিতার মধ্যে দিয়ে মানুষটা নতুন করে বেঁচে উঠেছে।

কলকাতার সব মানুষ, যাদের ভিতর পচে যাচ্ছে, এভাবে কবিতার মধ্যে গল্পের মধ্যে নয়তো ছবির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর ছটফট করছে।

উঁহু, মাধুরীর সবটাই নতুন তাজা বর্ণাঢ্য সুরভিত। তোমার আমার তৈরী মেকি ছবি কবিতা গল্পের এখানে দরকার নেই। আকাশের নীল, খালের জল, রাজহাঁসের ধবধবে ডানা তার কবিতা। মাদারের বেড়া দেওয়া টালির ঘর, খাঁচার রং-বেরঙের মুরগি, খাঁচার পাশে সাজিয়ে রাখা হাঁড়ি ভরতি ভুট্টার ছাতু, হাড়ের গুঁড়ো, হাসপাতালে রুগ্ন অক্ষয়—এসব তার গল্প। আর এই যে এতক্ষণ সাবান-টাবান মাথার পর এখন জলে ঝাঁপ দিল, পর পর দুটো ডুব দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কেটে হাঁসেদের কাছে চলে গেল, মাদী রাজহাঁসের লম্বা গলা জড়িয়ে তার কানে কানে দুটো কথা বলল—এসব হল ছবি, মাধুরীর জীবনের ছবি।

অন্য ছবি তার পছন্দ হবে কেন।

একটা ন্যাড়া তালগাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মাথায় রোদ নিয়ে রামানন্দ সব দেখছিল। এখন সামান্য কেশে গলার শব্দ করল। টের পেয়ে মাধুরী ঘাড় ফেরাল। রামানন্দকে দেখে হাসল, হাঁসের গলা ছেড়ে দিয়ে সাঁতার কেটে তখনি ঘাটে ফিরে এল।

'কখন ফিরলে মাস্টার?' যেন আর দেরি করা ঠিক না। আঁচলটা বুকের ওপর টেনে দিয়ে মাধুরী জল ছেড়ে তীরে উঠল। 'কেমন আছে ও?'

'ভাল।' পকেট থেকে রামানন্দ কফির প্যাকেটটা বের করল।

'একটু হাসল-টাসল?' কফির দিকে মোটেই চোখ নেই, মাধুরী তীক্ষ্ণ চোখে রামানন্দর চোখ দেখছিল।

'ভাল, ভাল', রামানন্দ ঘাড় নাড়ল, 'হাসল বইকি, অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্পটল্প করল।' ভেজা কাপড়ের নিচে মাধুরীর গায়ের রং ও মাংস কেমন তাজা কোমল সুশ্রী ঠেকছিল।

'সেই কখন বেরিয়েছ বাড়ি থেকে—' রামানন্দর সঙ্গে মাধুরী বাড়ির দিকে হাঁটছিল, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। 'এত ভাবছিলাম একা বসে বসে, এই তো চান করতে এলাম।'

'ভাবনার কিছুই নেই, অক্ষয় ক'দিনের মধ্যেই আশা করি বাড়ি ফিরতে পারবে।'

'ডাক্তারদের সঙ্গে আজ তোমার কথা হল?'

'না তা হয়নি, তা হলেও আমার মনে হচ্ছে—' রামানন্দ হঠাৎ চুপ করে গেল।

মাধুরী আর কিছু বলল না। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ সে বুঝতে পেরেছে অক্ষয়ের সকাল সকাল বাড়ি ফেরার আশাটা নিতান্তই রামানন্দর মনগড়া কথা, মাধুরীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মাত্র। রোদ্রে তার মাথার ভেজা চুল ভোমরার পাখার মতন চিকচিক করছিল।

'হুঁ, ভাল কথা, আমার কফি এনেছ?'

'এনেছি বইকি।' হাতের প্যাকেটটা রামানন্দ তুলে ধরল। 'খুব ভাল জিনিস চালান এসেছে এবার, নীলগিরির কফি, ওরা বলল।'

'ওরা সব সময়েই ভাল জিনিস বলে, না খেলে কিছু বোঝা যাবে না।' মাধুরী আর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। হাঁটবার সময় ওর পিছনটা দুলতে থাকে। ওর হাঁসগুলির কথা মনে হয় তখন। যেন হাঁসদের দেখে দেখে মাধুরী এমন পিছন দুলিয়ে হাঁটা শিখেছে। ওর নিতম্ব এমন কিছু ভারি না যে চলতে ফিরতে দুলবে। অস্বাভাবিক কি, রামানন্দ তখন চিন্তা করে, মানুষের কিছু কিছু স্বভাব পশু-পাখিরা নেয়, পশু-পাখিদের কোনো কোনো স্বভাব মানুষকে পেয়ে বসে।

'দ্যাখো দ্যাখো, কে আসছে!'

মাধুরীর চোখ অনুসরণ করে রামানন্দ সল্টলেকের ধুধু জমির দিকে চোখ ফেরাল। সাদা বালু উড়িয়ে শফী তার কালো লিকলিকে শরীরটা নিয়ে সাঁ সাঁ করে এদিকে ছুটে আসছে।

'শেয়ালের মতন দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।' রামানন্দ গুজগুজ করে হাসল।

মাধুরী হাসল না।

'তোমার দৃষ্টি একরকম মাস্টার, আমার অন্য রকম। অবিকল কেষ্ট ঠাকুরের মতন দেখাচ্ছে শফীকে।' মাধুরী গাঢ় গলায় বলল।

এর পর রামানন্দ কিছু বলতে সাহস পেল না। একটা শুকনো ঢোক গিলল শুধু।

॥ ৫ ॥

শফী যতক্ষণ থাকে, বাড়ি মাথায় করে রাখে। অসম্ভব বকতে পারে ছোঁড়া, আর ক্রমাগত হই-হই ছুটোছুটি। এক সেকেন্ড এক জায়গায় স্থির হয়ে বসা, কি দু' মিনিট মুখ বন্ধ রাখা তার কুষ্ঠিতে নেই।

ক'দিনই দেখেছে রামানন্দ।

রাজাবাজারের ঘুপসি বস্তি ছেড়ে এই খোলামেলা আকাশের নিচে মাধুরীর কাছে এসে শফীউল্লার প্রাণে আনন্দের তুফান ওঠে। তার চেহারাই বদলে যায় এই সময়টায়।

মিশমিশে কালো গায়ের রং। কিন্তু মুখটা ভীষণ মিষ্টি। টিকলো নাক। চোখ দুটো টানা টানা, উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন। গায়ের রং-এর যদি রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়, চোখ দেখে মনে হবে ভোরের আশ্চর্য নীল ময়ূরকণ্ঠী আকাশ। এখনও ঠান্ডা, বড় বেশি নির্মল। তবে সূর্য উঠবে। চোখের ধারে ধারে রক্তের লাল ছিটা, যৌবনের সতেজ রং প্রায় উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। দেবেই তো, পনেরো ষোল পার হতে চলল বয়স, পাতলা ঠোঁটের ওপর চিকন গোঁফের রেখা, চোয়ালের মৃদু ভাঙগাচোরা কাজ একটু একটু নজরে পড়ছে, গলার স্বর ভাঙগছে।

কাজেই কৈশোরের অজ্ঞানতা, নিষ্পাপ নিরীহ অন্ধকার, আবার এদিকে যৌবনের উদ্দীপ্ত বোধ বিশ্বাস উজ্জ্বল অহংকার-এর মাঝামাঝি এক জায়গায় পৌঁছে শফী এমন চঞ্চল অস্থির।

নিজেকে চিনতে পারছে না আর, বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। কী ছিলাম আমি, কী হচ্ছি। সব মানুষেরই এই হয়, এমন বয়স আসে। পথ হারিয়ে ফেলার, একটা চেনা খুঁটি ছেড়ে চলে আসার হিজিবিজি ধাঁধায় পড়ে হকচকিয়ে যাওয়া।

ছোঁড়ার চালচলন হাবভাব দেখে রামানন্দ সময় সময় খুশি হয়, বিরক্তও কম হয় না। কিন্তু দোষ দেবে কেমন করে। শফী এখন আকাশের মেঘ হয়েও নেই, পৃথিবীর সমুদ্রেও নেই। উজ্জ্বল বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে মাঝপথে দুলছে, হাওয়ায় কাঁপছে। না কি সমুদ্রে যাবার আগে বনের কিনারে আয়নার মতন চকচকে, স্রোত নেই ঢেউ নেই, নিরালা জলাশয় পেয়ে ঝুপঝুপ করে তার ওপর লাফিয়ে পড়ছে। যেন তাই। মাধুরী বনের ধারের দীঘি। বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে শফী জলে শব্দ তোলে, ঢেউ তোলে। শফী এলে মাধুরীর মুখে কথার খই ফোটে, হাসির ঢেউ ওঠে সর্বাঙ্গে, ঢেউয়ের সঙ্গে খুশির ছোট ছোট আবর্ত ওর গালে চিবুকে, চিবুকের নিচে কণ্ঠার কাছে অজস্র চোখে পড়ে, যেন দিশাহারা হয়ে ওঠে যুবতী।

এ-ও এক ছবি। মাদার ফুল, হাঁস, মুরগি, রোদ, বালু, খালের জল, পানা, গুগলী নিয়ে যেমন, তেমনি শফীকে নিয়েও মাধুরীর কবিতা।

অবশ্য রামানন্দর চোখে। তা না হলে ঐ দুটি মানুষ কবিতা-টবিতার বড় একটা ধার ধারে না।

রাজাবাজার থেকে ছোঁড়া হাঁটতে হাঁটতে এতটা রাস্তা চলে আসে। হপ্তায় দু' দিন আসে, তিন দিন আসে, আবার চার দিনও হয়ে যায়। অক্ষয় ঠিক করে

দিয়েছিল।

শফীদের ডিমের কারবার, এখানে সে ডিম নিতে আসে। হাঁস-মুরগি ডিম পাড়লে, যে ক'টা বাচ্চা ফুটাবার আলাদা করে রেখে মাধুরী বাদ-বাকি সব হাঁড়িতে তুলে রাখে, শফী এসে নিয়ে যায়। অবশ্য রোজ কিছু ডিম জমে না—দু'দিন, তিন দিন অন্তর শফীর আসার কথা।

কিন্তু রামানন্দ দেখছে, কেবল ডিমের জন্য আসা নয়, যেন আরও দরকারী কাজ থাকে শফীর এখানে, তাই কাল যদি মাধুরীর হাঁড়ি উজাড় করে সব ডিম নিয়ে গেল, পরদিন সকালেই আবার দেখা গেল গুনগুন করে গান করতে করতে সল্ট লেকের সাদা বালু উড়িয়ে ছিপছিপে কালো শরীরটা নাচাতে নাচাতে ছোঁড়া ছুটে আসছে। কি ব্যাপার? দেখা গেল তার হাতের পুঁটলিতে বাঁধা কিছু শুকনো মাছ—পাবদা শুঁটকী। হুঁ, দিদির জন্য নিয়ে এসেছে। মাধুরীর ভীষণ প্রিয় খাদ্যটি। চাটগাঁ থেকে শফীর মামা এসেছে চাঁদা ও পাবদা শুঁটকী নিয়ে। তাই থেকে শফী দিদির জন্য ক'টা পাবদা মাছ নিয়ে এল।

সেদিন পুঁটলি বেঁধে নিয়ে এসেছিল এত টোপাকুল। মেটিয়াবুরুজে শফীর মামার বাগানে দুটো কুল গাছে এবার ঝেঁপে কুল এসেছে। পাতা দেখা যায় না। টোপাকুল মাধুরীর ভীষণ প্রিয়। এই জিনিস পেলে সে ভাত খেতে ভুলে যায়। আর একদিন শফীর হাতে দেখা গেছে একটা প্রকাণ্ড ফুলকপি। কলকাতার বাজারে কপির অভাব কি, কিন্তু কপির এতবড় সাইজ বড় একটা চোখে পড়ে না। একদিন শফী ওটা মাথায় বসিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঘেমেটেমে একাকার। দেখে মাধুরীর কী হাসি!

আজও দিদির জন্য নিশ্চয় কিছু একটা এনে থাকবে। আজ ছোঁড়ার আসার কথা ছিল কি? কাল সে ঝুড়ি ভরতি করে ডিম নিয়ে গেছে। রামানন্দ জানে, আজ মাধুরীর হাঁড়িতে হাঁস বা মুরগির একটাও ডিম নেই।

সে যাই হোক, শফীর হাতে কিন্তু কোনো পুঁটলি-টুটলি ছিল না। যদি মাধুরীর জন্য পকেটে করে কিছু এনে থাকে। তা-ও সে আনে বইকি। বাদম-ভাজা চানাচুর পকৌড়ি। এই তল্লাটে এসব পাওয়া যায় না। অথচ কুড়মুড় করে নানা রকম ভাজাভুজি খেতে মাধুরীর খুবই পছন্দ।

রামানন্দ স্নান করতে চলে এসেছে। শফীর মুখটা একটু ভার ভার দেখল না? অন্য দিনের মত কেমন যেন হাসিখুশি না। দু'জন তখনি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। মাধুরীর নিশ্চয় রান্নার কিছু বাকি ছিল। এমন হয়। স্নানের আগে খানিকটা সেরে নিয়ে উনুনের বাকি কাজগুলি ও স্নানের পর এসে শেষ করে। 'মাস্টার, তুমি চট করে ডুব দিয়ে এসো, অনেক বেলা হল।' রামানন্দর দিকে মুখ না ফিরিয়ে মাধুরী বলছিল, 'কুমড়োর চচ্চড়িটা কেবল বাকি আছে। এখনি হয়ে যাবে।' তারপর মাধুরী আর উঠোনে দাঁড়ায়নি। শফীর হাত ধরে তার ছোট্ট রান্নার চালায় গিয়ে ঢুকেছে। উঠোনটা হঠাৎ তখন কেমন ফাঁকা লাগছিল। চার-দিকে রোদ টা টা করছে। শূন্য উঠোনটাকে মাধুরীর আঙুলের পরিচ্ছন্ন নখের মতন, না কি ঝকঝকে দাঁতের মতন মাজাঘষা পরিষ্কার মনে হচ্ছিল? হরিতকী গাছের উঁচু ডালে বসে একটা কাক অলস গলায় ডাকছিল। রামানন্দ ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়েছে, তারপর কাপড় গামছা নিয়ে তখনি বেরিয়ে খালের দিকে চলে এসেছে।

কিন্তু চট করে সে জলে নামল না। তীরে দাঁড়িয়ে সেই হাঁসটাকে দেখতে লাগল। ওপাশে কচুরিদামের কাছে ডুবিয়ে ডুবিয়ে গুগলী তুলছে। একটু আগে

মাধুরী ওটার গলা জড়িয়ে খুব আদর করছিল। এখন মাধুরী কুমড়োর চচ্চড়ি রান্না করছে। শফী নিশ্চয় উনুনের ধারে বসে আছে। আর একদিন দেখা গিয়েছিল উনুনের কাছে বসে ছোঁড়া পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে। কী রান্না করেছিল সেদিন মাধুরী? রামানন্দ মনে করতে পারল না। সত্যি কি কেষ্ট-ঠাকুরের মতন দেখায় শফীকে? কালো রং কোঁকড়া চুল টিকলো নাক বলে? যদি তাই হয়, তার পাশে, হুঁ, যখন দু'জন রান্নাঘরে ঢুকছিল, মাধুরীকে কেমন দেখাচ্ছিল? রাধা—রাই কিশোরী? না, তা কেন হবে। গোলাপের মতন গায়ের রং, রাত্রির অন্ধকার নিয়ে এক মাথা চুল, সরসীর মতন ঢলঢলে আয়ত চোখ, সুঠাম গড়ন, কিন্তু পঁচিশ-ছাব্বিশের কম বয়স হবে কি? চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রি হয়ে অক্ষয়ের স্ত্রী থমথমে যৌবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই দুটিকে রাধা-কৃষ্ণ মনেই হয় না। হওয়া উচিত না। শফী অনেক ছোট, কৃশ। তবে? রামানন্দ ফাঁপরে পড়ল। তার কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিতে আরম্ভ করল। কিছুতেই সে মনে করতে পারছিল না, ঐ দুটি মানুষকে পাশাপাশি বা মুখোমুখি দাঁড়ালে বা বসলে কাদের মতন দেখাতে পারে। কাদের মতন? এমন অসমান বয়স নিয়ে দু'জন কবে কোথায় একত্র হয়, ভাবতে ভাবতে গলদ্ঘর্ম হবার পর রামানন্দ অনেকটা সুস্থির হল। এবার তার ঠোঁট বেঁকে উঠল। ভুরুর মাঝখানের চামড়া দলা পাকিয়ে গেল। দুর্গন্ধের মতন কিছু একটা নাকে লাগলে নাকের ছিদ্র দুটো যেমন ওপরের দিকে ঠেলে ওঠে আপনা থেকে, বুজে যেতে চায়, লোমটোম নিয়ে রামানন্দর মোটা নাকটা অবিকল সেরকম চেহারা ধরল। তার দলের যে কোনো একটি কবি, শুভেন্দু বিকাশ নবকিশোর রজত উৎপলেন্দু অরুণাভ এবং তাদের চেয়েও যারা বয়সে ছোট, হুঁ, তরুণতম ত্যাঁদড় কবি পলাশ গাঙ্গুলীটিও যদি আজ ঠাণ্ডা রোদ মাথায় নিয়ে ধুলোয় গরমে একশা হয়ে এখানে ছুটে এসে এই দুটি মানুষকে একত্র দেখত তো সঙ্গে সঙ্গে অবাক হতো। হাতের কাছে কাগজ-কলম থাকলে ঠিক পদ্য লিখতে বসে যেত। শুভেন্দু ও বিকাশ ছাড়া বাদ-বাকি সবাই পকেটে খাতা কলম নিয়ে ঘোরে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের আমল থেকে, না কি তারও আগে, সেই চর্যাকারদের যুগ থেকে কবিরা এই কু-অভ্যাসটি অর্জন করেছে রামানন্দর জানা নেই, অত আগে কাগজ কলম আবিষ্কার না হলেও ঢাল তলোয়ারের মতন লেখার অন্য সাজসরঞ্জাম তাদের সঙ্গে খুবই থাকত। উঁহু, রাধাকৃষ্ণের বিরহ মিলনটিলন কিছু না, শফীর মধ্যে মাধুরীর মধ্যে কলকাতার আধুনিক কবিরা অন্য রস খুঁজে পেত, অন্য মূর্তি দেখত, ঐ যে আভনশায়ারের রসিক কবিটি ভেনাস-অ্যাডোনিসের মতন দুটি চমৎকার চোখ ঝলসান জুটি দাঁড় করিয়ে বীভৎস সুন্দর কাব্য লেখার রাস্তা দেখিয়ে গেছে! শুভেন্দুরা এখানে এসে তাই নিয়ে মেতে উঠত। উঁহু, তাদের বলে বোঝানো যেত না, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে রামানন্দ ঠিকই, কিন্তু ক্রমাগত তারা যেমন চোখের ওপর সেক্সের জ্বলুনিপুড়ুনি দেখছে, এখানে রামানন্দ অন্য ছবি দেখছে, ভাবতে ক্ষতি কি, এই ভাবনা শুভেন্দুদের মাথায় কোনো দিন আসবে না, শুনলে তারা বরং হাসবে। হাসুক, একটু আগে অক্ষয়ের উঠোনে দাঁড়িয়ে রামানন্দর মনে হয়েছিল, বসন্তের একটা জাঁকাল পুষ্পিত পলাশ গাছের নিচে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত কৃশকায় এক রাখাল বালক এসে দাঁড়িয়েছে। ছবিটা সুন্দর। আগেও, যতদিন শফীকে মাধুরীর পাশে দেখেছে, রামানন্দর মনে হয়েছে, বাইরে যতই চঞ্চল অস্থির হোক, আসলে ছোঁড়া অসহায়, একটা গাছের সুশীতল ছায়া খুঁজছে আশ্রয় খুঁজছে, তার চোখে সেই তৃষ্ণা, সেই ক্লান্তি, অভুক্ত সে, স্নেহ প্রীতি ভালবাসার কাঙ্গাল। তা

ছাড়া তার ভিতরে বেয়াড়া অশান্ত যৌবনের নড়াচড়া আরম্ভ হয়েছে, এই জন্য সে আরও বেশি বিমূঢ় বিভ্রান্ত। তাই মাছির মতন ঘুরে ঘুরে দিদির কাছে ছুটে আসা।

অবশ্য রামানন্দর এখনকার এই চমৎকার আশ্রয়টা শফীই পাইয়ে দিয়েছে। তা না হলে কী যে অবস্থা হতো। ক্রমাগত শুভেন্দুদের কাব্যচর্চা আর চেল্লাচেল্লি শুনে তার মাথাটা খারাপ হতে চলছিল। তাই তো, যে জিনিসের মধ্যে সে নেই, যা সে স্বেচ্ছায় বর্জন করেছে, ঠিক তার মধ্যেই তাকে বার বার টেনে নেওয়া, ধরে রাখার মতন নৃশংসতা কিছু আছে!

শফীর সঙ্গে তার কোথায় দেখা? সে যে শফীর মাস্টার মশাই ছিল। যে জন্য এখানে মাধুরী ও অক্ষয় তাকে মাস্টার বলে। এ ছাড়া এখানে রামানন্দর অন্য পরিচয় নেই। রামানন্দর পার্ক স্ট্রীটের স্কুলে ডোমেজ গোমেজ ডিকিন্স ম্যাকেঞ্জি পিল্লাই দেশাই চক্রবর্তী চ্যাটার্জিদের সঙ্গে শফীও ইংরেজী শিখতে গিয়েছিল। ডিমের কারবার করে বাপের হাতে কিছু পয়সাকড়ি জমেছিল, রামানন্দর যা অনুমান, অবশ্য রাজাবাজারের খোলার বস্তির আস্তানাটা ওদের ঠিকই আছে, আর ইয়াকুব মিঞার পরনেও যে ছেঁড়া লুঙ্গি ছেঁড়া শার্ট, রামানন্দ তাও লক্ষ্য করেছে। তা হলেও বেচারার খুব শখ ছিল ছেলেটা ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়ে বিলেত-টিলেত যাক। কিন্তু তার সেই গুড়ে শফী আচ্ছা করে বালু ছড়িয়েছে। থার্ড ক্লাসের বেড়া ই ডিঙ্গোতে পারল না। দু'দুবার অ্যানুয়েল পরীক্ষায় আটকে গেল। তাই তো, বাপের শখ আহ্লাদ মেজাজ মর্জির সঙ্গে ছেলের শখ মেজাজ মর্জিও যে মিলে যাবে তার কি আছে! শফী কী চাইছিল, তার খেয়ালের নৌকো কোন্ দরিয়ায় ভাসাতে চাইছে ইয়াকুব একদম বুঝতে পারেনি, না হলে ধরে বেঁধে তাকে স্কুলে পাঠায়! এখন অক্ষয়ের এই ভিটেয় ইয়াকুব একবার এসে উঁকি দিয়ে দেখত! এখনকার চেহারা আর শফীর স্কুলের সেই চেহারা! ঘণ্টা পড়ার পরেও দশ মিনিট পার না করে যে কোনো-দিন ক্লাশে ঢুকতো না। মাস্টার মশায়ের বকুনি খাবার ভয়ে রোজ শেয়ালের মতন পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে, এই জন্যই না রামানন্দ আজও তাকে শেয়াল বলে ডাকে। হুঁ, পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকত আর ইতিউতি করে তাকাত, যেন কোথাও কিছু চুরি করে এসেছে। তা চুরিই সে করত, বাপের কাছে চুরি করত, মাস্টার মশায়দের কাছে করত, ক্লাসে আর দশটা ছেলের কাছে করত। কেননা, কোনো দিন ভুল করেও একটা পড়া শিখে যায়নি। কিছু জিজ্ঞেস করলে নিচের দিকে চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকত। চুল ধরে টানো, কান ধরে টানো, যত খুশি বকুনি লাগাও, ছোঁড়া ঠিক চোখ দুটো বেঞ্চির দিকে নামিয়ে রেখে বোবা হয়ে আছে, পাথর হয়ে আছে। মারটা যেদিন বেশি পড়ত, একবার, একবারই শুধু চোখ তুলে তাকিয়েছে, অন্য মাস্টাররা কি করত তখন রামানন্দ বলতে পারে না, কিন্তু শফীর সেই অসহায় করুণ দৃষ্টি রামানন্দ সহ্য করতে পারত না, কেমন কান্না পেত তার, যেন কান্না রুখতে দাঁতে দাঁত চেপে একটু সময় সে চুপ করে থাকত। ক'দিনই এমন হয়েছে, তারপর হাতের বেতটা নামিয়ে রেখে শফীর মাথায় হাত রেখে, আদুরে গলায় বলত—কী দরকার কষ্ট করে তোর ইস্কুলে আসার, তার চেয়ে বাপের ডিমের কারবার দেখলে ভাল হতো না কি, বাপজানকে বুঝিয়ে বল না!

ইয়াকুবের ছেলে তাই বুঝিয়েছিল কি? রামানন্দ বলতে পারে না। তবে একদিন দেখা গেল শফী আর স্কুলে আসছে না। এক মাস দু' মাস—তারপর

ছ' মাস কেটে গেল। মাস্টাররা তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রামানন্দও বুঝল ছোঁড়া তার উপদেশ মাথায় করে নিয়েছে, হয়তো বাপের ডিমের কারবারেই লেগে গেছে। সত্যি, এক একদিন মার খেয়ে ছোঁড়া যখন নিঃশব্দে চোখ দুটো তুলে ধরেছে, রামানন্দর মনে হতো, চোখ না—যেন একটা কোমল উষ্ণ হাত বাড়িয়ে শফীউল্লা রামানন্দর হৃদ্‌পিণ্ডের ওপর রেখেছে। যেন রামানন্দকে ডেকে বলছে, এখানকার এই পাঠ্য বই-টই টুল টেবিল চেয়ার বেঞ্চি ঘণ্টার শব্দ চারদিকের দেওয়াল দপ্তরী আমার ভাল লাগে না স্যার, আমি হাঁপিয়ে উঠছি, আমায় মুক্তি দিন, মুক্তি দিন।

সেদিন রামানন্দ কী-দেখতে পেয়েছিল ইয়াকুবের ছেলের চোখের ভিতর? আকাশ ভরা রোদ, মাঠ ভরা ধুলো? মাদার মনসার-ঝোপে শালিক বুলবুলির নাচানাচি? একটা রক্তরাঙা পলাশ গাছ পায়ের কাছে মনোহর ছায়া ছড়িয়ে রেখে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে? হয়তো সেরকম কিছু দেখেনি, কিন্তু দেখতে পেলে রামানন্দ যেন শান্তি পেত। যেন রামানন্দ আশা করত, তেমন একটা রৌদ্র-ছায়া ছড়ানো বিশাল আকাশের নিচে পাখির ডাক ও ফাল্গুন পড়তে পড়তে ফুলে ফুলে গাছপালা ভরে উঠে এমন কোনো শান্ত পরিচ্ছন্ন জগতে শফীউল্লা তাকে ডেকে নিয়ে যাবে। শফী যখন আর স্কুলে আসছিল না, তার করুণ চোখ দুটো মনে পড়ে রামানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলত। তার বুক টনটন করত, তার মনে হতো, যদি আবার কোনোদিন কোথাও ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে দেখা হয় রামানন্দ তৎক্ষণাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবে, চুমোয় চুমোয় শ্যামলা রঙের কচি মুখটা আচ্ছন্ন করে দেবে। হুঁ, অস্বীকার করে লাভ নেই, যেন দরকার হলে রামানন্দ তখন গলা খুলে মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়, শফীর যে বয়স, গোঁফের রেখা উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, চোখে রক্তের ছিটা দেখা দিয়েছে, এই বয়সের একটি মেয়ের চেয়ে একটি ছেলের সাহচর্য তাকে বেশি সান্ত্বনা দেবে। অস্বীকার করে লাভ নেই। বুকে একটা হাহাকার নিয়ে রামানন্দ ঘুরছে, পূরবী তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না, বাউন্ডুলে কবি, গাধা স্কুল-মাস্টারকে ঐ মহিলা মনেপ্রাণে-ঘেন্না করে, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকবে বলে দিনরাত শাসায়। মোটে বিয়াল্লিশ বছর বয়স, এখনই কিছু যৌনসম্ভোগ থেকে রামানন্দ বঞ্চিত হতে চায় না, আর একটা শরীরের উত্তাপ, রক্তের স্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের নড়াচড়া বুক দিয়ে সে অনুভব করতে পারলে তৃপ্ত হয়, ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু কোথায় সেই জিনিস, ভোমরার ঝাঁকের মতন সুন্দর সুন্দর শরীর, সুন্দর মুখ নিয়ে মেয়েরা তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে ঠিকই, কবির সান্নিধ্য তাদের সুখ দেয়, রামানন্দর কবিতা পড়ে তারা মুগ্ধ, নিজেরাও কবিতা লিখতে চায়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, একটি মেয়ের প্রতিও রামানন্দ আকর্ষণ বোধ করে না, সব ক'টির চোখে সে পূরবীর চোখ দেখতে পায়, তাদের নিশ্বাসে পূরবীর নিশ্বাসের গন্ধ পায়। হুঁ, পূরবীর কাছ থেকে রামানন্দ জেনে গেছে, দৈবাৎ ওই মেয়েদের কারো স্বামী যদি কবি হয়, পূরবীর মতন ভদ্রলোককে মেয়েটিও বিয়ের পরদিন থেকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করবে, সেই পুরুষের চুল চোখ গায়ের চামড়া, এমন কি জামা-কাপড় দেখলেও তার গা-বমি করবে, আলাদা বিছানায় শোবে, কাব্যের সুষমা-টুষমা কর্পূরের মতন উবে গিয়ে ঘরে ছুঁচোর কেত্তন আরম্ভ হবে। কাজেই রামানন্দ মেয়ে জাতটাকেই আর সহ্য করতে পারছিল না। যদিও এর ষোল আনা তার স্ত্রীই দায়ী। পূরবী তাকে ঘোর নারীবিদ্বেষী করে তুলেছিল।

এই অবস্থায় রামানন্দ মনে মনে শফীকে-খুঁজছিল, ছোঁড়ার স্কুল ছাড়ার পরেও প্রায় ছ' মাস কেটে গেছে, ইতিমধ্যে পূরবী আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে

থাকতে আরম্ভ করেছিল। একদিক থেকে রামানন্দ তখন স্বস্তিবোধ করছে, যখন খুশি বাড়ি ঢোক, যেমন খুশি খাও, অবশ্য খাওয়াটা তখন হোটেলেই সারা হচ্ছিল, কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না, স্কুলে বেরোতে ইচ্ছেই করছে না, পরিচিত কোনো মানুষের মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না, এমন কি শুভেন্দু বিকাশদের মতন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়াতে ইচ্ছা করছে, সারাদিন ঘুরে দোর ভেজিয়ে কেবল বিছানায় শুয়ে থাকা, উঁহু কোনো বই পড়া না, কিছু লেখা না, লেখাটেখা শিকেয় তুলে রেখেছে, কোনোরকম চিন্তা অনুভূতি তার মধ্যে খেলা করবে না, এমন কি পৃথিবীর আলো শব্দ গন্ধ বাতাস কিছুই যেন তাকে স্পর্শ না করে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে বললে ভুল হবে, বরং তার তখন ভাবতে ইচ্ছা করছিল, ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয় বলতে যা বোঝায় সব কিছু তার ভোঁতা অকেজো হয়ে গেছে, যেন একটা মরা গাছ হয়ে, পাথরের চাঙগড় হয়ে সে বিছানায় শুয়ে আছে। দিনের পর দিন এভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়, ইচ্ছা করলেই সে কাটিয়ে দিতে পারে, চুল কাটা, দাঁড়ি কামানো, স্নান পায়খানা জামাকাপড় পরা—সব বন্ধ। এভাবেও ক'দিন কাটিয়েছিল বইকি রামানন্দ। স্কুলে যায়নি, সাত দিন কামাই করেছিল। কলকাতার রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি গাড়িঘোড়া, মানুষের মুখ, তাদের ব্যস্ততা ছুটোছুটি, সাজ-পোশাক, খাওয়া বেড়ানো, মানুষের ক্ষণে ক্ষণে রেগে ওঠা হেসে ওঠা, ট্রামবাসে ধাক্কাধাক্কি, চারদিকের অফিস আদালত দোকান সিনেমা, স্কুল-কলেজ, মিছিল শ্লোগান, ভিক্ষুক, রাস্তার মেয়ে, সাহিত্য খবরকাগজ, মোহনবাবুর চায়ের দোকানের আড্ডা, শুভেন্দু বিকাশ নবকিশোর উৎপলেন্দু—মনে পড়লে রামানন্দর উট্‌কি আসত, তার চেয়ে অন্ধকার ঘরে চোখ কান বুজে শুয়ে থাকা ঢের বেশি উপাদেয়, বাইরে যাবার কথা মনে হলেই একটা বধ্যভূমির ছবি তার চোখের সামনে তখন ভাসছে, গোটা কলকাতা শহরটা একটা কীলখানা; রোগা জিরজিরে হাজার হাজার গরু ছাগল ভেড়া এনে জড়ো করা হচ্ছে আর কাটা হচ্ছে, কেবল রক্ত, পশুদের ভয়ার্ত চিৎকার, পচা দুর্গন্ধ, ভনভন মাছি, লাল চোখ শকুনি গৃধিনী। এটা ভালই লাগত রামানন্দর, ঘরের বিছানায় চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে এই দুর্গন্ধ রক্ত মাছি শকুনের কথা ভাবতে, কলকাতার রাজনীতি সাহিত্য বাজার-হাট বইপাড়া স্কুল কলেজ অফিস-কাছারি শেয়ারের বাজার সিনেমা ঘোড়দৌড়ের মাঠ—সব এক দেখছে। আর তখন নিজের মনে হেসে সে কবিতা আওড়াতোঃ 'মনে হয় ঘণ্টা পড়ে গেছে, ট্রেন আসতে দেরি নেই—আমি কি কোথাও যাব? কোথায় যাব?' নিজের ও পরের লেখা সব কবিতাই তখন সে ভুলতে চাইছিল, তবু সময় সময় একটা দুটো ভাল লাইন অন্ধকারে বিদ্যুল্লতার মতন মগজের মধ্যে যে ঝলসে না উঠছে এমন না। সেদিন ঐ চলনসই কবিতাটি মনে পড়তে সে খুশি হয়েছিল, নিজের মগজকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল, কেননা সে তো শহর ছাড়তেই চাইছে, যত শীগ্‌গির সম্ভব দূরে কোথাও চলে যাওয়া।

এমন দিনে হঠাৎ একদিন শফীর সঙ্গে দেখা। কোথায় যেন বাসে করে যাচ্ছিল, বাস থেকে রামানন্দ দেখতে পেয়েছিল বৈঠকখানার মোড়ে অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে কালো রোগা শরীরটা ঝুঁকিয়ে শফী ফুটপাথের দোকান থেকে খেজুর কিনছে, নীল মাছি উড়ছে খেজুরের ঝাঁকার ওপর, শফীর পরনে টুকটুকে লাল লুঙ্গি। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ বাস থেকে নেমে পড়ে। তাকে দেখে ছোঁড়া অবাক। 'আমায় একটা ঘরটর দিতে পারিস? রামানন্দর প্রথম কথাই যেন ছিল ওটা। 'পুরনো বাসাটা ছেড়ে দিচ্ছি।' কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতন চেহারা করে

শফী ফ্যালফ্যাল করে মাস্টার মশায়কে দেখছিল, তারপর লাজুক হাসি হেসে চোখ নামিয়ে বলেছিল, 'আমার তো তেমন ভাল ঘর জানা নেই, স্যার।'

'কেন, তোদের ওখানে কী? তোদের রাজাবাজার বস্তির মধ্যে একটা ঘর পাওয়া যায় না?'

'ওরে ব্বাস, ওখানে আপনি থাকতে পারবেন না স্যার।'

'কেন, তোরা আছিস না?' রামানন্দ চোখ ছোট করেছিল। 'তোরা থাকতে পারলে আমিও খুব পারব।'

কেমন করে যেন হেসেছিল শফী। তরপর মাথা ঝাঁকিয়েছিল। 'ভয়ানক হট্টগোল স্যার ওখানে, রাতদিন চেঁচামেচি, আর ধোঁয়া দুর্গন্ধ নোংরা মাছি—'

'তা হোক, থাকুক দুর্গন্ধ চেঁচামেচি মাছি, আমায় একটা ঘর দে।'

কিন্তু শফী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না তার মাস্টার মশাই ওখানে গিয়ে থাকতে পারবে।

'বুঝলি', রামানন্দ আবার বলেছিল, 'এখুনি আমার একটা ঘরের দরকার, আজ পেলে আজই চলে যাই।'

তখন শফী বেলেঘাটার সল্ট লেকের ধারে অক্ষয়ের বাড়ির কথা বলেছিল। খুব খোলামেলা পরিষ্কার জায়গা। একটু দূর হয়। তাঁ হলেও এমন ফাঁকা জায়গায় মাস্টার মশায়ের ভাল লাগবে। শফীকে প্রায়ই সেখানে ডিমের জন্য যেতে হয়। রামানন্দ আপত্তি করেনি। হুঁ, দূরেই সে চলে যাবে, আর শফীও যখন প্রায় সেখানে যায়।

ঐ যে একদিন ছোঁড়ার চোখ দেখে রামানন্দর মনে হয়েছিল, আকাশ রোদ পাখির ডাক, ফাল্গুন পড়তে গাছের মাথা লাল হয়ে ওঠে এমন এক দেশে শফী তাকে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল।

কীলখানার পচা রক্ত দুর্গন্ধ শকুন ও পশুদের আর্তনাদ পিছনে ফেলে এসে রামানন্দ বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

নাকটা মোটা, মোটা ধাতের দেহ তার। একদিন সে কবিতা লিখত মনেই হয় না। স্নান করে ভেজা গামছাটা মাথায় জড়িয়ে এই যে বালুর ওপর দিয়ে হাঁটছে, দেখলে মনে হবে রুগীটুগী দেখে এসে খালের জলে স্নান করে গাঁয়ের এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, না কি মানুষটার মুদি দোকান আছে, থপথপ হেঁটে বাড়ি ফিরছে। আবার পুরুত ঠাকুরও মনে হতে পারে, রামানন্দর গায়ের রং ফরসা। তার ওপর মাথায় লাল গামছা জড়ানো। যেন পুজো-আচ্চা সেরে ঠাকুর-মশাই যজমান বাড়ি থেকে এই ফিরছে। যাই মনে হোক, আমাকে কেউ কবি না ভাবলেই হল, মনে মনে বলল সে।

খুব চুপচাপ লাগছিল বাড়িটা। যেন কেউ নেই। অবশ্য রান্নার চালার দরজা খোলা। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না, রান্নারও শব্দ নেই। তবে বুঝি রান্না শেষ করে মাধুরী রামানন্দর জন্য বসে আছে? শফী? এত শীগগির যে ভাইটিকে ও ছেড়ে দেবে রামানন্দর বিশ্বাস হল না। দুপুরে এলে ওকে দুমুঠো ভাত না খাইয়ে মাধুরী কোনোদিনই ছাড়ে না। ভেজা লুঙ্গি গামছা উঠোনের তারে শুকোতে দিয়ে রামানন্দ রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিল।

'কি হয়েছে!' অবাক হল সে। অবশ্য তখনি সে দেখে গিয়েছিল, শফীর মুখে আজ হাসি নেই কথা নেই, মুখটা বেজায় ভার। এখন মাধুরীর পায়ের কাছে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। যেন এই মাত্র কাঁদাকাটি করছিল। হাতের পিঠ দিয়ে খুব চোখ মুছছে। 'কি হল?'

'ওর বাপজান আজ খুব মেরেছে।' মাধুরী দরজার দিকে চোখ তুলল।

'কেন?' রামানন্দ একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ভিতরে গলাটা বাড়িয়ে দিল। সোজা হয়ে দাঁড়ালে ঘরের চাল মাথায় ঠেকে। 'ইয়াকুব ওকে মারল কেন?—শফী!' রামানন্দ ডাকল।

শফী মুখ তুলল না।

'এই দ্যাখো মাস্টার।' হাত বাড়িয়ে শফীর পিঠের জামাটা তুলে ধরল মাধুরী।

রামানন্দ দেখল শফীর পিঠে কালশিরা পড়েছে। রং ময়লা। তাই জায়গাটা নীল নীল দেখাচ্ছে।

॥ ৬ ॥

মোহনবাবুর চায়ের দোকানে ফরসা সুন্দর চেহারার একটি মানুষ বসে আছে। রামানন্দ যে চেয়ারটায় বসত সেটা দখল করে চুপচাপ বসে আছে। ডান হাতের আঙুলে আংটি। বাঁ হাতে ঘড়ি। টেবিলের ওপর একটা কাগজের বাণ্ডিল। সামনে কাচের গ্লাসটা শূন্য। চায়ের দাগ লেগে আছে। বোঝা যায় বেশ কিছুক্ষণ মানুষটির চা খাওয়া হয়ে গেছে। গ্লাসটার কানায় ক'টা মাছি দার্শনিকের মতো চুপচাপ বসে। এত স্থির হয়ে মাছিরা কখনও বসে থাকে? বাইরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কাজেই দুপুরটা মুখ গোমড়া করে অন্ধকার হয়ে আছে। অবশ্য অন্ধকার বা উজ্জ্বলতায় কিছু যায় আসে না, কটকটে রোদ বা থমথমে মেঘলা আকাশ—মোহনবাবুর দোকানের ভিতরটা চিরকাল একরকম—বেলা বারোটায়ও মনে হবে এখনি বুঝি শহরে সন্ধ্যা নামল। কাজেই ঝরঝরে রোদ-ওঠা সকাল থেকে আরম্ভ করে সোনামাখা বিকেল পর্যন্ত ফ্যাকাশে হলদে ডুমটা মাথার ওপর জ্বলবেই। মেঘলা দিন থাকলে তো কথাই নেই। রামানন্দ বলত, ওটা হল আমাদের চব্বিশ ঘণ্টার চাঁদ। চাঁদের আলো ছাড়া আমরা কাব্য-চর্চা করতে পারি না। কিন্তু ইদানিং কথাটা পাল্টে গেছে। ঐ যে তরুণতম ত্যাঁদড় কবিটি, যার নাম পলাশ গাঙ্গুলী, সম্প্রতি এই দলে এসে ভিড়ল, সেদিন বলছিল, ওটা হল চাঁপা ফুল। আমরা মোহনবাবুর আমড়া বাগানে চাঁপা তলায় বসে প্রাণ খুলে কাব্য আলোচনা করছি। শুনে শুভেন্দুরা সকলেই হেসেছিল। 'আমড়া বাগান কেন?' দলের মধ্যে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল।

উত্তরটা পলাশের মুখে তৈরী ছিল।

'বারে! আমরা যে এখানে আমড়াগাছি ছিঁড়ছি। বাবার সঙ্গে যখনই দেখা হয়, বলে, ছাইভস্ম কবিতা লেখা আর আমড়াগাছি ছেঁড়া এক কথা—ওতে কিচ্ছু হবে না খোকা।'

শুনে শুভেন্দুরা আর একবার হো-হো করে হেসেছিল।

এখন দোকানটা একেবারে ফাঁকা। কেবল রামানন্দর চেয়ার জুড়ে সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারার মানুষটি চুপ করে বসে আছে। আর ওপাশে মোহন পাল মাথা গুঁজে হিসাবের খাতা দেখছে। সুন্দর মানুষটির মাথার চুল পাট করা। বাঁ দিকে টেড়ি। পরনে শার্ট ট্রাউজারস। কিন্তু কেমন যেন বিরক্ত চেহারা করে বসে আছে। কপালে কুঞ্চন। বিরক্ত এবং বেশ একটা রাগী রাগীও দেখাচ্ছে ওকে। যদিও অনেকটা ইঞ্জিনিয়ার কি ডাক্তারের মতন দেখতে, যারা জানে না অনায়াসে তাই ধরে নেবে, বা অ্যাটর্নি অ্যাডভোকেট বলেও ভুল করা স্বাভাবিক।

আসলে এই হল কবি শুভেন্দু, শুভেন্দু ভৌমিক। কবি রামানন্দ সেনের অনুগামীদের একজন তো বটেই, এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান নায়কও বলা চলে।

এভাবে একলা আরও প্রায় দশ মিনিট আলাপ করার পর শুভেন্দু হাতের ঘড়ি দেখল। আড়াইটা বাজে। আজ মহরমের ছুটি, অফিস নেই। দুপুরেই এখানে চলে এসেছে।

ঘড়ি দেখার পর শুভেন্দু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরাতে যাবে, সেই মুহূর্তে পাতলা ছিপছিপে চেহারার আর একটি যুবক দোকানে ঢুকল। তার পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। চুড়িদার পাঞ্জাবির গলার দিকে ফুল-তোলা একটু নকশাও যেন রয়েছে। অবশ্য পায়জামা পাঞ্জাবি দুটোই যথেষ্ট ময়লা। পাঞ্জাবির দু' হাতে কুঁচি ছিল বোঝা যায়। ময়লা হয়ে যাবার পরেও কুঁচিগুলি এখনও অস্পষ্ট চোখে পড়ে। ব্যান্ডপার্টির ফ্লুট বাজিয়েদের গায়ের জামার কথা মনে পড়ে যায়। তাছাড়া যুবকের মাথায় বেশ বাহারের একটি বাবরি। নাকটা উঁচু। গলার কণ্ঠাস্থি অতিমাত্রায় প্রগল্‌ভ। সব মিলিয়ে মনে হবে ব্যান্ড দলের একজন ফ্লুটবাজিয়ে মোহনবাবুর চায়ের দোকানে ঢুকল।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কেননা এক হাতে সিগারেট ও আর এক হাতে দেশলাই ধরে রেখে শুভেন্দু গাল ছড়িয়ে হাসল। 'এই যে, কবি বিকাশচন্দ্রের এতক্ষণে উদয় হল। আর আমি শালা টানা দেড় ঘণ্টা এখানে মড়া আগলে বসে আছি।'

পরিচয় পাওয়া গেল। ইনি হলেন কবি বিকাশ চাটুজ্যে, আজ বাংলাদেশের আধুনিক সুররিয়ালিস্ট কবিদের প্রায় শীর্ষে অধিরোহণ করতে চলেছেন।

'একটু দেরি হয়ে গেল।' গলার স্বরটা অতিরিক্ত মেয়েলি। বিকাশ উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল, 'দাও, সিগারেট দাও।'

শুভেন্দু নিঃশব্দে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল এবং এবার হাতের সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল।

বিকাশের গাল গর্তে বসে গেছে। কোটরগত চক্ষুদ্বয়। সিগারেট ধরিয়ে যখন জোরে টান দিল তখন তার গালের গর্ত দু'টোর দিকে আর তাকানো যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে দু'দিক থেকে গাল দুটো কেউ বুঝি ফুটো করে দিল। সিগারেট টানার সময় কোটরগত চোখ দুটোও অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও সেই সঙ্গে সজল হয়ে উঠল। মনে হয় দীর্ঘ সময় তার ধূমপান করা হয়নি। এতক্ষণ পরে শুভেন্দুর একটা দামী সিগারেট টানতে পেরে তার প্রচণ্ড পিপাসা নিবারিত হতে চলল। যেন সেই সুখের উত্তেজনায় চোখ দুটো এমন চকচক করছে।

'মড়া আগলে বসে আছি', বলতে বলতে শুভেন্দু চোখের ইঙ্গিতে টেবিলের কাগজের বান্ডিলটা দেখিয়ে দিল। বিকাশ বুঝতে পারল এগুলি কবিতার প্রুফ। আগামী সংখ্যার 'পদাবলী'তে ছাপা হচ্ছে।

'প্রেস থেকে ওরা এসেছিল?' প্রুফের বান্ডিলটা বিকাশ বাঁ-হাতে তুলে নিয়ে তখনি আবার নামিয়ে রাখল। যেন ওজনটা পরীক্ষা করে দেখল শুধু, এছাড়া এতবড় বান্ডিলটা সম্পর্কে তার আর কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ নেই।

'হুঁ, এসেছিল বইকি, আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। বললাম, দেখা হয়নি।' শুভেন্দু টান হয়ে বসেছিল। এবার চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিল।

'কি বলল ওরা?' বিকাশও পিঠ এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

'খুব খিটিমিটি করছিল। অন্নদা নিজে এসেছিল। ম্যাটার কম্পোজ হয়ে সাতদিন পড়ে আছে। বলছিল, প্রেসের অন্য সব কাজের অসুবিধে হচ্ছে।'

'অন্য সব কাজের অসুবিধা হচ্ছে!' চেহারাটা বিকৃত করল বিকাশ। 'যেন পদাবলীর কাজ, কাজ না, ফর্মা পিছু গুণে গুণে এতগুলো করে টাকা দেওয়া হচ্ছে চাঁদকে—'

'বলছিল কলেজের কী সব নোট-টোট ছাপা হচ্ছে, টাইপ শর্ট পড়ে যাচ্ছে—'

'তোমার শালা চিরকালই টাইপ শর্ট থাকবে। মাগীবাজি করে টাকা ওড়াবে, টাইপ কিনবে কি দিয়ে—তা না হলে তোমার কত পরে স্টার্ট দিয়ে অরুণা-প্রেস আজ কত বড় হয়ে গেল। তুমি শালা সেই ঠুঁটো হয়ে রমানাথ কবিরাজ লেনের এঁদো গলিতে পচে মরছ—কলেজের নোট, রোয়াবি করার আর জায়গা পাচ্ছিল না—তুমি বললে না কেন, আমাদের যখন খুশি ধীরেসুস্থে প্রুফ দেখে পাঠাব। তাড়াহুড়ো করে একগাদা বানান ভুল নিয়ে পদাবলী বেরোক এ আমরা চাই না—'

বিকাশের কথা শেষ হবার আগেই এক সঙ্গে আরও দুটি তরুণ ভিতরে ঢুকল। দু'জনেরই ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মনে হয় কলেজে পড়ছে কি সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। শুভেন্দুর মতন তাদের পরনেও শার্ট ট্রাউজার্স। সরু মাথার চকচকে জুতো। তবে শুভেন্দুর যেমন পাট করা মাথা, এদের দু'জনের চুল ছোট করে ছাঁটা, একটু রুক্ষ, যেন তেলটেল দেয়ার কি চিরুনিটিরুনি চালাবার দিকে তেমন নজর নেই। একজনের হাতে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আর একজনের হাতে একগাদা কাগজ, যেন লিটল ম্যাগাজিন।

'এই যে অরুণাভ নবকিশোর এসে গেছে।' দরজার দিকে মুখ করে বসা বলে শুভেন্দু দু'জনকে আগে দেখল। বিকাশ পরে ঘাড় ফেরাল। কিছু বলল না সে। 'তারপর, দু'জনের কোথায় দেখা? একসঙ্গে উদয় হলে যে!' শুভেন্দু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

'আমি উত্তরপাড়া থেকে আসছিলাম, হাওড়া স্টেশনে অরুণাভর সঙ্গে দেখা, স্টেশনে দাঁড়িয়ে ও কাগজ কিনছিল।'

'বোসো বোসো।' শুভেন্দু অরুণাভর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'দেখি, কি কাগজ নিয়ে এলে।'

'ঐ তো, ক'টা লিটল ম্যাগাজিন।' দু'জন দুটো চেয়ার নিয়ে বসল। অরুণাভ তার হাতের কাগজগুলি শুভেন্দুর দিকে ঠেলে দিল।

পাক্ষিক মাসিক দ্বিমাসিক অনেক রকম কাগজ রয়েছে। শুভেন্দু আলতো করে কভারগুলো উল্টেপাল্টে দেখল, কোনোটা শুধুই কবিতা নিয়ে, কোনোটায় কবিতা গল্প প্রবন্ধ সমালোচনা ইত্যাদি পাঁচরকম জিনিস রয়েছে। কোনোটায় শুধুই গল্প।

বিকাশ একটা কাগজও ছুঁয়ে দেখল না। চোখ বুজে এক মনে সিগারেটটা শেষ করল। তারপর আর আঙুলে রাখা যায় না, সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটুকু মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল।

'আমাদের পদাবলী কবে বেরোচ্ছে শুভেন্দুদা?' নবকিশোর টেবিলের প্রুফের বাণ্ডিলটার ওপর চোখ রাখল।

হাতের ম্যাগাজিনগুলো অরুণাভর দিকে ঠেলে দিয়ে শুভেন্দু বড় করে একটা হাই তুললো। নবকিশোরের প্রশ্নের জবাব দিল না।

'তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা নেই একটায়ও, ওই যে "উন্মার্গ" কাগজটা, দেখলাম অ্যান্টি-পোয়েট্রি বলে কিছু চালাবার চেষ্টা করছে ওরা, তেমন কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না।' অরুণাভ ঠোঁট বেঁকাল।

'বোগাস।' বিকাশ এই প্রথম কথা বলল, তারপর নবকিশোরের দিকে চোখ তুলল। 'তুমি কি যেন বলছিলে নব? পদাবলী বেরোচ্ছে কবে? কিন্তু বেরটা করছে কে, একলা হাতে শুভেন্দু ক'দিক সামলাবে? লেখা জোগাড় কর, এডিট কর, প্রুফ দেখ, বিজ্ঞাপনের জন্যে ছুটোছুটি কর, স্টলে কাগজ দাও—সব ঠিক রেখে একটা পত্রিকা চালানো কি মুখের কথা।'

নবকিশোর একটু অপ্রস্তুত হল, লজ্জা পেল, চুপ করে রইল।

'আমাদের কিছু কিছু ভার দিলে আমরা তো করতে পারি।' অরুণাভ টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসল। দু' হাতের আঙুল একত্র করে হাত কচলাবার অস্পষ্ট ভঙ্গিও করল।

শুভেন্দু হাসল। 'বেশ তো, দেখ না তোমরা, এই তো প্রুফের গাদা জমে আছে, প্রেস থেকে অনবরত তাড়া দিচ্ছে, পারবে ঠিক ঠিক করে প্রুফগুলো দেখে দিতে?'

নবকিশোরের মতন অরুণাভও যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। হাত দুটো টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'রামানন্দদা না থাকাতে খুব অসুবিধা হয়েছে।' নবকিশোর আস্তে বলল।

'রামানন্দদা!' নাকের শব্দ করে বিকাশ মৃদু হাসল। 'রামানন্দ কতটা করত পদাবলীর জন্য শুনি? লেখাগুলো দেখে দিত—এই তো? কিন্তু বাকি কাজগুলো?' এক সেকেন্ড চুপ থেকে বিকাশ শুভেন্দুর প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে ধরিয়ে নিল। শুভেন্দুও একটা ধরাল। নবকিশোর ঢোক গিলল। অরুণাভ ঢোক গিলল। দু'জনেই প্রচণ্ড সিগারেটখোর। আঙুলের তামাটে পোড়া দাগ দেখলে বোঝা যায়। রামানন্দর সামনে তো নয়ই, শুভেন্দু ও বিকাশের সামনেও এরা তো পারতপক্ষে স্মোক করতে চায় না। অথচ দু'জনের পকেটেই প্রচুর সিগারেট মজুত থাকে। তবে শুভেন্দু বা বিকাশ মেজাজে থাকলে মাঝে মধ্যে এদের দিকেও হাত বাড়িয়ে দেয়। 'কি হে ছোকরা, সিগারেট-ফিগারেট আছে? আমার বাক্স খালি—ছাড় তো একটা।' তখন অরুণাভ কিংবা নবকিশোর আর কোনো সংকোচ না করে চটপট পকেট থেকে সিগাবেটের বাক্স বের করে ও'দের হাতে তুলে দেয়। ও'রা সিগারেট ধরাবার পর এরা নিজেরাও একট করে ধরিয়ে নেয়। কিন্তু আজ সেরকম কোনো সুযোগ আসছিল না বলে দু'জনে ছটফট করছিল।

'রামানন্দকে কোনোদিন লেখা জোগাড় করতে ছুটোছুটি করতে হতো না।' নবকিশোরের দিকে চোখ রেখে শুভেন্দু হাসিহাসি মুখেই বলল, 'প্রুফ দেখতে হতো না, বিজ্ঞাপনের জন্যও তাকে একদিন বেরোতে বলা হতো না। উ'হু, তার ক্ষমতাই ছিল না, এসব একটা কাজও গুছিয়ে করতে পারে—নামেই শুধু সে এডিটর ছিল, বাকি সব কাজ আমাকে করতে হচ্ছিল, বিকাশ করছিল। পদাবলীর জন্য বিকাশও যথেষ্ট খাটছে।'

প্রশংসা শুনে বিকাশের কাঠখোট্টা শুকনো মুখে একটু হাসি উ'কি দিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তা মিলিয়ে গেল। বিকাশকে কোনোদিনই হাসতে দেখা যায় না। সর্বদা কেমন বিরক্ত বিষণ্ণ। কথাবার্তাও কাটাকাটা। রসকষ নেই। সম্ভবত লিভারের অসুখ বলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। অথচ এই মানুষের হাত দিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর সুক্ষ্ম বুদ্ধিউজ্জ্বল কবিতা বেরোয় কি করে, নবকিশোরের মতন তরুণ ভক্তরা অনেকদিন চিন্তা করেছে।

'রামানন্দ কেবল কবিতা লিখেই খালাস ছিল; বলে কিনা যে ব্যক্তি কাছা দিতে ভুলে যায় তাকে দিয়ে হবে কাগজ এডিট করা, প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপন জোগাড় করা—

তবেই হয়েছিল! শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস কর, কাগজ চালাতে গিয়ে রামানন্দকে আমরা কতটুকু পেয়েছি।' বিকাশের কথায় শুভেন্দু নাকের একটু শব্দ করা ছাড়া আর কোনো মন্তব্য করল না।

'পদাবলী রেগুলারলি চালিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা কোথায় বলতে পার? না এই নিয়ে তোমরা তরুণরা একদিন চিন্তা করেছ? কাগজের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে—তেমনি ছাপা খরচ, প্রেসগুলো তো দিন দিন ডাকাত হয়ে উঠছে, ফর্মা পিছু কত করে পেলে যে ওরা খুশি হবে, ওদের পেট ভরবে, ঈশ্বর বলতে পারে। লিটল ম্যাগাজিন বিক্রি করে যে খরচ ওঠে না, তা তোমাদের ভাল জানা আছে, তাও কিনা স্রেফ কবিতা আর কবিতার আলোচনা—আমি বলি কি শুভেন্দু'—বিকাশ শুভেন্দুর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'এখন থেকে একটা করে রগরগে উপন্যাস পেছনে জুড়ে দাও, বেরোক ধারাবাহিক হয়ে, তাহলে কাগজটা কিছু বিক্রি হবে, বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে।' এটা বিকাশের রাগের কথা, অভিমানের কথা সন্দেহ কি। তাই শুভেন্দু মুখে কিছু বলল না। চোখ আড় করে মোহনবাবুকে দেখতে লাগল। হিসাবের খাতা থেকে চোখ তুলে মোহন পাল যেন নিবিষ্ট হয়ে রাস্তার ওপারে ডাস্টবিনটা দেখছিল। আকাশটা অসম্ভব ঘোলা। যেন সারাটা দুপুর অগ্নিমান্দ্যে ভুগছে। এই কি চৈত্রের মাজাঘষা উত্তপ্ত প্রখর মধ্যাহ্নের চেহারা? ভাবতেও কেমন লাগে। শুভেন্দু একটা অলস হাই তুলল।

'হুঁ, দুটো একটা বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পার কিনা তোমরা বরং চেষ্টা-চরিত্র করে দেখতে পার।' একসঙ্গে এতটা ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে বিকাশ আবার আরম্ভ করল : 'অবিশ্যি চেষ্টাই সার হবে—ক'টা কনসার্নের সঙ্গেই বা তোমাদের জানাশোনা আছে—আমি কি কম পরিশ্রম করেছি। কলকাতার হেন বড় বড় পার্টি নেই, মানে যারা কাগজে নিয়মিত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছাড়ে—সব ক'টা দরজায় ঢুঁ মেরেছি, উঁহু, সুবিধে হচ্ছে কোথায়! ফলে হচ্ছে কি, কাগজ প্রিন্টিং চার্জ, দপ্তরী—মানে সবটা খরচের চাপ একা শুভেন্দুকে বইতে হচ্ছে। রামানন্দ কোনোদিন একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি, আমার এই চাকরি নিয়ে সম্ভব না পদাবলীর জন্য মাস মাস—'

'আহা থাম না!' শুভেন্দুর আর চুপ থাকা হল না, যেন বিরক্তই হচ্ছে কথা-গুলি শুনে, 'এদের এসব বলে লাভ কী, এখনো গায়ে কলেজ ইউনিভার্সিটির গন্ধ লেগে আছে! কোন্ জন্মে এক-একজন চাকরি করবে, আর চাকরির বাজারের যা অবস্থা! হুঁ, বুঝতাম, প্রত্যেকেই বড় বড় সার্ভিসে ঢুকেছে, তখন না হয়—কিন্তু আজ এদের পদাবলী কি করে চলছে, কেমন করে চলবে, শুনিয়ে তো কিছু হবে না।'

আবহাওয়াটা থমথম করছিল। বিকাশ আর কিছু বলছিল না। মোহন পাল প্রচণ্ড শব্দ করে একটা হাঁচি দিল। চেয়ার থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে নাকটা ঝাড়তে যাবে, বাধা পেল, পাখির মতন ফুরফুর করে দু'টি মেয়ে এসে ভিতরে ঢুকল। একজনের বাসন্তী রঙের শাড়ি, আর একজনের ব্লু। পায়ে দু'জনেরই সাদা হালকা চটি। মাথায় ডবল ভাঁজ বেণী। গায়ের রং আশ্চর্য ফরসা, যেন একটিকে ছাড়িয়ে আর একটি সুন্দর। টানাটানা চোখ, টিয়ার ঠোঁটের মতন নাক। মোহন রেস্টুরেন্টের ভিতরের গুমোট অন্ধকারটা আচমকা রোদ লাগা জলের মতন ঝিল-মিল করে উঠল।

কিন্তু দু'টির একটিও কথা বলতে পারছিল না। ঠোঁট টেপা হাসি নিয়ে

শুভেন্দুদের টেবিল থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

'কি চাই আপনাদের?' শুভেন্দু প্রথম কথা বলল। তার মনে হল, দু'জনেই একটু একটু দুলছে, যেন ভিতরে কথা জমে আছে, অথচ বের করতে পারছে না—তারই ধাক্কা লেগে দু'টি শরীর মাধবীলতার মতন আন্দোলিত হচ্ছে আর হাসতে গিয়ে কেবল ঠোঁট টিপছে।

কেউ না দেখতে পায় অরুণাভ নবকিশোরের হাঁটুতে চোরা চিমটি কাটল। বিকাশ ইচ্ছা করে ঘাড়টা বেঁকিয়ে মোহন পালকে দেখছিল। পুরো একটা মিনিট হাঁ করে এদিকে তাকিয়ে থেকে এবার গলাটা দরজার বাইরে নিয়ে মোহন পাল ঘটা করে নাক ঝাড়তে আরম্ভ করল। পিঠের রং-চটা পশমী আলোয়নের কোণটা মেঝেয় লুটোচ্ছে।

'পদাবলী বেরিয়েছে?' চাপা গলায় যেন মুখের ভিতর লজেনস্ চিউইংগাম জাতীয় কিছু রয়েছে, একটি মেয়ে প্রশ্ন করল।

'না।' শুভেন্দু সংক্ষেপে উত্তর দিল।

'কবে বেরোবে?'

'দেরি হবে এবার কাগজ বেরোতে।' এদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বেশ একটু রুক্ষ গলায় বিকাশ উত্তর করল। অরুণাভ ও নবকিশোর অসন্তুষ্ট হল।

ঠিক এই মুহূর্তে এতটা রুক্ষতা, কর্কশতা তাদের মোটেই ভাল লাগল না। কবি হিসাবে বড় কবি হতে পারে বিকাশ চাটুয্যে, অরুণাভ ও নবকিশোর একসঙ্গে চিন্তা করল, মানুষ হিসাবে, হোক বয়োজ্যেষ্ঠ, এঁকে সময় সময় বরদাস্ত করা তাদের অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরা, এই মেয়ে দু'টি, আর কোনোদিন এখানে আসেনি, একেবারে নতুন মুখ, কফি হাউস কিংবা ইউনিভার্সিটির সামনে বা কলেজ স্ট্রীটের এদিকটায়ও এদের কাউকে আগে দেখেছে বলে নবকিশোর ও অরুণাভ মনে করতে পারছিল না। নিশ্চয় পদাবলীকে এরা ভালবাসে। হয়তো নিয়মিত কিনে পড়ে। একটু মিষ্টি করে সুন্দর করে বিকাশ চাটুয্যে এদের সঙ্গে কথা বললে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বিকাশ লক্ষ্য করল না, শুভেন্দুও না। অরুণাভ ও নবকিশোর চোয়াল শক্ত করে ভুরু কুঁচকে রেগে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে চুপ করে আছে। তবে মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা সুবিধা হচ্ছিল তাদের, দু'টি মেয়েকেই পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত, আর একটু ওপরে, ঊরু পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিল।

'অ, দেরি হবে।' প্রথমটি না, নবকিশোর ও অরুণাভ বুঝতে পারল এবার দ্বিতীয় মেয়েটি কথা বলছে, আগেরটির চেয়েও গাঢ় মিষ্টি গলার স্বর, যেন চাক ভেঙ্গে দু' ফোঁটা মধু ঝরে পড়ল। শব্দের ভিতর দিয়ে কোনো কোনো জিনিসের স্বাদ গন্ধ পাওয়া যায়, এমন কি রং পর্যন্ত বোঝা যায়, সেই স্বর এই মেয়ের, সুন্দরবনের ঘন সোনালী টাটকা মধুর আস্বাদ পেয়ে অরুণাভ ও নবকিশোর একসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল। একটু চুপ থেকে মেয়েটি আবার বলল, 'গত সংখ্যার পদাবলীতে রামানন্দ সেনের কবিতা ছিল না। এবার নিশ্চয় থাকছে?'

'না।' কর্কশ উত্তর। কটমট করে অরুণাভ ও নবকিশোর বিকাশ চাটুয্যের মুখটা আর একবার দেখল। চেহারাটা কেমন জঘন্য করে রেখে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে। 'রামানন্দ সেন আর পদাবলীতে লিখছেন না। লেখাই বন্ধ করে দিয়েছেন।'

'কেন?'

'তা কি করে বলব!' ধমক দিয়ে উঠল বিকাশ। 'কেউ লেখে কেউ লেখে না, কেউ দু'চারদিন বন্ধ রেখে আবার লিখতে আরম্ভ করে, কেউ একেবারে বন্ধ করে দেয়—এর মধ্যে কেন-টেন আসে কি? আর এলেও আমরা যে তার উত্তর দিতে পারব, কি করে আশা করেন! মানুষ নিজের মর্জি নিয়ে চলে।'

ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে মেয়েটি চুপ করল।

'আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?' শুভেন্দু প্রশ্ন করল।

'ল্যান্সডাউন রোড থেকে।' প্রথম মেয়েটি উত্তর করল।

'ওখানে স্টলে নিয়মিত পদাবলী পান?'

'মাঝে মাঝে পাই, যখন পাই না, এ পাড়ায় ছুটে আসতে হয়।'

শুনে শুভেন্দু আর কিছু বলল না। গম্ভীর হয়ে কথা বললেও তার গলার স্বর বিকাশের মতন রুক্ষ ছিল না, যেন একটু আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। তাছাড়া দেখতেও তো মানুষটা সুন্দর। কাজেই দেখা গেল সেই মুহূর্তে মেয়ে দু'টি আর কারো দিকে না তাকিয়ে টলটল করে কেবল শুভেন্দুকেই দেখছে। অরুণাভ ও নবকিশোর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যেন এখানে এখন বাজে কথাবার্তা হচ্ছে, এসব দিকে মনোযোগ দেবার সময় নেই এমন একটা ভঙ্গি নিয়ে পকেট থেকে কলম তুলে প্রুফের বাণ্ডিলটা টেনে নিয়ে বিকাশ ঘাড় গুঁজে প্রুফ দেখতে লেগে গেছে।

'আমরা যে এখানে বসি, কার কাছে খোঁজ পেলেন?'

'বা—রে!' ভুরু নাচিয়ে দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, 'আপনাদের কাগজেই তো এই দোকানের নম্বর রয়েছে। আর একটা ঠিকানাও অবিশ্যি দেওয়া থাকে।'

শুভেন্দু চুপ করে রইল। পদাবলীর দুটো ঠিকানাই দেওয়া হয়। একটা শুভেন্দুর গড়পার রোডের বাড়ির, আর একটা কলেজ রো-র মোহনবাবুর চায়ের দোকানের। মোহন রেস্টুরেণ্ট।

'আচ্ছা, রামানন্দবাবু কি আজ এখানে আসবেন?'

'রামানন্দবাবু এখানে আর আসেন না।' সেই নীরস কদর্য গলা, কটমট চাউনি, এমন করে বিকাশ ওদের দেখছে, যেন তার কাজের ক্ষতি হচ্ছে, যেন এই মুহূর্তে ওরা এখান থেকে চলে না গেলে সে আরও কঠিন কুৎসিত হয়ে উঠবে।

থতমত খেয়ে দু'টি মেয়ে একসঙ্গে ঢোক গিলল। মলম বুলোবার মতন মোলায়েম গলায় শুভেন্দু বলল, 'রামানন্দ অনেকদিন এখানে আসা ছেড়ে দিয়েছে।'

'রামানন্দবাবু কোথায় থাকেন?'

'বলতে পারব না।'

মেয়ে দু'টি আর দাঁড়াল না। কাগজ কবে বেরোবে জানতে এবং যেন সেইসঙ্গে কবি রামানন্দ সেনকে দেখতে পাবে এমন একটা আশা নিয়ে তারা এখানে ছুটে এসেছিল। এখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু দরজার দিকে এগিয়ে যাবার আগে আর কারো দিকে না, বিকাশ চাটুয্যের দিকে দু'জনেই একসঙ্গে এমন তীব্র কটাক্ষ হেনে গেল, যেন এই মানুষটির মতন ঘৃণ্য জীব পৃথিবীতে এর আগে তারা কখনও দেখেনি। বিশেষ করে নবকিশোর ও অরুণাভ মেয়ে দু'টির তাকানোর মধ্যে এই জিনিসটা বেশি করে লক্ষ্য করল। তারাও কম হতাশ হয়নি। কিন্তু তারপর দরজার ওপারে গিয়ে দু'টিতে কী বলাবলি করছিল?

'ধেৎ, রামানন্দ সেনের কবিতা না থাকলে পদাবলী আর ছুঁয়ে দেখে কে!'

'তাই তো, ওই একজনের কবিতা ছাড়া ওতে পড়ার মতন কিছু থাকে নাকি!

আমি আর পদাবলী কিনছি না।'

শুনল—মোহন পাল শুনল কিনা বোঝা গেল না, কেননা মোহন পাল অনেক কিছু শুনেও সময় সময় এমন ভান করে থাকে, যেন এই জগতে তার মতন বধির আর দ্বিতীয়টি নেই, কিন্তু বাকি চারটি মানুষ পরিষ্কার শুনতে পেল। শুভেন্দুর ফরসা মুখটা কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল। নবকিশোর ও অরুণাভর মুখ কালো হয়ে গেছে। পদাবলীর প্রায় প্রতি সংখ্যায় তাদের কবিতাও থাকে। আর বিকাশ চাটুয্যে? হাতের কলমটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে এমন-ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, কোটরাগত চোখ দুটো শ্বাপদের চোখের মতন জ্বলছে, যেন তার হাতে ওটা কলম না, ধারাল অস্ত্র, একটা ছুরি, যেন এখনি ছুটে গিয়ে ঐ দুই ছুঁড়ির বুকে আমূল বসিয়ে দেয়, তবেই সে শান্তি পায়, তার ক্রোধ প্রশমিত হয়।

শুভেন্দু দু' আঙুলে কপালের রগ টিপে ধরেছে। হাতের কলম ফেলে রেখে বিকাশ পকেট থেকে ময়লা রুমালটা তুলে কপালের ঘাম মুছল এবং তেমনি কটমট চোখে ওপরের পাখাটা দেখল। ওটা বাতাস যত না দেয় শব্দ করে অনেক বেশি।

'আপনি আর পাখাটা সারাবেন না মশায়?' বিকাশ প্রায় খেঁকিয়ে উঠল।

কিন্তু মোহন পাল কোনো অবস্থাতেই উত্তেজিত হয় না। বিকাশবাবু খেপে গেছে। তাহলেও হিসাবের খাতা থেকে চোখ তুলে মোহন ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সারাব, সারাব, মিস্ত্রীকে খবর দিয়েছি।'

বিকাশ আর কিছু বলল না। কারণ সে জানে, এই পাখা কোনোদিনই সারানো হবে না। অতিরিক্ত ঘাম পড়লে তারা অবশ্য রোজই একবার দু'বার কথাটা মোহনের কানে দেয় এবং মোহন পালও মাথা নেড়ে 'সারাব' 'সারাব' করে—আজ আট বছর। ব্যাপারটা দু'পক্ষেরই প্রায় অভ্যাসের সামিল হয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আর একবার দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল। এবার আর মাধবীলতা হয়ে দুলে দুলে না, সতেজ টনকো রজনীগন্ধার ডাঁট, ঋজু সুঠাম শরীর নিয়ে যুবতী দরজা পার হয়ে শুভেন্দুদের সামনে এসে দাঁড়াল।

॥ ৭ ॥

'আপনি শুভেন্দুবাবু?'

'হুঁ।' শুভেন্দু কপাল থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বসল।

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'এঁকে চিনলাম না?'

'কবি বিকাশ চ্যাটার্জি।'

'ও, নমস্কার নমস্কার।'

'নমস্কার।' পকেটে রুমাল ঢুকিয়ে বিকাশ থুঁতনি নাড়ল।

'এঁরা?'

'এটি নবকিশোর চৌধুরী, ওটি অরুণাভ চক্রবর্তী।'

'হুঁ, এদের লেখাও আমি পড়েছি। খুব ভাল লাগে। আপনাদের সকলের কবিতা আমার ভাল লাগে।'

'বসুন আপনি। দাঁড়িয়ে কেন।' বিকাশের রুক্ষ চেহারায় এতক্ষণ পর হাসির রোদ উঁকি দিতে দেখা গেল। নিজেই হাত বাড়িয়ে ওদিক থেকে একটা চেয়ার এদিকে টেনে আনল। যুবতী বসল। অরুণাভ নবকিশোরের চোখেও উৎসাহের উজ্জ্বলতা ফিরে এল।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন!'

'পাইকপাড়া।'

'ও, হ্যাঁ।' শুভেন্দুর চোখ বড় হয়ে উঠল। পাইকপাড়ায় দু'জনের নামে পদাবলী যায়। হেনা সেন, প্রেমাংশু দত্ত। আপনি অধ্যাপিকা হেনা সেন?'

'হুঁ,' হেনা সেন ঘাড় কাত করল, 'কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে। যেজন্য আমাকে এখানে ছুটে আসতে হল।'

'কি বলুন তো?' বিকাশ ঝুঁকে বসল। কাগজ নিয়মত পাচ্ছেন না? ডাকের গোলমাল হচ্ছে? ছাপার ভুলটুল বেশি দেখেন? না কি কাগজটা আর একটু বড় করছি না, মানে পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়াচ্ছি না বলে আমাদের ওপর খুশি হতে পারছেন না? বৈশাখ সংখ্যা একটু মোটা হবে, আধুনিক কবিতার ওপর একটা দীর্ঘ আলোচনা ছাপা হচ্ছে।'

'তাই নাকি!' হেনা সেন চোখ বড় করল। পাখির বাসার মতন গোল গোল চোখ। মুখের ডৌল লম্বাটে, চিবুক পাতলা ছোট, সম্ভবত ঠোঁটের স্বাভাবিক রং লাল। আলগা রং বুলোবার দরকার ছিল না। দু'দিক থেকে বেঁকে এসে ভুরু দু'টি নাকের ওপর প্রায় জোড়া লাগার অবস্থা, তবু মাঝখানে আলপিনের মতন ফাঁক থেকে গেছে, ফলে মুখের সৌন্দর্য বেড়েছে বই কমেনি। কথা বলার সময় চোখের পাতা একটু একটু কাঁপে। গলার স্বর সামান্য পুরুষালি। 'কবিতার ওপর আলোচনা আমার খুব ভাল লাগে। না, অভিযোগটা আমার অন্য কারণে। গত সংখ্যায় রামানন্দ সেনের কবিতা দেখতে পেলাম না কেন?'

চারজন নির্বাক স্থির হয়ে রইল। তাদের চোখে মুখে চাপা অস্বস্তি।

'আগামী সংখ্যায় পদাবলীতে নিশ্চয় ওঁর কবিতা থাকছে?'

বিকাশ টেবিল থেকে কলমটা তুলে নিল। নবকিশোর ও অরুণাভ ঘাড় গুঁজে অধ্যাপিকার গোড়ালির কাছে সায়ার সাদা লেসটুকু ফুলের পাপড়ির মতন কেমন একটু একটু কাঁপছে লক্ষ্য করছিল।

'শুনুন।' শুভেন্দু আর ইতস্তত করল না। 'আপনার কাছে গোপন করে লাভ নেই—সম্ভবত রামানন্দ সেনের কবিতা আর আপনাদের পড়াতে পারছি না। আগামী দু'এক সংখ্যার পদাবলীতে তো নয়ই, তারপর কি হবে এখনও অবশ্য আপনাকে সঠিক কথা দিতে পারছি না।'

'কেন! যুবতীর মুখের গর্ত একটু সময়ের জন্য গোল হয়ে রইল। পরে নিচের ঠোঁট আলতো করে কামড়ে ধরে কিছু যেন একটা চিন্তা করল। ভুরুর মাঝখানে আলপিনের ফাঁকটুকু কুঁচকোনো চামড়ার ভাঁজের মধ্যে মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেল। 'উনি কি বর্তমানে কলকাতায় নেই?' দাঁতের চাপ থেকে ঠোঁট আলগা হয়ে গেল। 'বাইরে কোথাও গেছেন? তা গেলেনই বা। ওখান থেকে ডাকে কবিতা পাঠাতে ক্ষতি কি। না কি, কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?'

'হুঁ, অসুস্থ।' শুভেন্দু কিছু বলার আগেই বিকাশ জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'রামানন্দ সেন অসুস্থ, আপাতত লেখাটেখা বন্ধ।'

'তাই নাকি?' হেনা সেনের গলায় উদ্বেগ প্রকাশ পেল। 'অসুখটা কী, অনেকদিন ভুগছেন?'

'মানসিক ব্যাধি।' রুষ্ট হয়ে বিকাশ বলল, 'হুঁ, বেশ কিছুদিন ভুগছেন।'

'হঠাৎ এমন হল কেন?'

'তা কি করে বলব!' বিকাশ ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠছিল। 'কার মন কি কারণে বিগড়ে যায় আমরা বাইরে থেকে তা জানব কেমন করে বলুন।'

হেনা সেন চুপ করে রইল।

'পারিবারিক অশান্তি থাকতে পারে, আর্থিক সঙ্কট একটা কারণ হতে পারে, শরীরে লুকোনো কোনো অসুখ থাকলে তা থেকেও মানুষের মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।' বিকাশ প্রুফের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'রামানন্দ সেন সত্যি যদি লেখা বন্ধ করে দেন, বাংলা সাহিত্যের দারুণ ক্ষতি হবে। আধুনিক কবিতার যে ধারা তিনি—'

'শুনুন শুনুন!' শুভেন্দু আর চুপ থাকতে পারল না, মহিলা বড্ড বেশি 'রামানন্দ সেন' 'রামানন্দ সেন' করছে, কাজেই কথাটা না বলা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছিল না। শুভেন্দু ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসল। 'মানুষের মধ্যে যখন ফ্রাস্ট্রেশন্ এসে যায়, বিশেষ সে যদি শিল্পী হয়, কবি হয়, তার কাছ থেকে আমরা আর কিছু আশা করতে পারি না। সে ফুরিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে ধরে নিতে হয়।'

'ফ্রাস্ট্রেশন্। রামানন্দ সেন।' হেনা সেন বিড়বিড় করে উঠল। যেন আকাশের সূর্য ভেঙে আধখানা হয়ে গেছে বা চন্দ্র এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে ধরনের কিছু শুভেন্দু তাকে শুনিয়ে দিল। কথাটা বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে না পেরে মহিলা রীতিমত ফাঁপরে পড়ে গেল। বেশ একটু চুপ থাকার পর আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা, তাঁর ঠিকানাটা কি দয়া করে আমায় দেবেন।' যেন ঠিকানা পেলে অধ্যাপিকা আজই, এখনি রামানন্দ সেনের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যায়।

অরুণাভ ও নবকিশোর পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করল। তাদের ইচ্ছা হচ্ছিল মহিলার সঙ্গে এই ফাঁকে একটা দু'টা কথা বলে। কিন্তু যেখানে বিকাশ ও শুভেন্দু বসে আছে, সেখানে আগু বাড়িয়ে কিছু বলতে তারা সাহস পেল না।

মহিলা আবার বলল, 'রামানন্দ সেন পুরোনো বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন শুনেছি। এখন তিনি কোথায় আছেন আপনারা নিশ্চয় জানেন?'

'না, আমরা জানি না।' বিকাশ চাটুয্যেকে শেষ পর্যন্ত রুক্ষ হয়ে উঠতে হল। 'তিনি তাঁর নতুন ঠিকানা আমাদের দেননি।'

'সে কি। আপনারা তাঁর বন্ধু, এতকাল তিনি পদাবলী কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আজ তাঁর ঠিকানাটাও আপনাদের কাছে নেই!'

চোয়াল শক্ত করে বিকাশ প্রুফ দেখছিল। শুভেন্দু চুপ থেকে হাতের নখগুলি দেখছিল। অরুণাভ ও নবকিশোর ঘাড় গুঁজে মহিলার গোড়ালির কাছে সায়ার নকশা করা লেসটা নতুন করে দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখনি মহিলা উঠে দাঁড়াল। যেন আর বসে থাকা বৃথা। যেন ইচ্ছা করে এরা ঠিকানাটা দিচ্ছে না এমন একটা চেহারা করে 'আচ্ছা চলি, নমস্কার'—নমস্কার জানাতে অবশ্য এদের কারো দিকে তাকাল না, মোহনবাবুর টাক পড়া মাথাটা দেখতে দেখতে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

'আপদ বিদায় হল।' শুভেন্দু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বিকাশ প্রুফ থেকে মুখ তুলল।

'ইচ্ছা করছিল একবার বলে দিই—বউ ঘর ছেড়ে চলে গেছে, রামানন্দর মাথা

এখন বিলকুল খারাপ। সে এখন আকাশে বাতাসে চরকির মতন পাক খেয়ে ঘুরছে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাঁর ঠিকানা বলতে পারে না। আর কবিতা—কেউ কবিতা চাইতে গেলে রামানন্দ কিলিয়ে ছাড়িয়ে দেবে।'

'সত্যি, ভাবতেও কেমন লাগে, এতবড় একটা আর্টিস্ট, কী হয়ে গেল!' নবকিশোর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আমি কাল রামানন্দদার স্কুলে গিয়েছিলাম। ক'দিন ধরে নাকি স্কুলেও আসছে না। আমাদের মতন ওরাও জানে মানুষটা নাকি বেলেঘাটায় আছে, কিন্তু সঠিক ঠিকানাটা কেউ বলতে পারল না।'

অরুণাভ আর থাকতে পারছিল না, চট করে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে শুভেন্দু ও বিকাশের দিকে বাড়িয়ে দিল। দু'জনে দুটো সিগারেট তুলে নিতে নবকিশোরের হাতেও একটা গুঁজে দিয়ে অরুণাভ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। 'হুঁ, স্কুলের কেউই রামানন্দর নতুন ঠিকানা জানে না। কাউকে বলছে না।'

'এসকেপিস্ট্। এছাড়া আর কি বলা যায় ওকে।' শুভেন্দু নাকের ছিদ্র দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া বের করে দিল। 'লোকের কাছে বলতেও পারছি না, আমাদেরই একজন বন্ধু, লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়, এতবড় একটা আর্টিস্ট, এতদিনের সাধনা, যে জিনিস নিয়ে এতকাল যুদ্ধ করে এল, আজ কিনা একটা শুঁটকি বউ-এর কাছে মার খেয়ে সব স্তব্ধ হয়ে গেল।'

'আমার মনে হয় অর্থকষ্টটাই একটা বড় ফ্যাক্টার হয়ে দাঁড়িয়েছিল—'

'ভাগ!' বিকাশ ধমক দিয়ে উঠল। নবকিশোর থেমে গেল। 'বলে কিনা মানুষ গাছতলায় বসেও শুনেছি কবিতা লেখে, কাঠের টুকরো চিবিয়ে ছবি আঁকে, তবু তো একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সে চাকরি করত, বউ রোজগার করে—শুভেন্দুর বাবার না হয় গাড়ি বাড়ি আছে, কিন্তু বাদ-বাকি সবাই কি আমরা খেটে খাচ্ছি না? আমাদেরও অর্থকষ্টের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়, তা বলে কেউ কবিতা লেখা বন্ধ রেখেছি! আমি তো আমার ওয়াইফকে রোজ বলি, খাই না-খাই, বাচ্চাগুলো শুকিয়ে মরুক কি বাঁচুক, কবিতা লেখা ছাড়ব না, কবিতা আমার জীবন, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন, এই জিনিস বন্ধ করলে আমি মরে যাব।' গর্তের ভিতর বিকাশের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

'......পাখির নীড়ের মতন চোখ তুলে......' গুণগুণ করতে করতে একজন দোকানে ঢুকল। সকলেই চোখ তুলল। কবি অমলেন্দু গুপ্ত। মাথায় ফুলানো ফাঁপানো বাবরি। হাঁটুর নিচে পাঞ্জাবির ঝুল। ধুতির কোঁচা মাটিতে লুটনো। পায়ে বার্মিজ স্যাণ্ডেল। হাতে নস্যির ডিবে। শুভেন্দু হাসল।

'কোথায় আবার পাখির নীড় চোখে দেখে এলেন?'

'এই মাত্র, বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিল।'

'মেরুন শাড়ি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' অমলেন্দু উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'শাঁখের মতন সাদা গোলাপী গায়ের রং?'

'হুঁ হুঁ, পায়ে জালিকাটা জুতো।'

'কানে লবঙ্গ ফুল?'

'আরে, সব মিলে যাচ্ছে দেখছি!' অমলেন্দু ধপ্ করে হেনা সেনের শূন্য চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'এখানে এসেছিল নাকি? তবে তো এখান থেকেই বেরিয়েছে।'

'হুঁ, জ্বালিয়ে গেছে এতক্ষণ।' বিকাশ প্রুফের কাগজগুলি গুটাতে লাগল।

'কি ব্যাপার? পদাবলী বেরিয়েছে কিনা খোঁজ করতে?'

'রামানন্দ সেনকে খুঁজতে।'

'তারপর?'

'কোথায় আছেন এখন রামানন্দ, গত সংখ্যায় তিনি লেখেননি কেন, আগামী সংখ্যায় লিখছেন কিনা, কেবল এইসব।'

এক মিনিট গম্ভীর হয়ে থাকল অমলেন্দু। পকেট থেকে সিগারেট তুলে ধরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে টানল।

'শুনুন, রামানন্দবাবুদের স্কুলের আর এক মাস্টার মশাই, রজনী চাকলাদার ভদ্রলোকের নাম, আমাদের লেক প্লেসের কাছাকাছি থাকেন। সেদিন কথায় কথায় রামানন্দ সেনের প্রসঙ্গ উঠতে ভদ্রলোক হাসলেনঃ মশাই, আপনাদের ঐ কবি বন্ধুটির মাথায় ছিট আছে। আগেও ছিল। ইদানীং জিনিসটা বেড়ে গেছে। প্রায়ই বলছে স্কুলের চাকরি আর ভাল লাগে না। দুম্ করে একদিন হয়তো ছেড়েই দেবো—'

'চাকরি ছেড়ে দেবে!' শুভেন্দু উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই প্রথম তাঁকে রাগ করতে দেখা গেল। 'আপনি চাকলাদারকে বললেন না কেন, এই বাজারে চাকরি ছাড়লে ঐ হাঁদাকান্ত গঙ্গারাম রামানন্দ সেন আর চাকরি জোটাতে পারবে না, উপোসে মরবে, রোজগেরে বউটিও সঙ্গে নেই যে, ঠেকনা দেবে, শ্রীমতী এখন আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে।'

'আহা সে তো বুঝলাম, ওই ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেই রয়ে গেছে, আমরা রামানন্দর বন্ধু, আমরা জানি তার মিসেস তাকে কী চোখে দেখত, যেহেতু সে কবিতা লেখে, স্কুলে মাস্টারী করে। মানে পুরবী দেবী আশা করেছিল, স্বামী চার হাজার টাকা মাইনের প্রকাণ্ড একটা চাকরী করবে, বাড়ি করবে, গাড়ি হাঁকিয়ে চলবে, সাহেবী চালে থাকবে, তিনিও মেমসাহেবটি সেজে থাকবেন। কিন্তু কিছুই যখন অপদার্থ রামানন্দকে দিয়ে হল না, গোঁসা করে মহিলা নিজেই চাকরীতে ঢুকে পড়ল। সেদিন থেকে রামানন্দর ওপর দুর্ব্যবহার। এবং এর পরিণাম যে একদিন এই হতো, আমরা যারা রামানন্দর খুব কাছাকাছি ছিলাম, যেহেতু রোজ তার ঘরের অশান্তির কথা এখানে এসে সে বলত, তখনই ধরে নিয়েছিলাম এই ফাটল বড় হতে হতে পরে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছোবে যখন কিছুতেই ওদের দুজনের আর একত্র থাকা হবে না—তা-ই হল। আজ দু' মাসের ওপর মহিলা টালিগঞ্জে চমৎকার ফ্ল্যাট নিয়ে আলাদা আছে, ক'দিন মতিচ্ছন্নের মতন কাটাল আমাদের বন্ধুটি, লেখাটেখা বন্ধ, চুল কাটে না দাড়ি কামায় না, গায়ে চাদর জড়িয়ে খড়ম পায়ে রাস্তায় ঘোরে, লোকে ভাবল কবি রামানন্দ হিপি হয়ে গেছে—যাই হোক, এসব কথা ঐ চাকলাদার মাস্টার মশাইটিকে বলিনি, বলতে বাধছিল, হুঁ, রামানন্দর মাথায় ছিট আছে, মানুষটা যেন কেমন কেমন—এসব বলার পর হুট করে আমায় চাকলাদার কী বলল শুনবেন?' অমলেন্দু হাসল। 'মশাই, আপনারা রামানন্দবাবুর বন্ধুবান্ধব সবাই শুনি বড় বড় কবি সাহিত্যিক —চেষ্টা-চরিত্র করে রামানন্দবাবুকে একটা প্রাইজ-ট্রাইজ পাইয়ে দিন না, আজকাল নাটক নভেল না লিখে স্রেফ লাইন মিলিয়ে পদ্য লিখছে এমন মানুষকেও তো শুনি আকাদমী রবীন্দ্র পুরস্কার-টুরস্কার দেওয়া হয়, হুঁ, তবেই দেখবেন ভদ্রলোকের মনে উৎসাহ-টুৎসাহ আসবে, একসঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা—আমার তো মনে হয় কবিতা লিখে মানুষটি সুবিধা করতে পারছে না, অথচ ওদিকেই নেশা, তাই এমন পাগলাটে মতিগতি, একটা প্রাইজ পেয়ে গেলে নামধামও হতো বইটইও

কাটত, দেখতেন একেবারে নর্মাল হয়ে গেছে আপনার বন্ধুটি। আমরা সাহিত্য-টাহিত্য করি না, কিন্তু কার মন কী চাইছে একটু-আধটু তো বুঝি।'

বিকাশ ছাড়া আর সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। হাসবার পর শুভেন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, 'এরা সাধারণ মানুষ, ভাবনাচিন্তাও সেইরকম, দোষ দেওয়া যায় না।'

কিন্তু নবকিশোর ও অরুণাভর হাসি তখনও থামছিল না।

'হুঁ, রামানন্দবাবুকে পুরস্কার!' গলার শব্দ শুনে সকলে হতভম্ব। যে মানুষ কোনোদিন, এদের এ-সব আলোচনায় যোগ দেবে দূরে থাক, কান পর্যন্ত দেয় না, দোকানে কবিতাপাঠ হচ্ছে কি কবিতা নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, কোনো সাহিত্যিকের প্রশংসা হচ্ছে কি গালিগালাজ করে তার গোষ্ঠী উদ্ধারের আয়োজন হচ্ছে জানতে শুনতে একবার চোখ তুলেও এদিকে তাকায় না, আজ কুড়ি বছর, কেবল হিসাবের খাতায় ঝুঁকে থাকা আর ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার ওপারের ডাস্টবিনটা মনোযোগ দিয়ে দেখা—সেই মোহন পাল পান-দোক্তার রসে ছোপানো ময়লা দাঁত বের করে হি-হি হাসছে। 'রামানন্দবাবুকে প্রাইজ পাইয়ে দেবার পরামর্শ! চমৎকার! একবার যদি ওই মাস্টারমশায়টি আমার দোকানে আসত তো আমিই বলে দিতাম, রামানন্দ সেন কথাটা শুনলে আপনার পিঠে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক কিল বসিয়ে দিত মশাই, ওই ব্যোমভোলা মানুষটাকে আমরা চিনি, আমরা এত বছর দেখলাম, বলে কিনা পুরস্কার আর অপুরস্কার, নিন্দা আর প্রশংসা, রোদ আর বৃষ্টি, বাজ আর বন্যা,' কিছু একটা গেরাহ্যির মধ্যে আনে কিনা, অষ্ট-প্রহর যার কাঁধে কবিতার ভূত চেপে আছে, চিনত শুধু নিজের কলমটা আর খাতাটা—ভুল বললাম শুভেন্দুবাবু?'

সকলেই চুপ। চুপ থেকে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। মিথ্যা কি, রামানন্দকে তারা যতটা চিনেছে, মোহন পাল তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম চিনেছে কি, কুড়ি বছর মানুষটা এখানে বসে চা খেয়ে গেছে, কবিতা পড়েছে, কবিতা শুনেছে, কবিতা নিয়ে সকলের সঙ্গে হই-হই করেছে, আবার যখন সময় এসেছে, এই হট্টগোলের মধ্যেও হঠাৎ অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে গিয়ে ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো রাস্তার দিকে মেলে ধরে, মনে হতো কোন্ সুদূরে চলে গেছে। যেন নির্জন নিঃসঙ্গ আকাশে এক ধূসর চিল ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে, প্রায় চোখে দেখা যায় না, চেনা যায় না, বোঝা যায় না আর তাকে।

তা হলেও রক্তমাংসের শরীরটা তো এই চেয়ারেই বসে থাকত। সেই মূর্তি সকলেব মনে জ্বলজ্বল করছিল। মোহন রেস্টুরেন্টের নোনা ধরা কালচে ঠাণ্ডা দেওয়ালের গায়ে সেই ছবি চিরকালের মতো আঁকা হয়ে আছে, চিরকাল না হোক, অন্তত যতকাল পদাবলী গোষ্ঠীর কবিরা এসে এখানে একত্র হবে, কাব্যালোচনা করবে ততকাল তো বটেই। উঁহু, রামানন্দকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনাই যে চলবে না। এবং চারটে দেওয়ালের মতোই মোহনবাবুও এই কবিবাসরের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। কাজেই রামানন্দ 'সম্পর্কে মোহন পালের মতামতের একটা দাম আছে না! রামানন্দর অভাব মোহন পালের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। তা না হলে মানুষটা হঠাৎ আজ এত কথা বলে! এত আবেগ প্রকাশ করে!

হুঁ, হওয়া না-হওয়া, পাওয়া না-পাওয়া, নিন্দা প্রশংসা, পুরস্কার অ-পুরস্কারের ঊর্ধ্বে ছিল রামানন্দ, হঠাৎ সে আজ এভাবে হারিয়ে গেল! না কি এমন করে হারিয়ে যাওয়া, চোখের আড়ালে চলে যাওয়াই তার ধর্ম, সকলের মধ্যে থেকেও যে একাকী থাকতে পেরেছে, নির্জনতার বর্ম পরে ভিড়ের মধ্যেও যে বরাবর

আত্মরক্ষা করে এসেছে।

তবে এটাই বা কী করে সম্ভব, শুভেন্দুরা তাও চিন্তা করে, মুখে তারা বলছে বটে 'পূরবী'—কিন্তু কিছুই যার কাম্য ছিল না, কোনো বন্ধনকেই যে বন্ধন মনে করত না, মুক্ত আকাশে নিঃসঙ্গ চিলের মতন পাখা মেলে দিয়ে বিভোর হয়ে শুধু ভেসে বেড়ানো যার আনন্দ, স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল বলে তার এই অবস্থা! গুলীবিদ্ধ পাখির মতন কবিতার আকাশ থেকে খসে পড়ল! বসন্তের পুষ্পিত ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে অভিমানী ফুলের ভূতলের কাঁটা ঝোপের অন্ধকারে আত্মগোপন?

অনেক কিছু উপমাই ক'দিন ধরে শুভেন্দুদের মনে পড়ছে। এবং সব ক'টাই অস্বস্তিকর, অবাঞ্ছিত! তারা ভাবছে, না না, এমন হতেই পারে না, রামানন্দ ঠিক আসবে, এসে গেল বলে, ঐ যে মোড়ে দাঁড়ানো রিকশাটার আড়ালে একটা মানুষকে দেখা যাচ্ছে না? হেলেদুলে থপথপ পা ফেলে এদিকে আসছে। অবিকল রামানন্দর হাঁটা, মাথার আকৃতিটা সেরকম। সামনেটা একটু উঁচু। পিছনটা খাড়া। যেন হঠাৎ ওদিকের হাড়টা সমান হয়ে গিয়ে ঘাড়ের দিকে মাথাটা খাড়া হয়ে নেমে গেছে। না, কোথায়, রিকশার আড়াল থেকে বেরিয়ে মানুষটা মোহন রেস্টুরেন্টের দরজা পার হয়ে চলে গেল। শুভেন্দুরা নিরাশ হল। এই মানুষের মাথার পিছনের হাড় মোটেই খাড়া না, পানের ডাবরের মতন গোল হয়ে কাঁধের দিকে বেঁকে নেমে গেছে। রামানন্দর মতন থপথপ করে হাঁটে বটে, কিন্তু হাতের ঐ মোটা টুসটুসে আঙুলে কোনোদিন কলম ওঠে না, কলমের বদলে কাঁচি। খসখস করে লেপ তোশকের বহর মেপে থান থান কাপড় কাটে। অলকা হোসিয়ারীর শিবানন্দ। রামানন্দর নন্দটাও পিছনে আছে। অন্যদিন হলে শুভেন্দুরা হাসাহাসি করত। আজ তারা গম্ভীর নীরব বিষণ্ণ।

'আমি এইমাত্র নীহার পাবলিশার্স থেকে আসছি।' অমলেন্দু বিড়বিড় করে বলল। শুভেন্দু শুনল, বিকাশ শুনল। চুপ করে রইল।

'হঠাৎ নীহার পাবলিশার্সে কেন অমলেন্দুদা?' উৎসাহের চোখ নিয়ে নবকিশোর প্রশ্ন করল। 'হুঁ, নতুন হয়েছে। ওদের কোনো বই দিলেন বুঝি?'

অমলেন্দু কলেজে ইকনমিকস্ পড়ায় এবং ফি বছর একটা-দুটো নোট বাজারে ছাড়ে। পাবলিশার পাড়ায় বেশ দহরম মহরম আছে। নবকিশোরের কথা শুনে হাসল। মাথা নাড়ল।

'ওরা পাঠ্য বই ছাপে না। গল্প উপন্যাস কবিতা।'

'অ, কবিতার বইও ছাপছে। চমৎকার!' নবকিশোর চোখ বড় করল। 'আপনার এখনো কোনো কালেকশন ব্যেরোয়নি। অথচ অনেক কবিতা জমে গেছে। আমাদের পদাবলীতেই তো ডজন দুই ছাপা হয়েছে, তাই না? নীহার পাবলিশার্স তাহলে আপনার কবিতার বই ছাপছে। খুব ভাল।' খুশি চোখে নবকিশোর অরুণাভর দিকে তাকাল।

'হুঁ, খুব ভাল, কথাটা না শুনেই নাচতে আরম্ভ করলে।' পকেট থেকে সিগারেট বের করল অমলেন্দু। শুভেন্দুকে দিল, বিকাশকে দিল, নিজে ধরাল একটা। 'এ তো নতুন প্রতিষ্ঠান, আমার কবিতার বই কোন্ সাহসে ছাপবে? কলেজে ওরা আমাকে টেলিফোন করেছিল। রামানন্দবাবুর কবিতার বইটা নতুন করে ছাপতে চাইছে।'

'স্বর্ণগোধূলি?' শুভেন্দু ভুরু কুঁচকোল। 'ওটা কি করে ছাপবে? ওটা যে মহাদেবের বই, ভগবতী লাইব্রেরীর বই? আট বছরে এডিশন করতে পারল না।'

'হুঁ, ভগবতীর মালিক মহাদেব আঢ্য তাই বলে। আট বছর কেন, চল্লিশ বছর পরেও স্বর্ণগোধূলির এডিশন হবে না, যার নাম মহাদেব, পাবলিশার পাড়ায় খচ্চর দি গ্রেট।' বিকাশ দাঁতে দাঁত ঘষল। চেয়ার থেকে পিঠ তুলে শুভেন্দু সোজা হয়ে বসল।

'আমি সেদিনও আর একবার বেটার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, ওই এক কান্না, ত্রিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট ছেড়ে দিয়েও আট বছরে দেড়শ কপির বেশি বেচতে পারল না। সব ফরমা গাদা হয়ে দপ্তরীর ঘরে পড়ে আছে, ইঁদুরে কাটছে, উইয়ে খাচ্ছে।'

'কিন্তু এটাও সত্য শুভেন্দু, হারামজাদা কোনোদিনই বলবে না যে, উই আর ইঁদুরের পেটে সব শেষ হয়ে গেল, তাহলেও তো বুঝতাম।'

'তা কি আর কখনো কোনো পাবলিশার বলে। তাছাড়া মহাদেব হল গভীর জলের মাছ। আগুন লেগে তার দোকান আর দপ্তরীর ঘর ছাই হয়ে যাক না, দেখবে তখনও সে বলবে স্বর্ণগোধূলির কিছু ফরমা বেঁচে গেছে।'

শুভেন্দুর কথায় একমাত্র বিকাশ ছাড়া বাকি সবাই হাসল।

'তাহলে আজ আপনাদের কাছে কথাটা বলি। এতদিন বলিনি।' যেন খুব একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেছে। এক মুঠো কৌতুক নিয়ে অরুণাভর চোখ দুটো কঝকক করছিল। পুজোর আগে আমরা য়ুনিভার্সিটির ক'জন ছেলে ভগবতী লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। আঢ্য মশাইকে খুব চেপে ধরলাম, মশাই, এখনো স্বর্ণগোধূলি বিক্রী হচ্ছে, লোকের হাতে প্রায়ই নতুন কপি দেখা যায়, কিন্তু আপনি বলছেন বইটার আর এডিশনই হল না, ক' হাজার ছেপেছিলেন বলুন তো? চোখ দুটো গোল হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের। ফ্যালফ্যাল করে একটু সময় আমাদের দিকে চেয়ে থেকে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে মাথাটা দু'বার ঝাঁকুনি দিল।—তা আপনারা বাইরে থেকে অনুমান করতে পারেন, স্বর্ণগোধূলি কিছু দশ বিশ হাজার ছেপে বসে আছি, আর রোজই দশ বিশ ত্রিশ কপি করে বেচে বেচে আমি খাচ্ছি। কথাটা আপনারা ভুলেই যাচ্ছেন যে দেশটা বাংলা দেশ, হুঁ, ঢাউস ঢাউস উপন্যাস কিনে পড়ছে, তা বলে কবিতা, কবিতার বই? বলে কিনা সারা বছরে আমি পাঁচ সাত কপি স্বর্ণগোধূলি বেচতে পারছি কিনা সন্দেহ, আর আপনারা হুট করে বলে দিলেন, রোজই রামানন্দ সেনের কবিতার বই লোকে কিনছে—অ্যাঁ, এটা একটা কথার কথা! রবিবাবু নজরুলের বই ছাড়া ফি হপ্তায় এসব কাব্যগ্রন্থের ক'টা ক্যাশমেমো কাটা হয় একবার দয়া করে ঘরে ঘরে খোঁজ নিন তো, এ পাড়ায় ভগবতী লাইব্রেরী ছাড়াও প্রকাশন সংস্থার কিছু কমতি নেই।

'সত্যি কথা, আমরা বেশ একটু বাড়িয়ে বলেছিলাম, তাহলেও হেরে যাব না এমন একটা জেদ নিয়ে দল বেঁধে সবাই সেদিন ভগবতী লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। বললাম, দেখুন, কাউন্টারে বসে ক' কপি স্বর্ণগোধূলি আপনি বেচেন, ক' কপি বাঁধানো বই আপনার দোকানে আছে আর দপ্তরীর বাড়িতে বা কী পরিমাণ লুজ ফর্মা পড়ে আছে তার হিসাব বার করা আমাদের পক্ষে শক্ত, পাবলিশারের হাতে বই চলে গেল মানে একটা অন্ধকার জগতে সেটা চলে গেল—এর সঠিক হিসাব খুঁজে বার করা বাইরের লোকের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় একমাত্র পাবলিশারদের সততার ওপর নির্ভর করে চলা ছাড়া অথরদের আর কোনো উপায় থাকে না—সেটা কথা না, কথা হচ্ছে কি, আজ কবিতার পাঠকসংখ্যা আগের চেয়ে আট গুণ বেড়ে গেছে, বিশেষ করে আধুনিক কবিতা,

এবং আধুনিক কবিদের কথা উঠলেই সকলের আগে একটা নামই মনে আসে ঃ রামানন্দ সেন—কাজেই আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, আপনি যেমন বলে থাকেন, আট বছরে দু'শ কপিও স্বর্ণগোধূলি বেচতে পারেননি। আমরা মনে করি, অ্যাদ্দিনে রামানন্দ সেনের ওই বিখ্যাত কালেকশনের এডিশন হওয়া উচিত ছিল—শুনে একটু চুপ করে থেকে মহাদেব কী বলল জানেন?'

সবাই উৎসুক হয়ে অরুণাভর কথাগুলি শুনছিল।

'কী বলল?' অমলেন্দু মাথা নাড়ল। 'আমার খাতাপত্র দেখুন, বস্তাবন্দী পুরোনো ক্যাশমেমোর তাড়া ঘাঁটুন, দপ্তরী বাড়ি চলুন—এইসব তো?'

'না, আঢ্য মশাই তাই বললে ভাল করতেন, তবে কি আর আমরা চটে যেতাম', অরুণাভ হাসল। 'এখন আমরা বন্ধুরা ওর মুখের কথা মনে করে যখন তখন হাসছি, কিন্তু সেদিন ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম—খুব একটা পণ্ডিতের মতন চেহারা করে লোকটা হঠাৎ বলে বসল—রামানন্দ সেনের কবিতা নিয়ে এমন করছেন আপনারা, যেন আজকালের মধ্যেই ওঁর স্বর্ণগোধূলি একটা পুরস্কার-টুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে—'

'তারপর!' এবার শুভেন্দু শব্দ করে হাসল। 'গবেট একটা। তোমরা তখন কী বললে?'

'মশাই, পেটে ওই বিদ্যা নিয়ে বইয়ের ব্যবসা করতে বসেছেন। এ সব কথা আপনার মুখে মানায় না। না কি ভেবেছেন পুরস্কার পেলেই রামানন্দ সেন একটা সাংঘাতিক বড় কবি হয়ে গেল, এখন লিলিপুট হয়ে আছে? কবিতার কিছু বোঝেন? যেখানে রামশ্যামযদুমধু প্রাণকেষ্ট হরেকেষ্ট পুরস্কার পাচ্ছে সেখানে রামানন্দ সেন না হয় না-ই পেল। হুঃ, জ্ঞানপীঠ আকাদমী রবীন্দ্র শরৎ স্মৃতি প্রাইজ! যদি একটু ভাল করে লেখাপড়া শিখতেন তা হলে অন্য কথা বলতেন। বুঝতে পারতেন পুরস্কার পাওয়া পাঁচখানা কেতাব আর পুরস্কার না-পাওয়া অন্য পাঁচখানা কেতাবের মধ্যেও গুণের কত আসমান-জমিন ফারাক থাকতে পারে। পুরস্কার পেলেই বড়-লেখক হয়ে গেল, আর যেহেতু পুরস্কার পেল না বলে আর একজন ছোট লেখক হয়ে থাকল, এই ধারণা বদলে ফেলুন। খোঁজ নিয়ে দেখুন বাস-লরীর পারমিট, মদের দোকানের পারমিটের মতন এক একটা পুরস্কারের পেছনেও কত ঘোরাঘুরি তম্বির তোষামোদ চলছে। এই যখন অবস্থা, আমরা মনে করি কবি রামানন্দ সেনের পুরস্কার পেয়ে কাজ নেই। আমাদের আধুনিকদের কাছে রামানন্দ সেন পুরস্কার না পেয়েও অনেক—অনেক বড় কবি।'

'উত্তরে কী বলল আঢ্য?'

'আর উত্তর নেই। মুখটা হাঁড়ির মতন করে চুপ করে বসে রইল।'

'যাই হোক,' অমলেন্দু একটা হাই তুলল। 'ওই পিশাচের কাছ থেকে স্বর্ণ-গোধূলি বের করে আনা কঠিন—নীহার পাবলিশারকে আমি তাই বললাম—ওই বইয়ের আশা ছেড়ে দিন, বরং আপনারা রামানন্দবাবুর হালের কবিতাগুলো নিয়ে একটা কালেকশন বার করুন। স্বর্ণগোধূলির পরেও তিনি অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখেছেন।'

'কি বলল?'

'ভেবে দেখবে।'

শুভেন্দু চুপ। প্রুফের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে বিকাশ যেন উঠব উঠব করছিল। অরুণাভ এবং নবকিশোরও উঠতে চাইছে। আবার দুজনের ধূমপানের নেশা প্রবল হয়ে উঠেছে। সকলেরই চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অমলেন্দুর জন্য চা এল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মোহন পাল আর একবার মুখ খুলল।

'কিন্তু বই যে করবেন, মূল মানুষটারই যে খোঁজ নেই। কবিতা বাছাই-টাছাই করে আপনারা না হয় সব ঠিকঠাক করে দিলেন। কিন্তু বই ছাপতে অথরের পারমিশনের দরকার হবে যে।'

শুভেন্দুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'দেখলেন অমলেন্দুবাবু, আমাদের সঙ্গে থেকে থেকে মোহন পাল মশাইও এসব ব্যাপারে কত গভীর চিন্তা করেন। আমি তো মনে করেছি মোহনবাবুর লাইফ নিয়ে একটা বই লিখে ফেলব। উপন্যাস।'

'বলেন কি?' মোহন পালের চোখ অতর্কিতে গোল হয়ে উঠল। সবাই ভেবেছিল কথাটা শুনে মানুষটা অতিমাত্রায় খুশী হবে। তাঁকে নিয়ে উপন্যাস! কিন্তু দেখা গেল খুশী হওয়ার পরিবর্তে অবাক হয়ে মোহন পাল শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই। আর কিছু বলছে না।

'কেন, জিনিসটা কি আপনার মনঃপূত হচ্ছে না?' শুভেন্দু ওদিকে একটু ঝুঁকে বসল।

'নাঃ', মোহন পাল আবেগে মাথা নাড়ল। 'আপনি কবি—কবিতাই লিখবেন, আবার উপন্যাসে হাত দেওয়া কেন। স্বধর্ম থেকে আপনি বা আপনার এইসব কবি বন্ধুরা বিচ্যুত হবেন এ আমার সহ্য হবে না। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম—'

'হিয়ার হিয়ার!' বিকাশ ছাড়া বাকি সবাই চিৎকার করে টেবিল চাপড়াতে লাগল।

এবার খুশী হয়ে মোহনবাবু ঘাড় গুঁজে হিসাবের খাতায় চোখ রাখল।

॥ ৮ ॥

অক্ষয়ের চোখের রঙের একটু উন্নতি হয়েছে। ফ্যাকাশে ভাবটা আর ততটা নেই।

দু' দিন আগে তার চোখের দিকে তাকালে রামানন্দর মন খারাপ হয়ে যেত। ঠিক ধরে নিত মানুষটা বাঁচবে না। অক্ষয় আর তার সেই সুন্দর টালির ঘরে ফিরে যাবে না। এ বছর তার ঘরের পিছনে মাদার গাছে কত ফুল ফুটেছে, সেই রঙের চমক দেখে মাধুরী এক এক সময় কেমন ফ্যালফ্যাল করে ওদিকে তাকায়, এসব কিছুই অক্ষয় দেখল না।

বড় কষ্ট হতো মানুষটার জন্য।

রঙের চমক লাগা মাধুরীর কালো চোখ দুটো দেখতে না পেয়ে অক্ষয় তার রক্তশূন্য দৃষ্টিটা একভাবে ধরে রেখে এখানে শুয়ে শুয়ে নার্স মেয়েটাকে দেখছে। অক্ষয়ের জন্য রামানন্দর তখন আরও বেশি মায়া হতো।

কোথায় মাধুরী, আর কোথায় এই ফুলরেণু মজুমদার। হুঁ, অক্ষয়ের কেবিনের দিনমানের নার্স। মোটা পাহাড়ের মত। গাদা গাদা মাংস চর্বি। কেবল মাংস দেখে কেউ যদি তৃপ্তি পায় তো, অক্ষয় যেমন ক'দিন ধরে করছে, ফুলরেণুর দিকে তাকিয়ে থাকাটা কিছু দোষের না। তাছাড়া রংটা খুব ফরসা। বিকেলের দিকে অক্ষয়ের কেবিনের ভিতরটা যখন আবছা আবছা হয়ে আসে, ঠিক সেই সময় যদি ফুলরেণু ভিতরে ঢোকে, মনে হয় একটা বিশাল আলো এসে ঘরটা ভরিয়ে দিল। চোখের সামনের অন্ধকার ভাবটা সরে গিয়ে হঠাৎ মশালের মতন

কিছু একটা দেখলে সেদিকে সকলেরই তাকাতে ইচ্ছা করে, মনটাও খুশি হয়। খুশি হয়ে রামানন্দও তখন চোখ তুলে ফুলরেণুর সুবিশাল ফরসা শরীরটার দিকে তাকিয়েছে।

কিন্তু অক্ষয়—রামানন্দ এটা খুব বুঝত, মাধুরীর অভাব, যেমন টানটোন মাজাঘষা শরীরের মেয়ে আর ঐ চোখ চুল ভুরু নিয়ে ছন্দ নিয়ে আশ্চর্য কোনো পাখির মতন, বুনো ফুলের মতন একটা কিছু—হুঁ, সেই সাংঘাতিক অভাবটা ভুলতেই না এমন করুণভাবে এই মোটা শরীরটাই দেখে! যেহেতু এও মেয়েমানুষ।

অক্ষয়ের চোখে একটা অসহায় কামভাব রামানন্দ প্রথম থেকে দেখতে পাচ্ছিল। মনে মনে সে হাসে। কিন্তু হাসলেও অক্ষয়ের ওপর অসন্তুষ্ট বা রাগ হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে রামানন্দ মনে করে না।

তবে কিনা এই ক'দিন রোগীর শরীরের অবস্থা যেমন গেছে, চোখ দুটো ঘোলা ছাইবর্ণ হয়ে থাকত—ওই চোখ ও চেহারার দিকে তাকালে যে-কোনো মানুষের মনে হতে পারত, দু'-চার দিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে, এতৎসত্ত্বেও বালিশে মাথাটা কাত করে রেখে ক্রমাগত ফুলরেণুর দিকে অক্ষয়কে তাকিয়ে থাকতে দেখলে রামানন্দর বুকের ভিতর টনটন করে উঠত। রামানন্দ চিন্তা করত, হয়তো সব মানুষই এমন, চিতায় ওঠার আগেও নারীসঙ্গ কামনা করে। দুর্বল নিস্তেজ দেহ নিয়ে সেই সঙ্গসুখ কতটা উপভোগ করবে ভেবে দেখতে চায় না। তেল ফুরিয়ে যাওয়া সলতের ধিকিধিকি আগুনটা বুকের মধ্যে কেমন জ্বলতে থাকে। কিছুতেই ওটা নিবতে দেয় না। এই জন্য না বলা হয়েছে কামানল! অক্ষয়ের জন্য এমন আপসোস হতো তখন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামানন্দ অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। মুমূর্ষু অক্ষয়ের কামকাতরতা রামানন্দকে সত্যি বেদনা দিত। তা-ও কিনা হাসপাতালের এই স্থূলদেহী বয়স্কা ফুলরেণুর জন্য! যদি সেই মুহূর্তে অক্ষয় মাধুরীর দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকত, রামানন্দর কিছু বলার ছিল না। অক্ষয়ের জন্য তখন তার এতটা দুঃখ হতো না। ভাবত, তবু একটা সুন্দর জিনিস চোখের সামনে রেখে অক্ষয় পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তার শেষ সময়ের এই জ্বালাপোড়া সার্থক হচ্ছে বলে সহজেই মেনে নেওয়া যেতে পারত। তাতে একটা তৃপ্তি পাওয়া যেত।

রামানন্দ অবশ্য ইচ্ছা করে মাধুরীকে সঙ্গে আনত না। অক্ষয়ের এই চেহারা দেখলে মাধুরী আরও বেশি ঘাবড়ে যাবে। কান্নাকাটি করবে। তা না হলে রোজই তো রামানন্দর সঙ্গে সে হাসপাতালে আসতে চেয়েছে। একথা সেকথা বলে রামানন্দ ওই মেয়েকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

আজ আর রামানন্দর কাছে জিনিসটা খারাপ লাগছিল না, বেদনাদায়ক মনে হচ্ছিল না। কেননা এখন আর অক্ষয়কে মুমূর্ষু বলা যায় না। মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে গিয়ে চোখে একটা চাকচিক্য উঁকি দিয়েছে। যেন মানুষটা খুব শীগগির মরছে না, এক নজর দেখলেই বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ তাই বুঝবে। এখন ডাক্তাররা অক্ষয়ের চেহারার এই সাময়িক উন্নতির ওপর কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তাদের আশঙ্কা একেবারে নির্মূল হওয়ার মতন অবস্থায় রোগী আসলে ফিরে এসেছে কিনা সেটা জানার অবশ্য উপায় ছিল না। তবে কাল বিকেলেও রামানন্দ একবার ওঁদের সঙ্গে দেখা করেছিল। মনে হয় ভয়ের কিছু নেই,—একজন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল। এর বেশি কিছু বলেনি। রামানন্দও আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

যাই হোক, সাধারণ মানুষ হিসাবে রামানন্দ ধরে নিতে পারে অক্ষয় মোটা-

মুটি ভাল আছে। কাজেই আজ এইমাত্র ফুলরেণু যখন তাকে দুধ খাইয়ে গেল, ওষুধ খাইয়ে গেল আর অক্ষয় দুধ ওষুধ কোনোটার দিকেই মনোযোগ না দিয়ে, মানে নিতান্তই যান্ত্রিকভাবে সেগুলো গলাধঃকরণ করে চোখের পলক না ফেলে কেবল ফুলরেণুর শরীরের গোছা গোছা ফরসা মাংস ও চর্বির ছোট বড় ঢেউ দেখছিল, রামানন্দর খুব একটা খারাপ লাগেনি। অক্ষয় বাঁচবে, সুতরাং চোখের সামনে জলজ্যান্ত একটা নারীদেহ দেখে তার যে কামনার উদ্রেক হবে ক্ষুধা হবে, এ খুবই স্বাভাবিক। রামানন্দ হৃষ্টমনে অক্ষয়ের এই কামার্ত দৃষ্টি কয়েকবারই লক্ষ্য করেছে। এবং বেশ উপভোগও করেছে।

'তুমি তো রাতের সেটিকে দেখনি মাস্টার, দেখেছিলে কি?' ফুলরেণু বেরিয়ে যেতে অক্ষয় শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে সারামুখে রীতিমত একটা পার্থিব হাসি ফুটিয়ে তুলল।

'না, দেখিনি।' রামনন্দ মাথা নাড়ল। অক্ষয়ের কেবিনে এখন পর্যন্ত সে রাত কাটায়নি। কেবল প্রথম রাতটাই সে হাসপাতালে ছিল। কিন্তু সেদিন অক্ষয় ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে। কেবিনে নিয়ে আসা হয় দু'দিন পরে। 'কিরকম দেখতে? ভাল?'

অক্ষয়ের ডান পায়ের গোড়ালির কাছে একটা বেশ গোলমতন দাদের চাকা রয়েছে। কবে থেকে তার এই রোগটা, রামানন্দ জিজ্ঞেস করেনি। অনেকদিন ভেবেছে অক্ষয়কে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কেমন সঙ্কোচ বোধ করত। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অক্ষয় একটু সময় চুপ থেকে গোড়ালিটা আচ্ছা করে চুলকে নিল।

'হুঁ, কি বললে, দেখতে কেমন?'

চুলকনো শেষ করে অক্ষয় রামানন্দর চোখে চোখ রেখে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। ঢোক গিলল। যেন সেই মুখ মনে পড়ে তার নতুন করে কামোদ্রেক হল, হতাশা উপস্থিত হল।

'কেমন দেখতে, খুব সুন্দর? ফুলরেণুর মতন মোটা না নিশ্চয়ই?' রামানন্দ এবার ইচ্ছা করে হাসল।

'আহা, মোটায় কি এসে যায়।' অক্ষয় যেন খুব একটা সন্তুষ্ট হল না রামানন্দর কথায়। 'সবাই ছিপছিপে বেতলতা হবে তার কি মানে আছে।'

রামানন্দ লজ্জা পেল। মাধুরীর গড়ন ছিপছিপে। বাড়তি চর্বি মাংস বলতে কিছু নেই। যেন তার শরীর নিয়েই শরীর। রোদের রেখার মতন। কোমরের নিচের গোল ভারি অংশটুকু এমন নিখুঁত মানানসই যা নিয়ে পৃথিবীর যে কোনো রূপসী গর্ববোধ করতে পারে।

কাজেই অক্ষয়ের উত্তর শুনে রামানন্দ হোঁচট খেল। তবে কি হাসপাতালে এসে মানুষটা মোটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। যেখানে বাড়তি মাংস আছে, মেদের আধিক্য আছে? রামানন্দ ভুরু কুঁচকে রইল।

অক্ষয় সেটা লক্ষ্য করল। যেন রামানন্দকে খুশি করতে উৎসাহের আতিশয্যে বালিশ থেকে পিঠটা তুলে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসল। শোয়া ছেড়ে কাল থেকে অক্ষয় বালিশে হেলান দিয়ে একটু একটু করে বসতে আরম্ভ করেছে।

'অবিকল মাধুরীর মতন দেখতে ওটি। নাম তরলা। তরলা বোস। মানে মাধুরীর মতন লম্বা পাতলা গড়ন। কিন্তু মাধুরীর রং পায়নি। শ্যামলা গায়ের চামড়াটা দেখলে, তোমায় কী বলব মাস্টার, কাঁচা ফজটলের কথা মনে পড়ে যায়।'

'বাঃ!' রামানন্দও ঝুঁকে বসল। অক্ষয়ের বেড-এর পাশে একটা টুলের ওপর

পা ঝুলিয়ে বসেছিল সে। যতক্ষণ এখানে থাকে রামানন্দ ঐ আসনটিতে বসে অক্ষয়ের সঙ্গে কথা বলে। তরলার গায়ের রং ও চামড়ার বর্ণনা শুনে রামানন্দর মনে হল, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকে অক্ষয়ের মধ্যে যেন একটু কবিত্বটবিত্ব এসে যাচ্ছে।

'আর গলার স্বর না, তোমায় কি বলব মাস্টার, রাত হলে সারা ওয়ার্ডটা একেবারে ঝিম মেরে থাকে তো, তরলার গলা কানে এলেই মনে হয় একটা ডাহুক ডাকছে। বুকের ভিতরটা তখন হু হু করে ওঠে।'

অক্ষয়ের কথা শুনতে শুনতে রামানন্দ একদৃষ্টে তার চোখ দুটো দেখছিল। বরং যখন সে একটু বেশি অসুস্থ ছিল, গোড়ার দিকে, তখনও অবশ্য অল্প বয়সের নার্সটার্স দেখলে ভিতরে ভিতরে অক্ষয় কাতর হয়ে উঠেছে, তার চোখ দেখলে বোঝা যেত, কিন্তু কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকার পরেই আবার সে তার হাঁসমুরগি, খালের জল, খোলা আকাশ, মাটি ও মাধুরীর কাছে ফিরে গেছে, রামানন্দর সঙ্গে সেসব আলোচনা করে সে বেশি তৃপ্তি পেয়েছে।

কিন্তু দু' একদিন ধরে, রামানন্দ লক্ষ্য করছে, অক্ষয় আর যেন বাড়িটাড়ির কথা বেশি বলছে না। ফুলরেণু কেবিনে ঢুকলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, ফুলরেণু বেরিয়ে গেলে বড় বড় নিশ্বাস ফেলে। আজ তার কাছে আর একটির উল্লেখ করল অক্ষয়। রাতের তরলা। মাধুরীর মতন ছিপছিপে গড়ন, শ্যামলা রং, কাঁচা ফলের মতন গায়ের চামড়া। 'কথা তো বলে না, যেন মনে হয় ডাহুক ডাকছে'— অক্ষয় আর একবার রামানন্দকে শুনিয়ে দিল।

'তবে তো একরাত আমাকেও তোমার কেবিনে থাকতে হয়, দেখতে হয় মেয়েটিকে।' রামানন্দ রসিকতা করল।

অক্ষয় সেটা গভীরভাবে নিল।

'থাকবে? থাকো না। তরলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।'

রামানন্দ একটু চিন্তা করল।

যেন অক্ষয় তা বুঝতে পারল।

'তুমি মাধুরীর জন্য ভাবছ, রাত্রে একলা থাকতে পারবে না? ভয় পাবে?'

'হুঁ।' মাথা নেড়ে রামানন্দ কথাটা স্বীকার করল।

'কেন, শফী আসে না?' অক্ষয় ভুরু কুঁচকোল।

'তা আসে। প্রায় রোজই এখন আসছে।'

অক্ষয় নিশ্চিন্ত হল। বিড়বিড় করে বলল, 'ছেলেটা ভাল। বড় বাধ্যের। মাধুরীর কথাটথা খুব শোনে।'

'হুঁ, তা শোনে।' রামানন্দ আবার বলল, 'তবে কিনা ওর বাপ বড় বেশি মারধর করছে ওকে।'

'কেন!'

'কাজেকর্মে মন নেই।'

'কেন, ডিমটিম নিয়ে যাচ্ছে না এখন!'

'হুঁ, তা নেয়, বাবাকে দেয়। তা হলেও ইয়াকুব নাকি যখন তখন ছেলেকে ধরে পিটয়। আজ তো দেখে এলাম মারের চোটে শফীর পিঠে কালশিটে পড়ে গেছে।'

'পিঠ খুলে তোমাদের দেখালে বুঝি?'

রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'মাধুরীকে দেখিয়েছিল, তখন আমি দেখেছি।'

'ইয়াকুব কিন্তু এমনিতে খুব ভাল মানুষ। গোড়ায় তো ডিম নিতে মাঝে

মাঝে আমাদের এখানে এসেছে। অনেক কাথাটথা বলেছি।' একটু চিন্তা করে অক্ষয় বলল, 'তবে কিনা এখন বুড়িয়ে গেছে। তাছাড়াও বউটা মারা যাওয়ার পর থেকে মেজাজটা কেমন খিটমিটে হয়ে গেছে।'

'শফী তাই বলল, মাধুরীকে নিশ্চয় আগেও বলেছে, আমাকে আজ কেঁদে কেঁদে বলল, ইয়াকুব এখন রাতদিন সরাব খায়, জুয়াটুয়া খেলে, আর যখন তখন ছেলেকে ধরে মারে। যখন মার আরম্ভ করে বুড়োর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, একেবারে গরুপেটা করে ছাড়ে।'

অক্ষয় শুনল। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

'আমি ভেবেছি কি, একদিন রাজাবাজারে গিয়ে ইয়াকুব মিঞাকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে বলব। মা-মরা ছেলে। তাছাড়া ছেলেটা ভাল। তোমার ডিমের ব্যবসা চালু আছে ঐ ছেলের জন্যই। কত হাঁটাহাঁটি পরিশ্রম করে এখান ওখান থেকে ডিম জোগাড় করে নিয়ে যায়।'

রামানন্দর কথা শুনে অক্ষয় খুশি হল।

'তাই ভাল, মাস্টার, তুমি একদিন কষ্ট করে রাজাবাজার যাও। গিয়ে বুড়োকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে এসো। হুঁ, ওতে আমার মনে হয় কাজটা হবে।'

রামানন্দ একটু হাসল।

'শফী আজ বলছিল, আর সে বাড়ি ফিরে যাবে না, মাধুরীর কাছে থেকে যাবে।'

অক্ষয়ও হাসল।

'অভিমান হয়েছে বাপের ওপর। তুমি কি আসবার সময় দেখে এলে ছোঁড়া তখনো মাধুরীর কাছে বসে আছে?'

'হুঁ, তবে এখন ফিরে এসেছে মনে হয়। আজ অবিশ্যি ডিমের জন্য যায়নি। এমনি।'

'ঐ আর কি?' অক্ষয় ব্যালিশে পিঠ ঠেকাল। 'অভিমান। খুব কষ্ট হয়েছে মনে। ইয়াকুব মিঞা কেমন মারধর করেছে, মাধুরীকে তাই দেখাতে এসেছিল। হুঁ, এতক্ষণ নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে। আসলে কিন্তু বাপজানকে ছোঁড়া পাগলের মত ভালবাসে।'

ইয়াকুবও ছেলেকে খুব ভালবাকে। তবে কিনা বউ মারা যাওয়ার পর থেকে বুড়োর মেজাজটা প্রায়ই খারাপ থাকে। অতিরিক্ত নেশা করে। ঐ নেশার ঝোঁকে শফীকে মারধর করে, তা না হলে—অক্ষয় থেমে গেল। ফুলরেণু ঘরে ঢুকল।

'আর একটা ওষুধ খাবার সময় হয়েছে বুঝি।' অক্ষয় দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

ফুলরেণু মুখে কিছু বলল না। মাথাটা ঈষৎ ঝাঁকাল। হলদে রাংতায় মোড়া ওষুধের বড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। মোড়ক ছিঁড়ে অক্ষয়কে একটা বড়ি খেতে দিল। অক্ষয়ের শিয়রের কাছে মিটসেফ. ওখান থেকে কাঁচের গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে অক্ষয়ের হাতে তুলে দিল। জল মুখে নিয়ে অক্ষয় আধবোজা চোখ করে বড়িটা কোঁত করে গিলে ফেলল। রামানন্দর মনে হল ভিটামিন টেবলেট। কাঁচের গ্লাসটা ধুয়ে মিটসেফের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে রেখে হাতের ঘড়িটা দেখতে দেখতে ফুলরেণু বেরিয়ে গেল।

অক্ষয়ের মতন রামানন্দও ঘাড় ফিরিয়ে ওর পিছনটা একবার দেখল।

'বুঝেছ মাস্টার, মোটা শরীরও খারাপ না। এরও আলাদা একটা বাহার আছে। তাছাড়া রংটা তো খুব ফরসা। ও যখনই আসে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি।'

'কিছু বলে না?'

'তা কি আর ওরা বলে, মেয়ের জাত, পুরুষের চোখ দেখলেই সব টের পায়।' দাঁত ছড়িয়ে অক্ষয় শব্দ না করে হাসল।

'তরলার দিকেও এভাবে চেয়ে থাকো নাকি!'

'হুঁ, আমার ঘুম পাতলা। জুতোর খুট শব্দ শুনলেই জেগে উঠি। মাথার ওপর ঐ নীল বাল্‌বটা জ্বলতে থাকে। মনে হয় তখন আশ্বিন মাসের অষ্টমীর পাতলা জোছনার মধ্যে আমি ডুবে আছি। আর ঐ কচি-কাঁচা চাঁদের আলো গায়ে মেখে একটা ডাহুক এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়ায়।'

রামানন্দর মুখে শব্দ নেই। কেমন হতভম্ব হয়ে অক্ষয়কে দেখছে। এ যে রীতিমত কাব্য। জানালার ধারে বসে ইলেকট্রিক আলোর নিচে প্যাড কলম নিয়ে রামানন্দ এসব চিন্তা করত, লিখত, এমন সব ইমেজ দেখত। এখনও দেখছে শুভেন্দুরা। মোহনবাবুর চায়ের দোকানে গোল হয়ে বসে সেসব কবিতা পড়ে তারা এ ওকে শোনায়।

তা শোনাক। কিন্তু অক্ষয়ের মুখে এসব কেন। রামানন্দ বিষণ্ণ হয়ে উঠল। রোদের গায়ে রোদ মিশে থাকে, মেঘের বুকে মেঘ জমে থাকে। একটা প্রকাণ্ড আকাশের নিচে ধু ধু বালুর দেশে মাদারের বেড়া দেওয়া লাল টালির ঘরে মাধুরী ও একঝাঁক হাঁসমুরগির সঙ্গে অক্ষয় চমৎকার মিশে আছে।

আলাদা করে কিছু কাব্য নেই সেখানে। দরকার পড়ে না। হঠাৎ আজ অক্ষয়ের চোখে মোহনবাবুর চায়ের দোকানের কবিদের স্বপ্ন, ইমেজ! লিটল ম্যাগাজিনের পচা পচা কবিতার উপমা! বিশ্বাস করতে কেমন লাগছিল রামানন্দর।

হয়তো তাই হবে, রামানন্দ পরে চিন্তা করল, মাধুরীদের কাছ থেকে দূরে সরে এসে দিনকতক শহরের হাসপাতালের একটা কেবিনে শুয়ে থেকে অক্ষয়ের মধ্যে এই সংক্রমণ হয়েছে।

অক্ষয়, রামানন্দ মনে মনে বলল, তুমি তোমার মাধুরী, ওখানকার রোদ মেঘ খালের জল ও রাজহাঁস, মাদার ফুল নিয়ে অনেক বেশি সত্য তাজা খাঁটি। শুভেন্দুদের চোখ দিয়ে হাসপাতালের নার্সকে 'ডাহুকী' দেখা তোমাকে একেবারে মানায় না। এসব কাব্যভাবনা অসুখের লক্ষণ। ওরা অসুখে ভুগছে, শুভেন্দু বিকাশ অমলেন্দু নবকিশোর অরুণাভ, কত নাম করব, কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওদের নিশ্বাসে ওষুধের গন্ধ পাবে, গায়ে সাগুবার্লির গন্ধ পাবে, তোমার মতন সব ক'টির চোখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে সারাক্ষণ কবিতার প্রলাপ বকে। তুমি সেরে উঠে মাধুরীর কাছে ফিরে যাবে, ওদের কোথাও যাবার জায়গা নেই। ওদের মাধুরী নেই, আকাশভরা রোদ নেই, কলেজ স্ট্রীটের দমবন্ধ হাওয়ায় কোনো রকমে শ্বাস টেনে টেনে এক একজন কেমন সিঁটিয়ে গেছে যদি দেখতে! আমি পালিয়ে এসেছি, তোমাদের খালের জলের রং, মাদার মনসা ঝোপের বাতাস অসাধারণ, আমার অসুখটা একদম সেরে গেছে। আমি যে কত সুখী এখন!

'কি হল, চুপ করে আছ, মাস্টার?' অক্ষয় চোখ টিপল।

'এবার উঠব।' রামানন্দ হাই তুলল।

'তা হলে কথা রইল, একদিন রাত্রে আমার কেবিনে এসে থাকবে, মাধুরীর জন্য ভয় নেই, বলে রাখলে শফী এসে পাহারা দেবে। তরলার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো।'

রামানন্দ কৃত্রিম ধমক লাগাল।

'রাখ দিকিনি তোমার তরলা? আম'র দেখে কাজ নেই, আলাপ করে দরকার নেই। কবে সকাল সকাল সেরে উঠবে, তার চিন্তা কর। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

একটা শুকনো ঢোক গিলে বোকা বোকা চোখে অক্ষয় রামানন্দকে দেখল। হাসল।

'চলি', রামানন্দ উঠল। টুলটা অক্ষয়ের খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখল। 'কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

রামানন্দ বেরিয়ে যেতে অক্ষয় মনোযোগ দিয়ে পায়ের দাদটা চুলকাতে আরম্ভ করল। 'মাস্টার একেবারে বেম্মচারী হয়ে গেছে এখন।' মনে মনে বলল।

॥ ৯ ॥

অক্ষয়ের কেবিনে বসে রামানন্দ যে কত দেখল তার হিসাব নেই। করিডর দিয়ে কেবল যাচ্ছে আর আসছে। ফড়িং প্রজাপতি শালিক বুলবুলি আরশোলা টিকটিকি। অনেকরকম। ফুলরেণুর মতন বিশাল দেহও আছে।

বাইরে এসে রামানন্দ আবার দেখল। ঝাঁকের ঝাঁক। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে নামছে। লনে দাঁড়িয়ে আছে। গল্প করছে হাসছে কাঁদছে। হাসপাতালের রুগী দেখতে এলেই কাঁদতে হবে, মুখ শুকনো রাখতে হবে তার কি আছে! কাজেই হাসছেও প্রচুর, গল্প করছে, এমন কি শিথিল শরীর এলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে, অনেকটা পার্কে ঢুকে হাওয়া খাওয়ার মতন। হাসপাতালের লনেও মানুষ বেড়ায়।

কিন্তু সব এক। তা বলে পুরুষ কি নেই। বিস্তর। কিন্তু ওদের দিকে চোখ ফেরাবার আগেই, যাকে বলে আঁকশি দিয়ে টেনে টেনে এরা মানুষের দৃষ্টি টেনে নেয়। এত রঙচঙ ঢঙঢাঙ। যেদিকে তাকাও, পেটকাটা পিঠকাটা বগলকাটা জামার ছড়াছড়ি। যেন পেট দেখাতে পিঠ দেখাতে বগল দেখাতে সব উঠে পড়ে লেগেছে। থুঃ! রামানন্দ চোখ বুজল। যেন সব ক'টিকে ডেকে তার বলতে ইচ্ছে করে, বরং ন্যাংটো হয়ে ঘোরা ভাল, তবু তার একটা অর্থ থাকবে, একটা সৌন্দর্য থাকবে। আধখানা ঢাকলাম আধখানা খোলা রাখলাম, সুন্দরও থাকব অশ্লীলও হবে, ভদ্রতাও থাকবে আদিমতাও রাখতে হবে—ইতরামো ছাড়া কি!

কিন্তু বলবে কাকে, ঘরের মানুষটিকেই রামানন্দ কোনোদিন বলতে পারল না। কবিতার খাতা, অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এত কাছে এসেছে এক একজন, সেদিন বউবাজার চায়ের দোকানে ঠায় প'য়তাল্লিশ মিনিট বসে যার সঙ্গে গল্প করল, কি যেন নাম, রেখা চক্রবর্তী—জামার নিচে শরীরের কতটা অংশ ঢাকা ছিল কতটা বেরিয়ে ছিল তা কি দেখেনি রামানন্দ, মুখ ফুটে পেরেছিল কিছু বলতে!

যেন এখন নিজের ওপর রাগ করে থপথপ পা ফেলে ব্লাড-ব্যাঙ্কের গা ঘেঁষে সে হাঁটতে লাগল। ইচ্ছা, এক নম্বর গেট দিয়ে বেরোবে। মনে মনে বলল, এর নাম হাসপাতাল। ঘা জখম কাটাচেরা হাহাকার অক্সিজেন সেলাইন রক্ত মৃত্যু—সাইলেন্স! কত বড় সাইনবোর্ড। আস্তে গাড়ি চালাও, হর্ন দেবে না, কথা কম বলবে। ভাল।

তার শোধ তুলছে এরা। তাই এত রঙ গালগল্প হাসি। ডেটল ক্লোরিন লাইজলের গন্ধ পাত্তা পাচ্ছে না, ক্রিম পাউডার হেয়ারঅয়েল লোশনের সৌরভ নিয়ে বাতাস মাতাল! তার চেয়ে বাবা বনে চলো।

গেট্-এর বাইরে এসে রামানন্দ ঠিক করল, উঁহুঃ, বাঁয়ে হ্যারিসন রোডের দিকে না, ওখানে মোহনবাবুর দোকানে গোল হয়ে বসে শুভেন্দুরা আধুনিক কবিতা কচলাকচলি করছে। ডাইনে ছানাপট্টির দিকেও না, ভিজিটার্স আওয়ারের ঘণ্টা পড়ে গেছে, এখুনি ঝাঁকের ঝাঁক এই গেট ওই গেট দিয়ে বেরিয়ে ট্রাম বাস রিকশা ট্যাক্সি ধরতে সারাটা কলেজ স্ট্রীট চষে বেড়াবে।

কাজেই চোখ কান বুজে কোনোরকমে রাস্তাটা ক্রস করে রামানন্দকে ওপারে উঠতে হবে। তারপর ঢুকে পড় ওই গলির মধ্যে। ঢের ভাল ওখানটা। মিশেল ভেজাল কিছু ঢুকতে পারেনি। পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ একশ' বছরের পুরোনো কলকাতার চেহারা দেখতে হলে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট উত্তম, নুনে ধরা জীর্ণ স্যাঁতসেঁতে বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে আজও ওরা তীর্থের কাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাণ নেই ভণিতা নেই—সোজাসুজি ব্যাপার। আধখানা ঢেকে আধখানা রাখতে এখনও যারা শিখল না।

তাই ভাল। শিস দিতে দিতে রামানন্দ ট্রাম লাইন পার হল। এতক্ষণ তার চোখ কটকট করছিল। এইবেলা চোখের স্বাদ পাল্টান যাবে। কিছু খাঁটি জিনিস দেখতে দেখতে ওদিক দিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে বেরিয়ে পড়া যাবে। ওখান থেকে বউবাজার স্টপে গিয়ে বেলেঘাটার বাস ধরতে অসুবিধার কিছু নেই।

'শুনুন শুনুন!'

রামানন্দ দাঁড়াল। ঘাড় ফেরাল।

জগত মণ্ডল হাসছে। হাতে ইজেল। কাঁধে রং তুলির থলে।

'কোথা থেকে?'

'হাসপাতাল থেকে।'

'ওয়াইফ? খালাসের ব্যাপার?'

রামানন্দ হাসল। মাথা নাড়ল।

'আমার এক বন্ধু। গ্যাসট্রিক আলসার।'

'তাই বলুন, আমি আরো ভাবলাম গিন্নী বুঝি—'

'আপনি কোথা থেকে?'

'আর বলবেন না। অনেকদিন পর ইচ্ছে হল গোলদীঘির একটা স্কেচ নেই। শালা বসতে না বসতে এমন দ্রুম্‌দ্রাম্ আরম্ভ হল।'

'হঠাৎ?' রামানন্দ ভুরু কুঁচকোল।

এই তো হচ্ছে আজকাল। য়ুনিভার্সিটি বিল্ডিং-এর সামনে এতবড় দুটো পটকা ফাটল। কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছেন। কোন্‌দিকে যাবেন?'

'আপনি?'

'বেলেঘাটার বাস ধরব।'

'বাড়ি?'

রামানন্দ ঘাড় কাত করল।

'এত সকাল সকাল?' জগত কেমন করে যেন হাসল। 'দেরি করলে গিন্নী রাগ করবে?'

রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'না, সেসব কিছু না।' একটু থেমে আবার বলল, 'কোথায় আর ঘুরব। বেরিয়েছি অনেকক্ষণ।'

'মশাই, আপনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ, আধুনিক কবিতা লেখেন কি

করে! কোথায় ঘুরব! কলকাতা শহরে জায়গার অভাব?' কথা শেষ করে মণ্ডল ফ্যা ফ্যা করে হাসল। 'চলুন আমার সঙ্গে। দু'ভাই আনন্দ করব।'

আর একদিনের কথা রামানন্দর মনে পড়ল। সেদিনই মানুষটার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। মন খারাপ করে রামানন্দ দমদমের ওদিকটায় রেল লাইনের কাছাকাছি একটা পুরনো ইটখোলার কাছে চুপ করে বসে ছিল। যেন রেল লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করত সে। কথাটা মনে হলে আজ তার হাসি পায়। যেন এর ঠিক ক'দিন আগে পূরবী আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করেছিল বলে রামানন্দ জগত-সংসার অন্ধকার দেখেছিল, জীবন অর্থহীন মনে হয়েছিল। সত্যি কি তাই! না কি পূরবী-টুরবী কিছু না। উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা, কমলা লেবুর ন্যায় গোল, ছেলেবেলায় যা সে ভূগোলে পড়েছিল, সেই পৃথিবীটা বড় বেশি পুরোনো একঘেয়ে হয়ে গিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া যায় কিনা, মানে অনেক সূর্যোদয় দেখলাম, অনেক ভাঙ্গা চাঁদ, বাঁকা রোদ্দুর, তাল পাকানো গরম, হাড় কাঁপানো শীত এই শরীরের ওপর দিয়ে, মাথার আনাচকানাচ ঘেঁষে পার হয়ে গেছে, আর না, এখন সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, এমন যদি কোনো দেশ থাকে, সেখানে কেমন লাগবে জানতে দেখতে কৌতূহলী হয়ে লাইনের ধারে সে ছুটে গিয়েছিল? না কি কবিতা—মানে অনেক কবিতা লেখা হল, শব্দের কুটকচাল নিয়ে জীবনের অর্ধেক প্রায় কাবার, অসুখটা সারছিল না, পিত্তশূলের বেদনায় অস্থির হয়ে করবী ফুলের বীচি খেয়ে না কি যেন, ছেলে-বেলার ঘটনা, করবী গাছের ডালে দড়ি বেঁধে দেশের গাঁয়ে দীনবন্ধু রাত্রে ঝুলে পড়ে জ্বালা জুড়িয়েছিল, ঠিক মনে করতে পারছিল না রামানন্দ, কিন্তু কলকাতা শহরে জুতসই গাছ নেই, হাতের কাছে দড়ি নেই, তাই কি দুপুরবেলা সেদিন মোহনবাবুর চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে বাস-এ চেপে সোজা দমদম রেল লাইনের ধারে ছুটে যাওয়া? বস্তুত, ব্যাপারটা যে কী দাঁড়িয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত কতটা কি হতো—চিন্তা করলে কাতুকুতু লাগার মতন একটা নিঃশব্দ হাসির সুড়সুড়ি রামানন্দর শিরদাঁড়া বেয়ে মাথা থেপে পা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠানামা করে। সেই মুহূর্তে সেদিন জগত মণ্ডলের সঙ্গে দেখা যদি না হতো? আর্টিস্ট, ছবি বিক্রি হয় না, গাছতলায় প্রদর্শনী খুলে বসে। ঘাপটি মেরে ইঁটের পাঁজার কাছে লোকটা বসে আছে দেখে গুণ্ডাটুণ্ডা ভেবে রামানন্দ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথচ মণ্ডল রাগ করল না। পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট অফার। রামানন্দ যে কী খুশি হয়েছিল। তুমি খাঁটি শিল্পী। মনে মনে মানুষটাকে সে নমস্কার জানিয়েছিল। হুঁ, শিল্পী। ছবি বেচে পয়সা নেই, বউ কারখানায় চাকরি করে। বউয়ের ব্যাগ থেকে চুরি করে তুলে আনা কুড়ি টাকা দিয়ে আনন্দ করতে রামানন্দকে নিয়ে দমদম থেকে ফিরে সোজা সোনাগাছি ছুটে যাওয়া। আহা, একটা সন্ধ্যা গেছে! আজ?

আনন্দ করতে যাওয়ার প্রস্তাব শুনে সেদিনের মতন রামানন্দ ফুক করে হাসল।

'রেস্ত?' সেদিনের মতন আর প্রশ্ন করল না যদিও, খারাপ দেখায়, চুপ করে চোখ বড় করে মণ্ডলের মুখটা সে দেখছিল।

বলবে 'চলুন, চলুন।' ইজেলটা বাঁ-হাতে চালান দিয়ে জগত মণ্ডল রামানন্দর কাঁধে তার ডান হাত তুলে দিল। 'দেশের মানুষ তো আমার ছবি বুঝল না, কাল এক লাইজলের গন্ধ কান, হিপিগোছের চেহারা, কড়কড়ে একশ' টাকার একটা নোট নিয়ে বাতাস মাত্তইটুকুন একটা ল্যাণ্ডস্কেপ, চার ইঞ্চি বাই ছ' ইঞ্চির বেশি হবে না,

হেলাফেলা করে আঁকা, দিব্যি কিনে নিয়ে গেল।'

'ওরা গুণের কদর বোঝে।' রামানন্দ খুশি হল।

'আসুন।' জগত রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। বাস ধরবে না ট্রামের জন্য অপেক্ষা, কিছু বুঝতে পারল না হঠাৎ রামানন্দ, কিন্তু দেখা গেল ট্রাম বাস কোনোটার দিকেই মণ্ডলের চোখ নেই, হাত তুলে একটা রিকশাওয়ালাকে ডাকছে। 'এই, ইধার লে আও।'

রিকশা কাছে আসতে দু'জন লাফিয়ে উঠে বসল।

'ভালই হল।' রামানন্দ আরাম করে গদিতে ঠেস দিয়ে বসল। 'অফিস ছুটির সময়, ভিড়ের জন্য ট্রাম বাস-এ ওঠা যেত না।'

'আরে রামঃ, রিকশা-ট্যাক্সির পয়সা না থাকলে এই সময় আমি সিধা হাঁটা দেই। নিন।' পকেট থেকে চকচকে নতুন সিগারেটের প্যাকেট বের করল জগত। রামানন্দর মনে পড়ল, সেদিন দমদম সেই ইঁটের গাদার কাছে রেল-লাইনের ধারে একটা দুমড়ান সিগারেটের আধখানা ছিঁড়ে জগত তাকে অফার করেছিল, তাতেই রামানন্দ কম খুশি হয়েছিল কি! অন্তরটা ভাল মণ্ডল মশায়ের, মনে মনে বলল সে। আজ আনকোরা নতুন প্যাকেটের মোড়ক ছিঁড়ে অনায়াসে আস্ত একটা ফিলটার টিপড্ বের করে দিল।

'ট্যাক্সিও পাওয়া যেত না এই সময়।'

'না না, অফিস ছুটি হয়েছে—দু'-ঘণ্টা দাঁড়িয়েও আপনি একটা ধরতে পারতেন কিনা সন্দেহ।' দেশলাই জ্বেলে রামানন্দ সিগারেট ধরাল এবং ঐ কাঠি দিয়ে মণ্ডলের মুখের সিগারেট জ্বেলে দিল।

'দেখা যাক, ফেরার সময় যদি এক-আধটা পাওয়া যায়। এই রিকশা, বাঁয়ে ঘুমকে চলো।'

'আজ তাহলে আমরা কোনদিকে যাচ্ছি!' রিকশা বাঁয়ে ঘুরছে দেখে রামানন্দর সন্দেহ হল। আজ যেন মণ্ডল তাকে নিয়ে আর চিৎপুর যাচ্ছে না।

'বৈঠকখানা।' জগত চোখ আড় করে রামানন্দর মুখ দেখল। 'দিশী চলে তো আপনার?'

'হুঁ, হুঁ,' রামানন্দ লম্বা করে ঘাড় কাত করল। 'দিশীই তো খাই, বিলিতী খাব পয়সা কোথায়।'

'না, পকেটে টাকা ছিল। আপনাকে নিয়ে একটা ভাল বার-টার-এ যাওয়া যেত, কিন্তু ওদিকে নন্দ শালাকে আবার বলে রেখেছি, বৈঠকখানার দোকানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। হয়তো গিয়ে দেখব বসে আছে।'

'বেশ তো চলুন না, আমি দিশী খাই, দিশীতে আপত্তি নেই।'

কিন্তু নন্দটা কে, রামানন্দ বুঝতে পারছিল না। যে-ই হোক, জগত মণ্ডলের সঙ্গে আজ আবার দেখা হয়ে গেল, এটাই বড় কথা। সেদিনের মতন আজও মণ্ডল তাকে আনন্দ করতে নিয়ে যাচ্ছে। একেই বলে দিলদরিয়া পার্টি। আজ বোধকরি মাল-টাল খেয়ে তারপর মণ্ডল তাকে জায়গায় নিয়ে যাবে। মণ্ডলের পকেট ভারি। আজ আর কথা কি। সেদিন বউয়ের ব্যাগ থেকে কুড়ি টাকা চুরি করে এনে কম ফুর্তি করেছিল!

'আমার মশায় রেখে বাঁচিয়ে চলার অভ্যেস নেই। একটা বাজে ছবি বেচে একশ' টাকা পেয়েছি—হুঁ, বলতে পারেন অভাবের সংসার, বউয়ের হাতে তুলে দিলে কাজে লাগাতে পারত। ভেবেও ছিলাম একবার দিয়ে দি। কিন্তু যেখানে হাজারটা ফুটো রয়েছে সংসারে, সেখানে এই একশ' টাকা দিয়ে কী হতো, ক'দিন

চলত বলুন? মাঝখান থেকে আজকের আমোদ ফুর্তিটাই মাটি হতো। তাছাড়া টাকাটা তো পাওয়ার কথা ছিল না, বলতে গেলে ওটা মুফৎ পাওয়া। এমন দু' চারশ' ছবি, যদি কোনোদিন আমার বুদ্ধু ওস্তাগর লেনের বাসায় যান, দেখবেন ঘরের আনাচেকানাচে, তক্তপোশের নিচে, কিছু বউয়ের ঘুঁটের বস্তার পাশে, কিছু রান্নাঘরের তাকের ওপর কালিঝুলি নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।'

'সব এক জায়গায় গুছিয়ে রাখেন না?'

'কত গুছিয়ে রাখব বলুন!' জগত হাসতে গিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'তাছাড়া সেদিন বলেছি আপনাকে, বউ ছেলে মেয়ে সবাই আমার ওপর খাপ্পা, সবাই ভাবে ওগুলো হল ঘরের জঞ্জাল। ওদের দোষ দেওয়া যায় না—একটাও বিক্রি হয় না, অথচ দিনের পর দিন আমি ছবি এঁকে চলেছি, তা না হলে, চিন্তা করে দেখুন—আমি সময় না পাই, ওরা তো যত্ন করে গুছিয়ে-টুছিয়ে সব তুলে রাখতে পারত, কিন্তু ওদের সেই উৎসাহ আসবে কোথা থেকে। কেনই বা আসবে!'

রামানন্দ জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল।

'তাহলেও আপনার আঁকা জিনিস, আপনার সৃষ্টি, ওঁরা যত্ন না করুক, আপনি সেগুলো এখানে সেখানে পড়ে থেকে নষ্ট হতে না দিয়ে প্রিজার্ভ করবেন—করা উচিত।'

নাকের ছিদ্র দিয়ে এতটা ধোঁয়া বের করে যেন সেই নাক দিয়েই জগত হাসল। 'আসল কথা কি জানেন, যখন আঁকি—আঁকি, আমার সমস্ত চিন্তাভাবনা, জীবন সম্পর্কে যাবতীয় ধ্যান-ধারণা, হুঁ, যদি ড্রিম বলেন তবে তাই, এমন কি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে সবটা উৎসাহ উদ্যম সময় শ্রম ঐ এক টুকরো কাগজের ওপর ঢেলে দিয়ে আমি রং ছিটিয়ে যাই, যেন তখনকার মতন ওটাই আমার গান, হুঁ, কবিতাও বলতে পারেন, আপনারা যেমন কবিতা লেখেন, হি-হি—'

'কিন্তু তারপর কী হল! ছবিটা আঁকা হয়ে গেল, ব্যস, আর আমি ওখানে নেই—আমার আর একবিন্দু মায়া থাকে না ওটার ওপর, এখন সেই ছবি গিন্নীর ঘুঁটের বস্তার পাশে পড়ে রইল কি নর্দমার জালির মুখে আটকে গিয়ে জল-কাদায় মাখামাখি হতে থাকল, আমার আর খেয়ালই থাকে না সেদিকে তাকাবার, আমি ভুলেই যাই কবে কি সব এঁকেছিলাম।'

কথা না বলে রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। রিকশাটা দাঁড়িয়ে আছে। আগে পিছনে অনেক গাড়ি জমে গেছে। ট্রাফিক জ্যাম।

'কি হল, চুপ করে আছেন?'

'বলুন।' যেন জগত মণ্ডল একাই বকে যাবে, রামানন্দ শুধু শ্রোতা। চোখ আড় করে আর্টিস্টের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি শুনছি।'

'একটা কবিতা লেখা হয়ে যাবার পর ওটা সম্পর্কে আপনার উৎসাহ-টুৎসাহ আর তেমন থাকে কি? আমার কথা আমি বললাম, এবার আপনারটা বলুন।'

'আমি আর কবিতাই লিখছি না, কবে লিখতুম তা-ও এখন প্রায় ভুলতে বসেছি।'

'লিখছেন না!' খুব একটা অবাক হল না যেন জগত, তেমন অখুশিও হল না। আঙুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে পিঠ টান করে বসল। গাড়িটা আবার চলছে। 'যাক গে, বাঁচা গেল, ভাবলাম ঘণ্টাখানেকের জন্য বুঝি শেকড় পোঁতা হয়ে গেলাম। যা বাবা, ছুটে চল এই বেলা, তীর্থের কাক হয়ে নন্দ শালা ওদিকে হাঁ করে বসে আছে।—হুঁ, কি যেন বলছিলাম'

রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথা শেষ করে জগত এদিকে ঘাড় ফেরাল। 'লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। কি করা হচ্ছে তা হলে এখন?'

'হাঁস-মুরগি নিয়ে আছি।'

'চমৎকার, ওয়ান্ডারফুল!' মণ্ডল চেঁচিয়ে উঠল। রাস্তার মানুষ ঘাড় ঘুরিয়ে রিকশাটা দেখল। হাসল। বাঙ্গাল, নিশ্চয় ভাবছে ওঁরা—রামানন্দ চিন্তা করল, অথবা এ-ও ধরে নিতে পারে, লোকটা মদ খেয়েছে, না হলে রিকশায় বসে এমন চেঁচায়! 'খুব ভাল করেছেন রামানন্দবাবু, বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।'

রামানন্দ কথা বলল না। জগত ভুরু কুঁচকোল।

'চাকদা গেছেন কখনো আপনি?'

'না', হঠাৎ চাকদা কেন, রামানন্দ ভেবে পেল না। 'জায়গাটার নাম শুনেছি, যাইনি।'

'আঃ যদি যেতেন।' জগত মাথা ঝাঁকাল। 'উঁহু, ঠিক চাকদা বলতে রেল স্টেশন, রেজিস্টারি অফিস, স্কুল, বাজারের ঐ ঘিঞ্জি চৌহদ্দিটা না, একেবারে ইন্টিরিয়ারে, বারো-চৌদ্দ মাইল ভেতরে—ট্রেন থেকে নেমে বাস-এ চাপলে ঘণ্টা দেড়েক লাগে পৌঁছোতে, যাকে বলে অজ পাড়াগাঁ, আমার এক পিসি থাকে। ঐ পিসির বাড়ি আমি চলে যাই। হুঁ, আঁকাউঁকি যখন আর ভাল লাগে না। এমন তো হয়ই, আজ যেমন আপনার মনের অবস্থা, কবিতা লিখতে ইচ্ছা করছে না, আমারও সময় সময় এটা হয়—ছবি আঁকার নাম শুনলেই গা-বমি করে। পিসির বাড়ি গিয়ে দিন কতক হাঁস মুরগি গরু ছাগল নিয়ে খুব হইচই করি—গাছ থেকে পেড়ে আম জাম খাই, পিসির দুটো দীঘি—মাছ ধরি, জলে নেমে সাঁতার কাটি—অর্থাৎ আমি যে কোনোদিন কলকাতায় থাকতাম, বুদ্ধু ওস্তাগর লেনের এক উপোস-করা আর্টিস্ট—কথাটা স্রেফ ভুলে যাই, ভুলে থাকি। বেড়ালের অসুখ দেখেছেন?'

রামানন্দ অল্প হাসল।

'দেখেছি যেন।'

'ওটা আসলে কিন্তু অসুখ না, ইচ্ছা করে শরীরে অসুখের মতন একটা অবস্থা তৈরি করে, দেখবেন বেড়াল তখন খুব করে ঘাস-টাস খায়, তারপর এক সময় সব উগরে ফেলে, মনে হবে বুঝি জ্বর হয়েছে, ভকভক বমি করে বমি করার পর কেমন নেতিয়ে পড়ে, তখন ঝোপের আড়াল কি ঘরের পেছন কোনো নিরিবিলি জায়গায় টানটান হয়ে শুয়ে থাকে, এভাবে সারাটা সকাল, কখনো সারাটা দুপুর, কোনো কোনো সময় একটা পুরো দিনই হয়তো কাটিয়ে দেয়—ইঁদুর ধরা, মাছভাজা চুরি করা, মুরগির পেছনে ছোটা—কিচ্ছু তখন তার মনে থাকে না। সব ভুলে থাকে। তেমনি আমরা শিল্পীরা। দিন কতক সব ভুলে থাকতে হয়। থাকা ভাল। তারপর যখন আপনি কলম ধরবেন, দেখবেন কেমন সব জিনিস মগজ থেকে বেরোচ্ছে—তাই করি আমি, হইচই করে পিসির বাড়ি ক'দিন কাটিয়ে তারপর কলকাতা ফিরে এসে যখন তুলি ধরি—আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই, এমন ছবি আমার হাত দিয়ে বেরোয় কি করে। দেখবেন, অসুখের অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার পর বেড়াল কেমন খপখপ ইঁদুর ধরে বেড়াচ্ছে। কেমন তেজ তার তখন।'

রামানন্দ আর হাসল না। মুখ বেজার করে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আমার আর কোনো দিনই কবিতা লেখা হবে না।'

'এটা মনে হয়। আমারও হয়। পিসির বাড়ি দীঘির পাঁকে নেমে মাগুর

মাছ শোল মাছ ধরি আর ভাবি, এই হাতে কোনোদিন তুলি উঠবে না। এভাবে মাছ ধরে সারা জীবন কাটবে।'

ছানাপট্টি পিছনে ফেলে রিকশা বাঁয়ে বাঁক নিয়ে শিয়ালদার দিকে ছুটল।

'এই যে কবিতা সম্পর্কে আপনার একটা বিতৃষ্ণা এসেছে, যেমন ছবি আঁকার ব্যাপারে আমার আসে, হাঁস মুরগি নিয়ে এখন মেতে আছেন, মনে সাময়িক একটু অন্য রকম জীবনযাপন, শিল্পীর পক্ষে এটা দরকার। এতে তার মনের শরীরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কেরানী সারা জীবন কেরানী হয়ে থাকতে পারে, উকিল, উকিল হয়ে থাকতে পারে, ডাক্তার, ডাক্তার। কিন্তু আমার আপনার কেস অন্য রকম। আমরা কী, আমরা কে বা আমরা কী হতে চাইছি—সব ভুলে থেকে দিন কতক উড়নচণ্ডী হয়ে এদিক-ওদিক করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না।'

আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হয়ে গেল। জগত মণ্ডল থামছিল না।

'এই ধরুন যেমন এখন, দু' ভাই বৈঠকখানার শুঁড়িখানায় ঢুকে প্রাণভরে দু' নম্বর খাব, আপনি কি দু' নম্বর খান?'

'হুঁ, ওটা আমার সুট করে।'

'গুড, আমি দু' নম্বর ছাড়া কিছু খাই না। একরকম জিনিস খেয়ে যাওয়া ভাল। তাতে লিভার ডেমেজ কম হয়—অনেকদিন চালিয়ে যাওয়া যায়। হুঁ, কি যেন বলছিলাম—প্রাণভরে দু'জনে খাব, এক পাঁইট দু' পাঁইট, তিন চার পাঁচ, তার মানে খেতে খেতে বমি করে দোকানের টুল টেবিল ভাসিয়ে দেওয়ার মতন যখন অবস্থা হবে, তখন আমরা উঠব, টলতে টলতে ওখান থেকে বেরিয়ে হাতের কাছে রিকশা ট্যাক্সি যা পাওয়া যায় একটা নিয়ে সোজা চলে যাব সোনাগাছি, রামবাগান বা শ্যামবাগান যেখানে হোক। তারপর আর কি, সরযূ হোক সোনামণি হোক, জ্ঞানদা মানদা—যে কোনো একজনের বিছানায় আমরা নেতিয়ে পড়ব, ইঁদুর ধরা, মাছভাজা চুরি করা, মুরগির পেছনে ধাওয়া করা, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা—কিচ্ছু মনে থাকবে না আমাদের। আমরা তখন এই জগত থেকে অনেক দূরে। আমাদের হুঁশ থাকবে না। ঘাস খেয়ে অসুখ হওয়া দুটো বেড়াল হয়ে সারা রাত দু'জনে বেশ্যাবাড়ি পড়ে আছি, হি-হি।'

একটু দম নিয়ে জগত আবার হাসল। 'তবে একটা কথা ব্রাদার—পিছুটান রলে, মানে তখন যদি আপনি বউদির কথা চিন্তা করেন, আনন্দটাই মাটি হবে। আমি করি না। অথচ আমার খুব জানা আছে, কাল সকালে চোখ রগড়াতে রগড়াতে যখন বাড়ি গিয়ে হাজির হব, ওয়াইফের হাতে ঝাঁটার বাড়ি খেতে হবে —কিন্তু কে আর সেসব গেরাহ্যি করে মশাই, ফ্রেস এনার্জি নিয়ে, বলতে পারেন তাজা একটা গোলাপের মন নিয়ে তুলি হাতে ততক্ষণে আমি সৃষ্টিকার্যে নেমে গেছি—সেই একটা সকালে এমন ব্রিলিয়ান্ট কিছু আমার হাত দিয়ে বেরোল, যার সঙ্গে অন্য পাঁচ দিনের কাজের কোনো তুলনাই হয় না।'

'আমরা এসে গেছি।' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। বৈঠকখানা বাজারের মুখে রিকশাটা দাঁড়াল।

'আমি দিচ্ছি—' রিকশা থেকে নেমে জগত তড়বড় করে পকেট থেকে পয়সা বের করল। রামানন্দ মনে মনে বলল, 'এমনিও আমি রিকশা ভাড়া দিতাম না। জগত মণ্ডলের সঙ্গে আনন্দ করতে বেরোলে একটা নয়া-পয়সাও আমার খরচ নেই।'

ভিড় ঠেলে দু'জনে বাজারে গলির ভিতর ঢুকল।

'কেমন, এসব ব্যাপারে—মানে একটু ওড়াওড়ি করে যখন বাড়ি ফেরেন, গিন্নীর খানিকটা সিম্পেথি-টিম্পেথি পান! না কি আমার মতন ঝাঁটার বাড়ি খেতে হয়?'

বোকা বোকা চোখ করে রামানন্দ জগতের মুখটা দেখল, হাসল, কিছু বলল না। কি বলবে সে?

॥ ১০ ॥

'ঐ দেখুন, নন্দ দাঁড়িয়ে আছে।' জগত আঙুল তুলে দেখাল।

রামানন্দ দেখল ফরসা ছিপছিপে একটি মানুষ এক হাতে শসা আর এক হাতে দুটো চারমিনারের প্যাকেট নিয়ে মদের দোকানের দরজার সামনে অপেক্ষা করছে।

যেন নন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে জগত একটা হাত শূন্যে উঁচিয়ে জোরে শিস দিল।

দেখতে পেয়ে নন্দ খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল। মানুষটিকে রামানন্দ আগে কখনও দেখেনি। রাস্তার দু' পাশে সার বেঁধে আলু, কলা, ঝিঙে, টমেটোর দোকান বসে গেছে। অফিস ফেরতা কেরানীর দল থলে হাতে হুমড়ি খেয়ে বাজার করছে।

'এদের দেখলে মায়া হয়।'

'কেন?'

'বড্ড বেশি বউ-ভক্ত।'

'হঠাৎ এই ধারণা আপনার?'

'বাঙগালী কেরানী সম্পর্কে এর চেয়ে খাঁটি সত্য আর হয় না যে।' জগত নিচু গলায় হাসল। 'দেখছেন না মন দিয়ে সারাদিন কলম পিষে এসে এখন কেমন মন দিয়ে বাজার-টাজার করছে, তারপর হুড়মুড় করে বাস ধরবে, ট্রাম ধরবে, ট্রেণ ধরবে। তারপর বাড়ি। তারপর রান্নাবান্না। তারপর খাওয়া। তারপর বউয়ের গলা জড়িয়ে এক ঘুমে রাত কাবার।'

'পরদিন সকালে আবার অফিস, বিকেলে থলে হাতে আবার এই বৈঠকখানা বাজার।'

নাকের শব্দ করে রামানন্দ হাসল। 'যেন দুনিয়ার সবাই ছবি আঁকে না বা কবিতা লেখে না বলে আপনার আফসোস!'

'মোটেই না।' জগত ধমক দিয়ে উঠল। 'দুনিয়ার আদ্দেকের বেশি মানুষ ঝাণ্ডা কাঁধে ফেলে আওয়াজ করতে করতে মিছিলে যোগ দিচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না! ছবি আঁকা, কবিতা লেখার দলে ক'জন!'

তাও বটে। পিছন থেকে একটা প্রকাণ্ড মিছিলের চাপ রামানন্দ গায়ে পিঠে অনুভব করছিল। সারাটা বউবাজার ষ্ট্রীট আওয়াজে আওয়াজে গরম হয়ে উঠেছে।

'ঠিকই বলেছেন।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'বেচারারা এদিকেও রইল না ওদিকেও নেই, মাঝখানে থেকে থলে হাতে ভিড়ের গুঁতো খেয়ে মরছে।'

জগত আর কিছু বলছিল না। ততক্ষণে মদের দোকানের দরজায় দুজন ঢুকে পড়েছে। এবং এই দোকানের যা বৈশিষ্ট্য, আগেও ক'দিন এখানে এসে রামানন্দ টের পেয়ে গেছে, ভিতরের বিখ্যাত প্রস্রাবখানার উগ্র গন্ধ ও আদা, ছোলা ও কাঁচা শশার ঠাণ্ডা মেজাজী সুবাস এক সঙ্গে নাক ছেঁকে ধরল।

'আমি জায়গা বুক করে রেখেছি।' নন্দ গাল ছড়িয়ে হাসল। 'বসে খাওয়ার

অসুবিধা হবে না।'

'গুড।' জগত খুশি হল। কেননা সারাক্ষণ এখানে এত ভিড়, কোনোরকমে দাঁড়িয়ে গলায় খানিকটা ঢেলে যেতে পারাটাই প্রায় সৌভাগ্যের ব্যাপার। 'তুমি একটা করিৎকর্মা মানুষ ব্রাদার। এই জন্যই তো আগে থেকে তোমাকে পাঠানো।'

প্রশংসা পেয়ে নন্দ আবার গাল ছড়িয়ে হাসল। রামানন্দ দেখল মানুষটার একটা দাঁতও অক্ষত নেই। যেন অ্যাসিডে সব ক'টা দাঁতের মাথা ক্ষয়ে গেছে, ধারগুলো ভেঙে গেছে। মুখটা সরু। কিন্তু গোঁফের বাহার আছে। দেখতেও মানুষটি বেশ ছোটখাট, প্রায় বামন বলা চলে, অথচ মুখের কাঁচ ভাবটা এখনও যেন পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। হাসিটাও সরল। এদিকে শুঁড়ির দোকানে আগেভাগে ঢুকে বসবার জায়গার সুবন্দোবস্ত করে ফেলেছে, বোঝা যায় এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে ইনি খুবই ওয়াকিবহাল। আর এত বড় একটা গোঁফ যখন রাখতে আরম্ভ করেছে, রামখোকা, নাকি ইঁচড়ে পাকা এক ছোকরা, ঠিক কোন্ শব্দটা এখানে জুতসই হবে রামানন্দ চিন্তা করছিল।

'আসুন, আমার সঙ্গে এদিকে চলে আসুন।' নন্দ আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। বার ঘেঁষে ভিতরে প্রকাণ্ড হলঘর। একটা টুল-টেবিলও খালি নেই। কেবল মানুষের মাথা, বোতল গেলাস, শালপাতায় শালপাতায় আদা, ছোলা, শশা, পেঁয়াজ কুঁচি, সিদ্ধ আলুর নৈবেদ্য। নন্দ দাঁড়াল না। এগিয়ে চলল। রামানন্দ ও জগত তাকে অনুসরণ করছে। হলের শেষ মাথায় আর একটা দরজা। তিনজন দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এবার প্রস্রাবখানার ঝাঁঝল গন্ধটা প্রবল হয়ে নাকে খোঁচা দিল। খুব কাছেই পায়খানা প্রস্রাবের জায়গা। তাহলেও মাথার ওপরটা খোলা। একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ ডালপালা ছড়িয়ে আছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ক'টা জ্বলজ্বলে তারা দেখা গেল।

'চমৎকার চমৎকার।' জগত রীতিমত চেঁচিয়ে উঠল। 'এই আমাদের পোর্টিকো—পোর্চ?'

'হুঁ, হুঁ, লাউঞ্জ, লবি, যা হোক একটা কিছু বলুন দাদা।' ওপাশ থেকে ভারি গলায় একজন হেসে উঠল।

আলো কম। দেওয়ালের গায়ে টিমটিম করছে একটা বাল্ব। তার ওপর এত বড় একটা ঝাঁকড়ামাথা গাছের অন্ধকার। কেমন ভূতুড়ে ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে জায়গাটায়। মানুষের আকার-আকৃতি বোঝা গেলেও চেহারার খুঁটিনাটি মালুম হয় না। তবে মানুষটা যে খুব মোটা বোঝা যাচ্ছিল। গলার স্বর শুনে মনে হয় জালার ভিতর থেকে বুঝি কেউ কথা বলছে।

তিনজনই ঘাড় ঘুরিয়ে ওপাশটা দেখল। উল্টোদিকের দেওয়ালে পিঠ ছেড়ে দিয়ে দু পা ছড়িয়ে সেই পর্বতসদৃশ মানুষটি টুলের ওপর বসে আছে। সামনে জলের ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের পাটাতনের ওপর বোতল, গেলাস, আদা, ছোলা, দেশলাই, সিগারেটের বাক্স রাখা হয়েছে।

'টেবিলখানা চমৎকার হয়েছে।' নন্দ গুজগুজ করে হাসল।

'যা খুশি করুক, ওদিকে আমাদের তাকাবার সময় নেই, তুমি মাল নিয়ে এসো তো। বসুন রামানন্দবাবু, বসে পড়ুন।' জগত এদিকের একটা বেঞ্চির ওপর বসল। রামানন্দ পাশে বসল ও একটা আরামের নিশ্বাস ফেলল।

'ভেতরে যেমন ভিড়, এখানটা তেমনি নিরিবিলি দেখছি।'

'নন্দ পাকা ছেলে।' জগত নিচু গলায় বলল। কিন্তু নন্দ তখনও দাঁড়িয়ে। 'কি হল!' জগত সেদিকে চোখ তুলল। 'দু নম্বর, হুঁ, একবারে একটা বোতল আনাই ভাল। পাঁইট-ফাইটে পোষাবে না। কি বলেন রামানন্দবাবু?'

'আমি কিন্তু খুব একটা বেশি খাব না!'

'আহা, নববধূর লজ্জা এখন রাখুন দিকিনি, আপনি কতটা খাবেন না-খাবেন সে আমি বুঝব।'

রামানন্দ চুপ।

'কি হল নন্দলাল'. জগত ঘাড় ফেরাল।

নন্দ ঘাড় চুলকাল।

'এই দ্যাখো!' জগত তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পারল। 'আমিও শালা যেমন।' সংগে সংগে পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করল। 'কটলেট-টটলেট কিছু খাবেন কি?'

'আহা, আগে তো আসল জিনিস আসুক।'

রামানন্দ চারমিনারের প্যাকেট খুলে এক শলা তুলে নিল। 'সেসব পরে দেখা যাবে।'

'তাই ভাল।' সিগারেট তুলে নিয়ে জগত একটা ধরাল।

'কষ্ট করে ভদ্রলোককে আনতে পাঠালেন, দেখলেন তো কাউণ্টারে যা ভিড়।'

'নন্দলাল ঠিক ম্যানেজ করে নিয়ে আসবে।' জগত পায়ের ওপর পা তুলে দিল। 'একটা বেয়ারাকে ডেকে বলতে পারতাম, কিন্তু ওদের আশায় বসে থাকলে কোমরে ব্যথা ধরে যেত। আমি ব্যাটাদের চিনি।'

'আপনার এই নন্দবাবুটির সংগে কিন্তু পরিচয় হল না।'

'হবে হবে। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আপনাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এত বড় সুযোগ এসেছে, আমি মনে করি আজ একটা গ্রেট-ডে, অন্তত আমার পক্ষে, হা-হা।'

'ভাল।' রামানন্দ খুশি হল। আর্টিষ্ট জগত মণ্ডলের সংগে কবি রামানন্দ সেনের বন্ধুত্ব হয়েছে, আবার এদিকে দেখা যাচ্ছে নন্দলাল নামের মানুষটিও জগতের এক গ্লাসের বন্ধু, কাজেই শুঁড়ির দোকানে এসে এই দুটি বন্ধুর মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেবার সুবর্ণ সুযোগ জগত মণ্ডল পুরোপুরি কাজে লাগবে এ তো জানা কথা।

কিন্তু রামানন্দ দেখছিল, ওপাশে আবছা অন্ধকারে বসে পাহাড়ের মতন মানুষটা একবার হেসে উঠে সেই যে চুপ করে গেল, তারপর মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই।

লজ্জা পেয়েছে? অপদস্ত হয়েছে? স্বাভাবিক। রামানন্দ চিন্তা করল, তার এমন গলাভরা হাসির সংগে যোগ দিতে এই দলের একটা মানুষ গ্রাহ্য করল না, একবার ওদিকে তাকাল না পর্যন্ত।

গেলাসটা হাতে নিয়ে একলা কেমন মনমরা হয়ে মানুষটা এদিকে তাকিয়ে আছে, বসে থাকার ভংগি দেখে তাই মনে হল। যেন গেলাসে চুমুক দেবার উৎসাহটাও হারিয়ে ফেলেছে। দেখে মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক। জায়গাটা অন্ধকার হলেও পরনে রীতিমত ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ের খানিকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। চোখে চশমাও রয়েছে। কাচ দুটো মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে। মনে হচ্ছিল, চশমার কাচ না, যেন নিজে ভদ্রলোক হয়ে এই তিনটি ভদ্রলোকের কাছ থেকে অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য ইত্যাদি পাওয়ার আঘাত সামলাতে না পেরে এমন বিশালকায় মানুষটার চোখ দুটো ছলছল করছে।

রামানন্দর মনের ভাব জগত মণ্ডল বুঝতে পারল কিনা জানা গেল না। তবে জগত একবারও সেদিকে তাকাচ্ছিল না। বরং বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকের দরজায় চোখ রাখছিল। নন্দ কখন বোতল নিয়ে ফেরে।

নন্দর সঙ্গে তিনটা কাচের গেলাস, দুটো সোডার বোতল ও শালপাতায় জড়ানো এত আদা, ছোলা নিয়ে একটা বেয়ারাও চলে এল।

তিনজন আর কোণার দিকে জালার মতন ভুঁড়ি নিয়ে সেই ভদ্রলোক, এ ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখা গেল না। প্রস্রাবের গন্ধ, অন্ধকার, ডালপালা ছড়ানো বিরাট একটা গাছ, এবং গাছের ফাঁকে নতুন আলপিনের মতন ঝকঝকে এক মুঠো তারা—এ সব কবিত্ব উপভোগ করে মদ খাবার মতন শৌখীন লোকের এখানে একান্ত অভাব বোঝা যাচ্ছিল। অথচ ভিতরে হলঘরে হই-চই হল্লার কমতি ছিল না। যেন মাঝে মধ্যে একটা দুটো মানুষ টলোমলো পায়ে ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা প্রস্রাবখানায় ঢুকে বেশ কিছুটা সময় লাগিয়ে হিসহিস শব্দ করার পর ওয়াক থু করে এতটা থুথুটুতু ছিটিয়ে তারপর আবার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। এখানকার এই অন্ধকার আসরের দিকে ভুল করেও কেউ তাকায় না।

'রিকশাওয়ালা ঠেলাওয়ালা, মুটে মজুর, আনাজের কারবারী, মাছের বেপারীদের ভিড় এই দোকানে, হট্টগোলটা এই জন্যই বেশি।'

'তুমি কি এদের ঘেন্না কর নন্দ!' ভাল করে একপাত্র পেটে না পড়তেই জগতের চোখ মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর চোখের মতন রক্তাভ হয়ে ওঠে। এই নিয়ে জগতের একটা চাপা গর্ব আছে। তা বলে অ্যাঞ্জেলোর মতন ছবি আঁকিয়ে সে হতে চায় না। উঁহু, অ্যাঞ্জেলো না, ডা ভিঞ্চি না, বত্তিচেলি না, টিশিয়ান না—অবন ঠাকুর বা যামিনী রায়, কেউ না—জগত মণ্ডল জগত মণ্ডলের মতন আঁকতে চায়। কোনো স্কুলের টিকেট তার গায়ে থাকবে এটা তার সহ্য হবে না। সে নিজেই একটা স্কুল, আর্টের ক্ষেত্রে কোনো নীতি কোনো ধারা কোনো ডগমা চালু থাকতে পারে, জগত মণ্ডল বিশ্বাস করে না। আজ যা হল আজকের মতই তা শেষ হয়ে গেল, কাল কি হবে সেটা কালকে বোঝা যাবে। একদিনের সূর্য ওঠার সঙ্গে আর একদিনের সূর্য ওঠার মিল খুঁজতে চাওয়ার পাগলামো জগতের নেই। প্রত্যেক দিনই নতুন করে সূর্য ওঠে। আকাশের রং মেঘের রং পর পর দুদিন, একরকম থাকে না। এক একদিনের উল্কাপাতের চেহারা এক এক রকম। এই শিল্প। আজ যেমন করে গোলাপ ফুটল কাল সেভাবে ফুটবে না, শত মাথা কুটলেও না। আজকের ফোটা আজকের শুকিয়ে যাওয়াতেই শেষ, কাল সকালে পাপড়ি খসার পালা। 'নন্দ, তুমি কি এদের ঘেন্না কর, মুটে মজুর ঠেলাওয়ালা ফেরিওয়ালাদের?' হাতের গেলাস নামিয়ে রেখে জগত আদা-নুন মুখে দিল।

'উঁহু।' নন্দ মাথা নাড়ল। 'এখন থেকে আমাকে জনগণেশের পুজো করতে হবে, তা না হলে আমি কল্কে পাব না।'

'গণতন্ত্র!' জগত বিড়বিড় করে উঠল। হাসল।

'তুমি হাসছ জগত, এদিকে আমার নাভিশ্বাস উঠেছে, সবাই মিলে আমায় কোণঠাসা করে দিচ্ছে, আমার আর বাঁচবার পথ থাকছে না।'

রামানন্দ হাঁ করে শুনছিল। হাসি হাসি মুখ করে জগত এদিকে ঘাড় ফেরাল। 'ভাল কথা, রামানন্দবাবু, আগে আপনাদের দুজনের পরিচয়টা করিয়ে দেই, হুঁ শ্রীনন্দলাল—না না, নন্দদুলাল, কেমন, পুরো নামটা তাই তুমি লিখছ না নন্দ?'

নন্দ ঘাড় কাত করল। কথা না বলে গেলাসে বড় করে চুমুক দিল।

'হুঁ, শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য', জগত গড়গড় করে বলে চলল, 'আধুনিক গল্পলেখক—হল না, বাংলা ছোট গল্পে নতুন রীতির পথিকৃৎ তো বটেই, সাম্প্রতিক ছোট গল্পের রূপকল্প সৃষ্টিতে যাঁর জুড়ি নেই; আর এই হলেন, এক নামে বাংলাদেশ যাঁকে চেনে, কবি রামানন্দ সেন, আধুনিক কবিতা বলতে সকলের আগে যাঁকে আমাদের মনে আসে—'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'আশ্চর্য, কতদিন ভেবেছি, কলকাতায় আছি, কবি রামানন্দ সেনও কলকাতায় থাকেন, অহরহ নামটা চোখে পড়ছে, কানেও শুনছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত মানুষটিকে চোখে দেখলাম না, মুখটা অপরিচিত থেকে গেল। ভাবলাম রামানন্দ বুঝি ডুমুরের ফুল।'

রামানন্দ হাসল।

'জগতবাবু এতক্ষণ নন্দ নন্দ করছিলেন, একবারও কিন্তু আমার মনে হয়নি, এই নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, আধুনিক গল্প লিখে বাংলাদেশকে যিনি বার বার চমকে দিয়েছেন। আজ আমার হাতের কাছে চাঁদ নেমে এল।'

'বেশ বেশ, এইবেলা দুজন সুস্থ হয়ে বসুন, গ্লাসের জিনিসটুকু শেষ করুন।'

জগত চোঁ করে হাতের গেলাস খালি করে ফেলল। পরস্পর পরিচিত হয়ে উৎসাহ যেমন তেমন, সৌজন্যটাই এখানে বড়, গেলাস হাতে রামানন্দ ও নন্দদুলাল দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

জগতের কথায় দুজন আবার বসল।

'হুঁ, কি বলছিলে নন্দ।' প্রথমবারের মতন এবারও জগতই তিনটা গেলাসে সমান করে মদ ঢেলে নিল, সোডা মেশাল। নতুন সিগারেট ধরাল। 'সবাই মিলে তোমায় কোণঠাসা করছে—সবাইটা কারা?'

'গোটা বাংলাদেশ, এখন রাজনীতি প্রবল, গণতন্ত্র শেষ কথা।'

'তারপর? কি চাইছে ওরা তোমার কাছে এখন? গণসাহিত্য?'

নন্দ গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'হুঁ, চাইছে অনেক কিছু, নিপীড়িত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত সংগ্রামশীল মানুষের জীবনস্পন্দন আমার লেখার মধ্যেই নেই, আমি নিজেকে নিয়েই অতিমাত্রায় ব্যস্ত, নিজের মন ছাড়া আর কোনো মানুষের মনের গভীরে ঢুকবার দায়দায়িত্ব আমি খুইয়েছি, কেবল নিজের আইডেনটিটি খুঁজে বেড়ানোর মধ্যে আমার যত উদ্যম, মনগড়া ভাষা নিয়ে, বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুগমানুষের ছাপ আমার লেখায় নেই, সাম্যবাদী সচেতনতা ছিটেফোঁটাও আমার মধ্যে তারা খুঁজে পাচ্ছে না, সাহিত্যের নামে ফ্যাণ্টাসীর রঙিন বুদবুদ ওড়ানোই আমার কাজ, আমি অমার্ক্সীয় অবৈজ্ঞানিক—ওদের ভাষায় সাহিত্য করতে বসে আমি ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া মানবতাবাদের পুজো করে চলেছি।'

'এইবার ঠ্যালা সামলাও।' মুখে মদ নিয়ে জগত কুলকুল করে হেসে উঠল। 'রামানন্দবাবু', রামানন্দর চোখের দিকে তাকাল না সে, মাথার ওপর অশ্বত্থের ছড়ানো ডালপালা দেখল। 'আপনাদের আধুনিক কবিতা নিয়েও কি এই সব দাবীদাওয়া হয়েছে?'

'বলতে পারব না, সাহিত্য আমি ছেড়ে দিয়েছি, অনেকদিন কবিতা লিখি না, কাজেই ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে—' বলতে বলতে রামানন্দ থেমে গেল।

'তা কি হয়, লিখতে আপনাকে হবেই—এক চুমুকে হাতের পাত্র শূন্য করে নন্দদুলাল কেমন করে জানি হাসল। 'আজ লেখা বন্ধ রেখেছেন, কাল সকালেই দেখবেন আপনার হাতের আঙুল আবার সুড়সুড় করছে—'

'হুঁ, করতেই হবে।' তিনটে গ্লাস এক সঙ্গে শেষ হয়ে যেতে জগত আবার মদ ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'বলে কিনা আজ একাদশীর উপোস চলেছে, কবিতা লেখা বন্ধ। কাল গলা পর্যন্ত ঠেসে কুল পাবেন না, রাত জেগে পাতার পর পাতা লিখেও রামানন্দবাবুর মনে হবে আরো কবিতা লিখি, আরো লিখি।' মদ ঢেলে শেষ

করে জগত হি-হি করে হাসল।

মানুষটা সত্যি রসিক। রামানন্দ না হেসে পারেন না।

'তা কবিতা গল্প নিয়ে যেমন—আপনাদের আঁকাটাকা নিয়ে তেমন কোনো আওয়াজ উঠছে না।' রামানন্দ চোখ ট্যারা করে মণ্ডলের মুখ দেখল।

'হুঁ, উঠবে বইকি, আজ না উঠলেও কাল উঠবে। বন্যা এলে কেবল কি বেগুন ক্ষেত, লংকা ক্ষেত ডোবে, উঠোনে জল ঢোকে, ঘরে ঢোকে. হেঁসেলে ঢোকে—কাঠ, ঘুঁটে. হাঁড়ি. কলসী, জুতো, খড়ম সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' তিনটা গ্লাসেই খানিকটা করে সোডার জল মিশিয়ে নিল জগত। 'তাতে আমার অসুবিধে হবে না কিছু, আপনার বা নন্দর মতন আমার তো কথার কারবার নেই, শব্দ নিয়ে নাড়া-চাড়া নেই যে. একটা কথা বেঠিক হলে দশ দিক থেকে দশটা কথা উঠবে. একটা শব্দ পট্‌কা হয়ে ছুটে এসে আমাকে নাস্তানাবুদ করে দেবে। আমার বোবা তুলি কেবল রঙ ছিটোতে জানে. বেশ তো, তাতেও যদি আপত্তি ওঠে. তখন না হয় সবুজ নীল ধুয়ে ফেলে টকটকে লাল রঙে তুলি ভিজিয়ে নেব, পাখি চাঁদ ফুলটুলের দিকে না ঝুঁকে লাঙল, বলদ, নৌকো, কোদাল, কুড়ুল আঁকাআঁকি করব।'

রামানন্দ শব্দ করে হাসল। নন্দ হাসল না।

'নন্দ ভায়ার মনের ভার কাটছে না। হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে দেখে ঘাবড়ে গেছে।'

'একটু ঘাবড়াতে হচ্ছে বইকি।' জগতের হাতের আগুন থেকে নন্দ সিগারেট ধরিয়ে নিল। 'হাওয়ার ঝোঁকটা হঠাৎ বেড়ে গেল কিনা, তাহলেও হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না. আমাকে লিখে খেয়ে বাঁচতে হবে. তা না হলে, তুমি জান জগত, ডি-লুক্স এম্পায়ার-এর সাদা ঘোড়া কালো হরিণের এমন প্রিয় আড্ডা ছেড়ে আজ ধেনো গিলতে কেন আমাকে এখানে ছুটে আসতে হল, ওখানে টাই-স্যুট বুট, মুর্গি মটন, ফিলটার টিপ্‌ড-এর দামী ধোঁয়া নিয়ে আসর গরম, কিন্তু ওদের নিয়ে গল্প লিখলে কাগজওয়ালারা এখন ভয়ানক নাক সিঁটকায়, বস্তা-পচা বুর্জোয়া সাহিত্য বলে লেখা ফিরিয়ে দেয়, বই করতে চাইলে পাবলিশাররা ছাপতে চায় না, সব্বাই চাইছে প্রগতি সাহিত্য, শ্রেণী সংগ্রাম, সর্বহারাদের নিয়ে তাজা রক্তঝরা লেখা।'

'ভাল করেছ নন্দ, বুদ্ধিমানের কাজ করেছ, এখানে জনগণেশের অবাধ বিচরণ। ছেঁড়া পা-জামা. ছেঁড়া লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি. খালি-পা, আদা-ছোলা. বিড়ির ধোঁয়ার এই বিরাট আসর ছেড়ে তোমার দূরে সরে থাকলে চলবে না. দুদিন আগে হোক পরে হোক, এখানে তোমাকে আসতেই হতো। তোমার কলমের জোর আছে. দেখার চোখ আছে, শোনার কান আছে। এখানে বসে প্রাণভরে ক'দিন টেনে যাও। গণ-সাহিত্য কব্জা করতে তোমার দুদিনের বেশি তিনদিন লাগবে না।'

'বটেই তো, বটেই তো, এমন যার গদ্যের ভাষা. এমন অনবদ্য যার স্টাইল—' রামানন্দ না, জগত্ না, তিনজন এক সঙ্গে চমকে উঠল. অন্ধকার কোণার সেই পাহাড় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এক পা এক পা করে কাছে এসে দাঁড়াল। 'নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।'

জগত রামানন্দর মুখ দেখল। রামানন্দ নন্দদুলালকে দেখল। নন্দদুলাল জগতকে দেখল. তারপর এক সঙ্গে তিনজন সেই বিরাট শরীরটার দিকে চোখ রাখল। রোমশ হাত দুটো জোড় করে তখনও বুকের কাছে ধরা। তিনজনকে পৃথক-ভাবে নমস্কার জানিয়ে একটা বিগলিত হাসি নিয়ে ঐরাবতের মতন মানুষটা মনে হচ্ছিল যেন প্রতিনমস্কারের অপেক্ষা করছে।

'মাতাল।' রামানন্দ বিড় বিড় করে উঠল। 'কি চাইছেন আপনি?' জগত রুক্ষ হয়ে উঠল।

'কিছু না, আপনাদের দেখছি।' তালশাঁসের মতন জোড়া থুঁতনি। আলোর

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বলে এতক্ষণের সেই অন্ধকার মুখ তিনজনই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। ভুরু দুটো দেখবার মতন। এক শ' মানুষের মধ্যে এমন ভুরু দেখা যায় না। যেন মাথার চুলের চেয়ে ভুরুর চুল বেশি। গায়ের রং কালো এবং শরীরটা প্রকাণ্ড বলে জুতোর বুরুশের মতন পুরু ভুরু দুটো যেন ওই মুখে মানিয়েছে বেশ।

'আপনি কোথায় থাকেন?' নন্দদুলাল ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল।

'আমি কলকাতায় থাকি।'

'ওখানে বসে খাচ্ছিলেন, এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন কেন?'

'দেখছি, কবি রামানন্দ সেনকে দেখছি, বিখ্যাত গল্পলেখক নন্দদুলাল ভট্টাচার্যকে দেখছি, শিল্পী জগত মণ্ডলকে দেখছি।'

তিনজন হঠাৎ চুপ করে গেল।

'এতকাল শুধু নাম শুনেছি, তিন প্রতিভার একসঙ্গে এক জায়গায় এভাবে মিলন দেখব, যেন এখনো নিজেব চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আজ আমার কী রাত্রি প্রভাত হয়েছিল! আমি ধন্য হয়ে গেলাম।' আলকাতরার মতন গায়ের রং অথচ দাঁতগুলি এত সাদা পরিচ্ছন্ন, এক শ' মানুষের মধ্যে এমন দাঁত দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

'বসুন, বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?' জগত আঙুল দিয়ে সামনের ফাঁকা বেঞ্চিটা দেখাল।

পাহাড়ের মতন শরীর নিয়ে মানুষটা বসল। বেঞ্চিটা ক্যাঁক করে উঠল।

'আপনার গেলাস পাঁইট ওখানে রয়ে গেল।' নন্দ সিগারেট বাড়িয়ে দিল।

'থাকুক গে, গেলাসে মাল নেই, বোতল খালি, সব শেষ করে এসেছি।'

'আর একটু খাবেন?'

'নিশ্চয় খাব, তিন গুণীর সঙ্গে একত্র বসে খাব বলেই তো এখানে উঠে এলাম। আজ আমার জীবন ধন্য।'

নন্দ নিজের হাতে দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে তার সিগারেটটা ধরিয়ে দিল।

'ধন্যবাদ, অ্যাঁ, খাব না! এখন নতুন করে আসর জমবে, দাঁড়ান—বেয়ারা বেয়ারা!' হেঁড়ে গলায় মানুষটা চেঁচিয়ে উঠল।

'বেয়ারাকে ডাকছেন কেন, এখানে মাল রয়ে গেছে, তার চেয়ে বরং—' রামানন্দ ওদিকের অন্ধকারে জলের ট্যাঙ্কের পাটাতনের ওপর ফেলে আসা তাঁর শূন্য গেলাসটার দিকে চোখ ফেরাতে নন্দদুলাল তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে সেটা নিয়ে এল।

'কী মুশকিল।' যেন বাংলাদেশের বিখ্যাত গল্পলেখক তাঁর এ'টো গেলাস হাত দিয়ে তুলে আনল দেখে মানুষটা বিব্রত হল, বিরক্তও হল খুব। 'আমি ওটা নিয়ে আসতে পারতাম, বেয়ারাকে ডাকলে বেয়ারা এনে দিত, তাছাড়া—দেখি।' জগতের হাঁটুর কাছে হাত বাড়িয়ে বোতলটা আলোর দিকে শূন্যে তুলে ধরে ভদ্রলোক এমন একটা চেহারা করল—'ফুঃ, আছে তো আর দু ফোঁটা মাত্র, পদ্মপত্রে ক' বিন্দু শিশির—এ দিয়ে পার্টি জমে কখনো—দাঁড়ান, বেয়ারা বেয়ারা—'

'বেয়ারাদের এখন পাবেন না।' রামানন্দ বিড় বিড় করে উঠল। 'পিক্ আওয়ার, খুব ব্যস্ত ওদিকে মনে হয়।'

'বটে! বকশিশের বেলায় শালারা খুব—'

আর এভাবে ডাকাডাকি করা কি অপেক্ষা করা ঠিক হবে না বুঝতে পেরে রাগে গজগজ করতে করতে পাহাড়ের মতন শরীরটা টেনে মানুষটা ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল।

'বেশ শাঁসালো মক্কেল মনে হয়।' নন্দদুলাল দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

'তাই তো মনে হয়, গুণী সংবর্ধনা করতে নিজেই মদ আনতে ছুটল, পার্টি দেবে বলে গেল না?' জগত হাসল।

'হুঁ।' জগতের দিকে চোখ তুলে রামানন্দ শব্দ না করে হাসল। 'গুণীদের দেখে খুব খুশি হয়েছে, একটু খরচপত্র করতে চাইছে।'

'বেশ ভাল হাতেই খরচ করবে দেখুন না!' নন্দদুলাল মাথা ঝাঁকাল।

'মনে হল পকেটে এখনো যথেষ্ট টাকা আছে।'

'কতক্ষণ বসে ওখানে খাচ্ছিল কে জানে?' অর্থাৎ জালার মতন ভুঁড়িটায় মহাপুরুষ কি পরিমাণ মাল ঢুকিয়েছে এবং কতটা মাতাল হয়েছে জগত যেন ঠিক আন্দাজ করতে পারছিল না। 'একটু শিক্ষিত বলে মনে হল, না রামানন্দবাবু?'

'মনে হয় বেশ ভালরকম শিক্ষিত।' রামানন্দর আগে নন্দ কথা বলল। 'আধুনিক গল্প, কবিতা সম্পর্কে বেশ খোঁজটোজ রাখে, তোমার আঁকা ছবি সম্পর্কেও খুব ইণ্টারেস্টেড মনে হল।'

'প্রফেসার?' রামানন্দ ভুরু কুঁচকোল।

'জানি না মশাই কোন্ হরিদাস পাল, আসুন ক' ফোঁটা শিশির বিন্দু আমরা শেষ করে ফেলি।' হেসে জগত বোতল উপুড় করে তিনটা গেলাসে একটু একটু করে বাকিটুকু ঢেলে নিল। 'গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের খাওয়াচ্ছে, ব্যস্, আর কিছু চাই না।.আমরা এতেই খুশি।'

'পাবলিশার কেউ হতে পারে।'

'হুঁ', নন্দর দিকে চোখ তুলে জগত বড় করে ভেংচি কাটল। 'সেই গুড়ে বালি ব্রাদার, সেই দিন বাসি হয়ে গেছে, ভেবেছ খরচপত্র করে মদ খাইয়ে খুশি করে তোমার একখানা পাণ্ডুলিপি চেয়ে নিয়ে বই করবে, তবেই হয়েছে আর কি, আপনি কী বলেন রামানন্দবাবু?'

রামানন্দ শব্দ না করে গেলাসের পানীয়টুকু শেষ করল।

লম্বা করে চুমুক দিয়ে জগতও হাতের পাত্র খালি করে ফেলল।

'হুঁ, সেসব ছিল যুদ্ধের ঠিক পরটায়, আমরা তখন স্বাধীনতা পেয়েছি, কালচারের ঠেলায় দেশ থইথই করছিল, রাতারাতি দুমদ্রাম সব পাবলিশার গজাতে লাগল, কেননা সরকারী খয়রাত পেয়ে রোজই নতুন লাইব্রেরী গজাচ্ছে, তখন সাহিত্যিকদের একটু ভালমন্দ খাইয়ে-দাইয়ে খাতির যত্ন করে পাবলিশারদের কেউ কেউ বইটই চেয়ে নিয়েছে—আজ তো শুনছি বইপাড়ায় মড়াকান্না শুরু হয়েছে, এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ—ঠিক কিনা রামানন্দবাবু, ওপাড়ায় তো আপনারও যাতায়াত আছে?'

'বইয়ের জগত থেকে আমি অনেক দূরে চলে গেছি জগতবাবু, বলেছি আপনাকে, আমি আর কিছু খোঁজখবর রাখি না।'

জগত কথাটা শুনেও শুনল না। নন্দদুলালের মুখটাই দেখছিল। 'বুঝলে নন্দ, এখন একটা দোকানে ঢুকলে এক কাপ চা পাও কিনা সন্দেহ—আমরা ছবি আঁকি, তোমাদের বইয়ের কভার-টভার করে দিতে হয়, কাজেই ও পাড়ার একটু খোঁজ-খবর রাখি বইকি।'

'তা হলে লোকটা কে?' হতাশ হয়ে নন্দদুলাল চোখ তুলে গাছের পাতা দেখছিল।

'হরিদাস পাল, যে-ই হোক, খাওয়াতে চাইছে খাব, এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—রামানন্দবাবু, মিথ্যা বললাম?' জগত রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাতে রামানন্দ গুজগুজ করে হাসল।

'মাল নিয়ে আদৌ আসে কিনা দেখুন—আমার তো মনে হয় মহাপুরুষ সট্‌কে

পড়েছে।'

'আশ্চর্যের কিছুই না, শুঁড়িখানায় এমন একটি দুটি চিজ হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়—এতক্ষণে হাতীটার ফিরে আস উচিত ছিল কিন্তু নন্দ!' যেন এই নিয়ে নন্দদুলালের সঙ্গে আর এক প্রস্থ রসিকতা করার ইচ্ছা হল জগতের। হঠাৎ থেমে গেল।

হাতীর মতন প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে থপ থপ পা ফেলে মানুষটা ফিরে এল। হাতে বোতল। পিছনে বেয়ারার হাতে সোডা ও এতবড় একটা ঠোঙ্গা। ঠোঙ্গার কাগজ ভিতর থেকে তেলে ভিজে উঠে এর মধ্যেই একটা কালচে দাগ ধরেছে। গরম কাটলেটের গন্ধ পাওয়া গেল।

'মশাই, আপনি দেখছি সত্যি একটা পার্টি লাগিয়ে দিলেন।' গাল ছড়িয়ে জগত হাসল।

॥ ১১ ॥

প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মানুষটা সাহিত্য করে। নাম ননীমাধব দত্ত। উপন্যাস লেখে। কিন্তু লেখে বললে কথাটা শেষ হয়ে গেল না। সাতখানা উপন্যাস বাজারে চালু আছে। উহুঁ, শখ করে ঘরের পয়সা খরচ করে বই ছাপানো না। ননীমাধব দত্তর পাবলিশার রয়েছে। হাতীবাগান বাজারের কাছে গ্রে-ষ্ট্রীটের মোড়ে প্রকাণ্ড দোকান। দোকানের মাথায় কতবড় সাইন বোর্ড! চণ্ডীমাতা পাবলিশিং হাউস। রামানন্দর চোখে পড়েনি? নন্দদুলালের চোখে পড়েনি?

জগত মণ্ডল তো সারা কলকাতা চষে বেড়ায়। কেবল ইডেন গার্ডেন গড়ের মাঠ মনুমেণ্ট হাওড়ার ব্রীজ বেলগাছিয়ার পোল কি গড়পাড় রোডের মোড়ের প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটা না, কলকাতা শহরের অগুণতি ফুটপাত, বাজার, দোকান, পার্ক, স্কুল, হাসপাতাল, ভিখিরি, রিকশা, ট্রাম, দমকল, অ্যাম্বুলেন্স, এমনকি চিৎপুরের দোকানে তবলা, বেহালা ঝুলছে, বড়বাজারে অন্ধকার চোরাগলির ভিতর কাটা কাপড়ের টুকরো বিক্রী হচ্ছে, বা কোথাও গাছতলায় রাস্তার সিমেণ্টের ওপর খড়িমাটি দিয়ে ষটচক্র এঁকে পাখির খাঁচাটি পাশে নিয়ে জ্যোতিষী বসে আছে, বা কোথায় আখমাড়ানি কলের চাকা ঘুরছে, স্কুলে যাবার পথে বই বগলে লোভী ছেলে সতৃষ্ণ চোখে একটা মানুষের ভাঁড়ে করে আখের রস খাওয়া দেখছে ইত্যাদি শয়ে শয়ে স্কেচ জগতকে ঘুরে ঘুরে করতে হয়। আর আজ পর্যন্ত কিনা হাতি-বাগান বাজারের কাছে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে চণ্ডীমাতা পাবলিশিং হাউসের এতবড় সাইনবোর্ডটা তার চোখে পড়ল!

বিশ্বাস করতে কেমন লাগে।

জগতের অনুতাপ হচ্ছিল।

তেমনি মন খারাপ করে কবি রামানন্দ সেন ও আধুনিক গল্পলেখক নন্দদুলাল ভট্টাচার্য ঔপন্যাসিক ননীমাধব দত্তর মুখটা খুঁটিয়ে দেখছিল। জুতোর বুরুশের মতন মোটা কালো কুচকুচে ভুরু, তালশাঁসের মতন পিটনো প্রশস্ত দু' ভাগ করা থুঁতনি, জালার মতন বিশাল ভুঁড়ি, চর্বি ঠাসা কাঁধ গর্দান।

তাই তো, রামানন্দর কবিতা, নন্দদুলালের গল্প এত ভাল পড়া আছে ননীমাধব দত্তর, প্রায় লাইন মুখস্থ বলতে পারে, আধুনিক চিত্রশিল্প সম্পর্কে কী ভয়ানক আগ্রহ, জগত কখন কোন্ ছবি এঁকেছিল, কবে তার প্রদর্শনী হয়েছিল—সব খোঁজ রাখে মানুষটা। আর তিনজনের একজনও কিনা ননীমাধবের একখানা বইও

পড়েনি। পড়েনি, এমনকি চোখেও দেখেনি। এর চেয়ে লজ্জার ও দুঃখের আর কী হতে পারে!

হুঁ, সাতখানা নভেল। চাট্টিখানি কথা! বাসর-প্রদীপ. প্রেমের পিঞ্জর, নতুন ঊষা, বিষের মালা, হৃদয়-সাহারা. ধান-ক্ষেতে-ঢেউ. রক্ত-ঝরা-ঘাম।

চোখ বুজে ননীমাধব নামগুলি বলে গেল। একটু সময় চুপ থাকল। তারপর হাসল।

'শেষের দুখানা বই—ধান-ক্ষেতে-ঢেউ ও রক্ত-ঝরা ঘামকে ঠিক প্রেমের উপন্যাস বলা যায় না, উপন্যাস ঠিকই. তবে একটু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের লেখা, বুঝলেন না. যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে তো।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' কটলেটে কামড় বসিয়ে জগত মাথা নাড়ল। 'খান, আপনার গ্লাস কিন্তু মোটেই খালি হচ্ছে না।'

'খাব, খাচ্ছি', ননীমাধব একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। 'আজ ভাই অনেক খাওয়া হয়েছে, সেই সন্ধ্যে থেকে একা বসে বসে টানছিলাম, তারপর তো আপনারা এলেন। আহা, আপনাদের দেখে কী আনন্দ যে হচ্ছে!'

'আমাদেরও কম আনন্দ হচ্ছে কি।' নন্দ না বলে পারল না। 'এতবড় একজন ঔপন্যাসিক—'

'না. না, একথা বলে লজ্জা দেবেন না, আপনাদের আধুনিকদের মতন ভাষার জেল্লাটা আমার নেই. এত নামধাম নেই. আমি অকপটেই স্বীকার করছি. আপনাদের যেমন পাঁচটা কাগজে লেখা ছাপা হয়. আধুনিক পত্র-পত্রিকাগুলো আপনাদের নিয়ে, বিশেষ করে পুজোর সময়, বড়দিনের সময় হইচই লুফালুফি করে—আমার বেলায় তো আর সেসব কিছু না, তবে হ্যাঁ. লিখছি, নিজের মনে সাধনা করে যাচ্ছি, এবং তার ফল যে না পাচ্ছি তা নয়।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়', রামানন্দ অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল। 'আপনার হল নীরব সাধনা, আর সেই সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে, কি বলেন জগতবাবু?'

'বলে কিনা সিদ্ধিলাভ. সাত সাতখানা উপন্যাস যাঁর বাজারে চালু, বুঝলেন ননীমাধববাবু'—জগতের চোখ লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু ননীমাধবের তুলনায় কিছুই না। ইতিমধ্যে চশমাটা খুলে ফেলে ননীমাধব পকেটে পুরেছে। পাটনাই পেঁয়াজের মতন লাল চোখ দুটো কী অসম্ভব দপদপ করছে। সেই লাল চোখের দিকে চোখ রেখে জগত হাসল। 'আধুনিকদের কথা বলছেন. এই আধুনিকদেরই মশাই আপনি এখন ঈর্ষার পাত্র।'

'হেঁ হেঁ—' ননীমাধব বিগলিত হয়ে উঠল। এক চুমুকে গেলাস খালি করে ফেলল। পকেট থেকে গন্ধমাখা সিল্কের রুমাল বের করে ঠোঁট মুছল। 'তবে কিনা একটা কথা বলব জগতবাবু।'

'বলুন. এই আসরে আপনিই বক্তা। আমরা শ্রোতা।' এবার রামানন্দ বোতল কাত করে চারটে গেলাসে ঢালল। জগত সোডা মেশাল।

রামানন্দ বলল, 'জগতবাবু ঠিকই বলেছেন, আপনি আমাদের ঈর্ষার পাত্র মশাই, আপনি বোধ করি খবর রাখেন না. এতকাল কবিতা লিখে এই আমি রামানন্দ সেন একখানা মোটে কবিতার বই ছাপতে পেরেছি। তা-ও আজ আট বছর পাবলিশারের ঘরে পড়ে আছে। উইয়ে খাচ্ছে, ইঁদুরে কাটছে। বিক্রী নেই। এডিশন নেই। আর এই যে নন্দদুলাল ভট্টাচার্য. নতুন রীতির গল্প লিখে বাংলাদেশকে বার বার চমকে দিচ্ছেন, যাঁকে নিয়ে পত্রপত্রিকা পুজোর সময়, এক্স্‌মাসের সময় হইচই করে নাচানাচি করে—আজ পর্যন্ত কোনো বেটা পাবলিশার এ'র একটা

গল্পের বই ছাপল না। বিশ্বাস করবেন?'

'কাজেই', নন্দদুলাল বলল, 'আপনি আমাদের কাছে রাজার মতন, হিমালয়ের মতন, সাহিত্যের কমলবনে আপনি হাতী, আমরা পিঁপড়ে।'

'না না, আপনাদের মতন আমার রগরগে ভাষা নেই, স্টাইলের জেল্লা নেই, একটু পুরোনো ঢঙের লেখা, তবে একটা কথা নন্দদুলালবাবু, আমার মতন অভিজ্ঞতা আপনাদের কারোর নেই, এই আমি জোর গলায় বলতে পারি।'

'ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতাটাই তো চোদ্দ আনা পুঁজি—গল্পটা না হলে দাঁড়াবে কিসের ওপর, আগে তো খড়মাটি, তারপর রঙের পোঁচ। আগে গল্প, তারপর ভাষা। স্টাইল টেকনিক।'

জগতের কথায় ননীমাধবের চওড়া ছাতি আরও চওড়া হয়ে উঠল। কেমন একটা উত্তেজনায় পেয়ে বসল মানুষটাকে।

'দাঁড়ান, আমি আর একটা বোতল নিয়ে আসি।'

'বসুন বসুন।' ননীমাধব উঠে যাচ্ছিল, নন্দদুলাল হাত চেপে ধরল। এদিকের টুলে রামানন্দ ও জগত যেমন পাশাপাশি বসেছে, তেমনি পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হতে নন্দদুলাল এধার থেকে উঠে গিয়ে উল্টোদিকের টুলে ননীমাধবের পাশে বসেছে। 'এখনো সিকি-ভাগ মাল রয়ে গেছে বোতলে। আগে এটুকু শেষ হোক।'

'ক' ফোঁটা শিশির বিন্দু। গণ্ডূষে সাবাড় হয়ে যাবে।' ননীমাধব গলা খুলে হাসল।

'যখন হবে—হবে। এখন আপনি স্থির হয়ে বসুন।' জগত বোতলের বাকি মদটুকু চারটে গেলাসে সমান ভাগ করে ঢেলে নিল। 'হুঁ, কী বলছিলেন, অভিজ্ঞতা। তাই তো, এই জন্যই না সাতখানা নভেল আপনার হাত দিয়ে বেরোল। আবার যখন আপনার নতুন বই হবে আমি কভার এঁকে দেব।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, পুজোর আগেই আর একখানা ছাড়ছি। আমি উমেশকে বলে রাখব, এবার নতুন আর্টিষ্ট অর্থাৎ মডার্ন ঢঙে যারা বইয়ের প্রচ্ছদ-টচ্ছদ করেন তেমন একজনকে দিয়ে আমার বইয়ের মলাট আঁকাব—উহুঁ, আমার কথা ঠেলতে পারবে না উমেশ, এখন চণ্ডীমাতার সে-ই সব দেখাশোনা করে, প্রোপ্রাইটার জনার্দনবাবুর মেজো ছেলে, চমৎকার অমায়িক লোক, আমার সঙ্গে রীতিমত ইয়ে-টিয়ে চলে।' ননীমাধব হাতেব গেলাসটা তুলে দেখাল।

'আপনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন!' নন্দদুলাল প্রশ্ন করল। মানুষটার অভিজ্ঞতার ধরনটা জানতে সে উসখুস করছিল।

'অনেক—বিহার, ওড়িশা, মাদ্রাজ, বোম্বাই—ওদিকে আসাম, মণিপুর—ব্যবসার খাতিরে দু' তিন মাস অন্তর একবার করে বেরোতে হয়।'

তিনজন চুপ। ব্যবসার কথাটা আগেই শোনা হয়ে গেছে। বৈঠকখানা বাজারে এই মদের দোকানের পিছনেই ননীমাধব দত্তর প্রকাণ্ড আলুর আড়ৎ। সারা দিন আলু নিয়ে কারবার। রাত্রে আলো জেবলে জেগে জেগে উপন্যাস লেখা। আবার লেখার ফাঁকে ফাঁকে পড়া। আধুনিক গল্প, কবিতা খুব ভাল লাগে। আধুনিক শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখার নেশাও কম না। 'লেখার ধাঁচটা পুরোনো, কিন্তু মনটা আমার আধুনিক, বুঝলেন, সেদিক থেকে যে আমি পিছিয়ে আছি তা নয়।'

'না, তা কেন থাকবেন। আপনার কথাবার্তা শুনেই তো বোঝা যাচ্ছে, মনের দিক থেকে আপনি অনেক এগিয়ে আছেন।'

'তাই তো', নন্দর সঙ্গে জগত গলা মেলাল, 'এই মন আর আপনার বিপুল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, দু' মাস, তিন মাস পর পর বোম্বাই, বিহার, আসাম, মণিপুর টুর দেওয়া—ইয়ার্কি, এত মানুষ দেখা, এত জায়গা ঘোরা, তার ওপর কোনোরকম

হই-হট্টগোলের মধ্যে না গিয়ে নীরবে সাহিত্য সাধনা—আপনাকে মশাই মারে কে—আমার তো মনে হয়, মনে হয়—'

'হেম মজুমদার টজুমদারকে আপনি পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন।' জগত উপযুক্ত কথাটা খুঁজে পাচ্ছিল না, রামানন্দ ধরিয়ে দিল।

'হেম মজুমদারটা কে?' ননীমাধব সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।

'অ, হেম মজুমদারের নাম শোনেননি।' জগত অল্প শব্দ করে হাসল, রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'রামানন্দবাবু, ননীমাধববাবু হেম মজুমদারের নামই শোনেননি।'

'অস্বাভাবিক কিছু না। হেম মজুমদার এমন কিছু একটা মহাপুরুষ না যে পৃথিবীর সবাই তার নাম শুনবে কি নামটা মনে রাখবে।'

'আহা, তাহলেও তো লোকটা আকাদমী পুরস্কার পেয়েছে। চৌদ্দটা বড় ও ছাব্বিশখানা ছোট উপন্যাস লিখেছে—কাজেই—'

জগতের কথা মাঝখানে থেমে গেল। ননীমাধব দত্ত জোরে শব্দ করে হেসে উঠল। 'এখন বুঝেছি, এখন মনে পড়েছে—দেখুন হঠাৎ কেমন খটকায় পড়ে গিয়েছিলাম, রামরাম মজুমদার, মানে আমার বড় শালা, পোস্তায় মশলার দোকান যার, মজুমদার বলতে তার সঙ্গে নামটা গুলিয়ে ফেলেছিলাম, হুঁ, এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, হেম মজুমদার, বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক, হালে পুরস্কার পেয়েছেন—'

'কিচ্ছু ক্ষতি ছিল না', অভয় দেওয়ার মতন গলার সুর করে রামানন্দ বলল, 'কোনো ক্ষতি হবে না, আপনি যদি ওই নামটা ভুলে থাকেন কি আদৌ নামটা না শোনেন। পাক না পুরস্কার, আমি তাকে পোস্তার একজন মশলা ব্যবসায়ীর চেয়ে বড় মনে করি না।'

'ঠিক কথা।' এবার নন্দদুলাল মাথা ঝাঁকাল। 'আমি হেম মজুমদারের একটা বইও পড়িনি। আমি মনে করি, ও বেটা লেখকই নয়—শুনেছি বিলিতি বইয়ের চ্যাপ্টার চুরি করে নিজের উপন্যাসে ঢুকিয়ে দেয়—'

'ছি ছি, এটা ঠিক না'। ননীমাধব নাক সিঁটকবার মতন চেহারা করল। 'বলে কিনা নিজের জিনিসই এত দেবার থাকে, নিজের কথাই এত বলার আছে, বিদেশী বই থেকে চুরি করার কিছু দরকার পড়ে! কি জানি বাবা, আমি তো ভাবতেই পারি না, আর একজনের লেখা চুরি করে কি ধার করে কেমন করে নিজের বইয়ে সেটা ঢোকান যায়—তবে আর তোমার সৃষ্টির মৌলিকত্ব কোথায় রইল, সৌন্দর্যই বা থাকে কেমন করে—'

'তাই তো বলছি মশাই', গলার স্বর যতটা পারা যায় গম্ভীর করে তুলল জগত। 'আপনি আপনার সৃষ্টির মৌলিকত্ব নিয়ে চালিয়ে যান।' বলার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য বোতলটা বেঞ্চির ওপর দু'বার জোরে ঠুকল। উদ্দেশ্য, আর এক ফোঁটাও মাল নেই সেদিকে ননীমাধবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 'হুঁ, চালিয়ে যান, হেম মজুমদার আপনার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। বানের জল হয়ে যেমন বাংলা সাহিত্যে ঢুকেছে, তেমনি বানের জল হয়ে একদিন বেরিয়ে যাবে। মজুমদার আকাদমী পুরস্কার পেয়েছে—আপনি তার চেয়ে ঢের বড় পুরস্কার পাবেন, জ্ঞানপীঠ পাবেন।'

'কেন, নোবেল পুরস্কার পেতে ক্ষতি কি। চোখ ঘুরিয়ে রামানন্দ বলল, 'যদি তেমন কাউকে দিয়ে এঁর একটা বই—ওই যে বললেন প্রেমের পিঞ্জর, নাকি ধানক্ষেতে-ঢেউ—কোন্‌টা আপনার মতে শ্রেষ্ঠ?'

'দুটোই ভাল বই, দুটোই দু' দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। একটায় আছে প্রেমের ট্র্যাজেডী, দুটি যুবক-যুবতীর হৃদয়-রহস্য নিয়ে লেখা, আর একটা সাম্যবাদী উপন্যাস,

বাংলার চাষীদের জীবনের ট্র্যাজেডীর চিত্র তুলে ধরেছি।' এত মদ খাওয়ার পরেও ননীমাধব মেয়েছেলের মতন সলজ্জ ভঙ্গী করে হাসল।

'না, না, ওয়েষ্টের ব্যাপার, বোঝেন তো', রামানন্দ একটা হাত শূন্যে তুলে দিল। 'সাম্যটাম্য নোবেল কমিটির পছন্দ না-ও হতে পারে, বরং ঐ প্রেমের পিঞ্জরখানাই কোনো ভাল লোককে দিয়ে ইংরেজী তর্জমা করে পাঠান—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—'

'দাঁড়ান, এভাবে জমছে না, মাল ফুরিয়ে গেছে, আর একটা বোতল নিয়ে আসি।'

ননীমাধব ভিতরে ছুটে গেল। নন্দদুলাল হাসতে হাসতে বেঞ্চির ওপর ভেঙ্গে পড়ল।

'অনেক দিন এমন বাণিজ্য করে সুরাপান করা হয়নি।' জগত উল্টোদিকের বেঞ্চির ওপর প্রায় নন্দদুলালের পিঠের কাছে একটা পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসল।

রামানন্দ শব্দ না করে সিগারেট ধরাল।

'আমরা কিন্তু সহজে মাতাল হই না।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'তার মানে আমরা এ যুগের মানুষ, এক সঙ্গে অনেক বেশি খেয়ে আগের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি নর্ম্যাল থাকতে পারি।'

পানের দোকানের সামনে আরশির ভিতর মুখ দেখতে দেখতে চারজন গল্প করছিল। আরশির ভিতর একজন আর একজনকে দেখে কথা বলছিল। এখন আর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা না, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ গভীর বিষয়ে তারা চলে এসেছে। রামানন্দ পান খায় না, শুধু সিগারেট টানছে. জগত বেনারসের লালপাতি জর্দা সহযোগে ডবল খিলি পান মুখে তুলেছে। নন্দদুলাল পান সিগারেট কোনোটাই খাচ্ছে না, দোকানীর কাছ থেকে সুপুরী চেয়ে নিয়ে চিবোচ্ছে। ননীমাধব দত্ত পানও চিবোচ্ছে, সিগারেটও ফুঁকছে।

'এ যুগের মানুষ বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন', জগত আরশির ভিতর ননী-মাধবের চোখ দুটো দেখল। 'আপনার কথা শুনে মনে হয় এই আমলে মদের আর জোর নেই, সব জলো হয়ে গেছে, তার মানে এখন ওরা মালের সঙ্গে অনেক বেশি জল মেশাচ্ছে, যার জন্য অনেক বেশি খেয়েও আমরা শক্ত স্বাভাবিক নর্ম্যাল থাকতে পারি, এই তো?'

'না', ননীমাধব সজোরে মাথা ঝাঁকাল। মাল ঠিকই আছে, খামকা ওদের দোষ দেব কেন, তবে কোনো কোনো জায়গায় সময় বিশেষে ছিপি খুলে যে এক-আধটু জল ঢালাঢালি না হয় তা নয়—আমার কথা সেটা না, আমার বক্তব্য, আমরা আগেব কালের মানুষের চেয়ে পরিমাণে ঢের বেশি খেয়ে ষ্ট্যান্ড করতে পারি, মাতলামি করি না। হুঁশ রেখে চলি।'

'তা হলে তো আপনি যাকে বলে, জেনারেশনের কথা তুলছেন মশাই।' আরশির ভিতর রামানন্দর থুঁতনি নড়ে উঠল। 'এই আমল সেই আমল, এই যুগ সেই যুগ?'

'হুঁ, তাই তো।' ননীমাধবের মুখ মাথা একসঙ্গে নড়ে উঠল। ঠোঁটের সিগারেট নড়ে উঠল।

আরশির ভিতর জগত রামানন্দর সঙ্গে চোখ টেপাটেপি করল।

'তা হলে আপনি বলতে চাইছেন, আপনার বাপ কাকারা সহজেই মাতাল হয়ে পড়ত, মানে একটুখানি গলায় ঢেলে রাস্তায় গড়াগড়ি।'

রামানন্দ এমন ভঙ্গি করে কথা বলল, জগত চট করে আরশি থেকে মুখটা সরিয়ে নিল। নন্দদুলাল মুখ সরাল না, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখল, তাতে বিশেষ কাজ হল না যদিও, ভিতরের হাসির ধাক্কায় তার দু' গাল ফুলে উঠল, নাকের বাঁশী ফেঁপে উঠল।

ননীমাধব এসব গ্রাহ্য করল না।

'আমার বাপ কাকা, আপনার বাপ কাকা, জগতবাবুর বাপ কাকা, নন্দবাবুর বাপ কাকা সকলের কথাই হচ্ছে মশাই।' কটমট চোখ করে ননীমাধব রামানন্দকে দেখল। 'এই যেমন এখন আমরা চারজন চার-চারটে বোতল শেষ করে দোকান থেকে বেরিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে ভদ্রভাবে স্বাভাবিক গলায় চমৎকার ডিসেন্সি বজায় রেখে কথাবার্তা বলছি, উঁহু, আপনাদের বাপ কাকাদের আমলে কিছুতেই তা হতো না, এই পানের দোকানের সামনে রাস্তার ওপর তারা হইচই বাধিয়ে দিত। অথচ আমরা এত ড্রিঙ্ক করে এসেছি, রাস্তার মানুষ প্রায় টেরই পাচ্ছে না, কেমন হে হরিহর।' পানের দোকানের হরিহরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল ননীমাধব, 'আমরা যে মদ খেয়েছি কিছু বোঝা যাচ্ছে!'

হরিহর দাঁত ছড়িয়ে হাসল। মাথা নাড়ল।

'দেখলেন জগতবাবু!' ননীমাধব আরশির দিকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'না বললে হরিহরও কিছু টের পেত না এই মাত্র আমরা আকণ্ঠ সুরাপান করে দোকান থেকে বেরিয়েছি।'

এ পাড়ায় হরিহরের দোকান অনেক দিনের, একেবারে কাছেই ননীমাধবের আলুর আড়ত।

দু'জনের পরিচয়টা গভীর। ননীমাধবের মাতলামির ধরনটা কেমন, হরিহরের অজানা ছিল না। হয়তো এই জন্যই কথা বলার আগে সব ক'টা দাঁত বের করে হাসল। এই হাসির অর্থ জগত, রামানন্দ ও নন্দদুলাল বুঝল।

'কিন্তু সেকথা হচ্ছে না।' রামানন্দ মোটেই হাসল না। বরং হঠাৎ হাতের মুঠো পাকিয়ে তুলল। 'আপনার বাপ কাকা মদ খেতে পারে, বুঝেছেন, আমার বাবা কাকারা কেউ এই জিনিস স্পর্শ করত না।'

'আহা, একটা কথার কথা!' রামানন্দর রকম-সকম দেখে ননীমাধব একটু ঘাবড়ে গেল। 'মানে বাপ কাকা বলতে আমি এই যুগ আর সেই যুগ—দুটো আলাদা যুগকে বোঝাচ্ছিলাম।'

'যা-ই বোঝান না কেন, হুট করে আমার বাবা কাকাকে টেনে আনা আপনার আদৌ ঠিক হয়নি। এদিকে বলছেন সাহিত্য করেন, উপন্যাস লেখেন, কথাবার্তা ছোটলোকের মতন।'

'যাক গে রামানন্দবাবু—', হিউমারটা নষ্ট হচ্ছে, রামানন্দ একটু রগচটা মানুষ, বুঝতে পেরে জগত মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চেষ্টা করল। 'আপনার সেণ্টিমেণ্টে লেগেছে—ভদ্রলোক এতটা বুঝতে পারেননি—'

'না বুঝে এমন বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বের করা ঠিক হয়নি। নিজের বাপ কাকা মদ খেয়ে নর্দমায় গড়াত বলে আর সব মানুষের বাবা কাকাও তাই করত, এই ধারণা উনি পোষণ করেন কি করে সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য।'

'তা কারো কারো বাবা-কাকা মদ খেত বইকি।' ব্যাপারটা লঘু করবার জন্য জগত শব্দ করে হাসল। 'আমার বাবা মদ খেত না, কিন্তু কাকা খেত, রোজ খেত। নন্দ, তোমার?'

'আমার বাবা গাঁজার ভক্ত ছিল। ডাক্তার মানুষ, বেশ ভাল পসার জমিয়েছিল। গাঁজা টেনে বাছাধন পসারটা নষ্ট করে দিল।'

'আমার বড়কাকা মদ খেত না। মেজোকাকা খেত। একদিন তো বড়কাকা রেগে গিয়ে মেজোকাকার হাতের বোতল কেড়ে নিয়ে সেটা তার মাথায় ছুঁড়ে মারল।'

'মাথাটা ফেটে গেল নিশ্চয়?'

জগত মাথা ঝাঁকিয়ে টেনে টেনে হাসল।

'মাথা ফাটেনি। বোতলটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।'

'বাপ!' নন্দর চোখ গোল হয়ে গেল। 'তবে তো দেখা যাচ্ছে তোমার কাকার মাথাটা বোতলের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত ছিল হে?'

'হুঁ, তাই তো', জগত চোখ ট্যারা করে ননীমাধবকে দেখল। 'যেমন ইনি এই-মাত্র বলছিলেন মদের চেয়ে এখন আমাদের এই যুগের মানুষের পেট ও লিভারের তেজ বেশি, ক্ষমতা বেশি। তাই না ননীমাধববাবু!'

কিন্তু ননীমাধব আর কথা বলছিল না। গম্ভীর হয়ে রামানন্দকে দেখছিল।

'রামানন্দবাবু!' জগত ডাকল, 'চলুন আমরা এগোই, রিকশা, ট্যাক্সি যা-হোক একটা ধরতে হবে।'

রামানন্দ স্থির নির্বিকার। যেন জগতের কথা কানে গেল না, বা কানে গেলেও তা গ্রাহ্য করল না। লাল ফোলা ফোলা চোখে ক্রমাগত ননীমাধবকে দেখছে। জগতের কাছে ব্যাপারটা সুবিধের মনে হল না, জগতের পাশে দাঁড়িয়ে নন্দও একটা কিছু আশঙ্কা করছিল। রামানন্দর সঙ্গে তাদের মেলামেশা ছিল না। জগতের সঙ্গে একদিনই শুধু কবির পরিচয় হয়েছিল এবং পরিচয়টা কী সাংঘাতিক অপ্রীতিকর অবস্থাব মধ্যে দিয়ে ঘটেছিল। সেই দমদম রেল লাইনের ধারে রামানন্দর মতন জগতও হাওয়া খেতে গিয়েছিল। হঠাৎ গুণ্ডা ভেবে রামানন্দ যেমন করে জগতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। এখন ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে রামানন্দর সেই ভয়ংকর মূর্তি দেখে জগতের মনের অবস্থা কী হয়েছিল! এমনি হাসিখুশি, চেহারার দিক থেকেও মানুষটা বেশ সৌম্যদর্শন এবং কথাবার্তার মধ্যেও একটা চমৎকার সরলতা রয়েছে। আসলে রামানন্দ যে রগচটা লোক, সহজেই মাথা গরম করে ফেলে, জগত সেটা প্রথম দিনই বুঝে গিয়েছিল।

'কি হল, রামানন্দবাবু, চলুন, আমরা এগোই', জগত আর একবার ডাকল, সেই সঙ্গে সে ননীমাধবকেও দেখল। 'কি মশাই, আপনি কোন্‌দিকে যাবেন, আড়তে ফিরে যাচ্ছেন, না কি আর কোথাও—'

রামানন্দ যেমন জগতের দিকে তাকাচ্ছিল না, তার কথা শুনছিল না, একদৃষ্টে কেবল ননীমাধবকে দেখছে, তেমনি ননীমাধবও রামানন্দকে দেখছে, অন্য কোনো-দিকে চোখ ফেরাচ্ছে না, যেন জগতের কথায় আর কান দেবার সময়ই পাচ্ছে না।

নন্দদুলালের হাতে লুকিয়ে চিমটি কাটল জগত।

'এখনই না ঘুষাঘুষি শুরু হয়!' ফিসফিসিয়ে বলল সে।

'হোক না, ক্ষতি কি।' নন্দদুলাল চাপা গলায় হাসল। 'এত খাওয়া-দাওয়া করলাম, চারজনে চারটে বোতল কম কি, আড়তদার তো সন্ধ্যে থেকে বসে টানছিল, অথচ লোকে একটু টের পাবে না, এটাই বা কেমন কথা।'

'তাই তো।' জগত আর আস্তে বলল না। 'খেলাম আর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম, রাস্তার মাছিটিও বুঝতে পারল না যে আমরা মদ খেয়েছি—এতে আনন্দ থাকে না। তবু একটু ঘুষাঘুষি করলে লোকে টের পাবে যে বাবুদের পেটে জিনিস পড়েছে, বাবুদের নেশা হয়েছে। ঠিকই বলেছ নন্দ—মদ খাওয়ার ষোল আনা আনন্দ পেতে হলে—'

জগতের কথা থেমে গেল। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল ননীমাধব দত্ত। রামানন্দর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হু হু করে কেঁদে উঠল।

নন্দ শুনল, জগত শুনল, পানের দোকানের হরিহর এবং রাস্তার ওপর কলা, বেগুন, ঝিঙের দোকান সাজিয়ে বসেছিল মানুষগুলি—সবাই শুনল ননীমাধবের বুক-ফাটা কান্না। শুনল এবং হাঁ করে তাকিয়ে থেকে তারা দৃশ্যটা উপভোগ করল।

রামানন্দর পা দুটো আঁকড়ে ধরে ননীমাধব ক্রমাগত ককাচ্ছে। 'আমায় ক্ষমা করুন কবি, আমায় ক্ষমা করুন, আমি না বুঝে আপনার মনে কষ্ট দিয়েছি, মাইরি, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত, জ্ঞানী, গুণী। আপনার বাবা-কাকা কোনোদিন সুরা স্পর্শ করেননি। তাঁরা পুণ্যাত্মা ছিলেন, মহাপুরুষ ছিলেন। আমার বাবা-কাকার মতন পাপী ছিলেন না। আমার বাবা-কাকা মদে বেশ্যায় লেপা-লেপি হয়ে থাকত। বাবা মরেছে লিভার পচে, কাকা মরেছে সিফিলিসের বিষে।'

জগত নন্দর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপল। নন্দও হাসল।

'থাক হয়েছে', জগত নুয়ে ননীমাধবের হাত ধরে টেনে তুলল। 'ক্ষমা চেয়েছেন যখন আর কি, রামানন্দবাবু আপনাকে ক্ষমা করেছেন, এইবেলা উঠুন।'

ননীমাধব তখনও হাউ হাউ করে কাঁদছে। তার পাঞ্জাবিতে ধুলো, কপালে নাকের ডগায় ধুলো। চারপাশের মানুষগুলি আড়তদারের অবস্থা দেখে চাপা গলায় হাসছে। অতিরিক্ত মদ খেলে আড়তদার যে এমন কান্নাকাটি করে তাদের কারো অজানা ছিল না। আজ তিনটি অচেনা বাবু সঙ্গে রয়েছে দেখে তারা যেমন অবাক হচ্ছিল তেমনি মজাটাও অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি উপভোগ করছিল।

'হুঁ, আর কাঁদবেন না ননীবাবু, ওপাশ থেকে একজন সান্ত্বনা দিল, 'বাবু আপনাকে ক্ষমা করেছেন।'

'হুঁ', আর একজনও সহানুভূতির গলায় বলল, 'বাবু খুব ভদ্দরলোক, আপনাকে তো আর কিছু বলছেন না, এখন আপনি আপনার আড়তে ফিরে যান।'

মানুষগুলি জগত এবং নন্দকে যত না দেখছিল, রামানন্দকেই বেশি করে খুঁটিয়ে দেখছিল। রামানন্দ কিন্তু অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে তখনও কটমট করে ননীমাধবকে দেখছে। 'আপনি ননীমাধববাবুকে একবার মুখে বলুন যে ক্ষমা করেছেন।' একজন রামানন্দর দিকে এক পা এগিয়ে গেল। মানুষটি কে সেদিকে চোখ না ফিরিয়ে রামানন্দ গম্ভীর গলায় চিৎকার করে উঠল।

'কাল আবার আমি এই দোকানে মদ খেতে আসব, দেখি যদি আমার বাবা কাকাকে নিয়ে কেউ কথা বলে, আমি ঠিক ঘুষি মেরে নাকের বাঁশী ফাটিয়ে দেব।'

'না না, আর কেউ কিছু আপনাদের বলবে না। এ পাড়ার দোকান। আমরা তো এখানেই আছি। আপনারা আসবেন, বসে খাবেন। আসলে ননীবাবু মানুষটা ভালই। তবে কিনা পেটে একটু বেশি পড়লে মুখ দিয়ে বেফাঁস একটা দুটো কথা বেরিয়ে পড়ে। তা তিনি ক্ষমা চাইছেন, কথাটা বলে তাঁর মনে দুঃখই হয়েছে। উঁহু, আর কেউ কিছু আপনাদের বলবে না। আপনারা বাবুরা অন্য পাড়া থেকে বৈঠকখানার দোকানে ড্রিঙ্ক করতে আসেন, আপনাদের কেউ অপমান করলে আমরা চুপ করে বসে থাকব নাকি!'

প্রায় চার-পাঁচজন আনাজ বেপারী ফল বেপারী একসঙ্গে কথা বলে উঠল।

'বাস্, তবে আর কি চাই।' জগত এবার রামানন্দর হাত ধরল। 'চলুন রাত হয়েছে, কাল আবার এই দোকানে এসে আমরা আসর গরম করব। কেউ আর বাপ-কাকা নিয়ে কথা বলবে না।'

নন্দ ও জগতের সঙ্গে রামানন্দ হাঁটতে আরম্ভ করেছিল, ননীমাধব বাধা দিল।

'এক মিনিট স্যার।' নন্দর মতন রামানন্দও অবাক হয়ে দেখল জামার হাতায় চোখ মুছে নিয়ে ননীমাধব বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। 'আপনাদের সিগারেট ফুরিয়ে গেছে—আমি সিগারেট কিনে দিচ্ছি।' ননীমাধব হাসছিল এবার।

'হু্ঁ, তাই দিন।' নন্দ তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল। 'আমাদের সিগারেট শেষ হয়ে গেছে মনেই ছিল না।'

'আমি দিচ্ছি, আমি কিনে দেবো আপনাদের সিগারেট, ঘাবড়াচ্ছেন কেন।' জালার মতন ভুঁড়িটা বাগিয়ে ননীমাধব হরিহরের দোকানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'এই শালা হরিহর, তিন প্যাকেট ফিলটার টিপড্—'

গালাগাল খেয়ে হরিহর রাগ করে না। বরং ঘাড় গুঁজে হাসে।

'নিন সিগারেট।'

কিন্তু হঠাৎ ননীমাধবের ভাবান্তর উপস্থিত হল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতটা তুলে আনল। যেন একটা গভীর কিছু চিন্তা করছে। পেঁয়াজের মতন লাল টক-টকে চোখ দুটো হরিহরের মুখের দিকে মেলে ধরে চুপ করে আছে।

'কি হল মশাই, সিগারেট নিন।' জগত হেঁকে উঠল।

'হুঁ, নেব।' জগতের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ননীমাধব আবার পকেটে হাত ঢোকাল। একটা পকেট খুঁজল। তারপব জামার বুক পকেট দেখল। ভিতরের দিকের পকেট খুঁজল।

নন্দদুলাল গাল ছড়িয়ে হাসল।

'কি হল, পকেট মেরেছে?'

'হুঁ, না না।' ননীমাধব পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলল। 'টাকাকড়ি ঠিকই আছে—'

'তবে মেরেছেটা কী?'

'ঘড়িটা ছিল, ওটা মেরে দিয়েছে।'

'অ্যাঁ!' পিছন থেকে চার পাঁচজন একসঙ্গে চমকে উঠল। 'আপনার রিস্ট-ওয়াচ?'

ননীমাধব মাথা ঝাঁকাল।

'স্প্রীং কেটে গিয়েছিল। পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম মাল খেয়ে বিনোদের দোকানে গিয়ে সারিয়ে আনব।'

'এই সেরেছে!' আবার এক সঙ্গে চার-পাঁচটা গলা কথা কয়ে উঠল। 'তবে তো মদের দোকানেই আপনার ঘড়িটা গেছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' ননীমাধব বিড়বিড় করে উঠল ও সেই সঙ্গে একবার জগতের মুখ একবার নন্দদুলালের মুখ এবং পরে রামানন্দর মুখের দিকে তাকাল।

'কি মশাই, আমাদের সন্দেহ করছেন নাকি!' রামানন্দ ভেংচি কাটার মতন চেহাবা করল। 'আমাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছিলেন বলে?'

'আহা, তিনি তো সেকথা বলেননি!' রামানন্দ আবার গরম হয়ে উঠছে দেখে জগত তাকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল। 'তিনি তো অনেক আগে থেকেই বাইরে প্রস্রাবখানার কাছে অন্ধকারে বসে বসে টানছিলেন। কেমন না ননীমাধববাবু!'

ননীমাধব গুম হয়ে রইল।

'কি মশাই, কথা বলছেন না কেন।' রামানন্দ ধমক লাগাল।

'হুঁ, আমাদের সঙ্গে শেষের দিকে বসে খাচ্ছিলেন ঠিকই।' নন্দদুলাল তৎক্ষণাৎ ফলের বেপারী আনাজের বেপারীদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'কিন্তু খেতে খেতে আমরা বারণ করলাম ভদ্দরলোককে, বেয়ারাদের একজনকে ডাকলেই এনে দিত, উহুঁ, তিনি নিজে ছুটে গেলেন বোতল আনতে, একবার না, দু'বার করে গেলেন, এই সময়টায় কাউণ্টারে কেমন ভিড়খানা থাকে আপনারা তো জানেন দাদা।'

'জানি, খুব জানি।' পাঁচটা মানুষ এক সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। 'তবে তো আর কথাই নেই, তবে তো হয়েছেই, চোর ছ্যাঁচোড় গুণ্ডা বদমাস সব ঐ এক ঘাটে জল খেতে আসে। বউবাজারের দোকান আমরা চিনি না!'

'আপনি তো আচ্ছা মানুষ ননীবাবু, এতকাল এখানে এসে খাচ্ছেন!' একজন অভিযোগের সুরে বলল, 'এই ভিড়ের মধ্যে ঘড়ি পকেটে রেখে মাল কিনছিলেন? আনাড়ী মানুষ নতুন কেউ হলে তবু কথা ছিল।'

'থাক থাক, আমার ঘড়ির জন্য তোমাদের কাউকে কান্নাকাটি করতে হবে না।' যেন আনাড়ী শব্দটা শুনে ননীমাধব চটে গেল। 'আমারটা গেছে সে আমি দেখব। এই শালা হরিহর, সিগারেট দিবি!'

'এই তো তখন থেকে আপনার সিগারেট হাতে নিয়ে বসে আছি, নিন।' হরিহর কিন্তু তখনও ঘাড় গুঁজে হাসছিল।

'অ্যাঁ, তুই হাসছিস! আমার পকেট মারা গেছে আর তোর খুব আহ্লাদ হয়েছে —কেমন রে শালা, এই জীবনে ক'টা ঘড়ি চোখে দেখেছিস, ক'টা ঘড়ি হাতে পরেছিস শুনি?' একটা পাঁচ টাকার নোট হরিহরের নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ননীমাধব দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। 'ঘড়ি গেছে, কাল সকালেই দেখবি আমার হাতে নতুন ঘড়ি। তোর মতন পুঁটি মাছের পরাণ নিয়ে ননীমাধব বৈঠকখানায় আলুর আড়ত খুলেছে, পুঁটি মাছের আত্মা নিয়ে বৈঠকখানার দোকানে মদ খেতে ঢোকে!'

'খুব খাঁটি কথা।' পিছন থেকে গলা বাড়িয়ে একজন প্রবোধ দিল। 'আপনার মতন পয়সাঅলা মানুষ এ-পাড়ায় ক'টা আছে। যান, এই বেলা ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ুন।'

'শুয়ে পড়ব!' ননীমাধব মানুষটিকে দেখতে পেল না, তাহলেও সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হি-হি করে হাসল। 'সবে সন্ধ্যে যে ভাই, ননী দত্তর সবে এখন সন্ধ্যে, এখন হাড়কাটায় ইন্দুর ঘরে বসা হবে। ইন্দুমতী কচ্ছপের মাংস রেঁধে আমার পথ চেয়ে বসে আছে—আসুন, সিগারেট খান জগতবাবু, রামানন্দবাবু নিন, নন্দলালবাবু! তিনজনের হাতে তিনটা আস্ত প্যাকেট তুলে দিয়ে আড়তদার পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'অহো, এমন নামজাদা তিনজনার সাথে আজ পরিচয় হল, আমার কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য!'

'আমাদেরও সৌভাগ্য, এমন মালদার মানুষ তুমি।' জগত বিড়বিড় করে উঠল। সিগারেট হাতে পেয়ে তিনজন আর এক মিনিট দাঁড়াল না। লম্বা পা ফেলে বৈঠকখানার গলি পার হয়ে বউবাজারের চওড়া রাস্তায় উঠে এল।

।। ১২ ।।

নন্দদুলাল হাসছিল। হাসির তোড়টা ক্রমেই বাড়ছিল। গীর্জার কাছে এসে সে যেন আর হাঁটতে পারছিল না। হাসতে হাসতে প্রায় মাটিতে বসে পড়ার মতন অবস্থা।

'কি ব্যাপার!' হাসি জিনিসটা সংক্রামক। রামানন্দ হাসছিল জগত হাসছিল। নন্দদুলাল একটা গূঢ় কারণ নিয়ে হাসছিল। রামানন্দ ও জগত স্রেফ তার হাসি দেখে হাসছিল। অথচ কারণটা জানতে পারছে না, এই জন্য মুখে হাসি নিয়ে দুজন বিরক্ত হচ্ছিল কম না।

'এমন পাগলের মতন হাসার কোনো মানে হয় না।' যেন নিজে আর হাসবে না, হঠাৎ গম্ভীর হতে চেষ্টা করে রামানন্দ হাতের পুরোনো সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরাল। 'নন্দবাবু, ব্যাপারখানা কী বলুন তো।'

'এই নন্দ!' জগত চোখ পাকাল। 'এতটা সময় সামলে থেকে এখন বেশ মাতলামি আরম্ভ হয়েছে, না?'

নন্দদুলাল আকাশের দিকে চোখ তুলে হাসছিল। নাকি গীর্জার মাথার ঘড়িটা দেখছিল। দশটা বাজে। সন্ধ্যার দিকে রাস্তার ভিড়টা যেমন ছিল এখন অনেকটা কমে গেছে। তাহলেও ঘটাং ঘটাং করে ট্রাম যাচ্ছিল, হুড়মুড় করে বাস লরীর আসা-যাওয়ার কমতি ছিল না। রাস্তায় মানুষের হাঁটাচলা কমেছে এই যা।

গীর্জা পিছনে ফেলে তিনজন সার্কুলার রোডের মোড়ে চলে এল। সেই বিলিতি মদের দোকানের সামনে। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

'মণ্ডল!' নন্দ ডাকল। হাসির চোটে তার চোখে জল এসে গেছে। রাস্তার আলো পড়ে চোখ চকচক করছিল।

'হুঁ, কি হয়েছে শুনি?' নন্দর সঙ্গে রামানন্দ ও জগত দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু কিছু বলতে আরম্ভ করতে গিয়ে নন্দ বলতে পারল না। আবার হি-হি করে হাসছিল।

'তোমার ঐ আড়তদারের সঙ্গে থেকে যাওয়া উচিত ছিল, তাহলে মাতলামিটা জমত ভাল।' জগত এবার রীতিমত রেগে গেল। 'রামানন্দবাবু, মিথ্যে বললাম!'

'আড়তদার এখন হাড়কাটায় ইন্দুর কাছে যাচ্ছে।'

'আহা, আমাদেরও তো এমন একটা প্রোগ্রাম ছিল, কোথায় এই নিয়ে তিনজন আলোচনা করতাম, কিন্তু এই আদমী কোমরের কষি ঢিলে করে মেয়েছেলের মতো হাসছে তো হাসছেই। নন্দ!' জগত জোরে ধমক লাগাল।

'না, আর হাসব না', যেন হাসি বন্ধ করতে নন্দও চেষ্টা করছিল, কিন্তু কেউ ভিতর থেকে সুড়সুড়ি দিয়ে ক্রমাগত তাকে হাসাচ্ছিল। যাতে আর পেটের হাসিটা কোনোমতে না বেরোয়, শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখল সে। চোখ তুলে এদিক-ওদিক দেখল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা জিনিস তুলে জগত ও রামা-নন্দর চোখের সামনে ধরল।

'মাই গড্!' রামানন্দ চমকে উঠল। জগতের চোখের তারা গোল হয়ে গেল।

নন্দর হাতের জিনিস দেখা শেষ করে দুজন তার চোখ দুটো দেখল। যেন পেট থেকে হাসির ভুড়ভুড়ি উঠে তার দুই চোখ আবার টইটম্বুর হয়ে উঠেছে।

'কাজটা কি ভাল হল নন্দ!' প্রায় পুরো একটা মিনিট চুপ থাকার পর জগত কথা বলল। তার তাকানো ও গলার স্বর থেকে বোঝা গেল সে আঘাত পেয়েছে।

'মানে আর একদিনের মালের খরচটা নন্দবাবু তুলে আনল।' অন্য আর কেউ না হাসলেও এবার রামানন্দ হাসল।

জগত মণ্ডল মাথা ঝাঁকাল।

'না, নন্দর এ-কাজ আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। পকেটে টাকা থাকবে আনন্দ করব, হুঁ, ড্রিঙ্ক করব, ব্রথেলে যাব কি অন্য কোথাও মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করব, টাকা না থাকলে কিছুই করব না, চুপ করে থাকব; তা বলে—'

'তা বলে ফুর্তি করতে এটা বেচে টাকা যোগাড় করা হবে ভেবে ননীমাধবের পকেট থেকে আমি জিনিসটা তুলে এনেছি তোমায় কে বললে!' যেন নন্দও হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল, ছেড়ে কথা কইবে না এমন একটা তেজী ভাব নিয়ে জগতের দিকে তাকাল।

'আপনার হাত সাফাইয়ের প্রশংসা করতে হয় নন্দবাবু।' রামানন্দ মিহি গলায় বলে শেষ করল।

'অ্যাঁ, আমি ভাবতেই পারি না', নাক সিঁটকাবার মত চেহারা করে জগত সামনের রাস্তাটা দেখল, যেন নন্দর দিকে তাকাতে তার ঘেন্না করছিল। 'ছি ছি, মানুষটা আমাদের পরিচয় পেয়ে কাছে এসে বসল, আহ্লাদ করে এত খরচপত্র করে খাওয়ালে-টাওয়ালে, আর সুযোগ পেয়ে ঠিক তারই সর্বনাশ করলাম আমরা!'

'সর্বনাশ কিছুই না, আড়তদারের অনেক টাকা, শুনলে না, কালই একটা নতুন ঘড়ি কিনছে।'

'তা কিনুক।' নন্দর দিকে মুখটা এবার না ঘুরিয়ে পারল না জগত। 'তা বলে তার পকেট থেকে এটা আমরা তুলে আনব? একটা কথার কথা!'

'আমি চাইছিলাম তার একটা ক্ষতি হোক।' নন্দর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল।

'কেন?'

'আমি চাইছিলাম তার আরো বেশ ভাল রকম সর্বনাশ হোক।'

'কেন?'

'গায়ের জোরে পারতাম না, মোষের মতন দেহ, না হলে ইচ্ছা ছিল ঘুষি মেরে বেটার নাকটা ফাটিয়ে দেই।'

'কেন, কি দোষ করেছিল ও, গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের মদ খাওয়ালে বলে?'

'না।' নন্দর মুখের পেশী কুঁচকে উঠল। চোখের তারা ছুঁচলো করে জগতের মুখটা দেখল। 'শুয়ারটা সাতখানা উপন্যাস বাজারে ছেড়েছে বলে।'

'অ, তাই বলো।' জগত চোখ ট্যারা করে রামানন্দকে এক নজর দেখল, ঠোঁট টিপে রামানন্দ হাসছিল, এক সেকেণ্ডের জন্য একটা বিদ্রূপের হাসি জগতের চোখে মুখে উঁকি দিতে চেয়েছিল, জগত সঙ্গে সঙ্গে মুখটা গম্ভীর করে ফেলল। 'তা সে যদি উপন্যাস লিখতে পারে আর পাব্লিশারও পেয়ে যায় তাতে তোমার রাগ করার, কিছু বলার থাকে কি?'

'একশ বার থাকে।' যেন বত্রিশ বছরের যুবক না, আবদারে একটি কিশোর, একটি রাগী ছেলে, নন্দর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আলুর ব্যবসা করে সে, তাই করুক; সাহিত্য করার, উপন্যাস লেখার তার কোনো রাইট নেই, থাকতে দেওয়া উচিত না।'

জগত চুপ করে রইল।

রামানন্দ জোরে জোরে টেনে সিগারেটটা শেষ করতে লাগল।

'আমার এমন ইচ্ছা করছিল রামানন্দবাবু', নন্দ রামানন্দর দিকে তাকাল। 'হাতে ছুরিটুরি থাকলে ঐ মোটা ভুঁড়িটা বুঝি ফাঁসিয়ে দিতাম, হাসছিলাম ঠিকই, তার পয়সায় মদও খাচ্ছিলাম গল্পও করছিলাম, কিন্তু রাগে আক্রোশে ভেতরটা এমন জ্বালা করছিল আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

'ঘড়িটা তাহলে এখন কি করবেন?'

'কিছুই করব না।' ঠোঁটটা বেঁকিয়ে নন্দদুলাল এদিক-ওদিক দেখল, মানুষজন পাতলা হয়ে গেছে, একটা দেবদারু গাছের দরুন জায়গাটাও অন্ধকার অন্ধকার, হাতের ঘড়িটা পেভমেণ্টের ওপর গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল নন্দ, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

জগত একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'চলি রামানন্দবাবু।'

'কোন্ দিকে?'

নন্দ উত্তর করল না এবং রাগ করে জগতের দিকে শেষ পর্যন্ত আর তাকালই না। পেভমেণ্ট থেকে নেমে বড় বড় পা ফেলে রাস্তাটা পার হতে লাগল।

'কোথায় যাচ্ছে?' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না—' বলতে গিয়ে জগত হঠাৎ থেমে গেল, রাস্তার ওপারে তার চোখ গেল। লাইটপোষ্টের নিচে একটি যুবতী দাঁড়িয়ে। এবার জগত অনেকটা নিজের মনে হাসল। এখন বুঝেছি, এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'কে ওটি?' রামানন্দও মেয়েটিকে দেখল।

'এর নাম রেখা—রেখা চক্রবর্তী।' জগত গুজগুজ করে হাসল। 'এই বিখ্যাত মেয়েটিকে আপনি চেনেন না!'

রামানন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। দেখার মতন চোখ করে সে এখন রাস্তার ওপারে আলোর নিচে প্রকাণ্ড খোঁপা মাথায় সবুজ শাড়ি জড়ানো প্রায় একটি কবিতার মতন সুন্দর দীঘল ছাঁদের শরীরটা দেখল।

'আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি।' জগতের দিকে চোখ ঘুরিয়ে রামানন্দ আড়ষ্ট গলায় প্রশ্ন করল।

'সব আর্টিষ্টের সঙ্গে ওর পরিচয়। কবি, ছবি আঁকিয়ে, গল্প-লেখকরাই তো ওর বন্ধু।' জগত একটা হালকা নিশ্বাস ফেলল। 'কাল ওকে নিয়ে আমি ডায়মণ্ড-হারবার বেড়িয়ে এসেছি। প্রায় সারাটা দিন দুজনে হইহই করে কাটালাম।'

'চমৎকার! আপনিও যাবেন নাকি ওখানে!'

'নাঃ, নন্দদুলালকে নিশ্চয় হাতের ইশারা করে ডেকেছে। আমায় তো ডাকেনি। ডাকলে নিশ্চয় যেতাম। বরং নন্দদুলাল ওকে নিয়ে এখন একটু বেড়াক-টেড়াক, গল্পসল্প করুক।'

'হু, এটা ভাল, নন্দবাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে আছে ওই আলুর বেপারী ননীমাধবকে দেখে।'

'স্বাভাবিক, সাতখানা উপন্যাস লিখে ফেলেছে ব্যাটা, কোন্ এক চণ্ডীমাতা পাব্লিশর সেসব রাবিশ ছেপেছেও। আজ কুড়ি বছর নন্দ দারুণ দারুণ সব গল্প লিখছে, একটা বই পাব্লিশারকে গছাতে পারল না। তবে কিনা—'

'বলুন—'

কথা থামিয়ে জগত হঠাৎ হাঁ করে রাস্তার ওপারের দৃশ্যটা দেখছিল। নন্দর হাত ধরেছে যুবতী। খিলখিল হাসছে। শরীর কাঁপছে। খোঁপা কাঁপছে। দুজন অপেক্ষা করছে। যেন ওই ট্যাক্সিটা ডাকবে।

'ভলাপচুয়াস।' জগত বিড়বিড় করে উঠল। 'বড্ড বেশি কামোদ্দীপক চেহারা মেয়েটার।'

রামানন্দ শুনল। চুপ করে রইল।

'তবে কিনা, হু, নন্দর কথা বলছিলাম. মেয়েপাগলা আমরাও, একটু ভাল চেহারার ভাল শরীরের মেয়ে দেখলেই জিভে জল আসে, কিন্তু ও যেন মাত্রা হারিয়ে ফেলে। এতটা ভাল না। ফলে হয়েছে কি, তার লেখার মধ্যেও জিনিসটা ইদানীং একটু বেশি এসে গেছে। সেক্স। ফলে পাব্লিশাররা তার বইয়ে হাত লাগাতে ভয় পাচ্ছে। হাওয়াটা এখন সাংঘাতিক ঘুরে গেছে তো। পলিটিকস্ ছাড়া মানুষ অন্য কিছুতেই আর স্বাদ পাচ্ছে না।'

'তখন যেন বলছিল একটু গণতন্ত্র-টনতন্ত্র লাগিয়ে গল্প লিখবে?'

'হবে না, নন্দকে দিয়ে হবে না।' জগত জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'তার যেটুকু দেবার, মানে যে লাইনে সে লিখছিল, খুব দিতে পারত, ভয়ানক এক্সপেরিমেণ্ট্যাল লেখা। জোরালো স্টাইল। কিন্তু সকলের স্বাদ লাগাবার মতন গল্প লিখতে গেলেই ও মরবে। মরেছেও। হয়তো পয়সার জন্য এখন সেভাবেই লিখতে চাইছে—গণ-সাহিত্য করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। সবাইকে দিয়ে সব কিছু হয় কি।'

রামানন্দ চুপ করে রইল। জগত আর একবার চুপ থেকে রাস্তার ওপারের দুজনকে দেখছিল। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছে। নন্দ দরজা খুলে দিল। যুবতী আগে ভিতরে ঢুকল। পরে নন্দ। দুজনকে নিয়ে গাড়ি পার্ক সার্কাসের দিকে ছুটল।

'আপনার সঙ্গে একদিন পরিচয় করিয়ে দেবো।'

'পরিচয় হয়েছে।' রামানন্দ এবার চাপা গলায় হাসল।

'হয়েছে? এতক্ষণ বলেননি তো।' জগত খুশি হল। 'হুঁ, কবি রামানন্দ সেনের সঙ্গে পরিচয় না করে ওই আর্ট-রসিকা থাকতে পারবে না যে। কোথায় দেখা হল?'

'এই বউবাজার ষ্ট্রীটেই। হুঁ, রাস্তার ওপর। পরে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা-টা খাওয়া হল। কবিতা-টবিতা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনাও করল শ্রীমতী।'

'গুড্।' রামানন্দর হাতে চাপ দিল জগত মণ্ডল। 'কেমন, চলা-বলা তাকানোর মধ্যে দারুণ সেক্স-অ্যাপীল রয়েছে লক্ষ্য করেছিলেন?'

'ডক্টর্স লেনে বাসা, বাপ রিটায়ার্ড জজ, ভাই পুলিশ অফিসার, নিজে টেলি-ফোন ভবনে চাকরি করে—'

জগত শব্দ করে হাসল।

'আপনাকে এ-ই পরিচয় দিয়েছে বুঝি—আমায় বলছিল ফরডাইজ লেনে থাকে, বাপ কোবরেজ, ওয়েলিংটনে ভাইয়ের ইলেকট্রিক গুড্স-এর দোকান, নিজে একটা প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারী করছে।'

রামানন্দর চোখ দুটো গোল হয়ে গেল। 'আর আমাদের নন্দদুলালের কাছে কী খবরটা দিয়েছে শুনবেন না?'

রামানন্দ কোনো কথা না বলে কেবল একটা ঢোক গিলল। ওপারে লাইটপোষ্টের নিচে যেখানে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিল সেই ফাঁকা জায়গাটায় পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে একটা ভিখিরি এসে জাঁকিয়ে বসেছে। চোখ আড় করে রামানন্দ তাই দেখছিল।

'নন্দকে বলেছে, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, শিগগীর হয়তো ওদের ডিভোর্স হয়ে যাবে। লোকটা আকাট মুর্খ, কোন্ সিনেমা হলে নাকি টিকেট বেচে, তার রুচি মেজাজ জীবনধারণের পদ্ধতি কোনোটার সঙ্গে শ্রীমতী খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না, জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে।'

'অ, তাহলে বিয়ে হয়েছে!' রামানন্দ জগতের দিকে চোখ ফেরাল।

'আপনি কুমারী ভেবেছিলেন, আমিও মশাই তাই, নন্দও গোড়ায় তাই মনে করত।' জগত ফ্যা-ফ্যা করে হাসল। 'তা কুমারী হোক, অকুমারী হোক, ম্যারিড, বিধবা বা ডিভোর্সী, জজ সাহেবের মেয়ে কি কোবরেজের কন্যা কি সিনেমার টিকেট বেচিয়ের গিন্নী—আমরা এসব কিছুই দেখব না কিছুই জানার দরকার নেই, কি বলেন? আমরা দেখছি তুমি রূপসী যুবতী এমন রসাল চেহারা নিয়ে বেছে বেছে রাজ্যের সাহিত্যিক কবি শিল্পীদের পাকড়াও করছ। এটাই আমাদের লাভ। তোমার ওই চমৎকার রুচির জন্যই তোমাকে আমরা মাথায় করে রাখব। সাধারণ একটা স্ট্রীট গার্লকে যে-চোখে দেখি, তোমাকে আমরা সেই চোখে কোনোদিন দেখব না। ঠিক কিনা বলুন?'

'তা তো বটেই।' বিকাশের কাছে ওই মেয়ে কী পরিচয় দিয়েছিল কে জানে। রামানন্দ হঠাৎ চিন্তা করল। বিকাশদের পাড়ায় ওর এক মামাতো বোন থাকে, সে-দিন বলছিল না? আর রামানন্দর মনে পড়ল সেদিন চায়ের দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গে চমৎকার লড়াইয়ের ছবিটা। বাপ্, যেন কথার তুবড়ি ছুটছিল এইটুকুন একটা মুখ দিয়ে, যা কিনা পাখির হাঁ-য়ের চেয়ে বড় না। ম্যানেজার তাতেই ঘায়েল।

বালু; সবুজ ঘাস আর কোথায়! চারদিকে এমন কড়া রোদ চৈত্রের, গা পুড়ে যায়, গরম বালুর ওপর পা দিলে পায়ে ফোস্কা পড়ে।

বেলা দশটা থেকে দমকা গরম হাওয়া আরম্ভ হয়। তারপর যত বেলা বাড়ে আগুনের হলকা বইতে থাকে।

কিন্তু এই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। শফীও না, মাধুরীও না।

স্বাভাবিক। আকাশ নিয়ে, রোদ নিয়ে, মেঘ নিয়ে মাথা ঘামাবার একটা বয়স থাকে। একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছোবার আগে আবহাওয়া, ধান-পাট, খাল-বিলের জল, ফলপাকুড় কি ক্রমাগত খরা চললে যে মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির অসুখ-বিসুখ হতে পারে এ সব কে চিন্তা করে!

রামানন্দ অবশ্য আট বছর বয়স থেকে রোদের কথা, মেঘের কথা, গাছপালার কথা খুব ভাবত। কখন জ্যোৎস্না উঠবে, কবে থেকে অন্ধকার রাত আরম্ভ, ঘাসের আগায় শিশির জমেছে কিনা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করত। পাখিল ডাকটাক শুনত।

মানে তখন থেকে কবি হওয়ার জন্য সে তৈরী হচ্ছিল। যেমন ছোটবেলা থেকে কারো কারো মধ্যে কোনো অসুখের বীজ লুকিয়ে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে। তার-পর সেই অসুখ তাকে সারাজীবন ভোগায়।

কিন্তু এদের সেসব নেই, কাব্যের বিষাক্ত ব্যামোর কীট শফী ও মাধুরীর রক্ত দূষিত করতে পারেনি যে, চাঁদ দেখলে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, চৈত্রের আগুন দেখলে অবাক হবে, কি বৃষ্টি হলে হাততালি দেবে।

তারা সুখী। তারা সুস্থ।

আবহাওয়া নিয়ে, ধান-পাট নিয়ে, খরা-বান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আরো বেশি বয়সে আসে। অক্ষয় এসব নিয়ে ভাবে, ইয়াকুব মিঞা ভাববে। কেননা তাদের অন্য দায়দায়িত্ব রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, জমির ফলনটলনের সঙ্গে মেঘ, বৃষ্টি কুয়াশা, রোদের সম্পর্ক আছে বইকি। তা জমি অবশ্য কারো নেই, ইয়াকুবের কোনোদিনই ছিল না। ভেড়ি লোপাট হয়ে যাবার আগে এদিকেই ধারেকাছে দু-চার বিঘে ধানের জমি করেছিল অক্ষয়, ভেড়ির সঙ্গে সেগুলিও গেছে। হুঁ, ব্যবসা, সেটা আছে। অক্ষয়ের হাঁস-মুরগির চাষ, শফীর বাবার ডিমের কারবার—এই নিয়ে অক্ষয়ের মাথা বেদনা, ইয়াকুবের দুশ্চিন্তা—একটানা খরা চললে, গরমি দিতে থাকলে হাঁস-মুরগির মড়ক আরম্ভ হবে, ডিমের কারবার লাটে উঠবে। কিন্তু এই নিয়ে শফী বা মাধুরী ভাববে নাকি! হাঁস-মুরগি ডিম পাড়ে, অক্ষয়ের কথা মতন মাধুরী সে-গুলি জমিয়ে রাখে, ইয়াকুবের কথা মতন শফী এসে একদিন ঝাঁকায় তুলে সব নিয়ে যায়। ব্যস, তারপর তারা আর কিছু ভাবে না।

রোদে জলে কুয়াশায় মেঘে খরায় বানে তাদের একরকম আনন্দ। তারা সর্বদাই খুশি। সব সময় হাসছে।

হাসবার, আনন্দ করার বয়স যে ওদের।

শিয়ালদা থেকে রামানন্দকে দিয়ে একটা শীতল পাটি আনিয়েছে মাধুরী। বলা যায় আনাতে পারল। মাধুরী ক'দিনই বলেছিল। রামানন্দ ভুলে গেছে। রোজই অক্ষয়কে দেখতে সে হাসপাতালে যায়। আর রোজ ভাবত ফেরার পথে মাধুরীর পাটিটা কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু অক্ষয়ের সঙ্গে একথা-সেকথা বলতে বলতে পাটির কথা শেষ পর্যন্ত তার আর মনেই থাকত না।

তারপর আর কি। বাড়ি ফিরে মাধুরীর কথা শুনতে হতো। এই নিয়ে মাধুরী ঠোঁট ফুলিয়ে একদিন দু'দিন অভিমান পর্যন্ত করেছে।

কাল বাড়ি থেকে বেরোবার সময়, মেয়েরা যেমন একটা কথা মনে রাখতে আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখে, রামানন্দও তার রুমালের কোণায় বড় করে একটা গিঁট দিয়ে রেখেছিল।

হাসপাতালে এই নিয়ে অক্ষয় একটু ঠাট্টা-মস্করা করতে ছাড়েনি। অর্থাৎ 'মেয়ে-মানুষ' কথাটা তার মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল, হুঁ, দুবার-একবার পকেট থেকে ময়লা রুমালটা বের করে রামানন্দ যখন মুখ মুছতে গেছে, রুমালের গিঁটটা অক্ষয়ের চোখে পড়েছে। আর একবার পকেট থেকে সেটা সে বের করতেই অক্ষয় ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়েছিল। 'ওটা কি হে মাষ্টার, তোমার রুমালের কোণায়?'

রামানন্দ হেসে ফেলেছিল।

'পাটি, মাধুরীর শীতল পাটি।'

চট করে অক্ষয় কথাটা বুঝতে পারেনি। ফ্যাকাশে চোখ করে রামানন্দর মুখটা দেখছিল।

তখন রামানন্দ ব্যাপারটা তাকে খুলে বলে। মাধুরীর পাটি কিনে নিয়ে যাবার কথা রোজই সে ভুলে যাচ্ছে। এইজন্য রুমালে আজ গিঁট দিয়ে বেরিয়েছে। আজ আর তার ভুল হবে না।

'তুমি দেখছি মাষ্টার মেয়েছেলের বাড়া।' অক্ষয় শব্দ করে হেসেছিল। অক্ষয়ের এক জেঠীর আঁচলে নাকি রোজ এমন একটা না, তিনটে চারটে করে গিঁট দেওয়া থাকত। জিজ্ঞেস করলে জেঠী বলত, আমার কি পোড়ার মাথায় কোনো কথা মনে থাকে, সব কেমন ভুলে যাই রে বাবা। এবং কোন্ কথার জন্য যে কোন্ গিঁটটা আঁচলে দিয়েছে, জেঠী এক এক করে তা অক্ষয়কে বুঝিয়ে দিত। এটা ভঁড়ারের চাবির, ক'দিন ধরে চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছে, এখন আর শেকল তুলে দিলে হয় না, শোবার আগে দরজায় তালা দিতে হয়, ভুলে না যাই তাই আঁচলে গিঁট, এটা আমার লঙ্কা ক্ষেতে বেড়া দেবার ব্যাপার, মনেই থাকে না ছাই—কালও একটা ছাগল ঘুরঘুর করছিল, আর এই গিঁট হল সক্কালবেলা কাল তোর জেঠা যখন হাটে যাবে, আমার দোক্তা পাতার কথা মনে করিয়ে দেবো—ক'দিন ধরে কেবল ভুলে যাচ্ছি।

অক্ষয়ের জেঠীর গল্প শুনে রামানন্দও দারুণ হেসেছিল।

আজ শীতল পাটি দেখে মাধুরী খুব খুশি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের পিছনে মাদার ঝোপের কাছে, কেননা চারদিকে ধুধু বালুর মরুভূমির মধ্যে ঐ একটা জায়গায়ই কিছু নধর দূর্বাঘাস গজিয়েছে, শফীকে নিয়ে মাধুরী ঘাসের ওপর ঘটা করে নতুন পাটি বিছিয়েছে। গাছের ছায়া পড়ে জায়গাটা ঠাণ্ডাও বেশ। অনেকক্ষণ পাটির ওপর দু'জনে শুয়ে গল্প করেছে। তারপর ঘরের গরমে তিষ্ঠোতে না পেরে রামানন্দও এক সময় সেখানে চলে গেছে।

মাষ্টারকে দেখে মাধুরীর এত ভাল লাগছিল। তিনজন যখন একত্র হয় রামা-নন্দকেও গল্পটল্প করতে হয়, চুপ করে থাকলে মাধুরী চটে যায়।

'এসো মাষ্টার, তোমার জন্য জায়গা রেখেছি।' মাধুরী একদিকে সরে বসে, শফী আর এক ধারে শরীরটা গুটিয়ে বসে। শীতল পাটির ওপর রামানন্দ পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে। চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকায়। রুক্ষ তামাটে আকাশ স্তব্ধ হয়ে আছে। বাতাস বন্ধ। একটা দমবন্ধ করা গুমোট চারদিকে।

তাহলে হবে কি, ঠিক এখানটায় সেই অস্বস্তি নেই। এখানে নব বসন্তের পরিবেশ। গুচ্ছ গুচ্ছ মাদার ফুল ফুটে আছে। রামানন্দর ঠিক মাথার ওপর মাদারের

ঝোপ ঘেঁষে একটা ডুমুরের চারা গজিয়েছে। কী অসম্ভব চকচক করছে চওড়া পাতাগুলি। সবুজ তো বটেই। এত টাটকা এত পরিচ্ছন্ন, মনে হয় কেউ যেন বাক্স থেকে খুলে এই মাত্র পাতাগুলি গাছের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য, একটু হাওয়াও টের পাওয়া যায় এই ঠাণ্ডা ছায়ার জায়গাটায় এলে। মাদার ফুল দুলছে, ডুমুর পাতা কাঁপছে। ঝোপের পিছনে কয়েকটা শালিক চড়ুই কিচিরমিচির করছে।

তাছাড়া এই দুটি মানুষ! একজন রামানন্দর ডাইনে, একজন বাঁয়ে বসে আছে।

তাদের চোখের দিকে তাকাও।

তোমার মনেই হবে না চৈত্রের গনগনে আগুন নিয়ে পৃথিবীটা নীরস ধূসর বন্ধ্যা হয়ে আছে। বা কোনোদিন ছিল। বা কখনও তা হবে।

এত প্রাণ ঐ দুটি চোখে। চঞ্চল অস্থির। যেন কত বর্ষার সজল মেঘ, কত স্নিগ্ধতা নিয়ে সারাক্ষণ তারা পূর্ণ হয়ে আছে। বলে কিনা ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়-দায়িত্ব আর ধান-পাটের কথা ভেবে মন খারাপ করা! তারা মন খারাপ করে না। স্বভাব তাদের করতে দেয় না, বয়স তাদের বাধা দেয়।

একমাত্র অক্ষয়ের জন্য মাঝে মাঝে মন খারাপ করা ছাড়া সংসারে আর কিছুর জন্য ভাববার আছে, মাধুরী মরে গেলেও তা বিশ্বাস করে না।

তা-ও অক্ষয় বিনা অপারেশনেই হাসপাতাল থেকে চলে আসবে শোনার পর থেকে ক'দিন ধরে মাধুরীর ফুর্তি ধরতে গেলে শতগুণ বেড়ে গেছে।

আর এদিকে শফীর হয়েছে মজা। অবশ্য বাপের জন্য কি আর তার মন ভিতরে ভিতরে না কাঁদে!

হাসপাতালে আছে ইয়াকুব। অক্ষয়ের মতন মেডিকেল কলেজে না। নীলরতন সরকারে দেওয়া হয়েছে তাকে। লিভার ফুলে গেছে। অতিরিক্ত সরাব খাওয়ার কুফল। শফীর মুখে যা শোনা গেল, ডাক্তাররা নাকি বলছে, আর এক ফোঁটা মদ পেটে গেলে ইয়াকুব মিঞাকে বাঁচানো যাবে না।

সে যাই হোক, ভালয় ভালয় ইয়াকুব হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসুক, আর সবাই যেমন চাইছে, শফীও নিশ্চয় চাইবে।

কিন্তু এখন তো দিনকতক সে, যাকে বলে, ছাড়া গরু। একেবারে ডাক চাপ নেই, বকা-ঝকা নেই। মারধোর বন্ধ। ডিম অবশ্য সে আগের মতোই নিয়ে যাচ্ছে। শফীর ফুফা তিলজলা থেকে এসে একদিন দু'দিন করে রাজাবাজার থাকছে। বেপারীদের সংগে কথাবার্তা বলা, টাকা-পয়সার লেনদেন শফীকে দিয়ে তো হয় না। একটা ভারভারিক্কি মানুষের দরকার। হাসপাতালে যাবার আগে ইয়াকুব খবর পাঠিয়ে শফীর ফুফাকে আনিয়েছে। ফুফা এদিক দেখছে, ওদিকে তিনজলায় নিজের দর্জির দোকান রয়েছে, তা-ও তাঁকে দেখতে হয়। শফীকে দেখবে, চোখে চোখে রাখবে এত সময় কোথায় মানুষটার।

কাজেই শফীউল্লার এখন আহ্লাদ ধরে না।

ফুর্তির বান ডাকছে এই দু'তিন দিন ধরে।

কালও দুপুরবেলা এখানে খাওয়াদাওয়া করেছে। মাধুরী যেমন বলেছিল, কাল শিয়ালদার বাজার থেকে মৌরলা মাছ আর কাঁচা আম নিয়ে এসেছিল শফী। আম দিয়ে চমৎকার মাছের চচ্চড়ি রান্না করেছিল মাধুরী। অনেকদিন পর আম দিয়ে মাছ খেয়ে রামানন্দও খুব তৃপ্তি পেয়েছিল। যেন আজও স্বাদটা জিভে লেগে আছে। আজ মাধুরীর কথা মতন বেলেঘাটার বাজার থেকে শফী চিংড়ি মাছ ও ইঁচড় এনেছে। রামানন্দ বাজার করে ঠিকই। কিন্তু মাধুরী যেমন যেমন বলে দেয় সব সময় সেভাবে সব মনে রেখে জিনিসগুলি আনতে পারে না সে। একটা আনলে তো আর একটা আনতে ভুলে যায়। এইজন্য শফীকে দিয়ে বাজার করিয়ে মাধুরী

বেশি সুখ পায়।

এবং এটা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে, শফী দু'বেলাই এখানে খাবে। তা না হলে তাকে শিয়ালদা কি রাজাবাজার ফিরে গিয়ে হোটেলে খেতে হয়। মাধুরীর এটা মনঃপূত না। হোটেলের খাওয়া—কেবল কতগুলি পয়সার শ্রাদ্ধ। নিজের হাতে রেঁধেবেড়ে খাওয়াও যখন ছোঁড়াকে দিয়ে সম্ভব না। তবু তার ফুফা যদি পাকা-পাকিভাবে ক'দিন কলকাতায় এসে থাকত। তা তো না। কাল দুপুরে এসেছিল ফুফা। ডিমের বেপারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে টাকা-পয়সার বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে বিকেলেই আবার তিলজলা ফিরে গেছে। আবার আসতে সেই সোমবার সকাল। কাজেই শুক্কুর, শনি, রবি এই তিনটা দিন ছেলেটা একা একা ওখানে থাকেই বা কি করে, আর খাওয়ার এই কষ্ট।

শফী তো এই চাইছে।

সারাদিন দুজনের গল্প, এক সঙ্গে খাওয়া, ওঠা-বসা। মাধুরী রান্না করে, শফী বাটনা বেটে দেয় মাছ কুটে দেয়, আনাজ কুটে দেয়। এদিক থেকে মাধুরীর কাজের কত সাহায্য হয়। আজ সকালে শফী সবটা উঠোন ঝাঁট দিয়েছে। তেমনি ভাইকে মাধুরী আদরও করছে। এক মুঠ বেশি ভাত একটু বেশি তরকারী শফীর পাতে ঠেলে দিতে পারলে সে খুশি। চানের সময় ভাইয়ের গায়ে মাথায় ভাল করে তেল মাখিয়ে দেওয়া। তারপর যখন চান করে এল, জোরে চিরুনি চালিয়ে একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল সমান করে দেওয়া। কাল ওই ঘন প্রায় জটধরা চুল আঁচড়াতে গিয়ে মাধুরী একটা চিরুনি ভেঙেছে। এত জোরে মাধুরী চিরুনি চালাচ্ছিল, চুলে টান পড়তে শফী ক'বারই আঃ উঃ করেছিল। কিন্তু চিরুনি ভেঙে গেল বলে মাধুরী হাল ছেড়ে দেবে নাকি। তক্ষুনি রামানন্দর চিরুনিটা তুলে নিয়ে শফীর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে আবার জোরে জোরে আঁচড়াতে শুরু করেছে।

শফী বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

'আচ্ছা, তুমি আমায় কী ভাব বলো দিকিনি?'

'কিচ্ছু না, তুই একটা জংলী। ঐ যে মাষ্টার বলে শেয়াল, তাই। এমন একটা মাথা করে রাখে কেউ—জীবনে কোনোদিন তেল পড়ে না, জল পড়ে না।' মাধুরী ছেড়ে কথা কইবার পাত্রী না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করেছিল।

'এমন করছ, মনে হয় আমি ডান হাত বাঁ-হাত চিনি না, অবোধ শিশু নিজের মাথা নিজে আঁচড়াতে পারব না।' শফী বিড়বিড় করে বলেছিল তখন।

'তাই তো দেখছি, নিজে পারলে তোর চুলের এই অবস্থা হয়!' মাধুরীও চিরুনি চালানো বন্ধ করেনি। কটাস কটাস করে কথা বলছিল আর হাত নাড়ছিল।

শফী তখন চুপ করে ভেবেছে। কী ভাবছিল ছোঁড়া! কাছেই রামানন্দ দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তার হাসিও পাচ্ছিল খুব। ঐ যে, যার পাতলা ঠোঁটে গোঁফের রেখা উঁকি দিয়েছে, চোখের নীল প্রায় লাল হয়ে উঠল, সূর্য ওঠার আগের আকাশের অবস্থা, পনেরো-ষোল পার হতে চলল বয়স, গলার স্বর ভাঙতে আরম্ভ করেছে—চোয়াল থুঁতনি একটু একটু শক্ত হচ্ছে, নিজেকে প্রায় চিনতে পারছে না, বুঝতে পারছে না—কী ছিলাম আমি, কী হতে চলেছি, আকাশের স্থির মেঘ না কি চঞ্চল বৃষ্টির ফোঁটা, সমুদ্রে ছিটকে পড়ব নাকি বনের ধারের নিরালা ছোট্ট দীঘির বুকে টুপটাপ লাফিয়ে পড়ে ছোট ছোট ঢেউ জাগাব—এমন যার মনের অবস্থা, দিশাহারা অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত—ঠিক সেই মুহূর্তে একটি যুবতীর কাছে সে অবোধ শিশু ছাড়া কিছু না? এখনো তার ডান বাঁ জ্ঞান হয়নি? মাথায় তেল দিতে জানে না, চিরুনি চালাতে শিখল না?

চেহারা দেখে রামানন্দ বুঝতে পেরেছিল শফীর মনে খুব লেগেছে, অভিমান

হয়েছে। অথচ একটু আগে খালে নেমে শফী তার শৌর্যবীর্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে এসেছে। তুখোড় সাঁতারু সে। উঁহু, রাজাবাজারে দীঘিপুকুর পাবে কোথায়, খরচ করে ইয়াকুব মিঞা ছেলেকে হেদোয় কি গোলদীঘিতে সাঁতার শিখতে পাঠাবে সেই আদমীই সে নয়। শফী সাঁতার শিখেছে মেটিয়াবুরুজে তার মামার দীঘিতে, একটা না, বড় বড় দুটো দীঘি মামার। তাছাড়া তিলজলা ফুফার বাড়ি গেলে সেখানেও সে পুকুর দীঘি পায়। অর্ধেক দিন তার জলে কাটে তখন।

পাড়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল রামানন্দ। পানকৌড়ির মতন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে কোথায় চলে গিয়েছিল শফী। হুঁ, ভাইকে নিয়ে এক সঙ্গে মাধুরী চান করতে জলে নেমেছিল। মাধুরী মোটামুটি ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু শফীর কাছে শিশু। তাছাড়া ডুব সাঁতারটা মাধুরী ভাল করে রপ্ত করতে পারেনি। তবে শফী তাকে শিখিয়ে দেবে আশ্বাস দিয়েছে, তার সঙ্গে দুচারদিন অভ্যাস করলেই ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে মাধুরীও অনেক দূর চলে যেতে পারবে। আজ একবার দুবার মাধুরী চেষ্টা করেছিল। ডুব দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু জলের নিচে দু' হাতের বেশি এগোতে পারেনি। যেখানে ডুব দেয় ঠিক প্রায় সেখানেই তার মাথাটা আবার ভেসে উঠতে দেখা গেছে। এমন দুবার হয়েছে। অথচ শফী সঙ্গে সঙ্গেই আছে। জল থেকে মাথা তুলে মাধুরীর সে কী খিলখিল হাসি। পারল না বলে যে একটু লজ্জা পাবে তা না। শফী চটে গিয়েছিল। একটু সাহস করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, জোর ধমক দিয়েছিল সে। জলের ওপর মাথা রেখে হাত পা ছোঁড়া যেমন, ডুব দিয়েও ঠিক সেভাবেই জল কেটে এগিয়ে যাওয়া এমন কিছু কঠিন না। তৃতীয়-বার মাধুরী অবশ্য ভাল করে চেষ্টা করতে গেল, তখন হেলেঞ্চার দামে চুলটুল আটকে সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড। থাক, আজ আর দরকার নেই, শফীর রাগ তখনও কমেনি। এত হাসলে কোনো জিনিসই শেখা যায় না। গজগজ করছিল সে। এক হাতে দামের জট থেকে মাধুরীর চুল ছাড়াচ্ছিল, আর এক হাত দিয়ে মাধুরীর কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে জলের ওপর ভেসে থাকতে সাহায্য করছিল। অনেকটা সময় হাত পা ছুঁড়ে মাধুরী তখন বেশ ভাল রকম ক্লান্ত, নিজের চেষ্টায় কিছুতেই ভেসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। তখন রামানন্দ দেখেছে শফীর বুদ্ধি, সাহস, গায়ের জোর। কেমন চটপট হাত চালিয়ে মাধুরীকে সে হিঞ্চের দাম থেকে ছাড়িয়ে আনল।

দৃশ্যটা বাস্তবিক তখন দেখার মত।

রামানন্দর মাথার ওপর ঘন ছায়া ছিল। তীরের ঝাঁকড়া পাকুড় গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল। তার চান হয়ে গেছে। দুটি মানুষের সাঁতার কাটা দেখছিল সে। এদের ফেলে তো সে ঘরে ফিরে যেতে পারে না। তাছাড়া তেমন ইচ্ছাও তার ছিল না। বরং গাছের ছায়ায় খালের বুক থেকে উঠে আসা ঝিরঝিরে বাতাসটা তার ভাল লাগছিল। আর চোখের সামনে সেই আশ্চর্য—হুঁ, ছবিই একটা, চৈত্রের তেজালো রোদ না, মনে হচ্ছিল আকাশ ভেঙে রাশি রাশি আগুন ঝরে পড়ছে। তবে কিনা জলের ঠাণ্ডায় আগুনের ঝলসানিটা যে তারা তেমন টের পাচ্ছিল না এটা বেশ বোঝা গেছে। হেলেঞ্চার জঙ্গল থেকে মাধুরীর নিবিড় কালো চুল ছাড়িয়ে তার তলপেটে একটা হাত রেখে একটু ওপরের দিকে শরীরটা ঠেলে ধরে—যেমন করে মানুষ একখণ্ড কাঠ কি একটা হাঁড়ি জলের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে আসে, মাধুরীকে নিয়ে সেভাবে সাঁতার কেটে শফী অতি সহজে তীরের কাছে চলে এল। শফীর কালো পাথর কোঁদা শরীর অনেকক্ষণ জলে ভিজে থেকে চৈত্রের চোখ ধাঁধানো রোদে কেমন ঝকঝক করছিল। তার মাথার ঝাকড়া চুল এমনভাবে চোখ কপাল ঢেকে রেখেছিল, হঠাৎ ছোঁড়াকে মানুষ ভাবতে ইচ্ছা করছিল না, মনে হচ্ছিল

জলচর কোনো জীব। যেন প্রকাণ্ড একটা গোলাপী রঙের খাদ্যবস্তু নিয়ে সে তীরের কাছে ভেসে এসেছে। অনেকক্ষণ জলে থেকে মাধুরীর চামড়া আরও মসৃণ গোলাপী লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। যেন জলচর জীবটা অনেক যুদ্ধটুদ্ধ করে আর পাঁচটা প্রাণীকে ঘায়েল করে লোভনীয় খাদ্যটা জয় করে এনে এবার নিরালা ডাঙ্গার কাছে এসে তারিয়ে তারিয়ে খাবে। শফীকে এত বেশি প্রগল্‌ভ সবল বিক্রমশালী মনে হচ্ছিল। সেই তুলনায় মাধুরীকে কত করুণ অসহায় দেখাচ্ছিল। সুন্দর একটি প্রাণী, যাকে কেবল খাওয়া যায়, রূপ ছাড়া যার আর কোনো সম্বল নেই।

আর বাড়ি ফিরে কিনা সামান্য চুল আঁচড়ান নিয়ে মাধুরীর কাছে শফী পাঁচ বছরের একটি খোকা হয়ে গেল। মানে মাধুরী তাকে প্রায় সেই চোখে দেখছিল না? ধমক-টমকও দিচ্ছিল।

কাজেই ছোঁড়ার রাগ অভিমানটা তখন দেখার মতন ছিল। এইজন্যই রামানন্দ মনে মনে হেসেছিল। তারপর অবশ্য খেতে বসে আবার শফীর সেই হাসিখুশি চেহারা, দিদির সঙ্গে হইচই গল্প। এক সঙ্গে রামানন্দ খেতে বসেছিল। ইঁচড়টা মাধুরী চমৎকার রেঁধেছে। জিনিসটাও ভাল এনেছিল শফী। অনেক ভাত খেয়ে ফেলেছে আজ রামানন্দ। খানিকক্ষণ ঘরের বিছানায় গড়িয়ে-টড়িয়ে এখন আলস্য ভাঙ্গতে বাইরে গাছতলার ছায়ায় শীতল পাটির ওপর এসে পা ছড়িয়ে বসেছে। শফী ও মাধুরী মাষ্টারকে দেখে খুশি। দুজনের গল্পের যে মাথামুণ্ড ছিল না রামানন্দ জানত। এই নিয়ে তারও মাথাব্যথা ছিল না। তবে একটা জিনিস সে লক্ষ্য করল। মাধুরীর খোঁপায় এক মুঠো লাল ফুল। শফীর কারিকুরি রামানন্দ বুঝতে পারল। কালও ছোঁড়া তাই করেছিল। রামানন্দর সামনেই গাছ থেকে কিছু ফুল পেড়ে এনে মাধুরীর খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল।

'কেমন লাগছে মাষ্টার?' মাধুরী হাসছিল।

'সুন্দর—ভাল।' রামানন্দ বলতে পারত, বলল না, শফীর দিকে চোখ ফেরাল। 'কেমন দেখাচ্ছে শফী?'

কেননা শফী তার দিদিকে সাজিয়েছে, তার মুখ থেকে কথাটা শোনা দরকার।

লাজুক হাসি হেসে শফী প্রথম রামানন্দকে দেখল, তারপর মাধুরীর দিকে তাকাল। এক সেকেণ্ড কিছু একটা ভাবল। তারপর আর ভাবল না। রামানন্দ বা মাধুরী কারো দিকে না তাকিয়ে আকাশটা দেখল। 'বনমোরগী।' আস্তে বলল সে।

উপমাটা মাধুরীর ভাল লেগেছিল কি? রামানন্দ দেখল যুবতীর গাল লাল হয়ে উঠেছে। তবে চোখে একটা গর্বের ভাব। রামানন্দ দৃষ্টি আড় করে শফীকে দেখল। বনমোরগী। শব্দটা রামানন্দর মোটামুটি পছন্দ হল।

কিন্তু হোঁচট খেল সে অন্য কথা ভেবে। রাজাবাজারের ডিম বেপারীর কালো রোগা ছেলেটার মধ্যে কি কাব্যভাবনা রয়েছে, লুকিয়ে কবিতা-টবিতা লেখে যে, একটি সুন্দর মানুষকে আরও সুন্দর করে তুলতে হঠাৎ তার চুলে ফুল গুঁজে দিল!

তারপর সাজিয়ে দিয়ে এমন চমৎকার এক বর্ণনা।

বনমোরগী যে বলতে পারে সে বনময়ূরীও বলতে পারে। বনহরিণী। বন-জ্যোৎস্না। বনদেবী। যে কোনো একটা উপমা ছোঁড়ার মুখ দিয়ে বেরোতে পারত। উপমা ছাড়া কবিরা এক পা এগোয় না। কালিদাস থেকে আরম্ভ করে আজকের শুভেন্দুরা তাই করছে।

রামানন্দর কপালে ঘামের ফোঁটা জমছিল। ক'টা শালিক বুলবুলি শব্দ করে মাদার ঝোপের ভিতর খেলা করছে। পাতার ফাঁক দিয়ে কিছু ভাঙ্গাচুরা রোদ মাধুরীর কোলে পিঠে আলপনা বুনেছে।

না, তা কেন হবে, রামানন্দ নিজেকে প্রবোধ দিল, স্কুল-পালানো এই ছোঁড়ার চোখে কি রামানন্দ প্রথম থেকেই আকাশ, রোদ, মেঘ, হাওয়া, খাল, বিল, গাছ, পাখির একটা বিশাল নির্জন জগত উঁকি দিতে দেখেছিল না। তা না হলে রাজাবাজারের ঘিঞ্জি ছেড়ে ছোঁড়া এখানে ছুটে আসবে কেন। হুঁ, তৃষ্ণা, অবাধ নীল আকাশ, অবারিত মাঠের পিপাসা কিশোরকে এখানে নিয়ে এসেছে। এই পিপাসা নিয়ে সে দিদিকে ফুল দিয়ে সাজায়, দিদির দিকে চেয়ে থাকে। রাজহাঁসটার চোখে রামানন্দ ঠিক এই তৃষ্ণা দেখেছে। মাধুরী জলে নামলে সাদা ডানা ছড়িয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে ওটা ছুটে আসে, লম্বা গলা উঁচু করে মাধুরীকে দেখে। এই তৃষ্ণা নিয়ে দুপুরের গাঢ় রৌদ্র থেকে পালিয়ে শালিক, বুলবুলিরা এখানে ঝোপের ভিতর বসে কিচমিচ করে—এই তৃষ্ণা নিয়ে মাধুরী জলের গভীরে ডুব দিয়ে আশ্চর্য কিছু দেখতে পায়, জলে পা ডুবিয়ে গলা খুলে গান করে। স্বভাব ওদের।

এই নিয়ে রামানন্দর দুর্ভাবনা?

তবে তো চাঁদনী রাতে খালের জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি দেখেও রামানন্দ মন খারাপ করতে পারত। এদের জগতে এরা ঠিকই আছে। আরোপ করা কবিত্বের ধার এরা ধারে না, মাধুরী না শফী না, শালিক,-বুলবুলি, রাজহাঁস বা নিজে থেকে ফুটে ওঠা গুচ্ছের মাদার ফুল—কেউ না। মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে মেকী কাব্যের কারবার শুধু শুভেন্দুদের। অ্যাকোরিয়ামের নীরক্ত ফ্যাকাশে ক'টি মাছ। বন্ধ জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাব্যের ভুরভুরি কেটে জীবন কাটিয়ে দেওয়া। হুঁ, শহরের আধুনিক সব শিল্পী।

তার চেয়ে, আজ সকালেও রামানন্দ চিন্তা করেছে, শহুরে হলেও জগত মণ্ডল, নন্দদুলালদের মধ্যে যেন একটু রক্ত-টক্ত আছে, খানিকটা প্রাণের চাঞ্চল্য, জীবনবেগ তুমি দেখতে পাবে। শুভেন্দুরা কিছু না। উঁহু, অ্যাকোরিয়ামের মাছও না, বরং বলতে পার কাগজের পাখি। কেবল ওদের হাঁ-টাই চোখে পড়ে, ডাক শোনা যায় না, গান নেই। আছে শুধু বোবা কাব্যভাবনা। অসুখের মতন। একটা অসুখই বলা ভাল। যেমন শহরের হাসপাতালে শুয়ে অক্ষয়কেও অসুখটা ধরেছে। ফ্যাকাশে হলদে চোখ মেলে দিনের বেলা ফুলরেণুর চর্বিঠাসা দেহটা দেখে, রাত্রের হালকা নীল আলোয় পাতলা ছিপছিপে শরীরের তরলাকে দেখে। তরলা ডাহুকের মতন শব্দ করে।

এই কবিত্ব।

দুধ, বার্লি, লেবুর রস, শুক্ত, ভিটামিন টেবলেটের ব্যাপার।

এখানে রৌদ্রের তেজ অনেক বেশি, আকাশ গাঢ় নীল, বাতাস প্রবল। তেমনি মাধুরীর দুটি কালো চোখ। গভীর পরিচ্ছন্ন। শফী তাজা একটা বুনো ফল।

অসুখগন্ধী কাব্যভাবনা এদের পাবে না, রামানন্দ নিশ্চিন্ত হতে পারে।

'মাষ্টার!'

রামানন্দ চমকে উঠল।

বাতাসে ঝরে পড়া একটা ফুল নিয়ে মাধুরী নখ দিয়ে ছিঁড়ছে।

'এতক্ষণ আমরা কী নিয়ে কথা বলছিলাম বল তো?'

'সাঁতার? কাল আবার দুজন একসঙ্গে জলে নামবে?' রামানন্দ আন্দাজ করল।

'আহা, সে তো আছেই, মাষ্টার যেন কী!' চমৎকার ভ্রুভঙ্গি করল মাধুরী, হাসল। জলের গল্প সেই আবার কাল যখন জলে নামা হবে, তখন হবে, এখন আমরা ডাঙার গল্প করছি।'

রামানন্দ হাসল।

'কোন্ ডাঙার? চড়কডাঙার না উল্টাডাঙার?'

এবার শফী হাসল।

'শোনো মাষ্টার', মাধুরী পিঠ সোজা করে বসল। 'শনিবার থেকে নাওভাঙ্গা গাঁয়ে চড়কের মেলা বসবে। ফি বছর বসে, খুব বড় মেলা। আমরা যাব।'

'খুব ভাল কথা।'

'তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। সাতদিন ধরে মেলা।'

'মন্দ কি, অনেকদিন গাঁয়ের মেলা দেখি না। খুব করে তেলেভাজা খাওয়া যাবে, নাগরদোলায় চাপা যাবে, কি বলিস শফী?'

'আহা, যেন তেলেভাজা ছাড়া মেলায় আর কিছু খাবার আসবে না; কত ফল, কত মিষ্টি, তারপর চায়ের দোকান বসবে, চপটপ কত কি হবে—'

'ইস্, এখনি আমার জিভে জল আসছে—', ছেলেমানুষের মতন রামানন্দ খুশির চেহারা করল। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, মাধুরী তার পিঠে আঙুলের খোঁচা দিল।

'মাষ্টার, দ্যাখো কে আসছে।'

রামানন্দ রাস্তার দিকে ঘাড় ফেরাল। তার চোখ গোল হয়ে গেল। বেঁটে ছাতা হাতে, কালো জুতো পায়ে ফরসা লম্বা চেহারার একটি মেয়ে এদিকে আসছে।

অক্ষয়ের পরিচিত? রামানন্দ ঠিক বুঝতে পারছিল না।

।। ১৪ ।।

'আমি কবি রামানন্দ সেনের কাছে এসেছিলাম।'

'আমিই রামানন্দ সেন।' উৎসাহের সঙ্গে রামানন্দ বলল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরও হয়ে গেল। তার যেন মনে হল পরিচয়টা মহিলার কাছে গোপন করাই উচিত ছিল। গোপন করলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হতো কি!

একটা অস্বস্তি নিয়ে রামানন্দ তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে মাধুরী ও শফীকে দেখল।

দুজন আর বসে নেই। উঠে দাঁড়িয়েছে। মাদার ঝোপের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চোখ বড় করে এদিকে তাকিয়ে আছে। বেশ মনোযোগ দিয়ে নতুন মানুষটিকে দেখছে। চমৎকার শাড়ি-ব্লাউজ পরনে। মুখখানাও সুন্দর। ফরসা রং। জুতোর ওপর নকশা-করা শায়ার লেসটা উঁকি দিয়ে আছে।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

'পাইকপাড়া।'

'হঠাৎ এখানে? আমার কাছে?' রামানন্দ ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে তাকাল। মহিলার পায়ের জুতোয় প্রচুর ধুলো লেগেছে। বোঝা যায় তিনি অনেক হেঁটেছেন।

'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ক'দিন ধরেই চেষ্টা করছি। কাল আপনার স্কুলে গিয়েছিলাম, শুনলাম ছুটি নিয়েছেন।'

হুঁ, রামানন্দ মনে মনে বলল, এই ছুটিই ছুটি। আর আমার স্কুলে ফিরে যাওয়া হবে না।

চাকরিটা সে ছেড়ে দেবে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে।

'স্কুলে তো আমি ঠিকানা দেইনি, মানে এখানকার ঠিকানা, আপনি কার কাছে খোঁজ পেলেন?' গলার স্বরটা রুক্ষ করে ফেলল রামানন্দ। চোখ ছুঁচলো করে মহিলার মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু ভদ্রমহিলা সেইজন্য অসন্তুষ্ট হল না। অথবা এমন একটা মন ভোলানো

হাসি হাসল, ভিতরের অসন্তোষ বা রাগ প্রকাশ পেতে দিল না।

শফী ও মাধুরী একভাবে এদিকে তাকিয়ে আছে। তারা নিশ্চয় বুঝতে পারছে মাষ্টার বিরক্ত হচ্ছে, অথচ মেয়েছেলেটি বেশ ধৈর্য রেখে হাসিমুখে কথা বলছে। এইজন্য তারা অবাক হচ্ছিল বইকি। কৌতূহলও তাদের কম হচ্ছিল না। দুটি মানুষের চোখ দেখে রামানন্দ বুঝতে পারছিল।

'আপনার ঠিকানা জানা ছিল না, পুরনো বাসা ছেড়ে দিয়েছেন, আপনার স্কুলে খোঁজ নেবার আগে কলেজ ষ্ট্রীটে আপনাদের পদাবলী অফিস সেই চায়ের দোকানেও আমি গিয়েছিলাম।'

রামানন্দ প্রমাদ গনল।

'কি বলল ওরা? কার সঙ্গে কথা হয়েছিল?'

'সকলেই ছিলেন। শুভেন্দুবাবু, বিকাশবাবু, নবকিশোর, অরুণাভ সকলের সঙ্গেই সেদিন পরিচয় হল।'

'আপনি কি পদাবলী নিয়মিত পড়েন?'

'আমি পদাবলীর গ্রাহিকা। আমার নাম হেনা সেন। রানী পার্বতীসুন্দরী কলেজে আমি পড়াই।'

অধ্যাপিকার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রামানন্দ নতুন করে চোখ বুলোল।

'ওরা কেউ আমার এখানকার ঠিকানা জানে না। এইজন্যই জিজ্ঞেস করছি, ঠিকানাটা কোথা থেকে আপনি যোগাড় করলেন।' যেন রামানন্দ পাল্টা জেরা আরম্ভ কবল।

হেনা সেন মুখের হাসি বিলীন হতে দিল না।

'আমাদের পাইকপাড়ার সোনালী বাসর, একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আপনি নাম শুনেছেন কিনা জানি না।'

'না, শুনিনি।' রামানন্দ সজোরে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি সেখান থেকে এসেছেন বুঝি?'

'ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার লেখা শুধু ভালবাসি বললে সবটা বলা হয় না, একজন ভক্ত পাঠিকা আপনার, আমাদের সোনালী বাসরের ছেলেমেয়েরাও আপনার লেখার ভীষণ ভক্ত।'

'দেখুন', রামানন্দ চোখ দুটো ছোট করে ফেলল। 'অনেকদিন আমি লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছি। পদাবলীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন, কার কাছেই বা আমার ঠিকানা পেলেন কিছুই আমি জানি না। যাই হোক, যে উদ্দেশ্য নিয়েই আসুন বা যেখান থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে থাকুন—আপনাকে শুধু একটা কথাই আমি বলব, যদি লেখার জন্য এসে থাকেন আপনাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। আমি কবিতা লিখি না, কাউকে লেখা দিই না।'

'না, লেখার জন্য আমি আসিনি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' ঝলক দিয়ে হেনা সেন হেসে উঠল।...

'মেয়েটা কেমন বেহায়া।' মাধুরী বিড়বিড় করে উঠল। শফী মাথা ঝাঁকাল। কেননা, যেহেতু রামানন্দ দূরের একটা ঝোপের ছায়ায় সরে গিয়ে মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল, তাদের আলোচনার বিষয়টা মাধুরী ও শফী বুঝতে পারছিল না। তারা শুধু দেখছিল মাষ্টার ক্রমেই রেগে যাচ্ছে, বিরক্ত হচ্ছে আর মেয়েছেলেটি একভাবে হেসে চলেছে।

'আহ্লাদী খুকী, ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে।' মাধুরী ফিসফিসিয়ে উঠল।

'শাড়ি, জামা, খোঁপার খুব ফ্যাশান।' চাপা গলায় শফী বলল, 'ঠোঁটে রংটং মেখে

এয়েছেন।'

'ও কে রে শফী?'

'মনে হয় স্যারের কাছে ছেলেমেয়ে কাউকে পড়াতে চাইছেন—প্রাইভেট টুইশনের ব্যাপাব হতে পারে।'

হুঁ. তাও হতে পারে। শফীর অনুমানটা মাধুরীর মনে ধরল। তবে ছেলে পড়ানোর ব্যাপারে মাষ্টারের যা আলসেমি এসে গেছে—নিয়মমত ইস্কুলেই যাচ্ছে না—কারো বাড়ি গিয়ে পড়ানোয় রাজী হবে কি!

'মনে হয় না স্যারকে রাজী করাতে পারবে। স্যারের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে একদম ইচ্ছে নেই। বার বার কেমন মাথা নাড়ছে দেখছ না।'

'দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।' মাধুরী একটা ঢোক গিলল।

'হুঁ।' শফীও চুপ থেকে অপেক্ষা করতে লাগল।...

রামানন্দ তখন আকাশ থেকে পড়ার মতন চেহারা করেছে। 'কাব্য-নাটিকা! আমার লেখা? কোথায় লিখেছিলাম?'

'নগ্ন গোধূলি। আপনাদের পদাবলী কাগজেই বছর দুই আগে ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল।' হেনা সেন মনে করিয়ে দিল।

রামানন্দ ওপরের দিকে চোখ তুলে গাছের পাতা দেখতে লাগল।

'আপনার মনে নেই, আশ্চর্য!'

হেনা সেন আর হাসল না, একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'কী অদ্ভুত লেখা। রবীন্দ্রনাথের পরেও কতজনই তো কাব্য নাটিকা লিখলেন। কিন্তু আপনার ঐ জিনিস, আপনি হয়তো মনে করছেন আপনার একটা অমনযোগী লেখা, অসতর্ক মুহূর্তে একটা কিছু লিখবেন বলে হঠাৎ ওই ধরনের রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কেননা এও সত্য, ঐ একটি ছাড়া আর কোনো কাব্যনাটিকা আপনি লেখেননি। কিন্তু নগ্ন গোধূলি যে আপনার কত বড় সার্থক সৃষ্টি—'

'ঠিক আছে।' রামানন্দ এবার রীতিমত অধৈর্য হয়ে উঠল। 'একটা কাব্য-নাটিকা এককালে আমি হয়তো লিখেছিলাম, এখন কী করতে হবে আমাকে দয়া করে বলতে পারেন কি?'

ধমক খেয়ে হেনা সেন কিছুটা অপ্রস্তুত হল। লজ্জা পাওয়ার মতন চোখ করে ওপাশে দাঁড়ানো মাধুরী ও শফীকে একবার দেখল। মহিলা চুপ করে আছে দেখে রামানন্দ গলার স্বর বদলাল।

'কি হল, কোনো পাবলিশার লেখাটা ছাপতে চাইছে? আপনার সঙ্গে জানা-শোনা আছে বুঝি। এইজন্য আপনাকে পাঠিয়েছে?'

'না।' হেনা সেন এদিকে চোখ ফেরাল। 'কোনো পাবলিশারের সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই। নগ্ন গোধূলি যদি কেউ ছাপত আমি সত্যি খুশি হতাম। কত আজেবাজে জিনিস ছাপা হয়ে বাজারে বেরোচ্ছে—ঐ যে বলে, ক্ষীর ফেলে নীর নিয়ে কাড়াকাড়ি।'

'হুঁ, তা হোক নীর নিয়ে কাড়াকাড়ি, বাংলা সাহিত্যের কী হাল দাঁড়িয়েছে তা জানতে বা ঐ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে এখন আমার একটুও উৎসাহ নেই। সাহিত্য থেকে আমি একেবারে সরে এসেছি। এখন দয়া করে আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্যটা বলুন, হুঁ, আর আমার ঠিকানাটাই বা আপনাকে কে দিলে—' অর্থাৎ এই জিনিসটা যতক্ষণ জানতে না পারছে রামানন্দ কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না।

'তা হলে আপনাকে খুলে বলি শুনুন। হেনা সেন কোমর থেকে রুমালটা টেনে নিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'আমাদের সোনালী বাসরের ছেলেমেয়েরা

আপনার নগ্ন গোধূলি কাব্যনাটিকাখানা অভিনয় করবে ঠিক করেছে। এইজন্য আপনার অনুমতি নেওয়া দরকার। আপনার ঠিকানার জন্য আমি নিজে ঐ যে বললাম, দু-এক জায়গায় হাঁটাহাঁটি করে জোগাড় করতে পারিনি। আমাদের ক্লাবের দু-একটি ছেলে আপনাকে চেনে, কলেজ স্ট্রীটে আপনাকে দেখেছে. আপনি অবশ্য তাদের চেনেন না। যাই হোক, কিছুতেই আপনার ঠিকানাটা জোগাড় করতে পারছিলাম না, সবাই কেবল আপনার পুরোনো বাসার নম্বর বলছিল, এখানকার ঠিকানা কেউ বলতে পারছিল না, ঠিক এমন অবস্থায় সকলেরই যখন মন খারাপ, হঠাৎ কাল বিকেলে আমাদের ক্লাবের একটি ছেলে, যার কথা বললাম আপনাকে চিনত, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আপনি বেরিয়ে আসছেন দেখল, আপনি কলেজ স্ট্রীট ধরে বউবাজার পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে শেয়ালদার বাস ধরলেন। ছেলেটিও বউবাজার পর্যন্ত আপনার পিছু পিছু হেঁটে গিয়ে ঐ বাসে উঠে পড়ল। শেয়ালদায় নেমে আপনি টুকিটাকি দু-একটা জিনিস কিনলেন, কফি কিনলেন, তারপর বেলেঘাটার বাস ধরলেন। আমাদের ছেলেটিও ঐ বাসে চেপে বসল।'

রামানন্দর মুখের হাঁ গোল হয়ে গেল। চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। কথা বলছিল না। মহিলার কথা শুনে যাচ্ছিল।

'তারপর এখানে কোথায় আপনি বাস থেকে নামলেন, মাঠের ওপর দিয়ে কতটা রাস্তা হেঁটে বাড়ি এসে পেঁাছোলেন—ছেলেটি সব দেখেশুনে গেল।'

'অ্যাঁ. এ যে দেখছি রীতিমত গোয়েন্দাগিরি—এতটা রাস্তা আমার পিছু পিছু একটা মানুষ এল. আর আমি ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পেলাম না! সাংঘাতিক তো!'

রামানন্দর চোখমুখের অবস্থা দেখে হেনা সেন আর একবার না হেসে পারল না।

'খুব তুখোড় ছেলে—', ঘাম মুছবার ছল করে অধ্যাপিকা রুমাল বুলিয়ে ঠোঁটের হাসিটা মুছে ফেলতে চেষ্টা করল। 'যাই হোক. এই ব্যাপারে সে নিজে কিছু আপনাকে বলতে সাহস পায়নি, ছেলেমানুষ, পাছে আপনি তার অনুরোধ না রাখেন, ওর কাছ থেকে ভাল করে রাস্তাঘাটটা জেনে নিয়ে আমি আজ নিজে এলাম—'

'আপনি ওদের কে? অ বুঝেছি—ওই ক্লাবের একজন কেউকেটা, তাই তো?'

চেহারাটা এবার এত বিকৃত করে ফেলল রামানন্দ, হেনা সেন তার চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'আমি সোনালী বাসরের সেক্রেটারী।'

'তাই তো বললাম, আপনি ঐ চক্রের কুলকুণ্ডলিনী, দুনিয়ায় এত জিনিস থাকতে বেছে বেছে রামানন্দ সেনের কবেকার একটা পচা লেখা, কোনোদিনই যা কেউ পড়েনি, নগ্ন গোধূলি অভিনয় করবেন—আপনার বুদ্ধির বলিহারী!'

হেনা সেন আবার ঝলক দিয়ে হাসল।

'আপনি বলতে পারেন ওটা আপনার একটা অতি সাধারণ বাজে লেখা—কিন্তু আমাদের কাছে এ কী জিনিস আপনাকে বোঝাতে পারব না! সোনালী বাসরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ওই নাটিকা আমরা মঞ্চস্থ করব ঠিক করেছি। হুঁ, একদিনই অভিনয় হবে। আগামী বাইশে মার্চ সন্ধ্যেবেলা। আপনাকে অনুমতি দিতে হবে।'

'একদিন কেন!' রামানন্দ বড় করে ভেংচি কাটল। 'সহস্র রজনী ওই ছুঁচোর কেত্তন চালিয়ে যান। আমার আপত্তি নেই। ঢিল ছোঁড়া আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে থাকুন।'

হেনা সেন আর হাসল না। রুমাল দিয়ে চেপে চেপে কপালের ঘাম মুছল। যেন তার আরো কিছু বলার আছে। রামানন্দর মুখের দিকে একভাবে চেয়ে রইল।

'কি হল! কিছু বক্তব্য আছে আপনার? নাকি লিখিত অনুমোদন চাইছেন?'

হেনা সেন সুন্দর করে গ্রীবা নাড়াল।

'আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট।'

'তাহলে—', রামানন্দ থেমে গেল। মুখ ফুটে কি করে আর এক ভদ্রমহিলাকে চলে যেতে বলা চলে। একটা দারুণ বিতৃষ্ণা তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। চোখ তুলে রামানন্দ গাছের ডালে শালিক, বুলবুলি দেখল। তারপর চোখ নামিয়ে, পাছে মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়, ঘাড় ঘুরিয়ে ওপাশে দাঁড়ানো শফীকে, মাধুরীকে দেখল। 'কি রে শফী, তোদের মেলায় যাওয়া ঠিক হল?' যেন এখানকার প্রসঙ্গ শেষ, ভদ্রমহিলাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে রামানন্দ চেঁচিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেল।

শফী ও মাধুরী একটু লজ্জা পাওয়ার মতন ঠোঁট টিপে হাসল এবং একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চুপ করে রইল।

হেনা সেনও ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার সুন্দর চেহারার মেয়েটিকে ও কালো ছিপছিপে, লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, মাথায় কোঁকড়া চুল কিশোরকে দেখল। বস্তুত এরা কারা, হেনা ঠিক আন্দাজ করতে পারছিল না। কবি রামানন্দ সেন বিবাহিত সে জানে। কিন্তু এই মেয়েটি যে তার স্ত্রী না এই সম্পর্কে সে নিশ্চিত ছিল। কেননা রামানন্দর বয়সের তুলনায় মেয়েটি অনেক বেশি কচি। তাছাড়া রামানন্দ অপুত্রক, হেনা কার মুখে যেন শুনেছিল। কাজেই এরা হয়তো কবির আত্মীয়টাত্মীয় হবে।

'এঁরা মেলায় যাচ্ছেন বুঝি?' হেনা নতুন করে হাসতে চেষ্টা করল।

'হুঁ, নাওভাঙ্গায় চড়কের মেলা। আমিও যাব।' রামানন্দ মোটা গলায় উত্তর করল।

'খুব ভাল। গাঁয়ের মেলা সত্যি দেখবার মতন। এই যন্ত্রসভ্যতার যুগেও যে আমাদের এইসব মেলাটেলা, কীর্তন, যাত্রা, কবি, কথকতাগুলো এখনো বেঁচে আছে ভাবলে অবাক হতে হয়।'

'হুঁ, অবাক হতে হয়।' রামানন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে থুথু ফেলল। কটমট করে মহিলার মুখ দেখল। এবার তাকে অভদ্র হতেই হবে। 'তাহলে এইজন্যই আপনার এখানে আসা! আমার নগ্ন গোধূলি মঞ্চস্থ করতে চাইছেন, এই তো?'

'আমার আর একটা আবেদন আছে।'

'কী আশ্চর্য, আবার আপনার আবেদন থেকে যাচ্ছে—', রামানন্দ গর্জন করে উঠল।

'বিশেষ কিছুই না, আমরা নিজেরা এসে আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাব, সে-দিন মানে বাইশে মার্চ সন্ধ্যেবেলা আমাদের সোনালী বাসরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। আপনার কোনো কষ্ট হবে না, বেশি-ক্ষণ আপনাকে ধরে—'

'দেখুন—', রামানন্দ হেনা সেনকে শেষ করতে দিল না, উত্তেজনায় তার গলার স্বর কাঁপছিল, পাছে না একটা নাটকীয় কিছু করে ফেলে, নিজেকে সংযত করার জন্য মহিলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে সে মাথার ওপর গাছের পাতা দেখতে লাগল। 'আপনার কাজ শেষ হয়েছে, এবার দয়া করে আপনি চলে যান।' অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রামানন্দ কথাটা বলল।

'আমাদের এই একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।'

'আপনি যে দেখছি—আশ্চর্য, কী বলব!' যেন রামানন্দ সঠিক সংজ্ঞাটা ঠিক করতে পারছিল না। কোনোরকম সভাসমিতি, ফাংশন, জলসা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি যাই না, কোনোদিন কোথাও গেছি বলে মনে পড়ে না, আর এখন

তো সাহিত্যটাহিত্য আমার চোখের বিষ, আমি হাঁস-মুরগি নিয়ে আছি—আপনি অন্য কোনো কবি বা সাহিত্যিক দেখুন।'

'না, তা কি করে হয়! সোনালী বাসরের ছেলেমেয়েরা আপনাকেই চাইছে, আপনার কাব্যনাটিকা আমরা অভিনয় করছি—আমাদের সকলের ইচ্ছা সেদিন আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন!'

'হবে না হবে না।' রামানন্দ চিৎকর করে উঠল।

শফী ও মাধুরী পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। উঁহু, ছেলে পড়ানর ব্যাপার না, যেন অন্য কিছু, কিন্তু কী সেই জিনিস? মাষ্টার ওই মেয়েছেলেটির সঙ্গে কি নিয়ে এত তর্ক করছে বুঝতে না পেরে তারা অস্বস্তি বোধ করছিল। মাধুবী জানত, অক্ষয়ের কাছে রামানন্দ জিনিসটা গোপন করেনি, স্ত্রীর সঙ্গে মাষ্টাবের অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। অক্ষয় বা মাধুরী রামানন্দর স্ত্রীকে কখনো দেখেনি। হঠাৎ এই মেয়েছেলেটিকে এখানে দেখে মাধুরীর একবার সন্দেহ হয়েছিল, এই কি মাষ্টারের বউ! না, তা কি কবে হয়, সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী মাথা নেড়েছে. মাষ্টারের বয়েস হয়েছে, রগের কাছে দু-একটি পাকা চুল চোখে পড়ে, প্রায় মাধুরীর বয়সী না হলেও আরো একটু বয়স হয়েছে মহিলার, সুতরাং কিছুতেই এটি মাষ্টারের গিন্নী হতে পারে না।

এখন মাধুরীর সন্দেহ হচ্ছিল, নাকি একটা আপস মীমাংসার ব্যাপার নিয়ে বউয়েব পক্ষ থেকে মাষ্টারের শালীটালি কেউ এল। যে জন্য এত কথা কাটাকাটি, মুখ নাড়ানাড়ি চলেছে?

শফীর কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা বহস্যময় ঠেকছিল।

বামানন্দ সমানে চেঁচাচ্ছে।

'আমি যাব না, যাব না।'

'ছেলেরা কিছুতেই ছাড়বে না।' হেনা সেন হাসছিল।

'আপনাবা কি জোর করে আমায় ধরে নিয়ে যাবেন!'

'আজকালকার ছেলেদেব চেনেন তো! ওদেব রোক চেপেছে কবি রামানন্দ সেনকে চাই, না হলে সোনালী বাসরের এ বছরের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকবে, বিশেষ করে এবার রামানন্দব লেখা কাব্য-নাটিকা ওরা মঞ্চস্থ করছে।'

'আজকালকার ছেলে!' রামানন্দ খিঁচিয়ে উঠল। 'আমি যাব না, আমায় জোর কবে নিয়ে যাবে তাই না? এদিকে গোয়েন্দাগিরি করে আমার ঠিকানাটি খুঁজে বার করা হয়েছে। অ্যাঁ, মগের মুলুক পেয়েছে—অরাজকতা চলছে!'

'শুনুন—'

'আমি যাব না, ব্যস, এই শেষ কথা। আমি আর কোনো কথাই শুনছি না।'

'এটা আপনার পাগলামি, সাহিত্য থেকে দূরে সরে এসেছেন, সাহিত্য আপনার চোখের বিষ—দুদিন পরে হোক দশদিন পরে হোক, সাহিত্যে আপনাকে ফিরে যেতেই হবে, কবিতা আপনাকে লিখতেই হবে—না লিখে পারবেন না, কিন্তু সেটা বড় কথা না, একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে সবাই আপনাকে চাইছে সেখানে আপনার না যাওয়াটা কাজের কথা না, সাহিত্যের প্রশ্ন বাদ দিলেও এতগুলো মানুষের আবদার অনুরোধ উপেক্ষা করা, তাদের সকলের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করা—সামাজিক দায়িত্বের কথা চিন্তা করেও আপনাকে—'

'হুঁ, এত বড় কথা!' রামানন্দ লাফিয়ে উঠল। 'ভয়ানক বড় বড় উপদেশ দিচ্ছেন যে আমাকে—সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্তব্য! আমি সামাজিক নই, ঘোর অসামাজিক—অসামাজিক অমার্জিত অভদ্র—ব্যস, হল তো। যান কোথায় যাবেন, আপনি ফিরে যান, আর আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

থপথপ পা ফেলে রামানন্দ মাধুরীদের কাছে ফিরে গেল। কেমন যেন একটা রহস্যের হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে হেনা সেন একটু সময় সেদিকে চেয়ে রইল, তারপর গাছের ছায়া ছেড়ে রৌদ্র মাথায় নিয়ে গরম বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

'মাষ্টার, কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল?'

মাধুরীর চোখের দিকে তাকিয়ে রামানন্দ কিছু একটা ভাবল। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'তুমি এসব বুঝবে না।'

'মেয়েছেলেটা কোথা থেকে এসেছিল?'

'কলকাতা থেকে।'

'তোমার কেউ হয়?'

'নাঃ', বলতে গিয়ে রামানন্দ পরে থুঁতনি নাড়ল। 'হুঁ, আমার মাসী হয়।' এবার রামানন্দ মুখটা বিকৃত করে হাসল।

'মাসী!' মাধুরীর চোখ গোল হয়ে উঠল। 'তোমার চেয়ে যে অনেক ছোট।'

'কী মুশকিল! মাসী. পিসি বুঝি ছোট থাকতে নেই। মানুষের মামা, কাকা বয়সে ছোট হয় না? কি রে শফী!'

'হুঁ, হয় বইকি। আমার ছোট চাচা আমার তিন বছরের ছোট।'

মাধুরী লজ্জা পেল। বুঝতে পেরে রামানন্দ প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা করল।

'তবে ঐ কথা রইল। আসছে শনিবার তিনজনে চড়কের মেলায় যাব।'

'দিদি বলছিল সূয্যি ওঠার আগে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ব।'

শফীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে রামানন্দ মাধুরীকে দেখল।

'বাঃ, খুব ভাল বলেছ মাধুরী, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আমরা নাওভাঙ্গা পেঁৗছে যাব, চমৎকার হবে। সকাল থেকেই বুঝি মেলা বসে!'

মাধুরী কিন্তু উত্তর করল না। দূরের সাদা বালুর দিকে চেয়ে রইল। মেয়েছেলেটাকে একটা পাখির পালকের মত দেখাচ্ছিল। ক্রমশ ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

'দিদি বলছিল সারাদিন আমরা মেলায় থাকব। দুপুরে একটা গাছতলায় কাঠ জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করব।'

'দারুণ হবে!' চোখ পাকিয়ে রামানন্দ রীতিমত চিৎকার করে উঠল। 'সাংঘাতিক ফুর্তি হয় তাহলে সেদিন। চড়কের মেলাও দেখা হচ্ছে চড়ুইভাতিও খাওয়া হচ্ছে।'

শফীর দিকে না, মাধুরীর দিকে সরাসরি চোখ রেখে রামানন্দ কথা বলছিল, কিন্তু মাধুরী যেন তখনও সেই মাসীর কথাই চিন্তা করছে।

'তোমার বউয়ের ব্যাপার নিয়েই আজ মাসী এসেছেন, তাই না মাষ্টার?'

'বউয়ের বিষয়!' রামানন্দ চমকে উঠল। 'কেন?'

'মানে তোমাদের দুজনের মধ্যে যদি একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়?'

'অ, সেই কথা!' রামানন্দ গলার নিচে হাসল। 'মাথা খারাপ! মাটির পুতুল ভেঙ্গে গেলে তা আর জোড়া যায় না, আর জোড়া লাগিয়ে দিলেও বাচ্চা মেয়েটার তাতে মন ওঠে না, নতুন পুতুল চায়। যে মানুষ ঘর ছেড়ে চলে যায়, তার সঙ্গে আর বোঝাপড়া কি। তাছাড়া এই ব্যাপারে মাসী-পিসীদের ডাক্তারী অচল।'

মাধুরী নতুন করে ভাবনায় পড়ল।

'হুঁ, খুব আনন্দ হবে মাধুরী। আমি নিজে মাথায় করে হাঁড়িকুড়ি চাল-ডাল নিয়ে যাব।'

মাধুরী ফিক করে হাসল।

'তোমার যেমন বুদ্ধি মাষ্টার! নাওভাঙ্গার মেলায় হাঁড়িকুড়ি, চাল, ডাল, কাঠ,

তেল, নুন সব কিনতে পাওয়া যায়। আমাদের কিছুই এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার হবে না।'

'আচ্ছা!' রামানন্দর চোখের তারা নেচে উঠল।

'তবে তো আর কথাই নেই। ঝাড়া হাত-পা নিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ব।'

'বুঝলি শফী', যেন মাসীর চিন্তাটা ভূত হয়ে মাধুরীর মাথায় ভর করেছে। 'ভদ্রমহিলা নতুন মেয়ের খোঁজ নিয়ে এসেছিল; মাষ্টারকে আবার বিয়ে করাবে।'

'এই এতক্ষণ পর সার কথাটি বলতে পারলে।' রামানন্দ হেসে বড় করে মাথা ঝাঁকাল।

'হুঁ, নতুন মেয়ে—নতুন পুতুলের খবর নিয়ে এসেছিল মাসী। বুঝলি শফী?' রামানন্দ শফীর দিকে চোখ ফেরাল।

স্যারের বিয়েটিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে। একটু যেন লজ্জা পেয়ে শফী মাটির দিকে চোখ রেখে টিপে টিপে হাসছিল।

'তুমি কি রাজী হয়েছ মাষ্টার!' মাধুরীর উৎকণ্ঠা দূর হল না। 'দেখলাম যেন মাসীর সঙ্গে ঝগড়াটগড়া করছিলে?'

'আহা, আগে তো আমাকে মেয়ে দেখতে হবে। ভদ্রমহিলা চাইছিলেন এখনি তাঁকে কথা দেই—সেটা কি করে সম্ভব তোমরাই বল!'

'না, তা কি করে সম্ভব।' মাধুরী এতক্ষণ পর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারল। 'নিজে পাত্রী না দেখে কক্ষনো কথা দেবে না, বিশেষ তোমার আগের বউটা যখন এমন করে দাগা দিয়ে ঘর ভেঙে চলে গেল। কি বলিস শফী?'

শফী ঘাড় কাত করল।

রামানন্দও নিশ্চিন্ত হল। এদের কাছে এই ভাল। রামানন্দ এককালে কবিতা লিখত, তার কবেকার লেখা একটা পচা কাব্যনাটিকা মঞ্চস্থ করতে পাইকপাড়ার কোন এক সোনালী বাসর উঠে-পড়ে লেগেছে, আর সেই মামলা নিয়ে অধ্যাপিকা হেনা সেন দুপুরের রোদ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে এখানে ছুটে এসেছিল—এই সমস্ত হাবিজাবি কথা মাধুরী ও শফীর মাথায় ঢুকত না। তাদের মাথার ভিতরটা এখানকার নীল আকাশের মতন ঝকঝকে সুন্দর, পায়ের নিচের দূর্বাঘাসের মতন নরম মন। শহুরে সংস্কৃতির হাজার ভড়ং-ভাড়ং-এর চেয়ে সরাসরি জন্ম মৃত্যু বিয়ে তারা ভাল বোঝে। হুঁ, রামানন্দ মাষ্টারের বউ রামানন্দকে ছেড়ে চলে গেছে, সুতরাং রামানন্দ আবার বিয়ে করবে। এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তারা ধরে নিয়েছে। বিয়ে, গাঁয়ে চড়কের মেলা বসলে দল বেঁধে মেলায় যাওয়া, চড়ুইভাতি খাওয়া, দুপুরের গনগনে রোদে খালের জলে চোখ লাল করে ডুবিয়ে সাঁতার কাটা, মাদার ফুল ফুটলে একমুঠো ফুল চুলে গুঁজে দেওয়া। সংসারে এর অতিরিক্ত কোনো জিনিস আছে বোঝাতে গেলেও এই দুটি মানুষ বুঝবে না।

'আহ্, শনিবারের আগেই যদি মানুষটা বাড়ি এসে যায়! খুব মজা হয়, কেমন রে শফী!'

অক্ষয়ের কথা বলছে মাধুরী।

রামানন্দ গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল।

'উঁহু, বরং শনিবারটি পার করে অক্ষয় বাড়ি আসুক আমি চাইছি।'

'কেন!' মাধুরী ভুরু কুঁচকোলো।

'এখনো শরীরটা দুর্বল। তেমন করে হাঁটা-চলা করতে পারবে না, করা ঠিকও না। আমরা তিনজন হইহই করে মেলায় যাব, আর বেচারা একলা ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকবে। ভীষণ মন খারাপ লাগবে তার।'

কথাটা মাধুরী বুঝল।

'তা-ও বটে। আমাদেরও কষ্ট হবে। সবাই যাচ্ছি, ও যেতে পারছে না।' রামানন্দর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মাধুরী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'বরং শনিবারটা পার করে বাড়ি আসুক—ঠিকই বলেছ মাষ্টার।' যেন বিড়বিড় করে গাছটার সঙ্গে ও কথা বলতে লাগল।

একটা হলদে প্রজাপতি মাধুরীর ফুল-গোঁজা খোঁপার কাছে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। শফীর চোখের পলক পড়ছে না। সেদিকে তাকিয়ে আছে।

রামানন্দর মনে হল এক জোড়া কালো প্রজাপতি। অশান্ত হলদে প্রজাপতিটা উড়ছে। শফীর চোখের প্রজাপতি দুটো স্থির শান্ত হয়ে আছে।

।। ১৫ ।।

আজ পদাবলী বেরিয়েছে। যেদিন কাগজ বেরোয় মোহনবাবুর চায়ের দোকান একটু বেশি গরম থাকে। চায়ের পর চা অর্ডার দেওয়া হয়।

মোহনবাবুর দোকানের চপ, কাটলেটের স্বাদ ভাল জানা আছে বলে শুভেন্দুরা ভুল করেও সেদিকে পা বাড়ায় না। বাইরে থেকে মুড়ি আসে, তেলেভাজা আসে, সঙ্গে এত চিনাবাদাম।

এইজন্য মোহনবাবুর মনে দুঃখ বা অভিমান নেই। বরং টেবিলে খবরের কাগজ বিছিয়ে যখন মুড়ি ঢালা হয়, তেলেভাজার ঠোঙা খোলা হয় এবং শুভেন্দুরা চার-দিকের চেয়ার টেনে নিয়ে গোল হয়ে বসে, ঠিক সেই মুহূর্তে হিসাবের খাতা বন্ধ করে মোহনবাবু একা-পা দু-পা করে সেখানে এসে দাঁড়ায়।

এটা শুরু হয়েছে রামানন্দ চলে যাবার পর। যেন রামানন্দর অভাবটা পূরণ করার জন্য এবং শুভেন্দুরা মনে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে, এই হিসাবে মোহন পাল কবিদের সঙ্গে আজকাল একটু বেশি কথাটথা বলেন, আগের মতন মুখ বুজে কেবল হিসাবের খাতার ওপর ঝুঁকে না থেকে কবিদের টেবিলের কাছেও সময় সময় এসে দাঁড়ান।

দুপুরের দিকে কালবৈশাখীর মতন একটা জোরালো হাওয়া উঠেছিল, প্রচুর ধুলো উড়েছিল। তাপটা বেশ কমে গেছে। বৃষ্টি হয়নি যদিও। তারপর থেকে আকাশ মেঘলা হয়ে আছে।

ক'দিন ধরে একটানা খরা ও গরমের পর একটু ঠাণ্ডা লাগছিল। কাজেই গরম চায়ের সঙ্গে মুড়ি, তেলেভাজা জমেছিল ভাল। তাছাড়া আজ কবিতা-পত্র পদাবলী ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। কাগজ বেরোনো না পর্যন্ত সকলের চোখেমুখে কী ভয়ানক দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ঝুলছিল কাল বিকেল পর্যন্ত তা দেখা গেছে। আজ সকলেই নিশ্চিন্ত, প্রফুল্ল।

'খাবেন নাকি মোহনবাবু! একমুঠ তুলে নিন।'

'আপনারা খান। আমি দেখছি।' মোহন পাল অমায়িক হেসে ঘাড় কাত করল।

মোহনবাবু দেখেই তৃপ্তি পান।

'তা তো বটেই।' বিকাশ একটা টুসটুসে কড়া লংকা তুলে কামড় বসাল। 'আমরা কবিতা লিখি—দেখে মোহনবাবুর তৃপ্তি, আমরা কবিতা নিয়ে আলোচনা করি—শুনে মোহনবাবুর অগাধ আনন্দ।'

মুখের মুড়িটা মজিয়ে নিয়ে অমলেন্দু বলল, 'এখনো এমন একটি-দুটি মহৎ

লোক আছে বইকি। অপরের তৃপ্তিতে নিজের তৃপ্তি, অন্যের আনন্দ দেখে আনন্দ লাভ।'

শুভেন্দু মাথা ঝাঁকাল।

'আমাদের হাতে কলকাঠি থাকলে এমন মহৎ অন্তঃকরণের জন্য মোহনবাবুকে একটা প্রাইজ পাইয়ে দিতাম।'

'প্রাইজ! পুরস্কার!' মোহনবাবুর চোখ গোল হয়ে উঠল। এক সঙ্গে শুভেন্দু, বিকাশ ও অমলেন্দুকে দেখল।

'হুঁ, তাইতো।' অমলেন্দু তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 'কেবল কি বড় বড় কবি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক—যাঁরা সদাশয় সত্যিকার গ্রেটম্যান—পরার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেন এমন সব মহানুভবদের পুরস্কার দিয়ে আজকাল সম্মানিত করা হচ্ছে, আপনি কি খোঁজ রাখেন না?'

খোঁজ রাখেন বইকি। একটা বুদ্ধির হাসি মোহন পালের চোখেমুখে সঙ্গে সঙ্গে খেলা করে উঠল।

'আমি আর কী করলাম আপনাদের জন্য, কতটা করলাম!'

'আরে বাপ্! আপনি করেননি?' শুভেন্দু নাকের একটা শব্দ করল। আজ এই মোহন রেষ্টুরেণ্ট দিয়ে কলকাতা শহরে আপনি মশাই তিনখানা জাহাজের মতো বাড়ি তুলতে পারতেন। কিন্তু তা তো করেননি। লাভ লোকসানের কথা চিন্তা না করে দোকানটা স্রেফ আমাদের কবিদের ছেড়ে দিয়েছেন—আপনার এখানে আড্ডা গাড়তে না পারলে পদাবলীগোষ্ঠীর কবিতা—আধুনিক কবিতা নিয়ে রকমারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা আন্দোলন কবে থেমে যেত—'

'হুঁ, থেমে যেত।' মুখে সিগারেট গুঁজে অমলেন্দু মাথা ঝাঁকাল।

'কী যে বলেন আপনারা। জাহ্নবীর স্রোত কখনো থামতে পারে!'

'হিয়ার! হিয়ার!' শুভেন্দু, বিকাশ সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। টেবিল চাপড়াল।

মোহনবাবুর গোলগাল ভোঁতা মুখে আবার একটা বুদ্ধির দীপ্তি ঝিকিয়ে উঠল। বস্তুত এটা আগে দেখা যায়নি। রামানন্দ থাকতে শুভেন্দুরা মোহনকে নিয়ে এতসব রগুড়ে কথাও বলত না এবং মোহন পালও কথায় কথায় হিসাবের খাতা ছেড়ে কবিদের কাছে চলে এসে এমন খোলাখুলিভাবে তাদের আলোচনায় যোগ দিত না। আর, যেন সব বুঝতে পেরেছে, কবিদের মনে এমন একটা ধারণা জন্মিয়ে দিতে বুদ্ধিমানের মতন হাসতোও না। মানুষটার বুদ্ধি আছে তাই এতদিন জানা যায়নি। বস্তুত রামানন্দর সামনে শুভেন্দু, বিকাশ থেকে আরম্ভ করে এই মোহনবাবুটিও যেন কেমন ম্লান হয়ে ছিল। যেমন আকাশে যতক্ষণ সূর্য আছে, অন্য সব গ্রহ নক্ষত্রদের চেনা যায় না, বোঝা যায় না। কার কতটা দীপ্তি কতটা ঔজ্জ্বল্য সূর্য অস্ত যাবার পর প্রকাশ পায়। আজ শুভেন্দু, অমলেন্দুরা ধারাল রসাল এক একটা কথা বলছে আর সেটা হৃদয়ঙ্গম করে মোহন পাল ইনটেলেকচুয়াল হসি হাসছে।

'হুঁ, আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এ-দিনে এমন কেউ করে না। আপনি কবিতা লেখেন না, কবিতা পড়েন না, কিন্তু কবিদের ভালবাসেন, এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।'

'পড়ি, আপনাদের কবিতা একেবারে যে না পড়ি তা ভাববেন না কিন্তু।' মোহন পাল বিড়বিড় করে উঠল ও সেই সঙ্গে পশমী চাদরের তলা থেকে মোটা রোমশ হাতখানা বের করে, সবাই ভেবেছিল টেবিল থেকে মুড়ি-তেলেভাজা কিছু তুলে নেবে, তা না করে টেবিলের একপাশে জড়ো করে রাখা নতুন ছাপা হয়ে আসা এক-কপি পদাবলী তুলে নিল।

অভূতপূর্ব দৃশ্য। মোহনবাবুর হাতে শুভেন্দুরের কবিতা-পত্র! হাতের কাছে ক্যামেরাটা থাকলে শুভেন্দু একটা ছবি তুলে নিত। মোহন পাল পদাবলীর পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে এ যেন বিশ্বাস করতেও তাদের বাঁধছিল। বিকাশের দিকে চোখ তুলে অমলেন্দু টিপে টিপে হাসল।

'কেমন হয়েছে কাগজ, মোহনবাবু?'

'চমৎকার! এবারের মলাটখানা যা হয়েছে না, দেখলেই হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে করবে।'

'ঠিক বলেছেন, কভারটা দারুণ হয়েছে, নতুন আর্টিস্টকে দিয়ে করিয়েছি। বেলা দশটার সময় পাতিরামের স্টলে দু'শ কপি দিয়েছিলাম। একটু আগে খোঁজ নিয়ে জানলাম এর মধ্যেই পঞ্চাশ কপি বিক্রী হয়ে গেছে।'

'হবেই।' বিকাশের দিকে চোখ তুলে মোহন পাল বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়ল। 'আপনারা চালিয়ে যান চালিয়ে যান, রামানন্দবাবু নেই বলে পদাবলী বন্ধ হয়ে যাবে এটা ঠিক না।'

তা কি আর বন্ধ হয়। বিকাশ বিড়বিড় করে উঠল। মুড়ি-তেলেভাজা শেষ। তেলের দাগধরা খবরের কাগজখানা টেবিল থেকে তুলে শুভেন্দু দলা পাকিয়ে একটা বলের মতন করে দরজার দিকে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু চৌকাঠের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে কাগজটা গড়াতে গড়াতে মোহন পাল যে টেবিলে বসে হিসাবের খাতা লেখে, ঠিক সেখানে ফিরে এল। দেখে মোহন শব্দ করল না। রোজ এমন অনেক ছেঁড়া কাগজের টুকরো কবিরা দোকানের মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যায়। পরে দোকানের ছোকরা কর্মচারীকে দিয়ে ঝাঁট দিয়ে সেসব পরিষ্কার করা হয়।

আসলে মোহন পাল থেকে আরম্ভ করে শুভেন্দু, বিকাশ, অমলেন্দু—সকলেই যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

এই সংখ্যার পদাবলী হাতে নিয়ে মোহন মলাটের প্রশংসা করল। ওপর ওপর দু'চারটে পাতা নেড়েচেড়ে আবার কাগজটা টেবিলে রেখে দিল। মোহন পাল দেখল না, গেল-বারের মতন এবারও রামানন্দ সেনের কবিতা নেই। কিন্তু গত সংখ্যার পদাবলীতে রামানন্দকে নিয়ে আলোচনা ছিল। আজ পর্যন্ত যতগুলি পদাবলী বেরিয়েছে প্রতিবার রামানন্দকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রামানন্দর বিশেষ কোনো কবিতা নিয়ে অথবা তার সমগ্র কবিতাকর্ম নিয়ে বা আধুনিক তরুণ কবিদের কথা বলতে গিয়েও শেষে রামানন্দকেই টেনে আনা হয়েছে। আধুনিক কবিতা ও কবি-দের নিয়ে আলোচনাটাই পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। প্রতিবারই বিভিন্ন কবির ডজন দুই কবিতার শেষে একটা করে আলোচনা ছাপা হচ্ছে। প্রত্যেকটা আলোচনায় রামানন্দর উল্লেখ থাকবেই।

কিন্তু এবার নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে। আধুনিক কবিতার ওপর প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে লেখক বার বার বিকাশের কথা, শুভেন্দুর কথা বলেছে, অমলেন্দু গুপ্তর উল্লেখ আছে, অরুণাভ, নবকিশোরের নাম আছে। কবি রামানন্দ সেনের নাম কোথাও নেই। প্রবন্ধের লেখক কোন্ এক বেচারাম গলুই। বোঝা যায় ছদ্মনাম। বাইরের লোক তো নয়ই, পদাবলীগোষ্ঠীর একমাত্র শুভেন্দু, বিকাশ ও অমলেন্দু ছাড়া এখন পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি, আধুনিক কবিতার ওপর এই উজ্জ্বল মননশীল আলোচনাটি কার কলম থেকে বেরিয়েছে। তবে কেউ কেউ সন্দেহ করছে বেচারাম গলুইটি বিকাশ চাটুয্যে ছাড়া আর কেউ না।

সে যাই হোক, মোহন পাল কতটা বুঝতে পারল তা মোহন পালই জানে, কিন্তু এই সংখ্যার পদাবলী হাতে নিয়েই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবে, কবি রামানন্দ সেনকে অগ্রাহ্য করার, অস্বীকার করার একটা প্রচ্ছন্ন অভিযান যেন এখন

থেকে শুরু হয়ে গেছে।

অবাক হবার কিছুই নেই।

রামানন্দ সেন থাকল না বলে পদাবলী পত্রিকা থাকবে না, রামানন্দ আর কবিতা লিখছে না বলে অন্য সব কবি কলম ধুয়ে বাক্সে তুলে রাখবে, এ একটা কথাই না।

শুভেন্দুরা গোড়ার দিকে মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু আবার তারা কোমর বেঁধে লেগেছে। নূতন উদ্যম নিয়ে কবিতা লিখছে, নূতন উৎসাহ নিয়ে কাগজ বার করছে। বরং একটা অন্যরকম মেজাজ এসে গেছে তাদের। একটা প্রচণ্ড গাছের মতন রামানন্দ সকলের মাথার ওপর ছায়া ছড়িয়ে ছিল। গাছটা সরে গেছে, বা বলা যায় মারা গেছে। কেননা, যে লেখক লেখা বন্ধ করে দেয়, যে শিল্পী আর ছবি আঁকে না—শারীরিক অর্থে বেঁচে থাকলেও শিল্পের ক্ষেত্রে তাকে মৃত বলে ধরে নিতে কারো আপত্তি থাকে না।

কাজেই মাথার ওপর থেকে বিশাল ছায়াটা সরে যাওয়াতে পদাবলীগোষ্ঠীর কবিদের গায়ে নতুন রোদ বৃষ্টি তরতাজা হাওয়া লাগছে। নিজেদের মতন করে তারা এখন বড় হতে, বেড়ে উঠতে চাইছে।

নিজেদের মতন করে বড় হওয়া, বেড়ে ওঠা কবি শিল্পীদের একটা নেশার মতন। এই সুযোগ তারা কখনো হাতছাড়া করে না। স্বয়ম্ভু হবার বাসনাটা তাদের চির-কালই প্রবল।

এখন এই সংখ্যার পদাবলী হাতে নিয়েই মোহন পাল যে রামানন্দর কথা বলল, রামানন্দ না থাকলেও পত্রিকা যাতে বন্ধ রাখা না হয়, শুভেন্দুদের এই ধরনের একটু উপদেশ-টুপদেশ দিল, আসলে রামানন্দকে মোহন পাল ভুলতে পারছে না, রামানন্দর অভাবটা অন্য আর পাঁচজনের চেয়ে এই মানুষটা একটু বেশি অনুভব করছে—মোহনের গলার স্বর থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

কাজেই শুভেন্দুরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

রামানন্দ সম্পর্কে মোহন পালের আবেগ তাদের ছিল না। মোহন পাল কবিতা লেখে না। শুভেন্দু, বিকাশরা কবিতা লেখে। রামানন্দও কবিতা লিখত। কেবল লিখত না, আধুনিক কবি হিসাবে সর্বত্র সর্বাগ্রে নামটা উচ্চারিত হয়েছে। এই কারণে রামানন্দ সম্পর্কে তাদের আবেগ যত না ছিল, তুলনায় ঈর্ষাটা ছিল অনেক বেশি।

মোহন পাল এই জিনিস কোনোদিন বুঝবে না, এই যা রক্ষা।

'কেমন বৃষ্টিটা হয়েও কিন্তু হল না মোহনবাবু!' আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে উঠেছিল, একটা কিছু বলতে হয়, বুদ্ধি করে বিকাশ বৃষ্টির কথা বলল।

'হুঁ, রীতিমত খরা চলেছে। কবে যে জল হবে ঈশ্বর জানে।' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের আকাশটা একনজর দেখে মোহন নিজের আসনে ফিরে গেল।

'গরম জিলিপি খাবেন মোহনবাবু, আনাব? শুভেন্দু উঁচু গলায় বলে উঠল।

সব ক'টা নোংরা দাঁত বের করে মোহন হাসল।

'আপনারা খান। আজ পদাবলী বেরিয়েছে, আপনাদের কত আনন্দের দিন।'

'বা-রে, আপনারই বা কম আনন্দ কিসে—অমলেন্দু বলতে যাচ্ছিল, বাধা পেল। হুড়মুড় করে চশমা-পরা সুন্দর চেহারার একটি ছেলে দোকানে ঢুকল। গায়ে ফুল-হাতা শার্ট, হাত যদিও গুটানো, বাঁ কব্জিতে ঘড়ি, পরনে প্যাণ্ট, পায়ে বার্মিজ স্যাণ্ডেল। বাঁ হাতে যেমন ঘড়ি, ডান মণিবন্ধে টুকটুকে নীল একটা রুমাল জড়ানো।

শুভেন্দুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'পলাশ, এতকাল পর?'

'কলকাতায় ছিলাম না।' পলাশ গাঙ্গুলী মেয়েদের মতন করে হাসল। তার

মুখের ডৌল, ভুরু ও চিবুকে একটা মেয়েলী শ্রী রয়েছে। তাছাড়া বয়সে এখানে সকলের ছোট। যে জন্য শুভেন্দু, বিকাশদের কাছে তার একটা অতিরিক্ত প্রশ্রয় সব সময়েই পাওনা থাকে। ফলে বড়দের কাছে তার আব্দারটাও অন্যদের চেয়ে বেশি। এবং শুভেন্দু, বিকাশ বা অমলেন্দু যেন খুশি হয়ে তার আব্দার-টাব্দারটা পূরণ করার চেষ্টা করে। অন্তত অরুণাভ নবকিশোররা তাই লক্ষ্য করছে। যেমন ছোট-দের মধ্যে অরুণাভ, নবকিশোর, উৎপলেন্দু, রজত ও রাকেশ এই সংখ্যার পদাবলীতে একটা করে কবিতা লিখেছে, পলাশও লিখেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বড়দের লেখা অর্থাৎ শুভেন্দু, বিকাশ ও অমলেন্দুর কবিতার ঠিক পরেই ডানদিকের একটা পৃষ্ঠা সবটা জুড়ে বেশ চোখে পড়ার মতন করে পলাশ গাঙ্গুলীর এক সঙ্গে দুটো কবিতা ছাপা হয়েছে। এই একবার না, গত কয়েক সংখ্যার কাগজেই পলাশের প্রতি শুভেন্দুদের এ ধরনের –হুঁ, ভাবতে গেলে তো অন্যায়ই: অরুণাভ, নবকিশোর রজত, রাকেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে, পক্ষপাতিত্বটা চোখে লাগার মতন। অথচ কবিতার মেরিট বিচার করলে, নবকিশোরদের দৃঢ় বিশ্বাস, পলাশের লেখা কখনই এমন ঘটা করে আগের দিকের পাতায় ছাপা হতে পারে না। পদাবলী ছাড়া অন্য যে-কোনো একটা কবিতা ম্যাগাজিনে যদি ঠিক এই ক'জন কবিই একসঙ্গে লেখা পাঠাতো তো সেখানে আর যা-ই হোক, এই অবিচারটা হতো না। হয়তো দেখা যেত পলাশ গাঙ্গুলীর কবিতা সকলের পিছনে ছাপা হয়েছে। অন্য কাগজ আদৌ তার কবিতা ছাপবে কিনা সন্দেহ আছে। অরুণাভ প্রায়ই কথাটা বলে। দুঃখের বিষয়, পদাবলীগোষ্ঠীর রামানন্দ, শুভেন্দু, বিকাশ, অমলেন্দু অর্থাৎ বড় বড় কবিরা ছাড়া আর কোনো নবীন কবি এখন পর্যন্ত অন্য কোনো পত্র-পত্রিকায় লেখার সুযোগ পায়নি। সুযোগ পায়নি এই হিসাবে, অন্য কোনো কাগজের পক্ষ থেকে কবিতা পাঠাবার জন্য তাদের আজও সরকারীভাবে ডাকা হচ্ছে না। তা বলে অরুণাভ কি নবকিশোর কি উৎপলেন্দু যদি যেঁচে কোথাও কবিতা পাঠায় তো নিশ্চয়ই আদর করে সেগুলি ছাপা হবে। কিন্তু পদাবলীগোষ্ঠীর প্রেষ্টিজের কথা চিন্তা করে শুভেন্দুদের নির্দেশমত নবকিশোররা, যাকে বলে গায়ে পড়ে কোনো কাগজে লেখা পাঠাচ্ছে না। এই নিয়েই তাদের মধ্যে বলাবলি হয়, অন্য কোনো কাগজ নবকিশোর কি অরুণাভ কি রজত, রাকেশ বা উৎপলেন্দুর কবিতার যে মর্যাদা দেবে, পলাশের কবিতার তার সিকিভাগ মর্যাদা দেবে কিনা তাদের সন্দেহ রয়েছে। এই অবস্থায় এই 'ইঁচোড়পাকা' ছোঁড়াটাকে শুভেন্দু, বিকাশরা যেন মাথায় নিয়ে আছে। কেন? ছোকরার চেহারাটা সুন্দর মেয়েলী বলে? বাপ ইউনিভার্সিটির নামকবা অধ্যাপক বলে? প্রাচীন বাংলা কবিতার ওপর রিসার্চ করে ভদ্রলোক ডক্টরেট হয়েছেন বলে? আশ্চর্য কি, নিশ্চয় শুভেন্দুরা আশা করছে ডক্টর স্নেহময় গাঙ্গুলী ভবিষ্যতে আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে রিসার্চ শুরু করবেন। আর তখন তিনি তাঁর সুবৃহৎ গবেষণামূলক গ্রন্থে রামানন্দ সেনের সঙ্গে পদাবলীগোষ্ঠীর বাকি তিনটি প্রতিভা অর্থাৎ শুভেন্দু ভৌমিক, বিকাশ চাটুয্যে ও অমলেন্দু গুপ্তর কবিতা ফলাও করে আলোচনা করবেন। এই?

এসব অবশ্য নবকিশোরদের রাগের ভাবনা। জলপাইগুড়ির ছেলে, ক'দিন হয় পলাশ পদাবলীগোষ্ঠীতে ভিড়েছে? এর মধ্যেই 'শুভেন্দুদা'কে 'বিকাশদা'কে ছোঁড়া কেমন চমৎকার হাতের মুঠোয় করে ফেলেছে। এইতো গত পৌষালী সংখ্যার পদাবলীতে, যেহেতু স্পেশ্যাল সংখ্যা হিসাবে কাগজ একটু মোটা করা হয়েছিল, আধুনিক কবিতা ও কবিদের ওপর দুটো অতিরিক্ত প্রবন্ধ ছাপা হয়। শুভেন্দু একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। আর একটা অমলেন্দু গুপ্তব লেখার কথা ছিল। যে কোনো কারণে অমলেন্দুর লেখা হয়ে ওঠেনি। কাগজ বেরোলে নবকিশোরদের চোখ ছানা-

বড়া হয়ে গেল। অমলেন্দুর জায়গায় পলাশ গাঙ্গুলী আধুনিক কবিতার ওপর আলোচনা করেছে। জিনিসটা তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। এখনো যাকে কবিতার 'ক' মক্‌শ করতে হচ্ছে সে কিনা আধুনিক কবিতা ও কবিদের নিয়ে প্রবন্ধ লিখে ফেলল, আর ঘটা করে পদাবলীতে সেটি ছাপাও হল! রামানন্দ সেন থাকতেই এটা হয়েছিল। নবকিশোরদের বিশ্বাস, শুভেন্দু ভৌমিক ও বিকাশ চাটুয্যে খোদ সম্পাদকের সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ না করেই, যেহেতু 'লাল ছেলে' পলাশের ওপর দুজনের অতিমাত্রায় দুর্বলতা রয়েছে, এমন একটা কাঁচা হাতের লেখা প্রবন্ধ ছেপে দিয়েছিল। অবশ্য সম্পাদক হয়েও রামানন্দ সেন কি-ই-বা দেখতেন। কবিদের সব কিছুই শুভেন্দু ও বিকাশের এবং কিছুটা প্রফেসর অমলেন্দু গুপ্তর ইচ্ছা অনুসারে. এখন যেমন হচ্ছে, আগেও হতো। রামানন্দ নামেই সম্পাদক ছিলেন। একমাত্র নিজের লেখাটা ছাপা হয়ে বেরোবার পর একবার সেটার ওপর চোখ বুলোনো ছাড়া, তাও সব সময় করতেন কিনা সন্দেহ. কাগজের বাকি পৃষ্ঠাগুলিতে সাপ ছাপা হচ্ছে কি ব্যাং ছাপা হল, জানতে বা দেখতে তাঁর আগ্রহ কৌতূহল মেজাজ ধৈর্য কোনোটাই ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টা যে মানুষ নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকে, বাইরের অন্য কিছুর দিকে সে চোখ তুলে তাকাবে তা অবশ্য আশাও করা যায় না। রামানন্দর আত্মসমাহিত ভাবটাই নবকিশোরদের চোখে বেশি পড়ত।

মোটের ওপর পলাশ এখানে এসে জুটেছে পর থেকে নবকিশোরদের মনে শান্তি নেই। একটা চাপা ঈর্ষা নিয়ে পদাবলীর এই ক'টি তরুণ কবি ভুগছে।

শুভেন্দুদের আশকারা পেয়ে ছোঁড়া দিন দিন মাথায় উঠছে তারা চোখের ওপর দেখছে। দেখে চুপ করে থাকে। যেমন সিগারেটের ব্যাপারটা। আগেই বলা হয়েছে শুভেন্দু বা বিকাশ কি অমলেন্দু নিজে থেকে না চাইলে নবকিশোর অরুণাভ রজত বা রাকেশ কখনো পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে না। ইঁচড়ে পাকা পলাশের সেসব বালাই নেই। দোকানে ঢুকেই আগে পকেট থেকে সিগারেট বের করে শুভেন্দু, বিকাশ ও অমলেন্দুর হাতে একটা করে গুঁজে দিয়ে নিজে একটা ধরাবে। নবকিশোরদের দিকে ঠিক সেই মুহূর্তে ভুল করেও তাকাবে না। যেন তারা ক'টা নাবালক বসে আছে। তাদের সিগারেট অফার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যেন শুভেন্দু, বিকাশ ও অমলেন্দুর সমবয়সী সে। অথবা কবি হিসাবেও সে এই তিন কবির সমকক্ষ। সিগারেট ধরিয়ে ঐ তিনজনের কারো চেয়ারের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, দরকার হলে তাদের কারো একজনের চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পড়ে কথার খই ছিটোতে থাকবে। হেন জিনিস নেই যা নিয়ে সে কথা বলে না। যেন পৃথিবীর সব কিছু তার জানা হয়ে গেছে, দেখা হয়ে গেছে।

ক'দিন ছোঁড়া কলকাতায় ছিল না। নবকিশোররা শান্তিতে ছিল। আজ ঠিক পদাবলী বেরোল আর শ্রীমান এসে উপস্থিত। আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। নবকিশোর ও অরুণাভর মতন রজত ও রাকেশও চাপা অস্বস্তি নিয়ে গুম হয়ে রইল।

'কোলকাতার বাইরে কোথায় গিয়েছিলে?'

রুদ্ধশ্বাসে নতুন পদাবলীটা উল্টেপাল্টে একবার দেখে নিয়ে পলাশ শুভেন্দুর চোখের দিকে তাকাল।

'পুরী।'

'ক'দিন ছিলে?'

'দু হপ্তা।'

'বাঃ, চমৎকার! অমলেন্দু গুপ্ত উত্তর করল। 'দু হপ্তা সমুদ্রের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আসা রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

'ক'টা কবিতা লিখলে?'

বিকাশের চোখে চোখ রেখে পলাশ মাথা নাড়ল।

'একটাও না, বিশ্বাস করুন বিকাশদা।'

'চৌদ্দ-পনেরো দিন স্রেফ নোনা বাতাস খেয়ে কাটালে!' বিকাশ অবাক হবার মতন চেহারা করল।

'হুঁ, কেবল বালুর ওপর হাঁটলাম আর সমুদ্রের গর্জন শুনলাম।'

'চেহারাটার একটু উন্নতি হয়েছে।'

'আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম।' শুভেন্দুর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অমলেন্দু মাথা নাড়ল এবং পরক্ষণে আবার পলাশের দিকে চোখ ফেরাল। 'ভীষণ ফ্রেশ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

পলাশের মেয়েলী মুখে একটা গর্বের হাসি ফুটল।

'আমার পুরী ভ্রমণের কাহিনী একদিন ধীরেসুস্থে বসে আপনাদের শোনাব। দারুণ স্ফূর্তি হয়েছিল সেখানে।'

'বান্ধবীটান্ধবী নিশ্চয় জুটেছিল?'

অমলেন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে পলাশ মিটিমিটি হাসল। কিছু বলল না।

'তোমার বাবার শরীর এখন কেমন?' বিকাশ প্রশ্ন করল। 'ক'দিন আগে কাগজে দেখেছিলাম ডাঃ গাঙ্গুলী অসুস্থ?'

'এই জন্যই তো তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হল।' পলাশের গলার স্বর হঠাৎ শুকনো শোনাল। 'বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম গেল। এসে অবিশ্যি দেখলাম অবস্থা আর খারাপের দিকে যায়নি। বরং কাল বিকাল থেকে বাবা উঠে বসছেন-টসছেন। মানে ফার্স্ট স্ট্রোক তো—'

'যাক গে, কাগজে খবরটা দেখে আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন ভালয় ভালয় তিনি সেরে উঠুন।'

'তা উঠবেন, দারুণ ভাইটালিটি ভদ্রলোকের।' পলাশ পকেট থেকে সিগারেট তুলে বিকাশ, শুভেন্দু ও অমলেন্দুর হাতে তিন শলা গুঁজে দিয়ে নিজে একটা ধরাল। নবকিশোরদের দিকে ফিরেও তাকাল না। নবকিশোররা চাপা আক্রোশ নিয়ে দাঁত ঘষছিল। নিতান্তই আজ কাগজটা বেরিয়েছে। না হলে তারা উঠে কখন দোকান থেকে বেরিয়ে যেত। মাথা-পাকা ছেলেটাকে নিয়ে তিনটি বয়স্ক কবি এমন মেতে উঠেছে! যেন কতদিন পর পরিচিত একটি কিশোরীর দেখা পেয়েছে তারা।

'বাবা ঠিকই সেরে উঠবে—মাঝখান থেকে হুট করে একটা টেলিগ্রাম গিয়ে আমার ওখানকার আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।' পলাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আবার যাবে, আবার বান্ধবীকে নিয়ে পুরীর বালুবেলায় বসে আনন্দ করবে।' পলাশের পিঠে হাত বুলিয়ে শুভেন্দু সান্ত্বনা দিল।

'ও ভাল কথা, রামানন্দদা এসেছিলেন?'

'নাঃ', পলাশের পিঠ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে শুভেন্দু ভুরু কুঁচকোল। 'হঠাৎ তোমার রামানন্দকে মনে পড়ল!'

'পরশু রাত নটার পর অসিত শেয়ালদার মোড়ে রামানন্দকে দেখেছে।'

'অসিতটা কে?'

'আমার এক বন্ধু।'

'কবিতা লেখে?' বিকাশ উৎসুক চোখে তাকাল।

পলাশ হেসে মাথা নাড়ল।

'খুব ভাল ক্রিকেট খেলে। কবিতা লেখে না, কারো কবিতা পড়েও না। কবিতা তার মাথায়ই ঢোকে না।

'যাক গে', শুভেন্দু রামানন্দর কথা শুনতে চাইছিল।

'তোমার বন্ধু তাঁকে শেয়ালদার মোড়ে দেখল, কি করছিল রামানন্দ তখন? সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

'হুঁ', অসিত বলল, আরো দুজনকে সে রামানন্দর সঙ্গে দেখেছে, আর্টিস্ট জগত মণ্ডল ছিল আর নন্দদুলাল ছিল।'

'নন্দদুলালটা কে?'

'অশ্লীল গল্প-লেখক', পলাশ নাক সিঁটকাবার মতন চেহারা করল। 'নন্দদুলাল ভট্চায নাম শোনেননি?'

'আরে রামঃ! শেষ পর্যন্ত ওই স্কাউন্ড্রেলটার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে রামানন্দ। শুনেছি তো যেমন তার লেখা তেমনি নোংরা তার স্বভাবচরিত্র।'

'জগত মণ্ডল লোকটাও নাকি তাই শুনি।' বিকাশও নাক সিঁটকানো চেহারা করল। 'আঁকে ভাল কিন্তু জঘন্য চরিত্র মানুষটার। দিনরাত প্রস্-কোয়ার্টারে পড়ে থাকে।'

'অসিত তাই বলছিল, তিনজনের নাকি পা টলছিল, কোথাও খুব ড্রিঙ্ক করে রাস্তায় বেরিয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। একটু কৌতূহল নিয়ে সে একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভুদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।'

'তারপর?' শুভেন্দুর খুব খারাপ লাগছিল শুনতে। পদাবলীগোষ্ঠীর বন্ধুদের রামানন্দর ভাল লাগল না! কবিরা একটু বেশি মার্জিত পরিচ্ছন্ন? তাদের অভিজ্ঞতা ও চেতনার মূলে একটা বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি ক্রমাগত কাজ করে চলেছে, কবি-মনের এই সংস্কার, এই সফিস্টিকেশন রামানন্দকে ক্লান্ত পীড়িত করে তুলল? শেষ পর্যন্ত কে এক নন্দদুলাল ও জগত মণ্ডলের সঙ্গে—উঁহু, শুভেন্দু এ-ও চিন্তা করল, যেহেতু নন্দদুলাল সাহিত্য করে, জগত মণ্ডল ছবি আঁকে, ঠিক এই কারণে তারা রামানন্দকে আকর্ষণ করেনি, যেহেতু মেয়ে নিয়ে হুল্লোড় করতে, মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করতে ঐ দুটি মানুষের জুড়ি নেই, ঠিক সেই কারণে আজ তারা রামানন্দর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'পার্ভার্ট'। বিকাশ সেদিন ঠিক বলেছিল। শুভেন্দু নিজের মনে গজগজ করে উঠল। 'তারপর? ঐ মাতাল তিনটি কোনদিকে গেল?' তার গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল।

'অসিত দেখল উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। অসিত মেয়েটাকে প্রথম বুঝতে পারেনি। যেন সবে কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে, অফিস-টফিসে চাকরি করে, সাজ-পোশাকেরও দিক থেকে বেশ ভদ্র, চেহারাটাও সুন্দর। নন্দদুলাল হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে কী যেন বলল। তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি ডাকা হল। ট্যাক্সি চেপে দুজন একদিকে হাওয়া হয়ে গেল। পরে অসিত বুঝতে পেরেছে, রাস্তায় ঘোরা মেয়ে। শিকার ধরে বেড়ায়।'

'রামানন্দ কী করল তখন আর তার সঙ্গী জগত মণ্ডল? নিশ্চয় দুজনে খুব আপসোস করছিল?' অমলেন্দু অল্প শব্দ করে হাসল।

'উহুঁ', পলাশ মাথা ঝাঁকাল। 'সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ট্যাক্সি ডেকে দু'জনকে আগের ট্যাক্সিটার পিছু পিছু যেতে দেখেছিল অসিত।'

'তার মানে চারটিতে কোথাও একত্র হয়ে নরক গুলজার করে তুলেছিল।' শুভেন্দুর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল।

'যাক গে, শুভেন্দু, প্লিজ—আর আমি এই জিনিস শুনতে চাইনে', বিরক্ত চেহারা করে বিকাশ পরে পলাশের দিকে চোখ ফেরাল। 'বরং তুমি তোমার পুরীর বান্ধবীর গল্পটা আমাদের শোনালে পারতে হে ছেলে, আমরা খুশি হতাম, যে মরে গেছে, কোনোদিন যে আর আমাদের মধ্যে ফিরে আসছে না, হুট করে তুমি তার কথা তুলবে এ আমি কিন্তু আশাই করিনি, লীভ ইট।'

একটু চুপ থেকে অমলেন্দু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মত করে বলল, 'এত বড় একটা প্রতিভা এমন করে নষ্ট হয়ে যাবে ভাবতেও কেমন লাগে।'

'এবার আমি একটা কথা বলতে চাই অমলেন্দুবাবু, বিকাশবাবু, শুভেন্দু-বাবু।'

তিনজন এক সঙ্গে চোখ তুলে মোহন পালের দিকে তাকাল। সব ক'টা ময়লা দাঁত বের করে মোহন হাসছে।

'বলব ?'

'হুঁ, বলুন।'

'আপনারা চেঞ্জে যান—যান কিনা বলুন ?'

'যাই বইকি।' অমলেন্দু মোহনের কথার উত্তর দিল। 'পকেট অ্যালাও করলে ফি ছুটিতেই আমার চেঞ্জে যেতে ইচ্ছে করে—এই তো আমাদের পলাশচন্দ্র ক'দিন পুরীতে মহাআনন্দে কাটিয়ে এল।'

'আমার মনে হয় রামানন্দবাবুও তেমনি চেঞ্জে গেছেন।' মোহন আর হাসল না।

'ওই বেটা বেলেঘাটায় আছে।'—রুক্ষ গলায় বিকাশ বলল, 'আপনি তো শুনে-ছেন, সবই জানেন মোহনবাবু।'

'ওইতো ও'র চেঞ্জে যাওয়া।' গম্ভীর হয়ে মোহন বলল, 'দিনকতক আপনাদের আড্ডা থেকে সরে গিয়ে অন্য মানুষ দেখছে, অন্য হাওয়া গায়ে লাগাচ্ছে রামানন্দ সেন।'

'তাতে লাভটা কী শুনি।'

'নতুন আইডিয়া নতুন ইমেজ তিনি সংগ্রহ করছেন। দেখবেন ফিরে এসে রামা-নন্দ সাংঘাতিক সব কবিতা লিখছেন।' রামানন্দর চেয়ারটার দিকে অর্থাৎ শুভেন্দু যেটা দখল করে আছে, মোহন সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল। 'হুঁ, এই চেয়ারে আবার এসে তিনি বসবেন আর নতুন লেখা কবিতাগুলো আপনাদের পড়ে পড়ে শোনাবেন।'

শুভেন্দুরা স্তম্ভিত হয়ে মোহনের কথা শুনল, ফ্যালফ্যাল করে মানুষটাকে দেখল। উহুঁ, রামানন্দর কথা ভাবছিল না তারা, ভাবছিল মোহনকে। 'ইমেজ।' 'আইডিয়া'—দীর্ঘদিন ওই টেবিলে বসে হিসেবের খাতা দেখতে দেখতে শব্দ দুটো শুনেছে মোহন। আজ কেমন অবলীলাক্রমে জায়গা বুঝে দুটো শব্দ প্রয়োগ করতে পারল।

পায়ের শব্দ হতে সকলে দরজার দিকে চোখ ফেরাল। উৎপল। হাতে ফোলিও ব্যাগ। মাথায় রুমাল জড়ানো।

'রুমাল কেন ?' শুভেন্দু প্রশ্ন করল।

'টিপ টিপ পড়ছে যে।'

'তাহলে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে!'

অমলেন্দু দরজার বাইরে রাস্তাটা দেখল। 'সুখবর।' এবার জলের ফোঁটা তার চোখে পড়ল।

'তার চেয়েও বড় খবর, ভাল খবর নিয়ে এসেছি।'

সকলের চোখে কৌতূহল চিকিয়ে উঠল। মাথার রুমালটা খুলে ফেলে উৎপল একটা চেয়ার টেনে বসল। ব্যাগটা টেবিলে রাখল।

সকলেই অপেক্ষা করছিল ভাল খবরটা শুনতে।

'এই সংখ্যার পদাবলী সম্পর্কে নিশ্চয় কোনো খবর ?' বিকাশ আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না। 'ভাল সেল্ পাচ্ছে বুঝি ?'

উৎপল মাথা নাড়াল।

'পাইকপাড়ার সোনালী বাসর রামানন্দ সেনের কাব্যনাটিকা নগ্ন গোধূলি স্টেজে নামাচ্ছে।'

'তাই নাকি! কবে?'

'তেরোই মে।'

'তুমি কার কাছে খবরটা শুনলে?'

'শুনব কেন, পোস্টার দেখে এলাম। ট্রামে-বাসে ওরা পোস্টার মেরে দিয়েছে।'

'বড় অদ্ভুত তো!' শুভেন্দু বিড়বিড় করে উঠল। 'রামানন্দর অনুমতি না নিয়েই ওরা ওর কাব্যনাটিকা করছে?'

'শুনলাম অনুমতি পেয়েছে।' পলাশের সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল উৎপল। 'সকালে পোস্টার দেখেই আমি পাইকপাড়ার ওই ক্লাবের খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। শুনলাম রামানন্দর অনুমতি নিয়ে এসেছে।'

'কোথায় রামানন্দর দেখা পেল?'

'সেই বেলেঘাটার শেষ মাথায় সল্ট লেকের ধারে। একটা টালির বাড়ি। কার পোল্ট্রি যেন ওটা। লোকটার বউ, ছেলে, মেয়েও নাকি আছে। রামানন্দদা এখন সেখানে আস্তানা গেড়েছে।'

শুভেন্দু ও বিকাশ পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'তারপর?' অমলেন্দু উৎপলের দিকে ঝুঁকে বসল। 'আর কিছু শুনলে—!'

'সেদিন নাকি ওরা রামানন্দকেও পাইকপাড়া নিয়ে আসবে।'

'ইম্পসিব্‌ল। অসম্ভব।' বিকাশ মাথা ঝাঁকাল। 'রামানন্দ কোনোদিন কোনো সভা-সম্মেলন বা কাল্‌চারেল ফাংশানে আসে না। ওরা কী বলল? রামানন্দ রাজী হয়েছে?'

'রাজী হচ্ছে না, তবে ওরা নাকি, ক্লাবের একটি ছেলে আমায় যা বলল, যে-ভাবেই হোক কবি রামানন্দ সেনকে নিয়ে আসবে, ওদের সেদিনকার অনুষ্ঠানে তাঁকে চীফ গেষ্ট করা হচ্ছে, এই প্রোগ্রাম ওরা কিছুতেই বাতিল হতে দিচ্ছে না।'

ভুরু কপালে তুলে শুভেন্দু চুপ করে রইল। বিকাশও কিছু বলছিল না। অমলেন্দু চোখ বুজে সিগারেট টানছিল। নবকিশোর অরুণাভ অবশ্য প্রথম থেকে নীরব। ঐ পাকা ছেলেটার জন্য কোনো কথা বলতে তাদের ইচ্ছা করছিল না।

এবং এখন এই গভীর নীরবতার মধ্যে পলাশ গাঙ্গুলী গাল ভেঙে হাসল।

'মনে হচ্ছে যেন পাইকপাড়ার ছেলেরা রামানন্দদাকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসবে।'

'অনেকটা তাই', গম্ভীর হয়ে উৎপল বলল, 'পাইকপাড়ার ছেলেদের আমি চিনি, আমি নর্থ ক্যালকাটার মানুষ, গলায় গামছা দেবে না, তবে কথায় কথায় ওরা বোমা, রিভলভার বার করে। ভয়ানক অ্যারোগান্ট।'

অমলেন্দু নাকের শব্দ করে হাসল।

'আশ্চর্য', কেবল পাইকপাড়া না, কলকাতার অনেক জায়গায়ই দেখছি রকবাজ লক্কামার্কা ছেলের দল এখন বারোয়ারী পুজোটুজোর মতন খুব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছে। কাজেই সোনালি বাসরের ছোঁড়ারা যদি বোমা, রিভলবারের ভয় দেখিয়ে রামানন্দকে ধরে এনে চীফ গেষ্ট-এর চেয়ারে বসিয়ে দেয়, তাতে অবাক হবার কিছু থাকে না।'

'তাই করুক।' শুভেন্দু রাগে গিসগিস করছিল। 'উল্লুকটাকে, যেমন আমাদের ছেড়ে কোথায় সল্ট লেকের কোন্ বনবাদাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, এভাবে একটু জব্দ করা দরকার। অ্যাঁ, আমি ভাবতেই পারি না, একটা শিক্ষিত মানুষ,

মনের দিক থেকে, রুচির দিক থেকে অত্যন্ত পরিশীলিত পরিচ্ছন্ন প্রোগ্রেসিভ বলে যাকে এতকাল আমরা জেনেছি, বলা-কওয়া নেই, হুট্ করে লেখাটেখা বন্ধ করে বন্ধুবান্ধব ছেড়ে—কত কষ্ট করে কাগজটাকে আমরা প্রায় দাঁড় করিয়ে এনেছিলাম, একবার এটার কথা যে চিন্তাও করল না—গিয়ে এখন আসন গেড়েছে কে হাঁস-মুরগির চাষ করছে তার ঘরে—'

এতক্ষণ পর নবকিশোর কথা বলল।

'পরশু আর একবার আমি রামানন্দদার স্কুলে গিয়েছিলাম। শুনলাম রামানন্দদা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

'হা ঈশ্বর!' অমলেন্দু চেয়ারের পিঠে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। এক সেকেন্ড চোখ বুজে কিছু ভাবল। তারপর আবার সোজা হয়ে বসল। আমি তাই গেস্ করছি,—সল্ট লেকের ওই পোলট্রি—ওখানেই রামানন্দ সেন একটা কিছু করছে—অথবা করবে সেই ফিকিরে আছে, বলা যায় না, হয়তো হাঁস-মুরগির চাষ করবে ঠিক করে ফেলেছে।' অমলেন্দু হাসল।

'কিছু না, কিছু না, শুভেন্দু জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'ছেলে পড়ানো আর খাতা ভরে কবিতা লেখা ছাড়া—তার ওয়াইফ ঠিকই বলত, গাধাটার আর কিছু করার ক্ষমতা নেই—আমি অন্য কিছু আশঙ্কা করছি বিকাশ, তুমি বুঝতে পারছ?'

'মেয়েমানুষের গন্ধ পেয়েছে—তা না হলে', বিকাশ কোনোরকম ইতস্তত করল না। 'তা না হলে, সাতজন্মে কোনো ভদ্রলোক, শিক্ষিত মানুষ পা দেয় না, এমন একটা ভাগাড়ে শকুনটা পড়ে আছে? আমি গোড়া থেকেই জিনিসটা ভাবতাম। ওয়াইফ ওকে ছেড়ে যাবার পর থেকেই ওর এই বিকৃতি আরম্ভ—সেক্স ছাড়া আর অন্য কিছু চিন্তাই করতে পারছে না এখন। কবি হিসাবে সে কত বড় কবি এখনও তার বিচার হয়নি—আমরা অবিশ্যি তার ট্যালেণ্ট নিয়ে অনেক কিছু বলা-বলি করি, কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে আসলে রামানন্দ সেন সেকেণ্ড গ্রেড জিনীয়াস্ ছাড়া কিছু না, হুঁ, সেই লক্ষণ তার মধ্যে প্রবল। স্ত্রী চলে গেল তো তার সব কিছু গেল—এতকালের, কি বলব, কাব্যিক প্রজ্ঞা, এত দিনের সাধনা অনু-শীলন সামান্য যৌনক্ষুধার কাছে হেরে গেল?'

'মদটাও খুব খাচ্ছে।' পলাশ বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়ল। 'সেদিন অসিত যে অবস্থা দেখল!'

'মদ খাবে পয়সা কোথায়!' শুভেন্দু নাক কুঁচকোলো। 'গিয়ে দেখ তাড়ি গিলছে। সল্ট লেকের ওদিকটা শুনেছি তাড়ির জন্য বিখ্যাত। হয়তো রামানন্দর ওখানে পড়ে থাকার ওটাও একটা কারণ।'

'প্লিজ স্টপ, শুভেন্দু, প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ হতে দাও। আহম্মকটাকে নিয়ে আলোচনা করতে আর ইচ্ছে করছে না।'

'আমার মনে হয়'—মোহন পাল কারো দিকে তাকাচ্ছে না, হিসাবের খাতায়ও চোখ নেই, বাইরে রাস্তার এধারে দাঁড় করানো একটা রিকশা, ওধারে ডাস্টবিন, গলা বাড়িয়ে কাকটা জঞ্জালের মধ্যে মরা ইঁদুর খুঁজছে, কিছুই দেখছে না মোহন, সচরাচর যা হয় না, যেন দৃষ্টিটা কোন্ সুদূরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগল। 'আমার মনে হয় আপনাদের লাইনে আর থাকার ইচ্ছে ছিল না রামানন্দবাবুর। অন্যত্র চলে গেছেন, অন্য কিছু খুঁজছেন। তার মানে আপনারা যে ধরনের কবিতা লিখছেন, শিল্পসৃষ্টি করছেন, তাতে ওর মন সায় দিচ্ছিল না। হুঁ, তিনি লড়াই করছেন, আপনাদের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে, এখনকার এইসব শিক্ষা-টিক্ষার সঙ্গে, ফিরে এসে এমন সব কবিতা লিখবেন, আপনারা চমকে উঠবেন, বাংলাদেশ চমকে উঠবে। তিনি বুঝে গেছেন টেবিল-ল্যাম্প জেবলে সিগারেট ধরিয়ে

ঝর্ণা কলম বাগিয়ে ধরে কবিতা বানাবার কাল শেষ হয়ে গেছে, এবার পাঁজরের হাড় হবে তাঁর কলম, হৃৎপিণ্ডের রক্ত হবে কালি, তারপর তিনি—'

'আপনি চুপ করুন, চুপ করুন।' রোগা লিকলিকে চেহারা, কিন্তু বাজের মতন শোনাল বিকাশ চাটুয্যের গলার স্বর। কোটরগত চোখ দুটি জ্বলছিল। 'কোথায় ভাল কোয়ালিটির একটু চা আনবেন, নড়বড়ে পাখাটা সারাবেন, ড্রামটা পাল্টাবেন—তা তো না, ওখানে বসে বসে কাব্য নিয়ে, শিল্প নিয়ে বক্তৃতা করছেন—'

মোহন পাল রাগ করল না। অনেকদিন পর ময়লা পশমী আলোয়ানটা গা থেকে খুলে চেয়ারের হাতলের ওপর রাখল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে শিশুর মতন গাল ছড়িয়ে মোহন রেস্টুরেন্টের মালিক হাসছে। যেন একটা চাপা উত্তেজনায় আহ্লাদে তার ঠোঁট বেয়ে একটু লালা ঝরে পড়ল।

'আপনাদের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখেছি, কুড়ি বছর ধরে শুনলাম, আমি কি নতুন কিছু বলছি, বিকাশবাবু!' ঠাণ্ডা গলায় উত্তর করল।

'আমরাই তো মোহনবাবুকে এভাবে তৈরি করেছি, নষ্ট করেছি, ভদ্রলোকের দোকানটাকেও আর উঠতেই দিলাম না।' হতাশার ভঙ্গি নিয়ে শুভেন্দু চুলের ভিতর হাত ডুবিয়ে দিল। 'আজ যদি কাব্য নিয়ে আর্ট নিয়ে উনি আমাদের এক-আধটু বক্তৃতা শোনান আমাদের কি রাগ করা উচিত বিকাশ? অমলেন্দু!'

বিকাশ বা অমলেন্দু শব্দ করল না।

'আমার তো মনে হয় মোহন পাল এবার থেকে সরাসরি কবিতা লিখতে শুরু করে দেবে।' ত্যাঁদড় পলাশ চাপা গলায় উৎপলকে বোঝাচ্ছিল।

।। ১৬ ।।

চৈত্রের ঠাণ্ডায়-গরমে মেশানো মনোরম সকাল। আকাশটা অতিরিক্ত নীল চেহারা ধরে আছে।

হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ঢুকে রামানন্দর মনে হল, অন্তত এখানে এত নীল পরিচ্ছন্ন আকাশ মানায় না।

বলা যায় কি, ওই যে একটা বাহারের পামগ্রোভ দাঁড়িয়ে, এখনই হয়তো রামানন্দ শুনবে, সেই নিভৃত কুঞ্জে বসে কুহু কুহু কোকিল ডাকছে।

অথচ এদিকে লাইজল-ডেটলের চড়া গন্ধ প্রতি মুহূর্তে নাকে লাগছিল। 'কুহু-তানে পিক কুহরে'—কার লাইন মনে নেই। এদিকে সরু রাস্তার দু' পাশে ঘাসের মাথায় সকালের হালকা রোদের আভায় নীল বেগুনী চুমকি হয়ে কখনও সোনা হয়ে, রুপো হয়ে শিশিরবিন্দুর ঝলমলানি কম চোখে পড়ছিল কি—!

আবার এদিকে, দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকেছিল রামানন্দ, অপারেশন থিয়েটারের পাশ কাটিয়ে তাকে হাঁটতে হচ্ছিল, একটা কান্নার ফোঁপানি তার কানে এল। ঘাড় ফেরাতে দেখল, ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে ক্লান্ত বিষণ্ণ এক বুড়ো বসে আছে। বুড়োর কোলের কাছে মাথা রেখে একটি অল্প বয়সের মেয়ে মুখে আঁচল দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। মাথার কাপড়টা সরে গেছে। কালো কুচকুচে চুলের ভিতর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রক্তবর্ণ পুষ্পকোরকের মতো ছোট সিঁদুরের রেখাটা জ্বলছে। ওদের কেউ ওখানে আছে—কাটাচেরা হচ্ছে। চিন্তা করে রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

এদিকে এমন ফুরফুরে সকাল, একটা আশ্চর্য আকাশ, রৌদ্র-ঝলমল শিশিরের চমক। হাসপাতাল জায়গাটাই অদ্ভুত।

'যাচ্ছেন ?'

রামানন্দ থমকে দাঁড়াল। মুখে মদির হাসি যুবতীর, অবিকল চৈত্র মাসের হাসি, কিন্তু শরীরটা সাদা অ্যাপ্রনে মোড়া, কালো চোখ দুটোর দিকে তাকানো মাত্র যে কোন পুরুষচিত্তে দারুণ ব্যাকুলতা জাগবে, অথচ দু হাতের আঙুলের দিকে তাকাও, মনে হবে লম্বা ছুঁচলো ওই আঙুল ক'টা রুগীর মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দিতে, গায়ে ইনজেকশনের ছুঁচ ফুঁড়তে ওস্তাদ, হুঁ, কপালটাও টিপেটুপে দেবে দরকার হলে। ঠোঁট দেখলে মনে হবে বেড-এ শুয়ে তুমি বেশি কথা বললে, চেঁচামেচি, কান্না-কাটি করলে এই খুকি-খুকি মেয়েটি হঠাৎ মহিয়সী নারী হয়ে উঠে ধমক দিয়ে তোমায় ঠাণ্ডা করে দেবে। অথচ কেমন পেলব অধর ওষ্ঠ, চিবুকটি কত কচি, ঘাড়ের রেখায় কী আশ্চর্য কোমলতা। দু হাতে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করে।

ক'দিন হাসপাতালে আসা-যাওয়া করে রামানন্দ নার্সদের দেখে এসব ভেবেছে। ওরা এক সঙ্গে বেজায় শক্ত ও অদ্ভুত নরম হতে জানে।

এই যুবতী যে রামানন্দকেই প্রশ্নটা করছে, করে অল্প অল্প হাসছে, তাতে সন্দেহ কি। তা না হলে, বেশ তো চৈত্রের বাতাস গায়ে লাগিয়ে হেলে দুলে হেঁটে যাচ্ছিল, রামানন্দকে দেখে দাঁড়াবে কেন। 'যাচ্ছেন' মানে রামানন্দ তার পেশেণ্টকে দেখতে যাচ্ছে, অক্ষয়ের কাছে যাচ্ছে।

বোঝা গেল মেয়েটি অক্ষয়কে চেনে, রামানন্দকেও চেনে।

অক্ষয়ের কেবিনে দেখে থাকবে।

কিন্তু রামানন্দ একে কখনও দেখেনি। মানে দেখার মতন করে দেখেনি। তা না হলে যখন সে অক্ষয়ের কেবিনে ঢোকে, কি সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, য়ুনিফর্ম পরা ক'গণ্ডা নার্সকে এবেলা ওবেলা করিডর দিয়ে ছুটোছুটি করতে দেখে। হাতে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ, কিডনী-ট্রে, নয়তো থার্মোমিটার।

হুঁ, একমাত্র ফুলরেণু মজুমদারকে সে মনোযোগ দিয়ে দেখেছে। ফরসা, মোটা শরীরটা নিয়ে ফুলরেণু অক্ষয়কে ওষুধ খাওয়ায়, টেম্পারেচার নেয়, নাড়ী দেখে। খুঁটিয়ে রামানন্দ রোজ ফুলরেণুর হাত, পা, আঙুল, কোমর, গলা, চুল, ভুরু দেখে। কোনো নার্স তার এত কাছে আসে না। অক্ষয়ের বেড ঘেঁষে ফুলরেণু দাঁড়ায়, আর প্রায় অক্ষয়ের বিছানার সঙ্গে দুই হাঁটু ঠেকিয়ে রামানন্দ ছোট গোল টুলটার ওপর বসে থাকে। ফুলরেণুর গায়ের গন্ধটাও রামানন্দর মুখস্ত হয়ে গেছে। গায়ের গন্ধ, ফোঁসফোঁস শ্বাস ফেলার শব্দ। অতিরিক্ত মোটা হলে মানুষকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মনে হয় ফুলরেণু সর্বদাই ক্লান্ত, যেন কোথাও অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এসেছে। বুঝি এই জন্য তার শ্বাস-প্রশ্বাসের এমন গভীর টানাটানা শব্দ হচ্ছে।

কিন্তু এখন রামানন্দ কী দেখছিল!

আম গাছের সরু ছায়াটার মধ্যেই সুন্দরীর সবটা শরীর ধরে গেছে। ছিপছিপে হালকা ছোটখাট একটি মানুষ।

এই ছায়ায় দাঁড়ালে, রামানন্দ চিন্তা করল, ফুলরেণুর একটা বাহু ও কাঁধ ছাড়া বাকি দেহটা রোদে পুড়তে থাকত।

তাছাড়া রামানন্দ স্তব্ধ হয়ে দেখছিল, পাতলা শরীর ও পুতুলের মতন ছোট্ট মুখের ডৌল, কাঁধ ও মাথার তুলনায় মেয়েটির চোখ দুটো কি বিশাল। কালো তো বটেই। মাধুরীর চোখও এমন মিশমিশে কালো না। তা ছাড়া মাধুরীর চোখ আর একটু ছোট। কিন্তু এ যেন প্রকাণ্ড দুটো হ্রদ। যেন আস্ত জলজ্যান্ত এক একটি পুরুষ মাছকে গেলার পক্ষে এই চোখই উপযোগী। হায়রে নারী! রামানন্দ অস্বস্তি

বোধ করছিল।

'আপনি কি এই ওয়ার্ডে নতুন এলেন?' বেগতিক দেখে সে প্রশ্ন করল। 'আর তো কোনোদিন আপনাকে দেখিনি!'

একটু সময় নীরব থেকে সে আবার বলল, 'আমি সতেরো নম্বর কেবিনে অক্ষয়ের কাছে যাচ্ছি।' বলে রামানন্দ প্রকাণ্ড সেই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল।

'তা জানি, রোজই তো আপনি বন্ধুকে দেখতে আসছেন।' ক্ষীণাঙ্গী তরল গলায় হাসল। 'আমি নতুন না, এখন রাত্রে সতেরো নম্বর কেবিনে আমাকে ডিউটি দিতে হচ্ছে।'

এই তরলা বোস! রামানন্দ চুপ থেকে গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। যার গলার স্বর গভীর রাত্রে ডাহুকের ডাকের মতন শোনায়! ঘামছিল সে, মাথাটায় রোদ লাগছিল, বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে রামানন্দ কপালটা মুছল।

'তা এখন!' বলতে গিয়ে সে নিজেকে সংশোধন করল। 'ও বুঝতে পেরেছি, ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরছেন? তরলা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, রামানন্দ চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে। যেদিন একটু বেশি সকালে সে হাসপাতালে ঢোকে, রাতের ডিউটি শেষ করে এমন দু-চারটি নার্সকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে। 'অক্ষয়কে কেমন দেখলেন?' রামানন্দ একটা মামুলী প্রশ্ন করল।

তরলা হঠাৎ কথা বলল না। চোখ তুলে আম গাছের পাতা দেখল। রামানন্দ এবার মেয়েটির থুতনির নিচের সবটা অংশ দেখতে পেল। কানের উল্টোদিকের রোদ-না-লাগা ধূসর রঙের মতন জায়গাটা। কণ্ঠার কাছাকাছি ছোট একটা তিল রয়েছে।

'কাল বিকেলে কি আপনি এসেছিলেন?' চোখ নামিয়ে তরলা প্রশ্ন করল।

রামানন্দ মাথা নাড়ল। কাল বিকেলে তার আসা হয়নি। শফীর জন্য আসা হয়নি। খালের জলে ছোঁড়া মাছ ধরতে গিয়েছিল। আঙুলে একটা সিঙ্গি মাছ বুঝি হুল ফুটিয়ে দেয়। বাপ-রে মা-রে গেলাম-রে। বাছাধনের কী চিৎকার! যেন তাকে সাপে কেটেছে। তার চেয়েও বেশি অস্থির হয়ে পড়েছিল মাধুরী। ভয়ও পেয়েছিল খুব। এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছিল দুটিতে মিলে। কাকে সামাল দেবে রামানন্দ বুঝতে পারছিল না। ঘরে আইডিন, ডেটল কিছু নেই। যেন এই-জন্যই মাধুরী আরো বেশি ঘাবড়ে যায়। এখন উপায়! আইডিন, ডেটল কি আর কোনো ওষুধ-টষুধের জন্য রামানন্দকে না শেষ পর্যন্ত ছুটে আসতে হতো বেলেঘাটা সরকার বাজার। তাও কি আর একটুখানি রাস্তা! পাক্কা তিন মাইল। তারও বেশি। এর মাঝামাঝি কোথাও ওষুধের দোকান নেই। এখন রামানন্দ এতটা রাস্তা যাবে আসবে—এত সময় ধৈর্য ধরে মাধুরী অপেক্ষা করবে কী করে। শফী যেমন চিল্লাচ্ছিল, যেন শেষটায় নিরুপায় হয়ে মাধুরী তাড়াতাড়ি চুন, হলুদ গরম করে শফীর আঙুলে লাগিয়ে দেয়। তাতে ফল হয়। বেদনাটা একটু পরেই কমে যায়। মাধুরী তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়, সুস্থির হয়। এসব কাণ্ডকারখানার মধ্যে বিকেলটা কখন শেষ হয়ে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল মাধুরীর খেয়াল ছিল না। রামানন্দর খেয়াল ছিল হাসপাতালে আসতে হবে; ক'বারই তার মনে হয়েছিল। কিন্তু শফীকে, মাধুরীকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে তার আসা হয়নি।

তরলা চুপ করে আবার গাছের পাতা দেখছিল। দেখছিল আর বাতাসের দোলায় পাতার ছপছপ শব্দ কান পেতে শুনছিল।

'অক্ষয় কবে ছাড়া পাবে সঠিক তারিখটা জানা গেছে কি?'

চোখ নামিয়ে তরলা অল্প হাসল।

'ছাড়া পাবে আপনাকে কে বললে?'

'শুনছিলাম যেন!' একটু চমকে উঠল রামানন্দ, একটা ঢোক গিলল। তবে কিনা এর মধ্যে দু'বার শুনেছি ওর অপারেশন হবে, আবার শুনলাম হবে না, এখন তো শুনছি খুব শীগগীরই সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।'

'বাড়ি ফিরে যাচ্ছে কে বললে আপনাকে!' তরলা ছোট করে একটা ভ্রূকুটি করল।

রামানন্দ এবার সত্যি হতাশ হল। একটা বিশ্রী আশঙ্কা তার মনে উঁকি দিচ্ছিল।

'অবশ্য ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে এর মধ্যে আর আমি দেখা করিনি', অনেকটা অপরাধীর গলায় সে বলল, 'গত মঙ্গলবার ডাক্তার নন্দীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম, মানে তিনি আমাকে অনেকটা এইরকম আভাসই দিয়েছিলেন, আপাতত অক্ষয়ের অপারেশন করার দরকার হবে না, এমনি ট্রিটমেণ্ট করে যতটা—'

'বুঝতে পেরেছি।' তরলা অল্প মাথা নাড়ল। 'দেখুন, ডাক্তাররা সব সময় সব অবস্থায় আপনাদের সঠিক কথাটি বলতে চান না, বিশেষ অপারেশন-টপারেশনের ব্যাপারে একটু ভেবেচিন্তে রয়ে-সয়ে তাঁদের মুখ খুলতে হয়। হুঁ, প্রথমবার অক্ষয়বাবুর এক্স-রে রিপোর্ট দেখে তাই ঠিক করা হয়েছিল, অপারেশন এড়ান যাবে, কিন্তু পরে আবার ও'র পেটের ফটো নেওয়া হয়েছে।'

'হুঁ, আমি তাও শুনেছি, অক্ষয়ই আমাকে বলেছিল।'

'ডাক্তাররা অনেক কারণেই পেশেণ্টদের বা তাদের আত্মীয়স্বজনকে সব কথা সব সময় জানতে দেন না। হাসপাতালের তাই নিয়ম।' একটু সময় চুপ থেকে তরলা আবার গাছের পাতা দেখল, আকাশ দেখল।

'অথচ পরশু মিস মজুমদার, দিনমানে যিনি অক্ষয়ের কাছে থাকেন, আমাকে বলছিলেন এই শনিবারেই অক্ষয় বাড়ি যেতে পারবে।' তরলার চোখ দেখছিল না রামানন্দ, তার মসৃণ ছোট কব্জিতে কালো ফিতে বাঁধা ঘড়িটায় ক'টা বাজল তাই দেখতে সে চেষ্টা করছিল।

'মিস মজুমদার!' রামানন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তরলা হাসল। 'ফুলরেণু মিস আপনাকে কে বললে?'

'তাই তো আমি জানি, অক্ষয় একদিন আমাকে এরকম একটা আভাসই যেন দিয়েছিল।' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। বলতে কি, যুবতীর হাসির ধরনটা তাকে বেশ একটু অপ্রস্তুত করে দিল।

'ফুলরেণুর বিয়ে হয়েছিল, দুবার বিয়ে হয়েছিল।' তরলা আর হাসল না।

'তারপর?' যেন অপ্রত্যাশিত একটা কিছু শুনবে রামানন্দ। বড় করে ঢোক গিলল। 'দুবারই অভাগিনীর স্বামী মারা গেল বুঝি?' প্রায় বলতে যাচ্ছিল সে।

আবার গাছের পাতার দিকে হ্রদের মতন বিশাল কালো চোখ দুটো তুলে দিল তরলা। আস্তে আস্তে বলল, 'দুবারই ভেঙে গেছে, দুজনের সঙ্গেই ওর ডিভোর্স হয়েছে।'

শুনে রামানন্দ কিছু বলল না।

'না, ওটা বাজে কথা', তরলা আবার বলল, 'ফুলরেণু জানে না বলব না, হয়তো সঠিক খবরটা পেশেণ্টের সামনে আপনাকে বলতে সাহস পায়নি। গেল বুধবারই ডাক্তারদের ডিশিসন নেওয়া হয়ে গেছে, কাজেই ফুলরেণুর না জানার কিছু নেই।'

'তাহলে অক্ষয়ের অপারেশন হচ্ছে?' রামানন্দর কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল।

তরলা ছোট করে ঘাড় কাত করল। 'আগামী সোমবার সাড়ে দশটায়। সম্ভবত আজকালের মধ্যেই আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।'

রামানন্দ চুপ করে রইল।

'ও'র স্ত্রী আছেন শুনেছি, এবং ভদ্রলোক যে নিঃসন্তান তাও একদিন ও'র মুখে শুনেছি। আর কেউ আছেন? বুড়ো বাবা বা মা? ভাই-বোন কেউ?'

'ঐ এক স্ত্রীই—আর কেউ নেই।' রামানন্দ একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল।

'ভয়ের কিছুই নেই, যদিও মেজর অপারেশন কেস এটা। তাহলেও আজকাল আকছার এসব কাটাচেরা হচ্ছে।' যেন রামানন্দকে সান্ত্বনা দিল যুবতী। 'সম্ভবত ডাক্তার ঘোষ, এখনকার মধ্যে সার্জারীতে যাঁর সবচেয়ে নামডাক, আপনার বন্ধুর পেট কাটবেন।'

পেট কাটবেন! কথা বলার কী ধরন। নাকি নার্সরা এমন সব ভাষাই ব্যবহার করে।

'অপারেশনের পর অক্ষয়কে আর কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে?' চেহারাটা রুক্ষ করে ফেলল রামানন্দ।

'একমাস তো বটেই।' হাসিহাসি মুখে তরলা জবাব দিল। তারপর কেস বুঝে আরো যদি কিছুদিন রুগীকে এখানে রাখার দরকার হয়—সেসব ডাক্তাররা ঠিক করবেন; আগে থাকতে কিছু বলা মুশকিল।' সেই মুহূর্তে চট করে হাতের ঘড়ি দেখল তরলা। 'ওফ, আটটা বাজে!' ঘড়ি দেখার পর একটা ত্রস্ততার ভাব নিয়ে যুবতী রামানন্দর চোখের দিকে তাকাল। 'আমি চলি, সাতটা পঁয়তাল্লিশ ধরা হল না, আটটা পনেরোর ট্রেনটা ধরতে হবে। আর একদিন আপনার সঙ্গে ভাল করে কথা বলব। কেমন?'

রামানন্দ শব্দ করল না। ঘাড় কাত করল না। যেন আর একদিন ভাল করে কথা বলে আমাকে কৃতার্থ করবেন উনি। মনে মনে বলল সে, সেই সঙ্গে চোখ দুটো ছুঁচলো করে দেখল, এইটুকুন কোমর হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যায়, কেমন দুলিয়ে দুলিয়ে অক্ষয়ের লেগহর্ন মুরগী যেমন করে ছুটে চলে, তরলা বোস হাসপাতালের লন পার হয়ে তেমনি রাস্তার দিকে ছুটে যাচ্ছে।

কিন্তু ইনি মিস না মিসেস বোঝা গেল না তো? ভেবে রামানন্দ নিজের মনে হাসল। আহা, বেচারা ফুলরেণু! তৎক্ষণাৎ ফুলরেণুর কথা তার মনে পড়ল। হয়তো এত মোটা বলেই দু' দুবার বিয়ে করেও বেচারা স্বামীর ঘর করতে পারল না। মাধুরীকে গল্পটা শোনালে কেমন হয়?

সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দর মুখের পেশী কিন্তু শক্ত হয়ে উঠল। অক্ষয়ের পেট অপারেশন হবে। তার দুর্ভোগ শেষ হয়নি। শেষ হবে কী, বলো দুর্ভোগের সবে শুরু। তা না হয় তাকে সামাল দিতে ডাক্তারেরা থাকবে, আরো ক'টি নার্স থাকবে। কিন্তু টালির ঘরের সেই মানুষটিকে সামলাবে কে! রামানন্দ ভাবতেই পারছিল না মাধুরীকে কেমন করে এই খবরটা গিয়ে বলবে। তার রীতিমত ভয় করছিল। একটা অবসাদ নিয়ে সে অক্ষয়ের কেবিনের বারান্দায় উঠে গেল।

'এই যে, মাস্টার এসে গেছ।' অক্ষয় চেঁচিয়ে উঠল। কালকের চেয়েও বেশি হাসিখুশি তার চেহারা। 'এসো এসো, তোমার কথাই হচ্ছিল।'

ফুলরেণু ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ তুলে দরজার দিকে তাকাল। যেন অক্ষয়কে ওষুধের বড়ি গিলতে দিয়ে তার হাতে কাচের গেলাসে জল তুলে দিচ্ছিল।

রামানন্দ শব্দ করছে না। তার মনে হল, কাল বা পরশু যা দেখেছে, যেন আজ তার চেয়েও অনেক বেশি মোটা দেখাচ্ছে ফুলরেণুকে।

হুঁ, অক্ষয়কে বেশি হাসিখুশি দেখছে সে, ফুলরেণুকেও আর একটু বেশি মোটা দেখছে। এবার কি তার চোখের ভুল—দৃষ্টিভ্রম! রামানন্দ ঠিক বুঝতে পারছিল না। তরলার কথাগুলি তার মাথায় ঘুরছিল।

'মাস্টার, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ—টুলটা টেনে নিয়ে বসো।'

বেড-এর এ পাশটা জুড়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। যেন অক্ষয়ের বিছানার চাদরটা টেনেটুনে দিচ্ছিল। কাজেই রামানন্দ জায়গা পাবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

টের পেয়ে ফুলরেণু এক পাশে সরে দাঁড়াল। রামানন্দ হাত বাড়িয়ে খাটের নিচে থেকে টুলটা টেনে নিয়ে বসল।

'বুঝেছ মাস্টার!' অক্ষয় কোনোরকম ভূমিকা করল না, তার ফ্যাকাশে চোখে চমৎকার একটা উৎসাহ চিকিয়ে উঠতে দেখল রামানন্দ। 'সোমবার আমার অপারেশন হচ্ছে।'

রামানন্দর চেহারার কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। একভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ করে রইল।

অক্ষয় হাসল।

'আমি ঠিক জানতাম একদিন অপারেশন হবে, বুঝেছ মাস্টার, ঐ যে শেষবার বেরিয়াম এক্স-রে হয়ে গেল, তখনি বুঝেছিলাম নতুন করে যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে। হি-হি, তুমি বলছিলে বটে, আমার চেহারার উন্নতি হচ্ছে, শীগগীরই বাড়ি যাব, কিন্তু ক'দিন থেকেই পেটের ভেতরের ঘিনঘিনে ব্যথাটা বেশ টের পাচ্ছিলাম।'

রামানন্দ এবারও কথা বলল না।

'হুঁ, তোমাকে জানাবে বইকি, তোমাকে না জানিয়ে আমার পেটে ছুরি চালাবে না! কেননা তুমিই আমার দেখাশোনা করছ। ছোট ডাক্তার কাল বিকেলে এসে অবিশ্যি আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, বাড়িতে আর কে আছে আমার। মাধুরীর কথা বলতে বলল, যেহেতু উনি আপনার স্ত্রী, আইন অনুসারে আপনার অপারেশনের ব্যাপারে ওঁর লিখিত অনুমতির দরকার পড়বে, আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম, আমার বন্ধু ঐ মাস্টার মশাইটিই সব, আমার স্ত্রী ভীষণ ছেলেমানুষ, তাছাড়া মাথায় একটু ছিট আছে, কাটাচেরার কথা শুনলেই চেল্লাচেল্লি করবে, লাফালাফি করবে। ফিট-টিট হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য না, লেখাপড়া যা করিয়ে নেবার আমার বন্ধুকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। কেমন, ভাল বলিনি?'

'মাথায় ছিট আছে বলতে গেলে কেন?' রামানন্দ চটে গেল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মিটসেফ-এর কাছে খুটখাট করছিল ফুলরেণু, এই মাত্র যেন বেরিয়ে গেছে। স্বস্তি বোধ করল সে। কেননা ঐ নার্সটার সামনে মাধুরীর মাথায় ছিট আছে এমন একটা বাজে মিথ্যা কথা কিছুতেই সে সহ্য করত না।

ধমক খেয়ে অক্ষয় চুপ করে পায়ের দাদটা চুলকাতে লাগল।

'আমি বলতাম, আমি ঘুরিয়ে ডাক্তারকে অন্যভাবে কথাটা বলতাম। হুঁ, ছেলে-মানুষ তো বটেই, তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তা বলে অপারেশন হবে শুনলে মাধুরী লাফালাফি চেল্লাচেল্লিও করবে না, মূর্ছাও যাবে না এ আমি ঠিক জানি, হুঁ কাঁদবে, মুখ গুঁজে রাতদিন কাঁদবে, আর সবচেয়ে যেটা ভয় ওকে নিয়ে—স্রেফ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেবে। হয়তো এক নাগাড়ে পাঁচদিন জলটাও মুখে তুলবে না।'

'আরে আমি তো ওকে চিনি—ঐ ছিটের কথাটা কেন জানি ফস করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, মানে অন্যভাবে কথাটা বলা উচিত ছিল, অন্যরকম করে, কিন্তু তখন যেন আর কোনো কথাই খুঁজে পেলাম না। তা না হলে মাধুরীর মাথার ভেতরটা যে অনেক বেশি পরিষ্কার, তেজী টাটকা—আমার চেয়েও বেশি মগজ ঠিক রেখে চলতে জানে তা তুমিও দেখছ। ভাবলাম তখন, কি জানি, যদি তেমন করে কিছু একটা বললে ডাক্তাররা আমার কাটাচেরার ব্যাপারে ওই বেচারাকে আর টেনে না আনে—'

'তুমি আর একটা কথাও বলবে না।' রামানন্দর রাগ তখনও পড়ছিল না। 'যা

বলতে হয় আমি বলব, আমি সব ঠিক করব। আমার সঙ্গে কথা না বলে এঁরা কিছু করবেন না।'

'হুঁ, একশ'বার। তুমিই তো আমাকে এখানে ভর্তি করিয়েছ, প্রথম থেকে তুমি আছ। তুমিই সব।' ঘাড় গুঁজে দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে অক্ষয় দাদে ভরতি পায়ের পাতায় নখ চালাতে লাগল।

'আমি শুনেছি', একটু ঠাণ্ডা হয়ে রামানন্দ চোখটা দরজার দিকে রেখে আস্তে বলল, 'এই মাত্র তরলার মুখে শুনলাম অপারেশন হবে।'

'অ্যাঁ', চুলকানি থেমে গেল অক্ষয়ের. চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল, তার বিবর্ণ শুকনো মুখে প্রায় একটা অপার্থিব হাসি ভেসে উঠতে দেখল রামানন্দ। 'অ্যাঁ!' বলার পর পুরো একটা মিনিট চুপ থেকে রামানন্দর দিকে একভাবে সে তাকিয়ে আছে। যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না. অথবা বিশ্বাস করার পর এত বেশি পুলকিত রোমাঞ্চিত অভিভূত হয়ে পড়ল যে দ্বিতীয় আর একটি বাক্য তার মুখ থেকে উচ্চারিত হল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফুলরেণু আবার ভিতরে ঢুকল। অক্ষয় নিশ্চয় দেখতে পায়নি। নাকি দেখতে পেয়েও গ্রাহ্য করেনি. কেবল একটা চিন্তা নিয়েই সে মত্ত, দিশেহারা।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে তোমার দেখা হল! তাই তো, আমারই বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল।' অক্ষয়ের চোখ আর ততটা গোল নেই তখন। কিন্তু গলার স্বরটা ভরা ভরা। 'হুঁ, কষ্ট করে আমার কেবিনে তুমি রাত জাগতে আসবে কেন, একটু সকালের দিকে হাসপাতালে চলে এলেই ওকে দেখতে পাও. ডিউটি শেষ করার পরেও রিপোর্ট-টিপোর্ট কি যেন সব অফিসে বুঝিয়ে দিয়ে বেরোতে বেরোতে ওর প্রায় রোদ উঠে যায়. বেলা হয়ে যায়।'

রামানন্দ চুপ। যেন অক্ষয়কে আজ ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে. নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দিয়েছে কি. রামানন্দ চিন্তা করল, ওধারের ছোট টেবিলটার কাছে দাঁড়িয়ে ফুলরেণু সিরিঞ্জটা ঠিক করছিল. নাকি রোজই এ সময় অক্ষয়কে একটা করে ছুঁচের ফোঁড় খেতে হয়. হয়তো তাই হবে. এত সকালে তো রামানন্দ আর কোনোদিন হাসপাতালে আসেনি। চোখ আড় করে ফুলরেণুর বিশাল বাহুটা সে দেখছিল। এক ফালি রোদ এসেছে জানালা দিয়ে, অতিরিক্ত ফরসা হাতটা কেমন হলুদ হলুদ দেখাচ্ছে।

কিন্তু অক্ষয়ের চোখ এদিকে, রামানন্দর মুখের দিকে ফেরানো।

'কেমন, চোখ দুটো কেমন দেখলে! না, আগে বলো. গলার স্বরটা কেমন শুনলে?'

'ভাল।' রামানন্দ সংক্ষেপে উত্তর করল।

অক্ষয় খুশি হল না।

'আহা, ভাল বললেই তো সবটা বলা হল না, সবটা বোঝাও গেল না। যখন কথা বলছিল, অবিকল একটা ডাহুকী শব্দ করছে বলে তোমার মনে হল না কি!'

'অতটা খেয়াল করিনি।' রামানন্দ গম্ভীর হয়ে উত্তর করল। তার ভুরু কুঁচকে রইল। কেননা ফুলরেণু ইতিমধ্যে দুবার ঘাড় ফিরিয়ে কটমট করে অক্ষয়কে দেখেছে।

'অবিশ্যি রাতের অন্ধকারে মানুষের গলার স্বর একরকম, আবার দিনের আলোয়, সব কিছু যখন পরিষ্কার দেখা যায়, বোঝা যায়, ঠিক ঐ একই মানুষের গলার আওয়াজ অন্য রকম শোনায়, একেবারে আলাদা একটা সুর তখন।' অক্ষয় আর রামানন্দর দিকে তাকিয়ে নেই, দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল। 'তাই

বলছিলাম মাস্টার, যদি একটা রাত আমার কেবিনে এসে থাকতে তো টের পেতে এ কি কোনো মানুষ, কেবিনে কোনো মেয়ে কথা বলছে, নাকি একটা পাখি?'

'খুব বেশি কথা বলছেন আপনি, সমানে বকবক করে চলেছেন, পেট তো আছেই, আপনার লাঙস্-এর অবস্থাও ভাল না, ভুলে যাচ্ছেন মনে হয়।'

এতক্ষণ পর অক্ষয় ফুলরেণুর দিকে তাকাল। হাসল। 'ইন্‌জেকশন দেবার সময় হল বুঝি?'

ফুলরেণু আর কথা বলল না। সিরিঞ্জটা বাগিয়ে ধরে বেড-এর কাছে এসে দাঁড়াল। রামানন্দ দেখল যুবতীর চিবুকের নিচের চর্বির পুঁটলিটা কেমন ফুলে উঠেছে। মোটা মানুষ রেগে গেলে, বিশেষ যাদের গালে, গলায় অতিরিক্ত চর্বি আছে, থুঁতনির জায়গায় আগে ফুলে ওঠে, যেন ভিতরের সব রাগ, অভিমান, বিরক্তি ওখানটায় এসে জমা হতে থাকে; যেমন পাতলা রোগা মানুষের রাগ, অভিমান ভুরুর কাছে জমা হয়ে ভুরু দুটোকে বল্লমের মতন চোখা নয়তো ছুরির ফলার মতন ধারালো করে তোলে।

তা বল্লমের রাগ বা ছুরির ফলার রাগের চেয়ে পুঁটুলির রাগটা কিছু কম মারাত্মক না, কাপড়ে জড়িয়ে আনলে বোমাটাকেও পুঁটুলির মতনই দেখায়।

কাজেই রামানন্দ একটা বিস্ফোরণের আশংকা করছিল।

'দিন, হাতটা দিন।'

অক্ষয় বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল। গেঞ্জির হাতাটা ডান হাতে গুটিয়ে ধরে রাখল।

'উঁহু, ওরকম শক্ত করবেন না।' ফুলরেণুর থুঁতনির চর্বি আর একটু ফুলে উঠল, মোটা হয়ে উঠলো। 'আহাঃ, বলছি হাত নাড়বেন না, ইন্‌জেকশন দিতে এলে আপনি ভারি জ্বালাতন করেন। যেন আড়াই বছরের শিশু।'

'সত্যি, ছুঁচটাকে বড় ভয় করে মিস মজুমদার।' শিশুর মতন একটা আদুরে হাসি চোখে মুখে নিয়ে অক্ষয় বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে যন্ত্রণায় সে উঃ করে উঠল।

'নিন, তুলোটা চেপে ধরে রাখুন।'

ফুলরেণুর চেহারাটা হঠাৎ এমন কদর্য ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, রামানন্দ চমকে উঠল। অক্ষয় হাতের তুলোটা টিপে ধরে চোখ মুখ কুঁচকে আছে। রেগে গিয়ে ইচ্ছে করে মেয়েটা অক্ষয়কে ব্যথা দিল না তো, রামানন্দ চিন্তা করল, ইন্‌জেকশনের ছুঁচ এত লাগবার কথা কি!

টেবিলের কাছে সরে গিয়ে ফুলরেণু হাতের সিরিঞ্জ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছিল।

'কিসের ইন্‌জেকশন!'

'হার্ট লাঙস্ দুটোই খারাপ আপনার বন্ধুর, শরীরটা ঠিক না হলে শক্ত না হলে অপারেশন স্ট্যান্ড করবে কেমন করে।'

কথা বলার ধরনটা বিশ্রী—রামানন্দর মনে হল কোন নার্স রুগীর সামনে এভাবে বলে না, বলা উচিত না। রুষ্ট হয়ে মেয়েটার দিক থেকে চোখটা সরিয়ে আনল সে। ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না রামানন্দ ঠিক করে ফেলল। বিশেষ এমন চটে আছে যখন। অক্ষয়ের দিকে তাকাল সে। হাতের তুলো সরিয়ে দিয়ে ঘাড় সোজা করে অক্ষয় দিব্যি হাসছে। রামানন্দ কতকটা নিশ্চিন্ত হল।

'কি হল, ব্যথা কমে গেছে?'

'না না, ব্যথা না, পিঁপড়ের কামড়ের মতন সামান্য একটু লেগেছিল, ও কিছু না—' অক্ষয় কিন্তু চোখ তুলে টেবিলের পাশে দাঁড়ানো ফুলরেণুকেই দেখছিল, যেন পিঁপড়ের কামড়ের কথাটা ওকেই শোনাচ্ছিল।

'সোমবার যে-মানুষ অপারেশন থিয়েটারে যাচ্ছে তার মুখ দিয়ে এত কথা বেরোয় কি করে আমি জানি না।' থুতনির চর্বি একভাবে ফুলিয়ে রেখে ফুলরেণু গজগজ করছিল।

'আমি কিন্তু খুব বেশি কিছু বলিনি মিস মজুমদার, তরলার গলার স্বরটা মিষ্টি, তাই মাস্টারকে বলছিলাম, আজ তরলা বোসকে সে এই প্রথম দেখল কিনা।'

'হুঁ, হুঁ, সবই শুনলাম, সবই শুনেছি আমি।' ইচ্ছা করে ফুলরেণু ঘাড়টা ওদিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। অক্ষয়ের দিকে তাকাচ্ছে না। যেন হাতের সিরিঞ্জ ধোয়া আর শেষ হচ্ছিল না, যেন হাজারটা ব্যারামের বীজ অক্ষয়ের রক্ত থেকে ছুঁচের মাথায় উঠে এসেছে, ওষুধে ভিজিয়ে ভিজিয়ে ওটা শোধন না করা পর্যন্ত কিছুতেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। মুখের এপাশটা শুধু দেখা যাচ্ছিল যুবতীর। তাহলেও রামানন্দ অনুমান করল, থুতনির মতনই ওর বেড়ালের ন্যায় মোটা থ্যাবড়া নাকটাও রাগে অভিমানে ফুলে আছে। 'মিষ্টি মিষ্টি, তরলার গলায় চিনি গুড়, মধু, রসগোল্লার রস—কী নেই, বাপ্ এত ভাল লাগে একটা মেয়ের গলার আওয়াজ!'

শেষ পর্যন্ত বেড়ালের মতন একটা ভেংচি নিয়ে ফুলরেণু অক্ষয়ের দিকে তাকাল। রামানন্দ দেখল, যেন আজই ভাল করে লক্ষ্য করল, অত্যধিক ফরসা, মোটা মানুষটার চোখের মণি দুটোও ফ্যাকাশে নীল। আশ্চর্য, রামানন্দর ভাবতে ইচ্ছে করল, সব মিলিয়ে ফুলরেণু যেন একটি সুন্দর মার্জারী। যেন কথা বন্ধ করার পরেও, রামানন্দ শুনল, ফুলরেণুর গলার ভিতর গর গর শব্দ হচ্ছে। এমন করে তাকিয়ে আছে অক্ষয়ের দিকে, যেন এখনি তার ওপর লাফিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে ওই রোগা শরীরটার ছাল, মাংস খুলে ফেলবে।

'আপনি এত চটে গেছেন মিস মজুমদার!' অক্ষয়ের মুখের হাসিটা নিবে গেল।

'নিশ্চয় চটব, একশ'বার চটব। ওই তো রোগা, পেত্নীর মতন দেখতে, খেংরা কাঠির মতন শরীর, আপনার বন্ধু অস্বীকার করতে পারবে? একবার এঁকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না, কেমন সুন্দরী ওই তরলা বোস! আর আপনি কিনা পেত্নীটার পিচুটি জমে থাকা চোখের ও খনখনে গলার আওয়াজের বাখান করে মরে যান।'

'না, আর প্রশংসা করব না।' কানমলা খাওয়ার মতন চেহারা করল অক্ষয়। তার গলার স্বর করুণ হয়ে উঠল। 'প্রতিজ্ঞা করছি আর কোনোদিন—'

'করবেন, করবেন। আপনি ওই মুখ ভুলতে পারেন না, রাত্রে এই কেবিনে থাকে তো, শাঁকচুন্নীটা আপনাকে তুক করেছে—আরো দুদিন তরলার চোখ নিয়ে, গলার আওয়াজ নিয়ে আপনাকে আহা মরি করতে শুনেছি—আপনি যে কী সাংঘাতিক মানুষ—'

'না না, আর করব না, আর কোনোদিন ওই মেয়ের প্রশংসা করব না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

রামানন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোথায় সে ভেবেছিল ফুলরেণুর নীল ফ্যাকাশে চোখ হলদে আগুনের শিখা হয়ে ঝলসে উঠবে, মোটা চিবুক ও ফুলো ঘাড় নিয়ে অক্ষয়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে, তা করল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। পর পর আট-দশটা জলের ফোঁটা নিঃশব্দে চোখ থেকে ঝরে পড়ল। আর একটাও কথা বলল না, টলতে টলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

'মনে খুব লেগেছে ওর, বুঝলে মাস্টার।' অক্ষয় আস্তে বলল, 'মেয়েদের প্রশংসা মেয়েরা একেবারেই সহ্য করতে পারে না।'

রামানন্দ শব্দ করল না।

অক্ষয় গভীর মনোযোগের সঙ্গে পায়ের দাদ চুলকাতে লাগল। সেই সঙ্গে তার চোখে মুখে গভীর একটা ভাবনা দেখা দিল। বেশ কিছুক্ষণ ভাবল এবং পাটা চুলকে নিল। তারপর খুক্ করে হাসল।

'যাকগে, একদিক থেকে কিন্তু ভালই হয়েছে মাস্টার।'

'কি রকম?' রামানন্দ লম্বা নিশ্বাস ফেলে অক্ষয়ের চোখ দুটো দেখল। 'ভালটা কোন্ দিকে দিয়ে হল?'

'অপারেশন!' নাকের শব্দ করে হাসল অক্ষয়। 'এখন আর আমার কোনো ভাবনা রইল না। অপারেশনটা হয়ে গেলে আবার পাক্কা দু মাস আড়াই মাসের জন্য হাস-পাতালে থেকে যেতে পারব।'

'তুমি মরে যাও!' রামানন্দ বড় করে একটা ভেংচি কেটে উঠে পড়ল।

।।১৭।।

বেগুন দিয়ে টেংরা শুঁটকি খেতে ইচ্ছে হয়েছে মাধুরীর।

এক এক দিন অদ্ভুত এক একটা জিনিস খাবার সাধ হয় ওর। অবশ্য খাওয়াটাই সব নয়, এসব টুকিটাকি রান্নার হাতটাও ওর চমৎকার। আসল কথা অন্যরকম একটা কিছু রাঁধতে তার ইচ্ছা করে। রেঁধে নিজে খাবে, মাস্টারকে খাওয়াবে, শফীকে খাওয়াবে। অক্ষয় বাড়িতে থাকলে অক্ষয়কে খাওয়াত। যেন আসল তৃপ্তিটা তার সেইখানে। তারা খেয়ে বলবে, আজ একটা জিনিস মুখে উঠল, আলাদা স্বাদ জিভে লাগল।

কথাটা মিথ্যা কি। এমনি মাছের ঝোল, মাংস, ডাল, ভাজাভুজি যখন খুশি যেখানে খুশি খেতে পার। হোটেলে খাও, নিজের ঘরে খাও, আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি খাও, সেই একই পদ। এক ধরনের রান্না।

কিন্তু কাঁচা আম দিয়ে মৌরলা মাছের চচ্চড়ি, চিংড়ি দিয়ে কাঁঠালের ইঁচড়, কচি আমড়া দিয়ে লেঠা মাছের অম্বল—ইচ্ছা করলেই তুমি খেতে পাচ্ছ কোথায়! এসব রান্নার জন্য আলাদা মানুষ চাই, আলাদা মেজাজ চাই। সবাই সব কিছু রাঁধতে পারে না। জানে না। অতীতে রামানন্দ কী খেয়েছে এখন মাঝে মাঝে ভাবে। খাওয়ার ব্যাপারে যে একটা বিশেষ স্বাদ বা তৃপ্তির প্রশ্ন থাকতে পারে, রান্নার সামান্য রকমফের ঘটিয়েও যে ভোক্তার মনে একটু অন্যরকম উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা সম্ভব—রামানন্দর আগে ধারণা ছিল না।

নিতান্তই যেন অভ্যাসের তাড়নায় ক্ষুধার চাপে দুবেলা দু'মুঠো খেয়েছে। ভাতের সঙ্গে ঐ যে সাধারণ ডাল, তরকারি, একটা ভাজাটাজা, একটু বরফ চাপা মাছ, তাও কিছু ভাল না হলে আপত্তি নেই, কোনোরকমে উদর পূর্তি করে পাত থেকে উঠে পড়া। তার মধ্যে হাসিও নেই, কান্নাও নেই, উৎসাহ অনুৎসাহের প্রশ্ন নেই, ভাল লাগা, মন্দ লাগার কোনো ব্যাপারই ছিল না সেখানে। হুঁ, খাওয়া—জামার বোতাম লাগানর মতন, স্নানের পর চুলে চিরুনি চালাবার মতন, সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে পায়খানায় ছোটা বা রাত্রে ঘুম পেলে চোখ বুজে শুয়ে পড়া। একই কথা। একটা নিয়ম, অভ্যাস, স্বভাবের টান।

বিয়ের পর গোড়ার দিকে একদিন না দু'দিন যেন শখ করে রামানন্দগিন্নি একটা দুটো কী রান্না করেছিল। তারপর তো মহিলা চাকুরিতে ঢুকে পড়লেন। তারপর দীর্ঘ বারো বছর ঝিয়ের হাতের রান্না খাওয়া। তার মধ্যে স্বাদ-বিস্বাদ কে খুঁজতে গেছে!

খেতে বসে রামানন্দ চোখের সামনে কী দেখত? ঘরের দেওয়ালে টিকটিকি ঘুরছে, আলনায় ময়লা ব্রা বাতাসে দুলছে। রাত্রে? দিনের কালো টিকটিকিগুলিকে ইলেকট্রিক আলোয় চমৎকার সাদা দেখাত। একভাবে তারা দেওয়াল থেকে দেওয়ালে শিকার খুঁজে বেড়িয়েছে। দিনের বেলা কারো নিশ্বাসের শব্দ শুনত না, মহিলা তখন চাকরিতে। রাত্রে ভুসভুস নাক ডাকার শব্দ কানে নিয়ে রামানন্দ বিউলির ডালে আটার রুটি ভিজিয়ে মনের সুখে চিবিয়েছে। হুঁ, তখন ওইটা সুখ ছিল। অভ্যাস পালনটা একটা সুখ না? চৈত্র মাসে বিউলি ডাল, আশ্বিনে বিউলি ডাল, শনি, মঙ্গল, বিষ্যুৎ, সোম—রোজ সেই ডাল-রুটি। ভুসভুস নাক ডাকার শব্দ শুনেছে রামানন্দ আর চপচপ করে রুটি চিবিয়েছে। চোখের সামনে দিনের বেলার কালো টিকটিকিগুলি রাত্রে বিলকুল সাদা হয়ে গিয়ে পোকার পিছনে ছুটেছে।

তাই তো, মোহন রেস্টুরেণ্টে রাত ন'টা পর্যন্ত বকে এবং ন'টার পর সেখান থেকে বেরিয়ে পার্কে রাস্তায় কোথাও কোনো গলির মধ্যে দাঁড়িয়েই আবার রাত এগারোটা পর্যন্ত কবিতা নিয়ে আগডম-বাগডম বকা শেষ করে সে ঘরে ফিরত। সারাদিন অফিসে খেটে বাড়ি ফিরে শ্রীমতী ভাতের থালা নিয়ে তার জন্য জেগে বসে থাকবে, এই দৃশ্য রামানন্দ ঘুণাক্ষরেও আশা করত না।

আর এখন কিনা দু'বেলা এক জোড়া কালো উৎসুক চোখ মাস্টারের মুখের দিকে ধরে রেখে মাধুরী পাতের কাছে বসে থাকে। 'ওটা কেমন খেলে মাস্টার?' 'এটা দেখ আর একভাবে রান্না করেছি', 'কাল তোমাকে নারকেল দিয়ে মানকচু বাটা খাওয়াব, খেলে কোনোদিন ভুলতে পারবে না', 'পরশু রাঙ্গা আলু দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল রেঁধে খাওয়াব।'

খাওয়া এবং খাওয়ানোর মধ্যে এত রস এত উৎসাহ অভিনবত্ব থাকে, থাকতে পারে, রামানন্দ কল্পনাও করত না। তার কাছে খাওয়া ছিল দেওয়ালে টিকটিকি দেখা, ঘুমের বড় বড় শ্বাস-প্রশ্বাস শোনা অথবা জানালার ধারে আলনায় ঝুলানো ময়লা সায়া ব্রেসিয়ার বাতাসে নড়ছে, সেদিকে চুপ করে চেয়ে থেকে জিভ, চোয়ালে ও দাঁতের কাজ করে যাওয়া।

বেগুন দিয়ে ট্যাংরা শুঁটকি। শুনেই রামানন্দর জিভে আজ জল এসেছিল।

বলতে কি, মাধুরী তাকে খাদ্যরসিক করে তুলেছিল। কিন্তু খাওয়া এক জিনিস আর দেখেশুনে ভাল জিনিসটি বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া অন্য ব্যাপার।

হাসপাতালে বাপকে দেখতে এসেছিল শফী। সঙ্গে রামানন্দও এসেছে। কেবল অক্ষয়কে দেখতে দু'বেলা সে মেডিকেল কলেজে ছুটেছে, আর ইয়াকুব মিঞাকে একদিনও দেখা হবে না, এটা কেমন কথা। তাছাড়া শেয়ালদা রাস্তার ওপর নীল-রতন সরকার হাসপাতাল। হাঙ্গামার কিছু নেই। ফেরার পথে বৈঠকখানা বাজার থেকে, মাধুরী যেমন বলে দিয়েছে, বেশ শুকনো ঝুনঝুনে দেখে ট্যাংরা শুঁটকি কিনে নিয়ে যাবে, আর বেগুন। পুষ্ট অথচ কচি হবে এমন বেগুন আনতে হবে। তা না হলে শুকনো মাছের সঙ্গে ভাল মিশবে না।

সঙ্গে শফী আছে, তাই রামানন্দর ভাবনা ছিল না। রামানন্দ যদি চিনতে না পারে, শফী ঠিক চিনবে কোনটা ভাল শুঁটকি, কোন্ বেগুনটা কচি।

ইয়াকুব ভালই আছে। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। ঘরে ফেরার জন্য বুড়ো ছটফট করছে। অক্ষয়ের মতন হাসপাতালে পড়ে থাকতে চায় না। অপারেশন হবে শুনে উল্লুকটা এত খুশি। তাই তো, মাধুরীকে কি করে কথাটা বলবে, কাল থেকে রামানন্দ ভাবছে।

অবশ্য ইয়াকুবকে দেখতে আসার পিছনে আর একটা মতলবও রয়েছে রামা-নন্দর। শফীকে দিয়ে বেগুনটা শুঁটকিটা কিনে পাঠিয়ে দিয়ে বৈঠকখানার দোকানে

ঢুকে আজ একটা পুরো পাঁইট ধীরে সুস্থে বসে খাবে। সেই যে জগত মণ্ডলদের সঙ্গে সেদিন খেয়ে গেল, তারপর থেকে রোজই সে চালাচ্ছে। নেশাটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, রামানন্দ নিজেও বোঝে। অক্ষয় ব্যাপারটা জানে। মাধুরীও জানে মাস্টারের একটু টানার অভ্যাস আছে। জিনিসটা তারা দোষের মনে করে না। অক্ষয় পেটের জন্য কোনোদিন ওই জিনিস ধরতে সাহস পেল না। তা না হলে মেছোভেরীর চারপাশে যত মানুষ ছিল তার মধ্যে শতকরা নব্বুইজনকে মদ বা তাড়ি গিলতে দেখা গেছে। মাধুরীর বাবা তো মদ খেয়ে সর্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছিল। মদ খেয়েই সকাল সকাল মানুষটা মরলও। এইজন্যই না মাধুরীর বিয়ের সময় মাধুরীর মা মেয়েকে খালি গায়ে, খালি হাতে, যাকে বলে কেবল শাঁখা, সিঁদুর পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল। এক ফোঁটা সোনা দিতে পারেনি। মদের সঙ্গে মাধুরীর ভাল পরিচয় আছে। শফীরও। সে টের পেয়েছে, স্যাবের মুখে দু-একদিন বেশ ভালরকম গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু তার বাপ যেমন একটু পেটে পড়লেই লাফালাফি, বকাবকি করে, তাকে ধরে মারধর করে, মাস্টারমশায়ের সেসব না, বরং সেদিন যেন স্যারকে একটু বেশি গম্ভীর চুপচাপ থাকতে দেখে সে। হুঁ, শফীর বাবা বুড়ো ইয়াকুব মিঞা মদ খায়, তার তিলজলার ফুফা, মেটিয়াবুরুজের মামা, হাওড়ায় থাকে দুই চাচা—সবাই একটা না একটা নেশা করে। কাজেই শফীর কাছে এই জিনিস মোটেই নতুন না। কথাটা মিথ্যা কি, রামানন্দ টেনেটুনে বাড়ি ফিরলে মাধুরী তাকে একটু বেশি যত্নআত্তি করে। ডিমটা, মাছটা ঘরে থাকলে তাড়াতাড়ি ভেজেভুজে দেয়। মাস্টার যাতে খেয়ে-দেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়তে পারে তার ব্যবস্থাও করে দেয়।

এখন অক্ষয় বাড়িতে নেই বলে মাধুরীর এই সময়টায় একটু অসুবিধা হয় বইকি। মাস্টার সকাল সকাল শুয়ে পড়লে ভীষণ একলা পড়ে যায় ও। কারো সঙ্গে কথাটথা বলতে পারে না। হয়তো তখন মোটে সন্ধ্যা, পশ্চিমের লাল আকাশ কালো করে দিয়ে পাখিরা সবে নীড়ে ফিরছে। হাঁস, মুরগীর খাঁচা বন্ধ করে দিয়ে মাধুরী উঠোনে একটু পায়চারি করে, কিন্তু একা-একা কতক্ষণ আর ভাল লাগে। আকাশে তারা ফুটতে থাকে। এমন একটা সময় আসে যখন নিবিড় গাঢ় অন্ধকার একটা মোটা কালো চাদরের মতন মাধুরীর গলা পর্যন্ত ঢেকে দেয়, আর তার মাথার ওপর আকাশে অগুণতি রূপালি ফুটকি হয়ে তারাগুলি জ্বলতে থাকে। এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকে না। এই অবস্থাটা মাধুরীর কিছুতেই সহ্য হয় না। তার গা ছমছম করতে আরম্ভ করে। কেমন একটা ভয় ঢুকতে থাকে ভেতরে। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে আসে। দোর ভেজিয়ে খিল এঁটে দেয়। পাশের ছোট ঘরটা মাস্টারের। প্রথম থেকেই অক্ষয় রামানন্দকে ওটা ছেড়ে দিয়েছে। একটুখানি ঘর, তাছাড়া গরমকাল, মাস্টার দোর খোলা রেখে শোয়, আলোটালো বড় একটা জ্বালে না। চোর-ছেঁচড়ের কথা উঠলে রামানন্দ হাসে। আমার আছে কী যে নেবে। এক-জোড়া ছেঁড়া চটি আর দুটো জামাকাপড়। নাকি হাতলভাঙ্গা চিরুনি ও ফাটা আরশিটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে আসছে কেউ। শুনে মাধুরী হাসে। কেমন যেন ফকির বৈরাগী হয়ে মাস্টার এখানে এসেছিল। আজও তাই আছে। পোশাক-আশাকের ঐ অবস্থা। একখানার বেশি দুখানা জামা নেই। একটা রংচটা ফাইবারের সুটকেশ সম্বল। বাক্সপেটরা বলতে আর কিছু নেই। জিনিস থাকলে তো বাক্সপেটরা। টাকাকড়ি কিছু থাকলে সেটা অবশ্য নিজের কাছে না রেখে মাধুরীর কাছে রেখে দেয়। দরকারের সময় চেয়ে নেয়।

যেদিন নেশা করে না, সেদিন একটু সময়ের জন্য হলেও তার ঘরের আলোটা জ্বলতে দেখা যায়। নেশা করে ফিরলে কিসের আর আলো জ্বালানো। বিছানা পাতাই বা কাকে বলে—তখন অন্ধকারে দরজাটা হাঁ-খোলা রেখে খালি চাটাইয়ের

ওপর শুয়ে পড়ে।

কাজেই এ ক'টা দিন মাধুরীর অন্য মেজাজ। শফী আছে। আর ভয় করার কিছু নেই। শফী আছে, তাছাড়া এখন ফিনফিনে জ্যোৎস্নার রাত।

জ্যোৎস্নার রাত, চৈত্র মাস, শফী সাথী—বরং রামানন্দ ক'দিন ধরে সমানে যে খেয়েই ঘরে ফিরছে, মাধুরী ও শফী যেন আমোদই পাচ্ছে। তা বলে মাস্টারের সামনে কি আর তারা সেটা প্রকাশ করে, মাধুরী তো উল্টে রেগেই যায়, মাস্টারকে ধমক লাগায়, রোজ রোজ এসব ছাইভস্ম গেলা কেন. শরীর খারাপ হয়, পয়সা নষ্ট। রামানন্দ কথা বলে না। মিটিমিটি হাসে, এমনি তো মানুষটা ব্যোমভোলানাথ, তখন যেন আরো কাদা হয়ে যায়, নরম হয়ে যায়. মিটিমিটি হাসে, ঢুলুঢুলু চোখে মাধুরীর সুন্দর মুখটা দেখে. শফীকে দেখে। রাগটাগ করার পর মাধুরী শফীকে দিয়ে হাঁস, মুরগী, পায়রা, যা-হোক একটা কাটিয়ে ছুলিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাঁধতে বসে, রোজই মাস্টারকে মাংস রেঁধে খাওয়ান চাই—রামানন্দ কিছু খেতে চাইবে না, কেবল শুয়ে পড়তে চায়, কিন্তু মাধুরী তা শুনবে কেন! নেশা করে খালি পেটে থাকতে নেই মাধুরী জানে, খুব সকাল সকাল শরীর ভেঙে পড়ে। তাই পাতের কাছে বসে একরকম জোর করে, দরকার হলে আবার ধমক দিয়ে মাস্টারকে গরম ভাত, মাংসের ঝোল খাইয়ে দেয়। তারপর শফীকে নিয়ে ছোট ঘরের আলো জেবলে বিছানাটা টানটুন করে পেতে দেয়। দোর খোলাই থাকে। নেশা করে এসেছে বলে টুপ করে মানুষটা ঘুমিয়ে পড়বে ঠিকই। কিন্তু এক সময় নেশা ভাঙবে। তখন যে ভীষণ গরম লাগবে, মাস্টার ছটফট করবে। কাজেই ঘরের দরজা, যেমন রামানন্দর খুলে রেখে শোয়ার অভ্যাস, মাধুরী ও শফী তাই রাখে।

আসল কথা, শফী আছে বলে মাধুরী খুব হালকা বোধ করে, রীতিমত খোলা হাত পা নিয়ে মাস্টারের সেবাযত্ন করতে পারে। ক'দিন এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত গেছে, তার ওপর মাধুরী একলা এ-ঘর ও-ঘর হতেই তার কেমন ভয় করত। একটা মানুষ যখন নেশা করে আসে, তখন কি সে নিজের মধ্যে থাকে! তখন সে অন্য মানুষ। বেহুঁশ হয়ে গিয়ে বকাবকি, লাফালাফি, পাগলামি করা, চেঁচামেচি করা, এমনকি মারধর করা কারো স্বভাব, কিন্তু রামানন্দ তা নয়। তখন সে শিশু, শিশুর বাড়া। ডান-বাঁ চেনে না। মুখেও শব্দ নেই। মদ খেয়ে এলে এই মানুষকে একটু না দেখলে-শুনলে হয়! একা একা তার খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থাটা ভাল করে করতে পারত না বলে মাধুরীর মন খুঁত খুঁত কবত। বিশেষ অক্ষয় বাড়ি নেই। অক্ষয় থাকলে অবশ্য আর কোনো হাঙ্গামা থাকত না।

এখন মাধুরী সুখী। মাস্টারকে খাইয়ে শুইয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার পর শফীকে নিয়ে সে খেতে বসে। খেতে খেতে দুজনে গল্প করে। তারপর এক সময় রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে শীতল পাটি নিয়ে তারা উঠোনে চলে আসে। চাঁদের আলোয় বসে দুজন গল্প করে।

এই কথাই রামানন্দ এখন ভাবছিল। ক'দিন ধরে এই ছবি সে দেখছে।

নিজের হাতে বেছে বড় দেখে শুকনো ঝরঝরে ক'টা ট্যাংরা মাছ দোকানীর দাঁড়িপাল্লায় তুলে দিল শফী। ওজনটা ভাল করে দেখে নিল। জিনিসটা রামানন্দর বেশ পছন্দ হল। দেখে মাধুরী বেজায় খুশি হবে, ভাবল সে।

শুকনো মাছ কেনার পর দুজনে তরকারীর বাজারের দিকে এগিয়ে চলল। বেগুন কিনতে হবে। মাঝপথে বড় বড় পাটনাই পেঁয়াজ নেওয়া হল, রশুন নেওয়া হল। পেঁয়াজ, রশুনও বলে দিয়েছিল মাধুরী। শুঁটকি মাছ রান্না করতে ঐ দুটো চিজ আসল। রামানন্দ মনে মনে হাসল।

হুঁ, ক'দিন রোজ সন্ধ্যার দিকে মদ খেয়ে সে বাড়ি ফিরছে। তার একটা কারণ

ঐ ছবি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নাটা চকচকে হয়ে ওঠে। শীতলপাটি বিছিয়ে উঠোনে বসে দুটিতে গল্প করে। তারপর এক সময় উঠে হাত ধরাধরি করে উঠোনের চৌহদ্দী পার হয়ে জ্যোৎস্নার চেয়েও প্রখর চকচকে সাদা বালুভরা বিশাল প্রান্তরের দিকে চলে যায়।

রামানন্দর তখন কী মনে হয়? ক্লান্ত মেষপালক সে। কম্বল বিছিয়ে কোনো গাছতলায় শুয়ে আছে। কিন্তু তার আড়ষ্ট চোখ ওদিকে। মাঠের দিকে। কবিতার শরীর হয়ে তার ভেড়া দুটো মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছে।

তাই তো, ভেড়ার দঙ্গল নিয়ে কবির দল, শুভেন্দুর দল কষাইখানার দিকে ছুটছে। তাদের কুচিকুচি করে কেটে কবিতা তৈরী করবে। যেমন তাদের অভ্যাস, জঘন্য লোভ, হীন রুচি।

রামানন্দ আর সেই দলে নেই। পলাতক মেষপালক সে। দুটো ভেড়া সে আগলে রেখেছে, এই মাঠের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, 'হ্যাট' 'হ্যাট' শব্দ করে পিছন থেকে তাড়া দিয়ে লাঠির খোচা মেরে কেউ যাতে তাদের পিলখানার দিকে চালিয়ে নিয়ে না যায়। সব ভেড়াকেই মারতে হবে, সুন্দর শরীর দেখলেই কুচিয়ে কেটে কবিতার কিমা তৈরী করতে হবে তার কি মানে আছে! কবিতারসিকরা উত্তম খাদ্য খেয়ে পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলবে বলে? আচমন সেরে অধ্যাপকের দল আস্তিন গুটিয়ে কাগজ কলম নিয়ে পাতার পর পাতা মেধাবী আলোচনা জুড়বে বলে? সব আলোচনা রামানন্দর জানা হয়ে গেছে, কবিতা ভক্ষণকারী রসিকদেরও চেনা হয়ে গেছে। রামানন্দ তাদের ভয় করে। হুঁ, তাই এই ভীরু মেষপালক মাদার ঝোপের নিচে তার ছোট ঘরের বিছানায় দু' পাত্র গিলে এসে আচ্ছন্নের মতন শুয়ে থাকে আর দরজায় চোখ রেখে জ্যোৎস্নার মাঠের একটা অনাবিল ছবি দেখে, হাত ধরাধরি করে মাধুরী ও শফী অনেক দূর চলে যায়।

হুঁ, ভীরু না আরো কিছু, একটা মোটা লাঠি সঙ্গে রাখে না রামানন্দ? শুতে বসতে লাঠিটা তার সঙ্গী।

তার এই খুশির জগতে, আনন্দলোকে এক ফোঁটা শব্দ গন্ধ রস বা দৃশ্যের কেউ ভাগ বসাতে এলে লাঠির ঘায়ে মাথা দু ফাঁক করে দেবে এই হল মোদ্দা কথা।

বেগুনটাও পছন্দসই পাওয়া গেল। মণিরামপুরের বেগুন। আয়নার মতন চক-চকে গায়ের চামড়া। সাইজেও বেশ বড়।

'এবার তুই চলে যা শফী।'

শফী ঘাড় কাত কবল।

'আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। ভিড়ের দিকে চোখ রেখে রামানন্দ আস্তে বলল, 'তোকে বাসে তুলে দেবো?'

'না না, আমি ঠিক উঠতে পারব, আপনি আর কষ্ট করে রাস্তা পার হবেন কেন স্যার।'

'তবে যা, গাড়িঘোড়া দেখে সাবধানে রাস্তা ক্রশ করবি।'

'বেশি রাত করবেন না স্যার, দিদি চিন্তা করবে।'

'না, রাত করব না।'

বেগুন ও শুঁটকির পুঁটলী নিয়ে শফী রাস্তার ওপারে বাস ধরতে চলল।

নিশ্চিন্ত মনে রামানন্দ মদের দোকানের দিকে হাঁটা ধরল।

বেশ কিছুটা এগোবার পর প্রায় শুঁড়িখানার দরজার কাছে ভিড়ের ভিতর পিছন থেকে একজন তার কাঁধে হাত রাখল।

কে! চমকে উঠল সে। বিরক্ত হল। এমনকি রাগ করতেও যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে মানুষটাকে দেখে রামানন্দ বিমূঢ় স্তম্ভিত হল; একা না, সঙ্গে আর একটি

মানুষ, তাদের দুজনের পিছনে উটের মতন ঘাড় উঁচিয়ে আরো দুটি মুখ, তারপর আরো দুটি, আরো দুটি, যেন মোহনপালের দোকানের চেয়ারগুলি শূন্য করে দিয়ে সমস্ত দলটা এখানে ছুটে চলে এসেছে। শুভেন্দু গম্ভীর, বিকাশ শুকনো চেহারা নিয়ে কটমট করে রামানন্দকে দেখছে, অমলেন্দুর চোখে মুখে বিদ্রূপের নিঃশব্দ শাণিত হাসি, নবকিশোরের অবাক চেহারা, অরুণাভ ও রজতের চোখে একটা সনির্বন্ধ কাতরতা, রাকেশ ও উৎপলও যেন অতিমাত্রায় বেদনার্ত। একবার রামানন্দর দিকে, একবার পদাবলীগোষ্ঠীর অন্য সকলের মুখের দিকে চোখ রেখে একমাত্র পলাশ গাঙ্গুলী হালকা গলায় হি-হি করে হাসছিল। সকলের আগে অমলেন্দু কথা বলল।

'রামানন্দবাবু, আপনি এখানে?'

'হুঁ, তাতে হয়েছে কি!' ভুরু কুঁচকে আড়ষ্ট গলায় রামানন্দ উত্তর করল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে অমলেন্দু তার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল।

'আপনাকে আমরা খুঁজছি।' গম্ভীর গলায় শুভেন্দু বলল।

রামানন্দ কথা বলল না।

'কারো কাছে ঠিকানা দিচ্ছেন না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, ব্যাপারটা কী।' বিকাশ শুভেন্দুর পাশে এসে দাঁড়াল। দুজনকে পাশাপাশি দাঁড়াবার জায়গা দিতে অমলেন্দু একটু পিছনে সরে দাঁড়াল। চারদিক থেকে ভিড়ের চাপ ক্রমেই বাড়ছিল। একটা মানুষকে এতগুলি মানুষ ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাও বৈঠকখানা বাজারের গলি, তিন হাত দূরে মদের দোকান, রোজই এখানটায় একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে। পকেটমার, ছিনতাই, ছোরা মারামারি, মাতলামি, ঝগড়া আরো কত কি ঘটনা। কাজেই শুভেন্দুদের পিছন থেকে আরো চৌদ্দটা মুখ গলা উঁচিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।

'কি হল মশাই, পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল বুঝি!'

'মেরে ঠাণ্ডা করে দিন, হাত পা ভেঙে দিন, পরের পকেটে হাত ঢোকানো কেমন মজা বাছাধনকে শিখিয়ে দিন।'

'বরং পুলিশে দিয়ে দিন. সেখানে দলাই-মলাইটা ভাল হবে।'

'মুখে গন্ধ পাচ্ছেন? মাল খেয়ে বেরিয়েছিল, নাকি খাবে বলে দোকানে ঢুকতে যাচ্ছিল?'

'নাকি মেয়েছেলে নিয়ে কোথাও গোলমাল করে এসেছে!'

'ঐ সুন্দর চেহারার ভদ্রলোককে একবার জিজ্ঞেস করুন না ব্যাপারটা কী। শুভেন্দুর দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন আর একজনকে বলল, 'আমার তো মনে হয় কারো ঘরের বউকে ফুসলিয়ে বার করে এনেছে বেটা।'

'দেখতে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বলে মনে হচ্ছে।'

'অমন ঢের শালা চোর ছেঁচড় গাঁটকাটা দম্বাজ শিক্ষিত ভদ্দরলোক সেজে বৈঠকখানা বাজারে ঘোরাঘুরি করে।'

'আমাদের হাতে ছেড়ে দিন দাদা, আমরা শালাকে তৈরী করে দিই।'

'কথায় কিছু হবে না মশাই, আগে দু ঘা লাগান তো।'

'আচ্ছা, কি হয়েছে মশাই বলুন তো, লোকটা কে, কোথায় থাকে? কারো বাক্স-টাক্স ভেঙে পালিয়ে এসেছে বুঝি।'

অমলেন্দুর পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একজন প্রশ্ন করছিল। অমলেন্দু রুষ্ট হয়ে উঠল।

'আপনারা চুপ করুন। আপনাদের কোনো ব্যাপারই না, খামকা আপনারা ভিড় করছেন এখানে।'

'রাস্তার ওপর গোলমাল, ভিড় তো হবেই, কারো জায়গায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই।'

'কি হল মশাই, আমি ঠিক ধরেছি কিনা, নিজেদের ব্যাপার, ফ্রেন্ড, মানে ঐ বন্ধু বন্ধুপত্নী নিয়ে যা হোক কেলেঙ্কারী কিছু হয়েছে।'

উঁহু', আর একজন তৎক্ষণাৎ মাথা ঝাঁকাল। 'স্রেফ পলিটিক্যাল ব্যাপার—পার্টিগত কিছু একটা, দেখছেন না, এত বড় দলটার কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে চাইছে না, অথচ ভদ্রলোককে কেমন চেপে ধরেছে।'

'মানে এই পার্টি ছেড়ে আর এক পার্টিতে গিয়ে ভিড়েছে, যা হচ্ছে আজকাল, তাই বাবুদের এত গোঁসা, বাছাধনকে এমন ছেঁকে ধরেছে।'

'এখন হাত পা নিয়ে চাঁদ বাড়ি ফিরতে পারলে হয়—আজকাল হামেশা এসব হচ্ছে।'

'হুঁ, খুব সিরিয়াস ব্যাপার, এর রেজাল্টটা কি দাঁড়ায় দেখুন না, কেবল হাত পা ভাঙ্গা না, হয়তো লোকটাকে মেরেই ফেলবে।'

'ওপেন রাস্তার ওপর কিছু করবে না।'

'আপনি মশাই এখনো ব্রিটিশ আমলে আছেন, আজকাল পাব্লিকের সামনেই যা করার করে ফেলছে। করে সরেও যাচ্ছে। পুলিশকে তোয়াক্কা করছে নাকি! হয়তো এখনি লোকটাকে পাঁউরুটির মতন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

'আহা! হয়তো ওয়াইফ আছে, ছেলেপুলে আছে, হয়তো বুড়ো বাবা-মাও বেঁচে আছে, হয়তো কোনো ফ্যাক্টরী কি অফিসে চাকরি করত, গোটা ফ্যামিলীটা এর রোজগারে চলছিল—'

'এর নাম রাজনীতি মশাই, এর চেয়ে জঘন্য নোংরা জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু আছে?'

'কিন্তু এর বদলা আছে, দেখবেন, একটা প্রাণ এখন চলে যাচ্ছে ঠিকই, তার বদলে দশটা মানুষের রক্ত নেওয়া হবে। আপনারা কি মনে করছেন অন্য পার্টি, মানে যে দলে এই মানুষটা আছে তারা চুপ করে এটা হজম করে যাবে।'

'কক্‌খনই না কক্‌খনই না, গেল শনিবার নারকেলডাঙ্গায় কী হয়ে গেল, ক'দিন আগে উত্তরপাড়ায় কী হয়েছিল—' তিনজন এক সঙ্গে বলতে যাচ্ছিল।

'চুপ করুন, ঐ শুনুন খিটমিটে রোগা মানুষটা কী চাইছে, ঠিকানা জিজ্ঞেস করছে—কিছুতেই বেটা ঠিকানা বলতে চাইছে না।'

বিকাশের গর্তে ঢোকা চোখ দুটো জ্বলছিল। যেন সকলের চেয়ে তার আক্রোশটাই বেশি। রাগে তার রোগা শরীরটা রীতিমত কাঁপছিল। বাঁ-দিকের ঠোঁটের কোণা ও নাকের ডগাটা বঁড়শির মতন বেঁকে রয়েছে। ঘেন্নার ভাব প্রকাশ করার সময় তার ঠোঁট ও সরু নাকের মাথাটা এভাবে বেঁকে থাকে।

'একটা জিনিস আরম্ভ করে তারপর সরে পড়ার কোনো অর্থ হয় না। কাগজটার কতখানি ক্ষতি হচ্ছে একবার চিন্তা করেছেন? না, সেই দায়িত্ববোধ আপনার আছে? শুভেন্দুরা জানত, বিকাশ পদাবলীর কথাটাই আগে তুলবে, রামানন্দ সেনের কবিতা আর ছাপা হচ্ছে না, কাগজের সার্কুলেশন পড়ে যাচ্ছে, এটাই তার সবচেয়ে বেশি ক্ষোভের কারণ।

'কাগজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' ভয়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে রামানন্দ, লাল ফোলা ফোলা চোখ করে সে বিকাশের মুখের দিকে তাকাল। 'আমি অনেকদিন লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছি। এসব পত্রপত্রিকাও আমি পছন্দ করি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে', শুভেন্দু এই প্রথম মুখ খুলল। 'আমাদের কাগজে না হয় না-ই লিখলেন—তা বলে লেখা ছাড়বেন কেন, ছেড়ে লাভটা হচ্ছে কী।'

'কিছুই না, লিখেও কিছু লাভ হচ্ছিল বলে আমি মনে করি না। লেখাটেখার

ওপর আমার আস্থা নেই।'

'লেখার ওপর আপনার আস্থা নেই!' শুভেন্দু বিড়বিড় করে উঠল, যেন এর-পর আর কী বলা যেতে পারে হঠাৎ ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

'তাহলে এখন করছেন কি?' অমলেন্দু প্রশ্ন করল।

'হাঁস-মুরগির চাষ করছি।'

'স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন শুনলাম?'

'হুঁ।'

'হঠাৎ চাকরিটা ছেড়ে দিলেন?'

'আমার ইচ্ছা, আমার খুশি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' অমলেন্দু হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। 'কারো ইচ্ছার ওপর, মর্জির ওপর কারো হাত নেই।'

'রাস্তা দিন। আমি বেরিয়ে যাই।'

শুভেন্দু ও বিকাশ প্রায় গায়ে গায়ে লেগে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছিল। রামানন্দ দুজনের চোখের দিকে তাকাতে তারা সরে দাঁড়াল।

'কিন্তু ঠিকানাটা আপনি কিছুতেই বলছেন না রামানন্দদা। ঠিকানাটা বলে যান।' এক পা অগ্রসর হয়েছিল রামানন্দ। থমকে দাঁড়াল। আবদারে হাসি মুখ নিয়ে এবার পলাশ গাঙ্গুলী রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছে।

'আমার ঠিকানা দিয়ে তুমি করবে কি হে ছোকরা?' রামানন্দ ধমক দিয়ে উঠল। 'আমি কাউকে ঠিকানা বলি না।'

'মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে দেখা করব। মাঝে মাঝে আপনাকে কি আমাদের দেখতে ইচ্ছে করে না!'

'কিছু দরকার নেই, কিছু দরকার নেই। তোমরা তোমাদের মতন আছ, তাই থাক, আমাকে আমার নিজের মতন থাকতে দাও, সরে দাঁড়াও।'

পলাশ নাছোড়বান্দা।

'আপনাকে আমরা গুরু বলে মেনে নিয়েছিলাম, আজ আমাদের সকলকে আপনি ভুলে যাচ্ছেন। আমরা যে কতখানি অসহায় হয়ে পড়েছি বুঝতে পারছেন না।'

'খুব ফাজিল হয়েছ, না?' রামানন্দ ভেংচি কাটল ও সেই সঙ্গে মাথাটা জোরে ঝাঁকালো। 'আমি কারো গুরু না, কেউ কারো গুরু হতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ নিজেই নিজের গুরু। রাস্তা ছেড়ে দাও।'

'চলুন, কলেজ স্ট্রীট যাবেন, অনেকদিন মোহনবাবুর দোকানে যাচ্ছেন না, মোহনবাবু কত দুঃখ করে আপনার জন্যে।'

'ওফ্ হরিবল্! শুভেন্দুবাবু, এই ত্যাঁদড়টাকে কি আপনারা সামলাবেন? আমি কিন্তু চড়টড় বসিয়ে দেবো।'

'পলাশ!' শুভেন্দু চুপ থেকে, স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে মানুষটাকে কেবল দেখ-ছিল, যত দেখছে তত যেন সে বোকা হয়ে যাচ্ছে, এই কি রামানন্দ সেন? তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য কবিতা লিখে বাংলাদেশে একদিন যে চমক সৃষ্টি করত! এই সেই চোখ, এই চোখের মধ্যে নিঃসীম আকাশের নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, অন্ধকার রাত্রির রহস্য, নাকি যাকে বলে দিব্যদর্শনটর্শনের মতন কিছু একটা আবিষ্কার করে তারা সবাই বিস্মিত মুগ্ধ হতো। একথা বললে এখন কেউ বিশ্বাস করবে? বরং আলু, বেগুন কি ফলটলের দোকান সাজিয়ে মানুষটা যদি বাজারের এই গলির মধ্যে বসে যেত লোকে সেটা সহজে মেনে নিত।

এমন স্থূল আটপৌরে চেহারা হয়ে গেছে আজ রামানন্দর, কথা বলার ধরন,

তাকানো, গলার স্বরটা পর্যন্ত। বেশভূষা অবশ্য চিরকালই সাধারণ, কিন্তু আজ যেন তা আরো সাধারণ হাস্যকর ঠেকছিল। লালে, হলুদে মেশানো ডোরাকাটা একটা আধ-ময়লা শার্ট গায়ে, চারটে বোতামের তিনটেই কোথায় উড়ে গেছে। ফলে বুকের লোম বেরিয়ে আছে। দোকানের গোমস্তাদের মতন ধুতিটা মালকোঁচা দিয়ে পরা। এই চৈত্রের খরায়ও পায়ে রবারের জুতো। তাও যেন কোথায় খালবিলের রাস্তা মাড়িয়ে এসেছে। এত শুকনো কাঁদা লেগে আছে জুতোর গোড়ালীতে।

'পলাশ!' ক্রুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বিকাশ ডাকল।

পথ ছেড়ে দিয়ে পলাশ সরে দাঁড়াল। রামানন্দ বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু এক মিনিট পরেই দেখা গেল পলাশ, নবকিশোর, অরুণাভ, রাকেশ, উৎপল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত তরুণের দল রামানন্দর পিছে পিছে এগোচ্ছে। শুভেন্দু, বিকাশ ও অমলেন্দু এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'শুনুন রামানন্দদা!' পলাশের চোখের ইশারা পেয়ে রাকেশ চেঁচিয়ে পিছন থেকে ডাকল।

রামানন্দ ঘাড় ফেরাল না। রাস্তার ভিড় ঠেলে সামনের দিকে হেঁটে চলেছে। যেন ট্রাম কি বাস ধরবে।

'আপনি কিন্তু ড্রিংক না করে ফিরে যাচ্ছেন রামানন্দদা!' এবার উৎপল চেঁচিয়ে উঠল।

'রামানন্দদা!' পলাশ ডাকল। 'কান্ট্রি লীকার খেতে এসে আমাদের ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছেন, মোহনবাবুর দোকানে চলুন, আপনাকে আজ স্কচ খাওয়াব।'

ব্যর্থতার চারটে ঝরঝরে চাকা।

নিরাশার কালো বনেট ঢাকা।

দুঃসাহসের ইঞ্জিন—আহা আমার।

আজব অস্টিন, অশ্বমেধের ঘোড়া! —উৎপল আবৃত্তি করে উঠল। 'রামানন্দদা, আপনাকে ভুলতে পারি না, ভুলতে পারি না।'

পলাশ চেঁচিয়ে বলল—'ভেড়ার পশমে অবিরাম জ্যোৎস্নার খেলা, অবিসম্বাদিত নারী এক অথবা নিয়তি মসৃণ—রামানন্দদা এসব আমরা কেমন করে ভুলব, আপনি যে চিরদিন আমাদের—'

'লোকটা কে, মশাই?' শুভেন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে একজন প্রশ্ন করল, 'পাগল-টাগল!'

শুভেন্দু কথা বলল না। ঠোঁট বেঁকিয়ে বিকাশ উত্তর করল, হুঁ, পাগল, গাড়লও বলতে পারেন।'

।। ১৮ ।।

হেনা সেনের ঘরখানা সুন্দর। দোতলার ওপর দক্ষিণমুখো ছোট ছিমছাম ফ্ল্যাট। একলা মানুষ। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। নিজের হাতে মনের মতন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে পারে। ঝি এসে দুবেলা ধোয়া-মাজার কাজ করে দিয়ে যায়। উঁহু, রান্নার লোক নেই। নিজের হাতে রেঁধে খেতে ভালবাসে হেনা, স্বপাকভোজিনী।

একমাত্র মায়ের হাতের রান্না খেয়ে সে তৃপ্তি পেয়েছে, তা ছাড়া এই জীবনে কে-ই বা কোন্‌দিন তাকে রেঁধেবেড়ে খাইয়েছে। একমাত্র মা-ই ছিল যাকে বলে চিরসঙ্গিনী। চার বছরের হেনাকে কোলে নিয়ে মা বিধবা হয়েছিল। সেদিন কোনো স্বজনবন্ধু মা-মেয়েকে যেমন দেখতে আসেনি, তেমনি তারাও তারপর আর কোনো-

দিন কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি একবেলার জন্য পাত পাততে যায়নি। হেনার চেয়ে হেনার মা'র অভিমান, ঘেন্নাবোধটা ছিল বেশী।

অনাথা বিধবা? ভরণপোষণের প্রশ্ন?

উঁহু, সেদিক থেকেও হেনার মা বুদ্ধিমতী ছিলেন। একটুখানি লেখাপড়া শিখেছিলেন, স্বামী মারা যাবার পর সেটাই মহিলা কাজে লাগিয়েছিলেন। কাকে কাকে ধরে যেন কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিয়েছিলেন।

ব্যস, তারপর আর তাদের পায় কে! ঐ অল্প মাইনের ধিকিধিকি চাকরি সম্বল করেই মা হেনাকে বড় করে তুলল, লেখাপড়া শেখাল। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে ঢুকে হেনাও একটা দুটো টুইশন পেয়ে যায়। তারপর আর মা-মেয়ের দুঃখ কি! হেনা নির্বিঘ্নে এম-এ পাশ করল। এমনকি রাণী পার্বতীসুন্দরী গার্লস কলেজে হেনার প্রফেসারি পাওয়াও মা দেখে গেছে। চাকরি পেয়েই হেনা মাকে নিয়ে তাদের বহু দিনের পটলডাঙগার পায়রার খুপরীটা ছেড়ে একটা ভাল বাসায়, পাইক-পাড়ায় এই সুন্দর নিরবচ্ছিন্ন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল। এ বাড়ি এসে বছর দুই ছিল মা। তারপর মারা গেল। তারপর থেকে হেনা একলা। বিয়ের কথা মা কোনো কোনো সময় যে মেয়েকে একেবারে না বলেছে তা নয়, কিন্তু হেনা তাতে মোটেই কান দেয়নি। হেনার ঝোঁক শিল্প সাহিত্যের দিকে। নিজেও লিখতে পারে। কাজেই যতক্ষণ কলেজে চাকরি, তারপর বাকি সময়টা হেনা বইয়ের ভিতর মুখ গুঁজে, যেন পড়ার আর শেষ নেই, কখনও-সখনও চুপ করে ভাবে, তারপর এক সময় খাতা কলম নিয়ে কি সব লেখে।

ক্রমাগত এসব দেখেশুনে মা বিয়ের কথাই মেয়ের কাছে এদিকে আর তুলতেই সাহস পেত না।

বিয়ে, একটি পুরুষকে নিয়ে ঘরকন্না করার কথা হেনা সেন ভাববার সময় পায়নি। অন্তত বাইরে থেকে দেখে লোকে তাই মনে করে।

আরও একটা কারণ, কোনো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে হেনাকে মেলামেশা করতে আজ পর্যন্ত কেউ দেখল না।

তেমন কোনো বন্ধু তার আছে বলেও কেউ জানে না। এদিক দিয়ে পাইক-পাড়ায় হেনা সেনের প্রচুর সুনাম। অথচ ত্রিশ পার হয়ে গেল বয়স।

একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে হেনা সেন।

সোনালী বাসরের সবাই ভালবাসে মিস সেনকে। তাদের হেনাদি। একটা ছোট-খাট লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে এই সাংস্কৃতিক সংঘ। এই নিয়ে পর পর দুবার হেনা সেনকে সেক্রেটারী করা হল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, শরৎ-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তী, তাছাড়া এমনি সাধারণ গানবাজনা, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি আছেই। বছরে তিনটে চারটে বড় বড় অনুষ্ঠান করছে এরা। এখন হেনা সেন সোনালী বাসরের ছেলে-মেয়েদের দারুণ উৎসাহ দিচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠরাও দেখছেন, মিস সেন এপাড়ায় আসা থেকে ক্লাবটা কেমন জমজমাট হয়ে উঠেছে। ভারি সন্তুষ্ট তাঁরা অধ্যাপিকার ওপর। এবং সেটা নানা কারণে। তিনি বিদুষী, কুমারী, রূপবতী। অথচ চলাফেরায় কত সংযম, কী সুন্দর শুচিতা। এদিকে আবার শিল্প-সাহিত্যেও অবিশ্বাস্য রকম উৎসাহ। নিয়মিত চাঁদার খাতা নিয়ে বাসরের সভ্য-সভ্যারা প্রতিনিয়ত ঘোরাঘুরি তো করছেই—মিস সেন নিজেও বেশ ভাল টাকা-পয়সা দিচ্ছেন ক্লাবকে।

কথাটা শুনতে খারাপ শোনায়, অথচ ভাল অর্থেই বলা চলে, এপাড়ায় ছেলে-মেয়েদের মতন বড়রাও রীতিমত হেনার প্রেমে পড়ে গেছে। হুঁ, বয়োজ্যেষ্ঠরা। হেনা যা করছে তাই তাঁদের ভাল লাগছে। হেনা যা বলছে. ছেলেমেয়েদের মারফত

বয়োজ্যেষ্ঠদের কানে এসে যখন পেঁছোয়, তৎক্ষণাৎ সেটা কায়োমনোবাক্যে মেনে নেন।

অবশ্য ক্লাবের তাঁরা কেউ না। ছেলেমেয়েরাই সব। তাদের নিয়েই সোনালী বাসর। কিন্তু তাহলেও পাড়ার সোনার টুকরো সরলমতি কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীদের কে কিভাবে চালনা করছে অভিভাবক হয়ে তাঁরা সেদিকে একটু নজর রাখবেন বইকি। চারদিকে যেমন রাজনীতির ঢেউ, হরেক রকম পার্টি, আন্দোলন, তার ওপর বিদঘুটে বেকার সমস্যা, চরম অর্থনৈতিক চাপ। পাড়ার একটা ক্লাব, সমিতি, সংঘ বা বাসর যা-ই নাম দেওয়া হোক, এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রবীণরা উদাসীন বা অন্যমনস্ক থাকবেন, এদিনে আশা করা যায় না।

কাজেই মিস সেন সেদিন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক দিবস উপলক্ষে কোন্ এক আধুনিক কবি রামানন্দ সেনের কাব্যনাটিকা মঞ্চস্থ করাব প্রস্তাব দিতে বড়রা, বলতে কি, প্রথমটায় অতিমাত্রায় বিস্মিতই হয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এত নাটক-নাটিকা থাকতে, চিরকাল তাঁরা যা দেখে এসেছেন, শুনে এসেছেন অথবা অভিনয় করে এসেছেন, এককালে তাঁরাও যুবক ছিলেন. ক্লাব ফাংসন শব্দগুলির সঙ্গে মোটেই অপরিচিত নন, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য তাঁরাও দেখেছেন, অভিনয়ও করেছেন কেউ কেউ, হঠাৎ অখ্যাত, অজ্ঞাত এক রামানন্দ সেনের বই স্টেজে নামানো!

ছেলেমেয়েদের মারফত কথাটা কানে আসা মাত্র তাঁদের কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল. পাকা ভুরুর আগায় প্রশ্ন জাগল।

কিন্তু হেনা তার ক্লাবের সভ্য-সভ্যাদের যেমন বুঝিয়েছে. রবিঠাকুর পুরোনো হয়ে গেছে, বাসি হয়ে গেছে, এখনও ঐ বৃদ্ধের কাব্য, কবিতা, নৃত্যনাট্য, গীতি-নাট্য আঁকড়ে পড়ে থাকা কেন। তাঁর পরে যাঁরা এলেন বা আসছেন. নতুন ভঙ্গি, নতুন ভাবনা, নতুন চমক আমদানী করছেন, তাঁদের কি আমরা গ্রহণ করব না? বরং তাঁরাই আমাদের বেশি মুগ্ধ করছেন, প্রলুব্ধ করছেন। তাছাড়া তাজা ফুলের দিকে হাত বাড়ানো যৌবনের ধর্ম। যেহেতু একদা এক বিশ্বকবি আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁর তৈরী প্ল্যাস্টিকের ফুলগুলি আজও হাতে নিয়ে গন্ধ শোঁকার ভান করব, এটা কোনো কাজের কথা না। এটাকে শিল্পপ্রীতি বলে, না ভণ্ডামী!

কথাগুলি বয়োজ্যেষ্ঠদের কানে পেঁছোতে বিলম্ব হল না। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন। এবং মনে মনে ভাবলেন মিস সেনের যুক্তিটা কোনোমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেবল কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী কেন, টাটকা ফুলের সৌরভ তাঁরাও যে নাকে লাগাতে চান। সেই লোভ তাঁদেরও আছে। রামানন্দ সেনের কাব্যনাটিকা দেখবার জন্য ভিতরে ভিতরে বুড়োরা সত্যিই ছটফট করছিলেন। নাটিকাটি তাঁরা পড়েননি. তবে ছেলেমেয়েদের মুখে যা শুনেছেন, কেননা তখনই নাটিকার মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটি পুরুষকে ঘিরে ন'টি কুমারীর জীবনাবর্ত, এই নিয়ে নগ্ন গোধূলি রচিত হয়েছে, যেন সূর্যকে ঘিরে নয়টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে। উঁহু, নরনারীর সম্পর্ক চিত্রিত করতে গিয়ে কবি এখানে নিছক ভাবালুতা, রোমাণ্টিক চিন্তা-ভাবনার আশ্রয় নেননি। আধুনিক সুররিয়ালিস্টদের মতন এই নাটিকার সংগীতময় বিন্যাসের ভিতর দিয়ে আত্মার অনির্বাণ দীপ্তি, মানবসত্তার অকম্পিত প্রত্যয়কে কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রামানন্দ সেন নিছক কবি নন, প্রখর জীবনবোধসম্পন্ন এক শিল্পী। তাই সুর ও ছন্দের ভিতর দিয়ে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ব্যক্তির মানসকূট, আধুনিক নারী ও পুরুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। নগ্ন গোধূলির বৈশিষ্ট্য এখানে।

'আত্মার অনির্বাণ দীপ্তি', 'ব্যক্তির মানসকূট, 'মানবসত্তা', 'সুররিয়ালিস্ট

শিল্পী' ইত্যাদি বাছা বাছা কয়েকটা শব্দ এবং তাঁদের কাছে অভিনবও বটে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কানে আসছিল। কেননা মিস সেনের মুখ থেকে শোনার পর সোনালী বাসরের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে রামানন্দ সেনের কাব্য, কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে ঐ বাছা বাছা শব্দগুলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল। ক্রমে সেগুলি পাইকপাড়ার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। কাজেই রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে, অথবা পার্কে বা মাঠের এক প্রান্তে প্রবীণের দল প্রাতঃকালীন কি সান্ধ্য আড্ডায় যখন একত্র হতেন, হাওয়ায় ভর করে টুকরো টুকরো কথাগুলি তাঁদের কানে এসে পৌঁছোতে বিলম্ব হতো না। তাছাড়া একটি পুরুষকে ঘিরে নয়টি কুমারীর 'জীবনাবর্ত'। নয়টি গ্রহের সূর্য প্রদক্ষিণ। রামানন্দ সেন ও তাঁর কাব্যনাটিকা নিয়ে ক্রমে বৃদ্ধেরাও আলোচনায় মেতে উঠলেন। রেশনের কাঁকর মেশানো অভক্ষ্য চাল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, উৎকট বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক হামলা, রাজ্যপাল, ভোট, ইলেকশন ইত্যাদি নিয়ে গভীর সব আলোচনা দিন-কতক চাপা পড়ে রইল।

মোটকথা পাইকপাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা সোনালী বাসরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তাছাড়া কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল—স্বয়ং কবি রামানন্দ সেন এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন। সভাপতি অবশ্য আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। পাইকপাড়ার সর্বজনপ্রিয় বিভুদা অর্থাৎ কাউন্সিলার বিভূতিভূষণ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। গত দু' বছর ধরেই তিনি এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হচ্ছেন।

আয়োজন প্রায় সম্পন্ন। ইনভিটেশন কার্ড, প্রোগ্রাম, ক্লাবের অ্যানুয়াল রিপোর্ট ইত্যাদি দু' একদিনের মধ্যে প্রেসে ছাপতে দেওয়া হবে। মিস সেন নিজে হাতে লিখে সব ঠিক করে দিয়েছেন। শনিবার থেকে স্টেজ বাঁধার কাজ আরম্ভ হবে। কেননা বাইশে মার্চ অনুষ্ঠানের তারিখটা আর পরিবর্তন করা হয়নি। ডেকরশনের জন্য অন্তত তিন চারদিন সময় তো লাগবেই।

এখন যে দুশ্চিন্তাটা হেনাকে থেকে থেকে বিব্রত করছিল—রামানন্দ কি আসবেন ?

সেদিন সন্ধ্যার পর আলো নিবিয়ে দিয়ে জানালা খোলা রেখে তার একলা ঘরের বিছানায় শুয়ে হেনা আবার কথাটা চিন্তা করছিল। রামানন্দ সেনের কবিতার নিয়মিত পাঠিকা সে। রামানন্দর কবিতা তাকে যত বিচলিত মুগ্ধ আবিষ্ট করে, এমন আর কোনো আধুনিক কবির লেখা তা করে না। এই জন্যই হেনা অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে রামানন্দর কাব্যনাটিকাখানা, প্রায় অপঠিত অবহেলিত অবস্থায় যেটা বছর দুই আগে পদাবলী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে পড়ে আছে এবং কোনোদিনই সেটা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, সোনালী বাসরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের দিয়ে অভিনয় করার ব্যবস্থা করে। জিনিসটা আরো সুন্দর হবে, হেনা চিন্তা করল, যদি রামানন্দ অভিনয়ের দিন উপস্থিত থাকেন। রামানন্দকে হেনা কোনোদিন চোখে দেখেনি। কাজেই এই সুযোগে কবিকে দেখা ও তার সঙ্গে পরিচয় লাভের বাসনা কিছুতেই সে সংবরণ করতে পারছিল না। কিন্তু কোথায় কবির দেখা পাওয়া যায়। কেউ ঠিকানা বলতে পারছিল না। তারপর ঘটনাচক্রে একদিন মেডিকেল কলেজের দরজার সামনে মানুষটার দেখা পেয়ে ক্লাবের একটি উৎসাহী ছেলে যেভাবে তাঁর ঠিকানা জোগাড় করে আনল, সত্যি, প্রশংসা করার মতন। সেই ঠিকানা নিয়ে হেনা নিজেই গেল কবির সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তারপর ?

এর আগে রামানন্দর কবিতা পড়তে পড়তে হেনা কবির একটা ছবি, যাকে বলে

আলেখ্য, মনের মধ্যে এ'কে ঠিক করে রেখেছিল। সেদিন সল্টলেকের লাল টালির ঘরের পিছনে মাদার ঝোপের ছায়ায় যে মানুষটাকে সে দেখল তার সঙ্গে তার মনের ছবি কতটা মিলল?

রামানন্দর কবিতা পড়তে পড়তে তাঁর প্রকৃতি, তাঁর আচরণ, কথা বলার ধরন, এমন কি তাকানটি পর্যন্ত হেনা নিজের মনের মতন করে ছকে রেখেছিল।

সেদিনের দেখার সঙ্গে ছকের কিছুই মিলল না। হেনা হতাশ হয়েছিল।

রাগী, রুক্ষ, বদমেজাজী একটি মানুষ তার সঙ্গে কথা বলছিল। চেহারাও সেই রকম। কুৎসিতদর্শন বলবে না হেনা, কিন্তু ঐ মানুষের মধ্যে শিল্পপ্রীতি বা শিল্পভাবনার ছিটেফোঁটাও আছে, দেখে অন্তত হেনার মনে হয়নি। হুঁ, ঐ যে শুনেছে সে, হাঁস-মুরগির চাষ করছে রামানন্দ, হেনার মনে হয়েছিল ঐ বৃত্তিই মানুষটাকে মানায় ভাল, বা জঙ্গলে ঘুরে কাঠ কাটে, কি খালে-বিলে নেমে জাল ফেলে মাছ ধরে। ঐ মগজের মধ্যে কোনো-রকম সূক্ষ্ম চেতনা বা সংস্কৃতিগত কোন বিষয় কাজ করতে পারে বলে একবারও হেনার মনে হয়নি। যেন মোটা বুদ্ধির একটি মেহেনতী মানুষকে চোখের সামনে দেখছিল সে। কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন এবং সাধারণ জৈবিক নিয়মগুলি পালন করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু আছে বলে যার জানা নেই এবং জানাতে গেলেও যে সেসব বুঝতে চাইবে না।

মানুষটার রূঢ় আচরণে হেনা একটু আঘাতই পেয়েছিল, যদিও সে তা বুঝতে দেয়নি, সারাক্ষণ মুখে হাসি নিয়ে কবির সঙ্গে কথা বলে এসেছে।

সেখান থেকে ফিরে এসে হেনা নিজেকে বুঝিয়েছে লৌকিক আচরণ, বাহ্যিক চেহারা, মানুষটা সামাজিক কি অসামাজিক—এসব দেখে একজন শিল্পীকে বিচার করা চলে না।

তাঁর শিল্পকর্মই সব, সেদিক থেকে মানুষটা কতখানি সার্থক তুমি কেবল তাই দেখবে।

এবং বলতে কি, তারপর থেকে মাত্র এই দু' তিনদিনের মধ্যে ক্লাবের একটি দুটি উৎসাহী ছেলে খুঁজেপেতে কবি রামানন্দ সম্পর্কে এমন সব রিপোর্ট গোপনে সংগ্রহ করে হেনার কাছে পেশ করছে, শুনে হেনা এক এক সময় কীরকম নার্ভাস হয়ে পড়ছে। কিন্তু তখনই আবার সে শক্ত হয়ে উঠছে! অবশ্য এসব কথা যাতে পাড়ার প্রবীণদের কানে না যায়, হেনা সেভাবে ছেলেদের সাবধান করে দিচ্ছে।

উঁহু, রক্ষণশীল বুড়োর দল কিছুতেই এমন এক মানুষকে সোনালী বাসরের অ্যানুয়েল ফাংশনে চীফ গেস্ট করতে দিতে চাইবে না। আপত্তি করবে।

হয়তো রামানন্দর লেখা ঐ নাটকটাও তাঁরা বানচাল করে দিতে পারেন।

কেননা তাঁদের কাছে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, শালীন আচার-আচরণ, মানুষের চারিত্রিক শোভনতার দাম অনেক বেশি। রামানন্দ বড় কবি, তাঁর কবিতা ও কাব্য-নাটিকার এই প্রসাদ গুণ রয়েছে, এসব বিচার করার আগে তাঁরা দেখবেন মানুষটা ভদ্র কি অভদ্র, সচ্চরিত্র, কি লম্পট। যেহেতু পাড়ার একটা অনুষ্ঠানে তাঁকে আনা হচ্ছে, এখানে পাড়ার প্রেস্টিজের প্রশ্ন আগে। ছেলেমেয়েরা এসব নিয়ে যত চিন্তা না করছে, অভিভাবক হিসাবে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে তাঁদের অনেক বেশি ভাবতে হচ্ছে।

যদি তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন, সর্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় নেতা কাউন্সিলার বিভূতি চৌধুরী যেখানে সভাপতির আসন অলংকৃত করছেন, ঠিক তাঁর পাশেই আর একটা চেয়ারে প্রধান অতিথি হিসাবে একটা লম্পটকে, মাতালকে এনে বসানো হয়েছে, তাঁরা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হবেন সন্দেহ কি। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের সেক্রেটারী মিস সেনকে ডাকা হবে, তার কৈফিয়ত চাওয়া হবে। আপনি কি জানতেন না যে

লোকটা এই প্রকৃতির, নাকি কোনোরকম খোঁজখবর না নিয়ে—

তা-ই চিন্তা করছিল হেনা। এসব ভয় আছে। রামানন্দ মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করে, কেউ কেউ নাকি তাঁকে বেলেঘাটায় খালের ধারে নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে দেখেছে। স্ত্রীর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। মহিলা আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে আছেন। রামানন্দ সল্টলেকের এক হাঁস-মুরগিওয়ালার ঘরে আস্তানা গেড়েছে।

অবশ্য আস্তানাটা হেনা নিজের চোখেই সেদিন দেখে এসেছে। বউটা ভারি সুন্দর। কচি বয়স।

শুনতে শুনতে হেনা এখন এ-ও শুনছে, হাঁস-মুরগিওয়ালার ঐ বউটার সঙ্গে নাকি রামানন্দ অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। লোকটা হাসপাতালে পড়ে আছে। আর সেই সুযোগে মেয়েটাকে নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল কামার্ত রামানন্দ—

বস্তুত এটাও ঠিক, এসব খবরের কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা, হেনা বুঝতে পারছিল না।

চিরকাল সে রামানন্দর কবিতার মনোযোগী পাঠিকা। ব্যক্তিগতভাবে কবিকে সে জানত না, চিনত না। কিন্তু এখন জানার পর থেকে, দেখে আসার পর মাত্র এই অল্প সময়ের মধ্যে মানুষটি সম্পর্কে এত সব খবর তার কানে আসবে তার ধারনা ছিল না।

এদিকে চারদিকে পোস্টার পড়ছে, সোনালী বাসরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কবি রামানন্দ সেনকে 'প্রধান' অতিথি করে আনা হচ্ছে, খবরটা শহরের অর্ধেকের বেশি মানুষ ইতিমধ্যে হয়তো জেনে গিয়ে থাকবে। কাল পরশুর মধ্যে প্রোগ্রাম ও নেমন্তন্নর কার্ড ছাপা হয়ে আসছে। দুটোতেই রামানন্দ সেনের নাম থাকবে। আসলে এ-যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি রামানন্দই সব। এবারের অনুষ্ঠানটা বিশেষ করে তাঁকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে। তাঁর কাব্যনাটিকা অভিনয় হচ্ছে, কবি স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন।

অর্থাৎ হেনা এটাই প্রমাণ করতে চাইছে, বোঝাতে চাইছে, কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় এখন ক্লাব, সমিতি। জলসা, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদি রোজই এদিক-ওদিক লেগে আছে। কিন্তু সবই মামুলী ধরাবাঁধা ব্যাপার। কথাকলি, ভারত-নাট্যম, মণিপুরী নাচ, রবিঠাকুর ও নজরুল থেকে কিছু আবৃত্তি, একটু ক্ল্যাসি-ক্যাল সঙ, ডজন দুই রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আধুনিক গান, গীটার বাজনা, ত্রিপুরা ফ্লুট, কেরিকেচার এই সব। বড়জোর কোথাও কোথাও এক-আধটা নাটক। তা-ও লক্ষ বার লক্ষ জায়গায় অভিনীত সেই পুরোনো বস্তাপচা 'বিসর্জন', 'তপতী', 'রক্তকরবী' অথবা 'বর্ষামঙ্গল' কি 'ঋতুরঙ্গ'। যেন তারপর বাংলাদেশে আর নাটক-নাটিকা লেখা হয়নি, কাব্যনাটিকা তৈরী হয়নি।

কাজেই হেনা চাইছিল অন্তত পাইকপাড়ার মানুষ দেখুক ও জানুক, একজন আধুনিক কবির কলম থেকে কত সুন্দর জিনিস বেরোতে পারে এবং এটা না বললেও চলে, খবরটা কেবল পাইকপাড়ার বন্ধ বাতাসেই আটকে থাকবে না। রিষড়ে উত্তরপাড়া তো ভাল, কোথায় অশোকনগরের কোনো ক্লাব বা বামনগাছি বেড়াচাঁপার মতন জায়গাতেও আজ একটা ক্লাব বা সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতন কিছু করলে পরদিন সকালেই কাগজে খবরটা চমৎকার বেরিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে খবরটা আগে ছাপা হবে, চাই কি প্রথম পৃষ্ঠায় ডবল কলমেও ছাপা হয়ে বেরোতে পারে। তাহলেও রাজনীতির পরেই কাগজওয়ালারা এখন সংস্কৃতি-টংস্কৃতির ওপর জোর দিচ্ছে। খবরের কাগজের দায়িত্ব এখানেই শেষ যদিও। কেবল সংবাদটা ছেপে দেওয়া। কিন্তু সাহিত্য-পত্রিকাগুলি? তারা এই

নিয়ে আর একটু বলবে। পাইকপাড়ার সোনালী বাসরের সভ্য-সভ্যারা একজন আধুনিক কবির কাব্যনাটিকা মঞ্চস্থ করে সত্যিকার প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিলেন।

'প্রগতি', 'আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি'—এই শব্দগুলির দিকে চোখ রেখেই হেনা এবারের অনুষ্ঠানে রামানন্দ সেনের নগ্ন গোধূলি অভিনয় করার আয়োজন করেছে। এই প্রশংসাটা মূলত কি সোনালী বাসরের হেনা সেনেরই প্রাপ্য হচ্ছে না? তার চেষ্টা উদ্যম পরিকল্পনাই তো এখানে সব।

অথচ এদিকে রামানন্দ সম্পর্কে এক কথা এখন কানে আসছে। একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে যাওয়া হেনার পক্ষে স্বাভাবিক।

জানালার বাইরে বেশ গোল হয়ে চাঁদ উঠেছে। বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে হেনা স্থির চোখে কতক্ষণ চাঁদটাকে দেখল। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়াল। চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করল। আঁচলটা বুকে টেনে নিল। রামানন্দ আসতে চাইছিলেন না, যেন তাই ভাল ছিল। দরকার কি জোরজবরদস্তি করে মানুষটাকে এখানে টেনে আনার— নতুন করে হেনার চিন্তা আরম্ভ হল।

অবশ্য আজ বিকেলেও ক্লাবের দু-তিনটি বড় ছেলেমেয়েকে এই ঘরে ডেকে এনে হেনা বুঝিয়েছে, আমরা রামানন্দর ব্যক্তিগত চরিত্র দেখব না, কবি হিসাবে তিনি আমাদের কাছে খুব বড় কবি, আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, আমাদের প্রিয় লেখক। কাজেই এই অনুষ্ঠানে তাঁকে আমরা চাইছি।

কিন্তু কোনোরকমে যদি প্রবীণদের কানে ওঠে রামানন্দ এই চরিত্রের লোক? মাতাল, ব্রথেলে আনাগোনা আছে—হুঁ, এই খবরটাও হেনার কানে এসেছে। তাছাড়া নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, আর একজনের স্ত্রীকে নিয়ে আছে, চাকরি নেই, বন্ধুরা তাকে দু' চোখে দেখতে পারে না, এসব তো আছেই। উঁহু, এখন আর কবিতা-টবিতাও লেখে না, সাহিত্যজগত থেকে রামানন্দ অনেক দূরে। অথচ বেছে বেছে সোনালী বাসরের অ্যানুয়েল ফাংশানে মিস সেন কিনা এই মানুষটাকেই চীফ গেস্ট করে নিয়ে এল! একটা অস্থিরতা নিয়ে হেনা পায়চারি করছিল। এবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। দরজার কড়া নাড়ছে কেউ। হাতের ঘড়িতে সময় দেখে হেনা অবাক হল। ঠিক এই সময়ে এসে কেউ কড়া নাড়বে, তার অপেক্ষায় ছিল নাকি সে? হাসিমুখে দরজা খুলে দিল।

এক সঙ্গে চারটি যুবক ভিতরে ঢুকল।

হেনা দোরটা আবার ভেজিয়ে দিল।

দুজন এ-পাড়ার ছেলে। আর দুটিকে হেনা চিনতে পারল না। 'কি খবর প্রিয়তোষ?'

পরিচিতদের মধ্যে একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে হেনা প্রশ্ন করল।

'সব ঠিক হয়ে গেছে হেনাদি।'

যেন উত্তরটা ঠিক পরিষ্কার হল না; পাড়ার অন্য ছেলেটির দিকে হেনা চোখ তুলল।

'কি খবর হিমাংশু!'

'এঁরা আনতে যাবেন রামানন্দবাবুকে।'

হিমাংশু অপর দুটি যুবককে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

গায়ে টি-শার্ট, পরনে চোঙা প্যান্ট, ছুঁচলো জুতো পায়ে, কদমফুলের মতন চুল ছাঁটা মাথার, দুজনের হাতেই ঘড়ি রয়েছে, চেহারায় কেমন একটা রুক্ষ উদাসীনতার ছাপ। যেন পৃথিবীতে এরা কাউকে গ্রাহ্যগ্রাহ্য করে না।

'কোথায় থাকেন এঁরা।' এক সঙ্গে দুজনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেনা

পরে হিমাংশুর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'একজন ভবানীপুর থাকে, আর একজন বেহালায়—আমাদের বন্ধু।'

'কিন্তু ও'রা রামানন্দবাবুর বাড়ি চিনবেন না, তোমাদের কাউকে সঙ্গে যেতে হবে।'

'উ'হু', ভবানীপুরের যুবকটি মাথা নাড়ল। 'মুখে একটু ডিরেকশন বলে দিলেই আমরা বাড়ি খু'জে বার করব। তার জন্য আপনাদের চিন্তা করতে হবে না।'

'এ তো শুনছি বেলেঘাটা, ফাঁকা জায়গা', বেহালার ছেলেটি একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'কলকাতার সাংঘাতিক সাংঘাতিক ঘিঞ্জি গলি-ঘু'জির ভেতর থেকে আমরা লোক খু'জে বার করি। আমাদের অসাধ্য কিছু নেই।'

হেনা অল্প হাসল।

'কিন্তু উনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না যে। হিমাংশু ও প্রিয়তোষের মুখে শুনেছেন নিশ্চয়ই। আপনারা ও'কে পারবেন আনতে?'

'বললাম তো, আমাদের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। শুনলাম মঙ্গলবার আপনাদের ফাংশন, ছটায়। বেলা চারটের মধ্যে জানোয়ারটাকে ধরে এনে আপনাদের হেপাজতে তুলে দেবো।'

হেনা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। এরা কি জানে যে রামানন্দ একজন বড় কবি! প্রিয়তোষ বা হিমাংশু বলেনি? নাকি হিমাংশুদের মুখে কেবল শুনেছে, রামানন্দ একটা লম্পট, দুশ্চরিত্র, মাতাল, বাউন্ডুলে। ঘর-বাড়ি নেই, স্ত্রী নেই, আর একটি মেয়েছেলের কাছে পড়ে আছে? তা না হলে হেনার সামনে রামানন্দ সম্পর্কে এরা ঠিক এভাবে বলবে কেন।

নাকি হিমাংশুদের মুখে শুনেছে, রামানন্দ একাধারে বড় কবি, দুশ্চরিত্র মাতালও?

হেনা চিন্তা করল, হয়তো তাই সম্ভব। যে জন্য এরা রামানন্দকে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব বলে ধরে নিয়েছে। অস্বাভাবিক কিছু না। কারণ, হেনা যতটা অনুমান করল, কবি কাকে বলে এরা হয়তো জানে, কিন্তু চেহারায় যা বলছিল, দুটির একটিও তেমন একটা লেখাপড়া শিখেছে বলে হেনার মনে হল না, তা হলেও ছেলেবেলায় স্কুলেটুলে পড়ার সময় পাঠ্য বইয়ে কবি কুমুদ মল্লিক, কালিদাস রায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের ছবিটবি দেখে থাকবে, তাঁদের দুটো একটা করে কবিতাও হয়তো পড়েছে, আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই—এখনও রেডিও খুললেই কবিগুরুর গান, অর্থাৎ কবি সম্পর্কে মোটামুটি এদের একটা পরিষ্কার ধারণাই রয়েছে। এবং মাতাল, লম্পট, ভবঘুরে, বাউন্ডুলে কাকে বলে তা-ও এদের খুব ভাল জানা আছে। কিন্তু একটা মানুষ একাধারে কবিও, আবার লম্পট, দুশ্চরিত্র মাতালও, এই দুটো জিনিসকে এরা নিশ্চয় একত্র করতে পারছিল না। তাই হয়তো রামানন্দ এদের কাছে অস্বাভাবিক অদ্ভুত কিছু।

'আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।' ভবানীপুরের ছেলেটি চুপ করতে বেহালার ছেলেটি বলল, 'উল্লুকটাকে হিড়হিড় করে টেনে আপনাদের কাছে হাজির করব।'

'কিন্তু তিনি একজন মাননীয় ব্যক্তি, বড় কবি।' হেনা বড় করে একটা ঢোক গিলল। 'আমাদের সেদিনকার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হচ্ছেন, কাজেই ভদ্রলোককে আনতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যেন খুব একটা খারাপ ব্যবহার না করা হয়।'

ছেলেটি নাকের শব্দ করে হাসল। 'কবি হোক, মন্ত্রী হোক, গাঁটকাটা চোর বিজনেসম্যান বা সন্ন্যাসী—আমাদের কাছে সব বেটা সমান, ঠিক টাইম মতন সোনার চাঁদকে আপনাদের প্যান্ডেলে এনে হাজির করব।'

'আপনি হয়তো জানেন না হেনাদি', খুশি খুশি গলায় একটা গর্বের ভাব

নিয়ে হিমাংশু বলল, 'আমাদের এই দুটি ফ্রেন্ড কলকাতা শহরে কতজনের কত প্রবলেম যে সল্‌ভ করে দিয়েছে—আপনার কাছে বলতে ক্ষতি নেই, আপনি আমাদের কাছে এখন ঘরের লোকেন মতন, এদের সঙ্গে অস্ত্রটস্ত্র থাকে।'

'অস্ত্র!' হেনার চোখ গোল হয়ে উঠল। এদের কিসের অস্ত্র, কেমন অস্ত্র?'

প্রিয়তোষ চোখ টেপার মতন করে হেনার মুখের দিকে তাকাল। 'এই রিভলবার-টিভলবার জাতীয় জিনিস আর কি।'

'সর্বনাশ!' পায়ে মাথায় হেনা শিউরে উঠল। 'রিভলবার নিয়ে রামানন্দবাবুকে আনতে যাবেন এঁরা! নিরীহ মানুষ, সভা-সমিতিতে আসতে চান না, কাজেই আনতে গেলে একটু মেজাজ-টেজাজ উনি দেখাতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তখন রেগে গিয়ে এঁরা যদি ওটা ছুঁড়ে বসেন?'

'ম্যাডাম!' ভবানীপুরের ছেলেটি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। 'আপনি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতন কথা বলছেন। রিভলবার ছুঁড়তে যাব কেন। সাথে রাখি বলে কি আর কথায় কথায় আমরা ওই জিনিস ছুঁড়ি। মানে কবি মশাই যদি তেমন ত্যাঁদড়ামি করেন, টেড়া মেজাজ দেখান, তখন আমরাও অস্ত্রটা প্যান্টের পকেট থেকে একবার খুলে দেখাব। ব্যস, ওতেই কাজ হবে, চাঁদ আর টুঁ শব্দটি করবে না, বাপের সুপুত্তুরের মতন সুড়সুড় করে আমাদের সঙ্গে পাইকপাড়ায় ছুটে আসতে পথ পাবে না।'

'তবে একটা কাজ করলে হয়।' ভয়ের ভাবটা হেনা কাটাতে পারছিল না। আসল জিনিস সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে একটা কাঠের রিভলবার নিয়ে গেলে ক্ষতি কি, ভয় দেখানো যখন কথা—'

'সে ওরা ঠিক ম্যানেজ করবে।' হিমাংশু বলল, 'কাঠের জিনিস নিক কি টিনের জিনিস নিক, কি আসলটা সঙ্গে নিয়ে যাক, মোট কথা মঙ্গলবার রামানন্দ সেনকে এখানে এনে হাজির করা হবে। এই নিয়ে আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না।'

'আমাদের পাড়ার ফাংশন।' প্রিয়তোষ চড়া গলায় বলল, 'ট্রামে, বাসে, রাস্তায়, গলিতে পোস্টার লাগানো হয়ে গেছে। রামানন্দ এখন "না" বললে শুনব কেন, ফাংশন ভন্ডুল হতে কিছুতেই দেবো না, আপনার কথা মতন ওকে এনে, সেদিন চীফ গেস্টের চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হবে—কাজেই কেমন করে মানুষটাকে আনা হচ্ছে এই নিয়ে আপনি আর এখন মাথা ঘামাবেন না।'

'হুঁ', হিমাংশু ঘাড় কাত করল। 'তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন হেনাদি, রামানন্দ সেনকে কোনোরকম বডিলি ইনজিওর করা হবে না, হাত পা নিয়ে রীতি-মত সুস্থদেহে এসে তিনি যাতে সেদিন আমাদের এখানে ভাষণ-টাষণ দিতে পারেন, সেভাবেই তাঁকে নিয়ে আসা হবে—'

'চলুন হাঁদুবাবু, চলুন নিধুবাবু।' হেনার সঙ্গে কথা শেষ করে হিমাংশু সেই দুটি যুবকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বোঝা গেল একজনের নাম হাঁদু, একজনের নাম নিধু। চারজন এক সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়ে হেনা জানালার ওপারে হলদে চাঁদটাকে দেখতে লাগল।

।। ১৯ ।।

যে যাই বলুক, দুপুরের দিকে এমন একটা ক্লান্তিকর সময় আসে, যখন মোহন পালের মতন ঠান্ডা চুপচাপ মানুষটিও হাঁপিয়ে ওঠে। যেন সময় কাটে না। মোহন-বাবুর মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় কাজকর্ম, ছুটোছুটি, এমনকি বাইরের ট্রাম, বাস,

রিকশা, ঠেলা, লরী, ট্যাক্সি সব এক জায়গায় থেমে গেল। কিছুই যেন আর চলছে না। কোনোদিন বুঝি আর চলবেও না। যেন বাইরের এত গোলমালও হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে।

মোহনবাবুর তখন মনে হয় একটা ভূতুড়ে প্রহর পৃথিবীটার ওপর জাঁকিয়ে বসেছে। ঠিক এই সময়টাই যত অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল চাপে মানুষের কাঁধে। হুঁ, এমন একটা ভূতুড়ে সময়েই না রামানন্দ একদিন মদ খেয়ে দোকানে ঢুকেছিল। কেউ ছিল না সঙ্গে। চুপচাপ বসে চা খেল, নিজের মনে কী কতক্ষণ ভাবল, তারপর হুট করে একসময় উঠে মোহনবাবুর এই ছোট টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল, দুটো মৌরী তুলে মুখে পুরল, চায়ের পয়সাটা টেবিলে রাখল। তারপর কেমন যেন জ্ঞান-গদ্‌গদ স্বরে বলল, 'চলি মোহনবাবু, চললাম।' যেন চিরকালের মতন মানুষটা চলে যাচ্ছে।

মোহন খুব চমকে উঠেছিল।

কেবল গলার স্বর না, রামানন্দ সেনের তাকানটা পর্যন্ত ভয়ানক অস্বাভাবিক, অন্যরকম মনে হচ্ছিল। আজ মোহন পালের হাসি পায়, হয়তো সেটা সেদিন নেশার ঝোঁকেই, ঝুপ করে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে রামানন্দ কিনা মোহন পালের গালে চুমু খেতে চেয়েছিল। গা-টা কেমন ছমছম করে উঠেছিল মোহনবাবুর। কেননা, দীর্ঘ-দিন ধরে এই কবির দলটি তার দোকানে ঢুকে চা খাচ্ছে, গল্প করছে, কাব্য-চর্চা করছে। মদ খেয়ে কেউ বড় একটা দোকানে ঢুকেছে বলে মোহনবাবুর মনে পড়ে না। মোহন পাল কবিদের আলোচনা শুনেছে ঃ আজ একটু খাওয়া-দাওয়া হোক, কি বলো, রাজী আছ, রেস্ত আছে? ইত্যাদি। দোকানে বসে এই পর্যন্ত হয়েছে। তারপর হয়তো দল বেঁধে সব খালাসিটোলা কি একটু ভাল জিনিস গলায় ঢালতে ধর্মতলা চৌরঙ্গীর বাস ধরতে দোকান থেকে বেরিয়ে গেছে।

উহুঁ, রামানন্দর এমন একলা করে কোথা থেকে খেয়ে আসা, তা-ও সেদিন ভরদুপুরে খেয়ে দোকানে ঢুকে ওই মদের পেটে আবার গরম চা খাওয়া—সবটাই অস্বাভাবিক অসঙ্গত ঠেকছিল মোহন পালের কাছে। তারপর বিদায় নেবার সময় মোহনবাবুর খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরতি গালে চুমু খেতে চাওয়া!

কাজেই সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত রোজই মোহনবাবু কথাটা ভাবছে, সেই দুপুরের ভূতুড়ে সময়টায় রামানন্দ সেনের কাঁধেও ঠিক ভূত চেপেছিল। সেই যে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল আর তো কোনোদিন মানুষটা এ-মুখো হল না।

এমন এক ভূতুড়ে থমথমে দুপুরেই না অতর্কিতে এক বুড়োর আবির্ভাব ঘটল মোহন রেস্টুরেন্টে!

পৃথিবীটা সেদিন যেন আরও বেশি চুপচাপ ছিল। আকাশটারও কেমন বিশ্রী ঘোলা ঘোলা চেহারা ছিল। মোহনের কর্মচারী রমেশ দরজার কাছে টুলটা টেনে তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে নাক ডাকছিল। উনুনের আঁচ পড়ে গিয়েছিল। ডাল, ভাত রেঁধে রমেশই খুঁচিয়ে কয়লাটা নামিয়ে দিয়েছিল। লজ্‌ঝড় একটা স্টেটবাস চেপে দিনেরবেলা সেই কোন্ বেতাইতলা ফিরে গিয়ে ঘরের ভাত খাওয়া মোহন-বাবুর ঘটে না। এক রবিবার ছাড়া। রবিবার একবেলা দোকান খোলা থাকে। বিকেল তিনটা থেকে রাত ন'টা। কিন্তু অন্যদিন তা না। ভোর ছ'টা থেকে রাত ন'টা দোকানের দরজা খোলা থাকবে। কাজেই সেসব দিনে মধ্যাহ্ন আহার রমেশের সঙ্গে দোকানেই সারতে হয়। এইজন্য মোহন পালের দুঃখ নেই। ইচ্ছা করেই এই কৃচ্ছ্র পালন। না হলে ব্যবসা বাণিজ্য চলে না। চালে-ডালে এক সঙ্গে ফুটিয়ে নিয়ে যাহোক করে উদরপূর্তি। রাত্রে বাড়ি গিয়ে গিন্নীর হাতের রাঁধা ভাত যখন আছেই, একবেলার কষ্ট মোহন হেসেখেলে সহ্য করে। তাছাড়া দুপুরের এই খাওয়াটা

অভ্যাসও হয়ে গেছে।

হুঁ, যে কথা হচ্ছিল, সেদিন খেয়ে উঠে দরজার কাছে লম্বা টুলটা ঠেলে সদরের দুটো পাল্লার একটা ভেজিয়ে দিয়ে রমেশ নাক ডাকছিল, হিসাবের খাতা সামনে রেখে মোহন পালও ঢুলছিল। দোকানের ভিতরটা অন্ধকার অন্ধকার, চপের পুর ও গুলি তৈরি করে বড় বারকোশটায় সাজিয়ে রেখে একটা ভেজা গামছা দিয়ে রমেশ ঢেকে রেখেছিল। রোজই তা করে। সব সাজিয়ে রাখে। রেডি রাখে। বিকেল তিনটেয় কলের জল আসার সঙ্গে সঙ্গে খদ্দেরের আনাগোনা আরম্ভ হলেই নতুন করে কয়লা দিয়ে উনুনের মরা আঁচটা আবার জাগিয়ে তুলে রমেশ চপ ভাজতে লেগে যায়।

তা' বলে কি আর হুড়মুড় করে খদ্দের আসে যে সব চপ এক সঙ্গে ভেজে সন্ধ্যার আগে বেচে শেষ করবে। দোকানের সেই সুদিন কবে আসবে মোহন পাল জানে না। জানে না এবং এই নিয়ে খুব যে একটা মাথা ঘামায় তা-ও মনে হয় না। চলছে চলবে—যেমন করে হোক চলে যাবে এমন একটা ভাব নিয়ে চুপচাপ হিসাবের খাতাটা খুলে বসে থাকে। উহুঁ, যেহেতু কবির দলটা সারাক্ষণ দোকানের সব ক'টা চেয়ার জুড়ে থেকে হইহল্লা করে, আর এই জন্য বাইরের আর কোনো খদ্দের দোকানে ঢুকতে সাহস পায় না এমন কথা কিন্তু মোহন পাল ভুলেও মনে ঠাঁই দেয় না। তার ধারণা, গণেশ ঠাকুর মুখ তুলে তাকালে কবি-টবিতে কিছু আটকাবে না, বানের জল যখন খালে, বিলে, পুকুরে ঢুকতে আরম্ভ করে, তখন কি চারপাশের কাঁটাঝোপ বা কচুরিপানার দাম সেই জলের তোড় ঠেকাতে পারে—পারে না। কাজেই সুদিন যেদিন আসবে, গণেশ যেদিন মুখ তুলে তাকাবে, একলা রমেশ কেন, আরও দুটো কারিগর রেখেও মোহন চপ-কাটলেট, গ্রিল, ডেভিল পুডিং, পরোটা তৈরী করে খদ্দের লক্ষ্মীদের সাপ্লাই করে কূল পাবে না। এখন ঢিমেতালে কারবার চলছে বলে যে মোহন পাল মাথার চুল ছিঁড়বে, সে ব্যক্তিই সে না। এখন বলতে অবশ্য আজ কুড়ি বছর ধরেই দোকানের এই হাল। তাহলেও মোহন অপেক্ষা করতে জানে। ধৈর্যও যে ব্যবসার আর একটা মূলধন মোহনের তা ভাল জানা আছে। অনেকে জানে না বলে কারবার ফেঁদেই রাতারাতি মুনাফা লুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে মরে। এমন করে মরতে মোহন চায় না, মোটামুটি চলে গেলেই হল। মোহন পালের কিছু পানদোষ নেই, মেয়েছেলের শখ নেই যে রোজই কিছু খাবলা-খাবলা টাকার দরকার হবে। বিলাসিতা নেই। এমনকি সিগারেট, পান, দোক্তার মতন সাধারণ বাজে খরচগুলি জীবনের শুরু থেকে ছেঁটে বাদ দিয়েছে। কাজেই এই মানুষের ভয় কি। হুঁ, ঘর-ভাড়া, ইলেকট্রিক বিল ও রমেশের মাসের বেতনটা ঠিক ঠিক চালিয়ে গেলেই হল। তারপর তুমি গ্যাঁট হয়ে হিসাবের খাতা নিয়ে চুপ করে বসে থাক। এ-ও অনেকটা পুকুরে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরার মতন যে। চুপ করে বসে থাকা। যখন ফাতনা নড়ে উঠবে সুযোগ বুঝে ছিপ তুলে টান মারলেই হল। তাড়াহুড়ো করে কিছু লাভ নেই।

যাই হোক, একদিন সেই ভূতুড়ে দুপুরে আচম্‌কা এক বুড়োর দোকানে ঢোকার কথাটা চিন্তা করা যাক। রমেশের নাক ডাকছিল, মোহন নিজের চেয়ারে বসে হিসাবের খাতা সামনে রেখে ঢুলছিল, ভেজা গামছা দিয়ে ঢেকে রাখা বারকোশের চপের গুলি ও ভাজা পুরের ওপর লোলুপ মাছির ঝাঁক বনবন করে ঘুরছিল, সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেজানো, ভিতরটা অন্ধকার অন্ধকার, হঠাৎ দুর্দান্ত কাশির শব্দে মোহনের গায়ে মাথায় কেমন যেন ঝাঁকুনি লাগতে নড়েচড়ে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, উগ্রমূর্তি এক বৃদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে। কটমট করে অনর্গল তাকে দেখছে।

কেমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

উ'হ্, মোহন পালের দোকানে আজ পর্যন্ত কোনো বুড়োকে চা খেতে ঢুকতে কেউ দেখেনি। হয়তো শুভেন্দুদের জন্যই তা হয় না। সারাক্ষণ যেখানে যুবকের দল, চ্যাংড়ার দল আড্ডা দেয়, হইচই করে, সেখানে বুড়োরা ঢুকতে ভয় পায়। তাও আবার এই ভরদুপুরে। অবশ্য দোকানটা তখন একেবারে ফাঁকা। পুজো সংখ্যার পদাবলী ছাপা হচ্ছে। কবির দল ক'দিন ধরে বলতে গেলে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টাই রমানাথ কবিরাজ লেনে অন্নদার প্রেসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

নাকি এমন একটা সুযোগ বুঝেই নিরিবিলি বসে একটু চা খাবে বলে বুড়ো মানুষটা মোহন রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল। মোহন ঠিক বুঝতে পারছিল না। কবি-গোষ্ঠী অর্থাৎ শুভেন্দুবাবুদের ক'জন ছাড়া এই দোকানের চায়ের সুখ্যাতি বাইরের কোনো লোকের কানে যাবে বা গেছে তা-ই বা কেমন করে মোহন বিশ্বাস করে।

তা হলেও ক্যাশের টেবিলটা ছেড়ে উঠে মোহন সোজা হয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ মানুষ, সম্মান দেখাতে হয় বইকি।

'বসুন বসুন।—এই রমেশ! বাবু কি চাইছেন দ্যাখ্।' মোহন জোরে হেঁকে উঠল।

'আমি কিছু চাইছি না।' ভদ্রলোকও সমান জোরে চিৎকার করে উঠল, 'আমি চা-ফা খেতে এই নরকে ঢুকিনি।'

রমেশ চোখ রগড়াচ্ছিল। মোহন আড়ষ্ট হয়ে ভদ্রলোককে দেখল, নিশ্চয় রগচটা মানুষ, একটুতেই রেগে যায়। পাতলা ক'গাছা চুল মাথায়, সবই পেকে গেছে, নাকটা ভয়ানক চোখা, প্রায় বকের ঠোঁটের মতন, রোগা খিটখিটে শরীর; কণ্ঠার হাড়টা কী ভয়ানক উঁচু, যেন সরু মাথার তিন কোণা একটা কাঠের টুকরো কেউ সেখানে বসিয়ে দিয়েছে—আর একটু জোরে চেঁচালেই টুকরোটা আলগা হয়ে বেরিয়ে আসবে। পরনে ধুতি। সাদা শার্টের ওপর একটা ছাই রঙের জহর কোট চাপানো। কোটের তিনটা বোতাম তিন রঙের। বোঝা যায় জামাটা বেশ পুরোনো হয়েছে। যেন যুদ্ধের আগের তৈরি। পায়ে বাদামী রঙের ক্যাম্বিসের জুতো। চোখ বড় করে, প্রায় শ্বাস বন্ধ করে মোহন পাল বুড়োকে খুঁটিয়ে দেখে নিল। তার দোকানটা হঠাৎ নরক হয়ে গেল কেন সে বুঝতে পারছিল না।

'আপনার দোকান!' বুড়ো থুঁতনি নাড়ল।

মোহন একদিকে ঘাড়টা অল্প একটু কাত করে বলল, 'হুঁ, আমার দোকান।'

'কোথায় গেছে, শুয়ারটা কোথায় গেল, নাকি ওদিকের ঐ পর্দাটার পেছনে আমাকে দেখে লুকিয়েছে?' বলার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো পেছনের পর্দা ঝুলানো কামরাটার দিকে পা বাড়াল।

'ওখানে আমার উনুন, আমার রান্নাবান্না হয়। ওদিকে যাবেন না।' মোহন রুষ্ট হ'ল। 'আপনি কাকে চাইছেন বলুন তো, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' যেন ভদ্রতা রেখে কথা বলা মোহন পালের আর পোষাচ্ছিল না। কটমট করে বুড়োর মুখটা দেখল।

'আমি কাকে চাইছি? আমি কাকে খুঁজছি! আমি কোথা থেকে এসেছি—আমি আমার ছেলেকে খুঁজছি, আমার ছেলেকে চাইছি—আমি হাজরা থেকে এই দুপুর রোদে ছুটে এসেছি—হাঁপানির রুগী, ডাক্তার বেশি ছুটোছুটি নিষেধ করেছে, কিন্তু ঐ কুলাঙ্গারের জন্য—ঐ অপদার্থটার জন্য—'

বুড়ো একটু একটু করে হাঁপাতে আরম্ভ করল। এবং মোহন শুনল গলার একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ যেন প্রায় আরম্ভ হয়ে গেছে। হাঁপানির ব্যারাম থাকলে যা হয়। ফ্যাকাশে চোখ দুটোও, হয়তো উত্তেজনাবশত হঠাৎ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠতে দেখল মোহন এবং এক সেকেন্ড পরেই আবার দেখল দুটো চোখ থইথই জলে ভরে

উঠেছে। একটু কষ্ট হল মোহনের। ভয়ও হল। 'আপনার ছেলেকে তো আমি চিনতে পারলাম না। তিনি কি এখানে আসেন?'

'হেঁ হেঁ', তিনি এখানে শেকড় গেড়েছেন, তিনি ভুলে গেছেন তাঁর সত্তর বছরের বাবা একটা হাঁপানির রুগী, তিনি ভুলে গেছেন তাঁর গর্ভধারিণী পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ী চোখের ছানি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তিনি ভুলে গেছেন তাঁর সহধর্মিণী কাল বাদে পরশু আবার আঁতুড়ে ঢুকবে, তিনি সাহিত্য করছেন, তিনি কাব্যি নিয়ে মত্ত, কাল রাত থেকে তিনি বাড়ি যাচ্ছেন না, আমার ওষুধ আনা হয়নি, আজ সকালে রেশন তোলা হয়নি—'

এবার বুড়োর গলার স্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ মোহনের কানে এল। আর যেন কথা বলতে পারছে না। রোগা শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। একটা চেয়ারের হাতল চেপে ধরল।

'আপনি বসুন, আপনি এই চেয়ারটায় বসে পড়ুন।' মোহন বুড়োকে ধরে বসিয়ে দিতে গেল। কিন্তু ভদ্রলোক তা হতে দিল না। যেন এখনও যথেষ্ট তেজ রাখে। ঝট্‌কা দিয়ে মোহনের হাতটা সরিয়ে দিল।

'উঁহু, বসব না, আমি এখানে আরাম করতে আসিনি, আমি এসেছি উল্লুকটার খোঁজে, আমি এসেছি এই নরকটা দেখতে, অনেকদিন ধরে নামটা শুনছি, মোহন রেস্টুরেন্ট, মোহন রেস্টুরেন্ট—আপনি এই দোকানের মালিক—তাই আপনাকেও দেখতে এলাম, কেমন ধরনের জীব আপনি—অ্যা, আমার যে ছেলে আই-এ-এস পরীক্ষা দিত, যে-ছেলে ব্যারিস্টারী পড়তে একদিন বিলেত যেত, একটা বড় সরকারী পোস্টে ঢুকলেও কিনা আজ দু' হাজার আড়াই হাজার টাকা যে মাইনে পেত, আপনার দোকানের আড্ডায় মেতে একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল—তাই দেখতে এসেছিলাম মশাই, কেমন কারখানা খুলে বসেছেন আপনি যে, আমার এমন সর্বনাশটা করে ছাড়লেন।'

তাই তো! মোহনের চোখ দুটো এবার স্থির হয়ে গেল। হাজরা থেকে ছুটে এসেছে বুড়ো বলল-না! তবে তো বিকাশবাবুর বাবা। কবি বিকাশ চাটুজ্যের কবে যেন একবার আই-এ-এস না কি একটা পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কবির দল ক'দিনই এখানে বলাবলি করেছিল। মোহন ঘেমে উঠল। একটা বড় করে ঢোক গিলল, তারপর অনুনয়ের গলায় বলল, 'দেখুন, এ জন্য আমাকে তো দোষী করে লাভ নেই, আমি কি চাইছি, এ'রা কবিরা চব্বিশ ঘণ্টা আমার দোকানে এসে আড্ডা দিক! আমি বরং অসন্তুষ্ট হই, কিন্তু সবাই ভদ্দরলোকের ছেলে, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না, আপনি বলছেন এই আড্ডা মারার জন্য আপনার ক্ষতি হয়ে গেল, কিন্তু আমারও কি কম ক্ষতি করেছেন এনারা—আজ আমার কারবারের কি এই অবস্থা থাকত, দোকানের এই চেহারা হতো—কিন্তু কি করব...'

'চুপ করুন চুপ করুন।' বুড়ো মোহন পালকে ধমক দিয়ে উঠল। 'আপনাকে আর সাফাই গাইতে হবে না, আপনি যে কী ধরনের মানুষ, আমি বুঝে গেছি, আমারও যথেষ্ট বয়স হয়েছে, নিজে বুড়ো হয়েছেন, মাথায় এতবড় টাক, কিন্তু আপনার মগজে কুবুদ্ধি ছাড়া কিছু নেই, লেখাপড়া জানা পাঁচটা ভদ্রলোকের সন্তান কেবল কাব্যিচর্চা করুক আর আপনার দোকানে দিনরাত আড্ডা দিয়ে দিয়ে ডুবে যাক এই আপনার মতলব। কেননা রোজ তাহলে আপনার ক' কাপ চা বেশি কাটবে। আমরা কি এসব কিছুই বুঝি না—পরের ক্ষতি, পরের সর্বনাশটা আপনি দেখবেন কেন, নিজের স্বার্থটাই আপনার কাছে বড়। আপনাদের মতন এক একটা মানুষ যে সমাজের কত বড় শত্রু—'

'ছি ছি, এ আপনি বলছেন কি!' মোহন পাল চটে গেল। 'আপনারা যদি

আপনাদের ছেলেদের শাসন করতে না পারেন, কণ্ট্রোল করতে না পারেন, তাঁরা যদি গার্জেনের কথাবার্তা না শুনে একটা রেষ্টুরেণ্টে এসে সারাক্ষণ পড়ে থাকে তার জন্য কি আমি দায়ী—এই জন্য আমাকে কথা শুনতে হবে? ভারি মজা তো!'

'হুঁ, আপনাকেই শুনতে হবে—আপনার একটা সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে—যখন দেখছিলেন ছোঁড়ারা কিছুতেই আপনার এখানে আড্ডা দেওয়া বন্ধ করছিল না, আপনার উচিত ছিল দোকান গুটিয়ে ফেলা বা চায়ের দোকান তুলে দিয়ে জুতোর দোকান খোলা।' হাঁপানির ঘড়ঘড়ানি নিয়েও বুড়ো দু' হাত শূন্যে নাচাতে লাগল। 'আমি হলে তাই করতাম, আমাদের আমলে সবাই এটা করত, ক'টা ছেলে বকে যাচ্ছে কিছুতেই সহ্য করতাম না, আজ সমাজটাই দূষিত হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা মানুষ—কি বলব, ডিমরালাইজড, দুর্নীতিগ্রস্ত, কারো প্রতি কেউ দেখে না, কারো সর্বনাশের কথা কেউ চিন্তাই করে না।'

'আমার চিন্তা করার দরকারটা কি, আমি কারবারী লোক, সমাজসেবা করতে আসিনি।' প্রচণ্ড রাগ নিয়ে মোহনও ফুঁসছিল। 'লোকের কথায় আমি চায়ের দোকান ছেড়ে জুতোর দোকান করব, জুতোর দোকান ছেড়ে বাসনের দোকান খুলব—আবদার!'

'থাক থাক, আপনার সঙ্গে আমি বেশি কথা বলতে চাই না, এখন আমার গুণধর পুত্রটি কোথায় আছে দয়া করে বলবেন কি!'

'হুঁ, তাই বলুন, সিধে রাস্তায় হাঁটুন—তা না, দোকানে ঢুকেই হইচই শুরু, দোকানীকে দুষতে লাগলেন।' মোহন ঘামছিল, হাতের পাকানো মুঠো খুলে ফেলে কপালটা মুছে ফেলল। 'দেখুন গে তেনারা সব পুজোর কাগজ ছাপবার জন্য রমানাথ কবিরাজ লেনে অন্নদার প্রেসে দুদিন ধরে হত্যা দিয়েছে, কবিদের অনেক জায়গার আড্ডা, দুদিন ধরে কি আর আমার দোকানে ঢুকছে—'

'দেখছি দেখছি, পুজোর কাগজ ছাপানো আমি বের করছি।' কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো দরজার বাইরে নেমে গেল। 'শুয়োরটাকে যদি জুতোপেটা করে বাড়ি না পাঠাচ্ছি—অ্যাঁ, কাল বাদে পরশু বউমা হসপিটালে যাচ্ছে, তোর মাকে সকালে আই-স্পেশ্যালিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, আমার ট্যাবলেট, ইনজেকশানগুলো কেনা হচ্ছে না, আর এ পাড়ায় পড়ে থেকে তোর কাব্য সাহিত্যের মামলা আর শেষ হয় না—হারামজাদা!'

বুড়ো বুঝি ধুঁকতে ধুঁকতে অন্নদার প্রেসের দিকে ধাওয়া করল। মোহন হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কখন না হোঁচট-টোচট খেয়ে রোগা মানুষটা রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে!

।। ২০ ।।

না, এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে আর কারো বাবা কি কাকাকে এভাবে মোহন পালের দোকানে ছুটে আসতে কেউ দেখেনি। সেদিনও এই নিয়ে শুভেন্দুবাবুরা বেশ হাসাহাসি করেছিল। অন্নদার গেটের দরজায় পৌঁছানো মাত্র বিকাশ চাটুয্যে নাকি একটা ট্যাক্সি ডেকে বুড়োকে পাঁজাকোলা করে ধরে গাড়িতে তুলে দিয়ে খুব ধমক-টমক লাগিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আসলে বিকাশবাবুকে বুড়ো ভয় করে। ট্যাক্সিতে বসে নাকি আর একটা কথাও বলেনি। উহুঁ, সত্তর বছর কি, বিকাশবাবুর মুখে শোনা, প্রায় নব্বুই ছুঁয়েছে বুড়ো। তা ছাড়া কেবল হাঁপানি না। ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস, লো-প্রেসার, কিডনি ট্রাব্‌লস ইত্যাদি হরেকরকম ব্যারাম ক্ষীণ পাতলা

শরীরটায় লুকিয়ে রেখেছে তার বাবা। শুনে মোহনবাবুর চোখ গোল হয়ে গিয়েছিল। এত সব রোগ নিয়ে, তার ওপর ঐ বয়সে একটা মানুষ কি করে ভিড়ের বাসে ঝুলতে ঝুলতে হাজরা থেকে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় চলে আসতে পারে। কেননা, বিকাশ নিজেও প্রথমটা ভেবেছিল বুড়ো বুঝি ট্যাক্সি করে এসেছে, কিন্তু পরে যখন বুড়োর পকেট হাতড়ে বাসের টিকিট পাওয়া গেল, তখন বাপের ওপর বিকাশ আরও বেশি চটে গিয়েছিল।

'বুঝলেন না মোহনবাবু', বিকাশ একটু হেসে পরদিন মোহনকে বুঝিয়েছিল, 'ভর দুপুরে বুড়োর কাঁধে ভূত চেপেছিল। মানুষের কাঁধে যখন ভূত চাপে তখন সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু করে বসে।'

মোহন কিছু বলেনি। চুপ করে শুধু শুনেছিল। হুঁ, ঠিক তার ক'দিন পরেই যে আবার একটা এমন ভূতে-ধরা দুপুর আসবে কে জানত। পৃথিবীর সব নড়াচড়া বন্ধ, শব্দটব্দ থেমে গেছে; রমেশের নাক ডাকছে, ভিজে গামছা ঢাকা বারকোশের ওপর মাছির ঝাঁক বনবন করে উড়ছে, বাইরে আকাশটা ঘোলা ঘোলা, হিসাবের খাতা সামনে রেখে মোহন পাল ঢুলছে, ঠিক তখন—

না, এই দীর্ঘকালের মধ্যে কারো স্ত্রীকে, একমাত্র রামানন্দবাবুর স্ত্রী ছাড়া আর কোনো মহিলাকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি মোহনের। তা-ও রামানন্দর স্ত্রীকে দেখেছিল কখন, যখন তিনি কুমারী ছিলেন। পাখির মতন শরীরটা হালকা ছিল, কোমরটা সরু ছিল, কোকিলের সুরের মতন মিষ্টি চিকন ছিল গলাটা। কলেজ পালিয়ে দুজনে টুকটুক চা খেতে চলে আসত। যেন কবিতার খাতাটাতা হাতে থাকত। এখন যেখানটায় উনুন, দোকানের ঐ পর্দা ঘেরা খুপরিটায় গিয়ে দুজন বসত এবং দুজনে মিলে নিচু গলায়, অনেকটা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝরাতে পায়রা-পায়রাণী যেমন করে, কবিতার খাতা সামনে রেখে নিচু গলায় বকবকম করত, মোহন বাইরে বসে বেশ টের পেত। চমৎকার কাটত দুপুরটা। এখন অবশ্য আর এমন জোড়া বেঁধে আড়ালে গিয়ে বসার মতন পর্দা ঘেরা খুপরিটুপরি রাখেনি মোহন। কেননা, দিনকাল পাল্টে গেছে। প্রকাশ্যে, সকলের চোখের সামনে কবি কবিনীরা (শব্দটা মোহনের নিজের তৈরী, ডিকশনারীর কোথাও যে এই শব্দ নেই, শুভেন্দুরা অনেকদিন মোহনবাবুকে বুঝিয়েছে, ভুল ধরিয়ে দিয়েছে—এতৎসত্ত্বেও মোহন পাল যখন-তখন শব্দটা ব্যবহার করে, বলে কিনা কানে যেটা ভাল শোনায় সেটাই শুদ্ধ), হুঁ, কবিনীরা মোহনবাবুর দোকানে ঢুকে রীতিমত কবিদের টেবিলের চার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক বসাবার মতন গোল হয়ে বসে কাব্য আলোচনা করে।

যাই হোক, একদিন সেই ভূতুড়ে থমথমে দুপুরে এক ভদ্রমহিলা শুভেন্দুর হাত ধরে দোকানে ঢুকতে মোহন পালের ঢুলুনি ছুটে গেল। ঝাপসা চোখের পাতার ওপর দিয়ে মোহন যেন প্রথমটায় দেখল হস্তিনীর মতন বিশাল দেহ নিয়ে কেউ একজন তার টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ চোখ দুটো বড় করে ভাল করে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটিকে সে দেখল। প্রকাণ্ড শরীর, তা হলেও ধবধব করছে গায়ের রং, সিঁথির সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে, দোকানের ভিতরটা অন্ধকার, কিন্তু মহিলার হাতের এবং গলার সোনা ঝকমক করছিল। মোহনের যেন মনে হল, গায়ের রং এবং গয়নার রং দিয়ে মহিলা দোকানটা আলো করে ফেলেছে। মোহন তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং পরম উৎসাহ নিয়ে রমেশকে ডেকে জাগিয়ে দিল।

'একে চিনতে পারছেন!' মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু মোহনের চোখে চোখ রেখে মিটমিট হাসছিল।

কি করে আর চিনব, কোনোদিন যাকে চোখে দেখলাম না, মোহন নিজের মনে বলল। মাথার জ্বলজ্বলে সিঁদুরটার জন্য মেয়েটিকে যে শুভেন্দুর বান্ধবী-টান্ধবী ধরে নেবে চট করে তারও উপায় ছিল না। তাছাড়া আরো কারণ ছিল। মাসি-পিসি খুড়ি-জেঠি শ্রেণীর কেউ হবে, মোহন নিজেকে বোঝাল। কেননা, এত বিরাট দেহ শ্রীমতীর, পাশে শুভেন্দুকে কেমন নাবালক, ছোট ছেলেটির মতন লাগছিল। অথচ শুভেন্দু বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারার যুবক। তা হলেও ওই শরীরের পাশে শুভেন্দু ভৌমিক যেন কিছুই না। কাঁধ উঁচু একটা কলসীর পাশে ছোট একটা ঘটির মতন। ঠিক ততটা না হলেও অনেকটা তাই। কাজেই মোহন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে মানুষ দুটিকে দেখল। শুভেন্দু ক্রমাগত মিটমিট করে কেবল হেসেই যাচ্ছে।

'পারলেন না তো চিনতে!' রহস্য উদ্ঘাটন করবার মতন চেহারা করে শুভেন্দু দরাজ গলায় হাসল। রমলা—আমার স্ত্রী।'

মোহনের প্রায় আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা। হুঁ, রমলা নাম অনেক শুনেছে সে এই দোকানে বসে। শুভেন্দুবাবুর ওয়াইফ। কিন্তু তিনি যে এত বিরাট, এত উঁচু, এমন বিশাল দেহী তা মোহন পাল কি করে জানবে।

হঠাৎ মোহনের চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছা করছিল। চুপ করে থাকলে যেন ভাল লাগত। কিন্তু সৌজন্য বলে একটা কথা আছে না' তাই জোর করে সে হাসল এবং শুভেন্দু-গিন্নীর চোখের দিকে তাকিয়ে দুটো হাত বুকের কাছে ঠেকিয়ে একত্রও করল। 'নমস্কার।'

বড়লোকের বাড়ির বউ। দুধ, ঘি ক্ষীর, ননী খাওয়া শরীর। নিশ্চয় বাপও বড়-মানুষ। মোহন চিন্তা করল। চামচে খাওয়ার বয়স থেকে আজ পর্যন্ত ঐ দেহে প্রোটিন, ভিটামিনের যোগান সমানভাবে চলেছে। কাজেই হোক না মেয়েছেলে, এমন জোরালো মজবুত স্বাস্থ্য হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না।

এভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে মোহন তৃপ্তি বোধ করল এবং মুখের হাসিটাকে আর একটু ছড়িয়ে দিয়ে রীতিমত বড় গলায় বলল, 'বসুন বসুন। ভাল করে চা তৈরি কর রমেশ।' মোহন ঘাড় ঘুরিয়ে রমেশকে দেখল। রমেশ বুঝি ততক্ষণে চোখ-টোখ কচলে নিয়ে বিস্ময়ের ভাবটাকে একটু ভোঁতা করে এনেছে। কাঁধের ভেজা গামছাটা টেনে নিয়ে পিঠ ও বুকের ঘাম মুছতে মুছতে পর্দা খাটানো উনুনের দিকে চলল।

'বোসো, দাঁড়িয়ে কেন।' শুভেন্দু ভৌমিক আড়চোখে বউয়ের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। মোহন পালের উৎসাহটা দপ্ করে নিভে যাওয়ার অবস্থা।

এমন একটা অন্ধকার গোমড়া চেহারা করে আছে মহিলা।

মোহনের মনে হল, আবার তার দোকানের ভিতর থমথমে ভাব ঘনিয়ে উঠেছে। এই মাত্র যে কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোড জেগে উঠেছিল– প্রচুর ট্রাম, বাস, রিকশা, ট্যাক্সি চলার শব্দ তার কানে আসছিল; কত লোক চলাফেরা করছিল রাস্তায়; দোকানে দোকানে কত মানুষের ভিড় হইচই গোলমাল—এক মুহূর্তে তার মনে হল, সব আবার থেমে গেছে, অচল হয়ে আছে।

শুভেন্দু-গিন্নী একটাও কথা বলছিল না। কটমট করে ক্রমাগত এদিক-ওদিক দেখছিল।

'একটু চা খাবে না!' যেন অনেক সাহস করে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর শুভেন্দু বউয়ের মুখের কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিল। 'এই যে আমাদের মোহনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।'

'হুঁ, খুব ভাল জায়গায় তুমি আমায় নিয়ে এসেছ চা খেতে।' উঁচু নাকটা মোচড়

দিয়ে আরও উঁচু করে ফেলল মহিলা। 'এমন একটা নোংরা জায়গায় নোংরা দোকানে বসে তোমরা দিনের পর দিন আড্ডা দাও কি করে তাই ভাবছি! এই তোমাদের পদাবলীর অফিস!'

শুভেন্দুর মনের অবস্থা কেমন হল বোঝা গেল না, কিন্তু মোহনের বুকের ভিতরটা ঠান্ডা হয়ে গেল।

কেননা চারদিকের রং-চটা দেওয়াল, টেবিল, নড়বড়ে চেয়ার, কালিঝুল ভর্তি সিলিং, পর্দাঘেরা উনুনের জায়গাটা এবং মাথার ওপরের অপরিচ্ছন্ন হলদে ময়লা ডুম ও ভাঙ্গা পাখাটা দেখা শেষ করে সেই ঘেন্নাধরা নাক মোচড়ান চেহারা নিয়ে শুভেন্দুবাবুর স্ত্রী এবার দোকানের মালিক মোহন পালের দিকে কটমট করে তাকিয়েছে। মোহন প্রায় কুঁকড়ে গেল। চট করে চোখটা অন্যদিকে সরিয়ে নিল। নিজের নোংরা বেশভূষা, নখ, দাঁত ও লোমে ভর্তি ময়লা গায়ের চামড়া সম্পর্কে মানুষটা যে মোটেই সচেতন না এমন ভাববার কিছু কারণ নেই। কাজেই মোহনের রীতিমত ভয় হতে লাগল। যেমন তোমার মোহন রেষ্টুরেণ্ট তেমনি নোংরা রেষ্টুরেণ্টের মালিকটি—এমন একটা কথা মহিলার মুখ থেকে ফস্ করে বেরোতে কতক্ষণ! মহিলা দরজার দিকে এগোচ্ছিল।

'একটু বসে গেলে পারতে।' এক নজর মোহনবাবুকে দেখে শুভেন্দু আবার একটু সাহস করে বউয়ের মুখের কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিল। 'একটু চা খেয়ে যাও, মোহনবাবু চায়ের কথা বলেছেন, তুমি যদি এমনি চলে যাও আমাদের মোহনবাবু মনে খুব দুঃখ পাবেন।'

'আবার এখানে চা খাওয়ার কথা!' মহিলা আঁতকে ওঠার মতন চেহারা করে চোখ দুটো কপালে তুলে দিল। 'খেতে পারি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাবে। ঘেন্না নিয়ে কোনো জিনিস খেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয় তুমি খুব ভাল জানো।'

শুভেন্দুর মুখটা আসামীর মতন হয়ে গেল। কিন্তু তার স্ত্রী সেখানেই থামল না।

'তাই তো, এখন আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।' হাতের সেণ্টমাখা ছোট রুমালটা নাকের কাছে নিয়ে একবার গন্ধ শুঁকে মহিলা সরাসরি শুভেন্দুর চোখের দিকে তাকাল। 'এতদিন সাহিত্য করছ, কবিতা লিখছ, অথচ আজ পর্যন্ত কিছুই তুমি করতে পারলে না। সাধে কি লোকে বলে চাটে পাট, পাটে চাট—ভাল লোকের সঙ্গে মেলামেশা নেই, ভাল জায়গায় যাওয়া-আসা নেই, পচা ইঁদুরের গন্ধ, ধোঁয়া, অন্ধকার নিয়ে একটা ফোর্থ ক্লাস চায়ের দোকান—আর এখানে রাতদিন কটা বাজে লোকের সঙ্গে বসে আড্ডা দাও, তোমার উন্নতি হবে কেন—রবীন্দ্র আকাদমী দূরে থাক, সাধারণ একটা প্রাইজ—সিনেমা-কাগজ উল্টোরথ না কি যেন নাম, কবিদের মাঝে মাঝে পুরস্কার-টুরস্কার দিচ্ছে, তাই না? তুমি আমার চেয়ে ভাল খোঁজ রাখ, কিন্তু আমার মনে হয় তোমার কপালে তাও জুটবে না। নেভার।'

শুভেন্দু কেমন যেন বোকার মতন হেসে ফেলল।

'এখানে কিন্তু বড় বড় কবি আসেন। রামানন্দ সেন, বিকাশ চাটুয্যে, অমলেন্দু গুপ্ত—সবাই এই দোকানে আড্ডা দেন।'

'দ্যাখো', শুভেন্দু-গিন্নীর চোখ দুটো কুঁচকে উঠল, কপালে অনেকগুলি রেখা জাগল, 'রামানন্দ সেনের কবিতা দুর্বোধ্য, কমিউনিকেশনের বড্ড অভাব, আমার তো মনে হয় পাঠকরা কোনোদিন তার কবিতা বুঝতে পারেনি, কোনোদিন পারবেও না, তুমি ওকে বড় কবি বল, কিন্তু আমি—আমার যা ওপিনিয়ন, তোমায় সেদিনও বলেছি, এখানে না হয় কথাটা না-ই বললাম, কাজেই আপাতত ওর কথা ছেড়ে দাও, বাকি রইল দুজন, বিকাশ চাটুয্যে, অমলেন্দু গুপ্ত—আমি ওদের, সত্যি বলতে কি,

কবি স্বীকৃতি দিতে মোটেই রাজী না, দুজনেই টেকনিক-সর্বস্ব, কেবল শব্দের মার-প্যাঁচ, কথার খেলা, কবিতার নামে বাছাই বাছাই শব্দ বসিয়ে আতসবাজী তৈরী, হুঁ, ঐ আতসবাজী জেবলে পাঠকের চোখ ধাঁধানো সোজা, কিন্তু পাঠকের মন ছোঁয়া, হৃদয় ছোঁয়া অন্য জিনিস—এই জন্যেই আমি বলি, কবি শুভেন্দু ভৌমিকের পাশে ওরা কেউ দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে পারত না—তোমার অনেক প্রসপেক্ট ছিল, অনেক সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তুমি নিজে নিজেকে নষ্ট করছ—একে তো প্রলিটেরিয়েট মার্কা এক পত্রিকা করেছ পদাবলী, তার ওপর—তার ওপর উটকো ক'টি কবি সাহিত্যিক বন্ধু নিয়ে এমন যাচ্ছেতাই একটা চায়ের দোকানে বসে অষ্টপ্রহর আড্ডা দিচ্ছ—ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়—'

শুভেন্দু ফ্যালফ্যাল করে মোহন পালকে দেখছিল। শুভেন্দুর শুকনো মুখটা ক্রমশঃ উটের মুখের মতন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ছিল, বোঝা যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে মানুষটা খুবই লজ্জা পাচ্ছে, বিশেষ মোহন পাল এসব কথা শুনছে। তাই তো মোহন চিন্তা করল, শুভেন্দু-গিন্নী যদি—হুঁ, কবি শুভেন্দু ভৌমিকের স্ত্রী যে ভয়ানক বিদুষী, তার ওপর কনভেন্টে-পড়া মেয়ে, বাপের বাড়ির বিলিতি হালচালের মধ্যে বড় হয়েছে, এই দোকানেই শুভেন্দুবাবুর বন্ধুদের মধ্যে আলোচনাটা একাধিক দিন শুনেছে মোহন—হুঁ, এখন এই ভদ্রমহিলা যদি মোহন পালের অগোচরে এসব কথা বলত, শুভেন্দুবাবু নিশ্চয় এতটা ফাঁপরে পড়ত না। শুভেন্দুবাবুর চেহারা দেখে মানুষটার জন্য মোহনের মনে মনে কষ্ট হচ্ছিল।

কিন্তু শুভেন্দু হঠাৎ কায়দা করে জিনিসটা চাপা দিতে চাইল।

'যাক গে, তোমার যদি এখানে চা খেতে ইচ্ছে না করে, চলো, বেরিয়ে অন্য কোথাও—' স্ত্রীর হাত ধরে সামান্য নাড়া দিতে গেল সে, কিন্তু ফলটা উল্টো দাঁড়াল। মহিলাকে আরও বেশি বিরক্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে দেখল মোহন।

'উঁহু, এখানে এসেছি, এখানেই কথাটা বলে যাই, তোমার ওই কবি বন্ধুরা থাকলে আরো ভাল হতো, কেননা, অনেকদিন তোমার মুখে মোহন রেষ্টুরেণ্ট, মোহন রেষ্টুরেণ্ট শুনেছি—তাই ইচ্ছা করেই আজ দোকানের চেহাবাটা দেখতে এলাম—ওটা যে এমন একটা যাচ্ছেতাই ড্রেন—নরককুণ্ডু হবে, আমি অবিশ্যি ক'দিন আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম—এসে দেখলাম তা-ই।'

সুগন্ধি রুমালটা নাকে মুখে আর একটু বুলিয়ে নিয়ে থুঁতনি তুলে সিলিঙ-এর নড়বড়ে পাখাটা দেখতে গিয়ে মহিলা হঠাৎ চুপ করে রইল। মোহনবাবুর বুক কাঁপছিল। কিন্তু পরক্ষণে বোঝা গেল, পাখা নিয়ে শুভেন্দু-গিন্নী কিছু ভাবছে না, কাজল বুলনো জ্বলজ্বলে চোখ দুটো সরাসরি শুভেন্দুর দিকে আবার নামিয়ে নিয়েছে। 'দ্যাখো, তোমায় একটা কথা বলি, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা বই, বাংলা কবিতা বিয়ের আগে আমি একেবারে পড়তাম না, ছুঁয়েও দেখিনি কোনোদিন, ভাল লাগত না। লণ্ডন থেকে দাদা গাদা গাদা বিলিতি ম্যাগাজিন পাঠিয়েছে—রাতদিন সে-সব নিয়েই কাটত. বিয়ের পর তোমাদের বাড়ি এসে দেখলাম, তুমি কবিতা-টবিতা লিখছ—একটু কৌতূহল হল, ওই যে পদাবলী না কি কাগজটা আমাকে পড়তে দিলে—দুদিন একটু নেড়েচেড়ে দেখে তোমার সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব কবি বন্ধু-দের কার কতটা দৌড় বুঝে গেলাম, বলেছিও তোমাকে—রামানন্দ সেনের কবিতা-গুলো সব সময় আমার কাছে অস্পষ্ট ঝাপসা অর্থহীন বলে মনে হয়েছে—তার কবিতার মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে সন্দেহ নেই, তোমরা সেটা না বুঝে বলিষ্ঠতা বলিষ্ঠতা বলে অহরহ চিৎকার করছ, শুনে আমার হাসি পায়, আমি কিন্তু ওটাকে অ্যানিমেল এমলেস্‌নেস্‌ ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দিতে পারি না, অহেতুক একটা অস্থিরতা, অসঙ্গত একটা আর্তির সুর। অনেক সময় যা নিছক পাগলের প্রলাপের

মতন কানে লাগে। আমি তার কবিতা একেবারে সহ্য করতে পারি না। আর তোমাদের মধ্যেই কেউ একজন, কেননা পদাবলীর একটা দুটো প্রবন্ধ, কাব্যভাবনা নাম দিয়ে যে রাবিশ রচনাগুলো বেরোয়, আমি পড়েছি, হুঁ, দেখলাম তোমাদের একজন রামানন্দের শিল্পকর্মের ভেতর 'এক্সপ্রেশনিস্টিক রিয়ালিজম' আবিষ্কার করেছে, আর একজন 'প্যাস্টোরেল আর্টের' সন্ধান পেয়েছে—এসব ছেলেমানুষী দায়িত্বশূন্য কথার মূল্য কি, তুমি আমায় বোঝাতে পার।'

শুভেন্দু আবার বোকার মতন চুপ করে আছে। চোখ গোল করে মোহনবাবুকে দেখছে। তার বিদুষী স্ত্রী সমানভাবে বকে চলেছে।

'আর রামানন্দর শিষ্য বিকাশ চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু গুপ্ত, উৎপল চৌধুরী, এদের কথা তো বলেইছি, শুধু কথা আর আঙ্গিক নিয়ে ধস্তাধস্তি, কবিতার মধ্যে দিয়ে নতুন কিছু করব, নতুন কিছু বলব, তার জন্য অবিরাম তোমার বন্ধুরা গায়ের ঘাম ঝরাচ্ছে। তোমার মধ্যে সেসব বাজে ঝোঁক ছিল না—বরং বিয়ের পর এসেই তোমার লেখার মধ্যে একটা সুন্দর সিম্পলিসিটি আমি দেখেছিলাম, খুবই সিন্সিয়ার লেখা, চমৎকার ইন্টিমেট সুর ছিল তোমার কবিতায়, কিন্তু ঐ যে, একটা বাজে সার্কেলের মধ্যে নিজেকে ধরে রেখে তুমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছ। হুঁ, আজ এখানে এসে কথাগুলো বলছি তার কারণ, এই জঘন্য আড্ডাটা ছেড়ে তুমি যদি এই কলকাতার কবি মহেশ্বর দে, সৌমেন্দ্র মিত্র, সিদ্ধার্থ বসুদের সঙ্গে, অর্থাৎ যাঁরা দেশের সুধীসমাজের কাছে বার বার কবির সম্মান পেয়েছেন, সত্যিকার গুণী বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন, ছোট বড় মাঝারি নানা রকম পুরস্কার দিয়ে যাঁদের সম্মানিত করা হয়েছে—মেলামেশা করতে, দেখতে, তোমার এই মেরিট নিয়েই তুমি আজ কতটা এগিয়ে যেতে, কিন্তু তোমার কাধে যে কী ভূত চাপল, ' বলতে বলতে শুভেন্দুগিন্নী একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

শুভেন্দুর মতন মোহনও দাঁড়িয়ে শুনছিল।

মহিলা আর কোনদিকে তাকাল না, আস্তে আস্তে দরজার কাছে সরে গেল। মোহন ভাবল, কবির ওপর রাগ করে তিনি বুঝি বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু দেখা গেল দরজার কাছে গিয়ে আবার মহিলা এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে।

'শোনো, এবার কাজের কথা বলছি।'

শুভেন্দু-গিন্নীর গলার স্বরটা হঠাৎ অসম্ভব চড়া শোনাল। শুভেন্দুর মতন মোহন পালও প্রায় পায়ে মাথায় চমকে উঠল। 'বাবা যখন আমার জন্য পাত্র ঠিক করেন, তখন তুমি কবি বলে, কবিতা লেখ বলে তিনি তোমাকে সিলেক্ট করেননি, কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমাদের শিমুলতলার প্রকাণ্ড কাঠের বিজনেসটা দেখেই বাবা বিয়েটা সেটল্ করে ফেলেন। কিন্তু এখন দেখছি আমার ওদিকও গেল এদিকও গেল। আজ আড়াই হাজার টাকা মাইনে দিয়ে ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য বাইরে থেকে ম্যানেজার ঠিক করতে হয়, আর তুমি এখানে একটা অন্ধকার খোঁয়াড়ের মতন চায়ের দোকানে দিনের পর দিন ক'টি এঁচড়ে-পাকা বুদ্ধির-ঢেঁকি কবির সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কবিতার চুষিকাঠি চুষে যাচ্ছ—অনেকদিন কথাটা বলব বলব করেও বলিনি, আজ অনেক দুঃখে বললাম, তোমাকে পেয়ে আমার কতটা লাভ হয়েছে এখন চিন্তা করে দেখ।'

মহিলা আর এক সেকেণ্ড অপেক্ষা না করে রাস্তায় নেমে গেল। মোহন ভাবল শুভেন্দু-গিন্নী বুঝি শুভেন্দুকে ফেলে রেখে চলে গেল। কিন্তু দরজার ওদিকটায় গলা বাড়িয়ে উঁকি দিতে মোহনের চোখে পড়ল, একটা চকচকে কালো রঙের গাড়িতে শ্রীমতী চেপে বসেছে। মোহন নিশ্চিন্ত হল। যখন সে হিসাবের খাতা সামনে রেখে ঢুলছিল, তখন গাড়ি করে শুভেন্দু বউকে নিয়ে মোহন-রেস্টুরেন্টের

দরজায় এসে নেমেছিল। মোহন তখন খেয়াল করেনি। গিন্নী এখন তাহলে আবার কর্তার জন্য গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে। শুভেন্দু ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে।

বাঁচা গেল, মোহন মনে মনে বলল, আজ যদি আমার দোকানের দরজায় দেখতাম রামানন্দ ও রামানন্দ-গিন্নীর মতন আর একটা বিচ্ছেদের নাটক ঘটে গেল তো এই দুঃখ রাখবার কি জায়গা ছিল কোথাও!

পরদিন অবশ্য শুভেন্দুবাবুর চেহারা দেখে মোহন আরও বেশি নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

আগের দিনের লজ্জাটা নিশ্চয় মনে ছিল শুভেন্দুর। দোকানে আর কেউ আসেনি তখনও, ভিতরে ঢুকেই শুভেন্দু মোহন পালের দিকে চেয়ে দাঁত ছড়িয়ে ক্যাবলার মতন হাসছিল।

'কি ব্যাপার, শুভেন্দুবাবু?' হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে মোহন খুশি হয়ে বলেছিল, 'বসুন বসুন।'

শুভেন্দু বসল না। বসবার আগেই লজ্জাটা ভেঙে ফেলতে চাইল।

'বুঝলেন মোহনবাবু, আমার কাঁধে কাল ভূত চেপেছিল। ভাবলাম কোনোদিন তো ও আপনার দোকানে আসেনি। তাই কাল সঙ্গে করে নিয়ে এলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, ইচ্ছে ছিল এখান থেকে চা খেয়ে বেরিয়ে সোজা চৌরঙ্গী চলে যাব। মেট্রোয় ভার্জিনিয়া উলফের একটা বই হচ্ছে। দুজনে আনন্দ করে দেখব। দেখুন কি কাণ্ডটা হয়ে গেল!'

'ছবি দেখা হল না! মোহন প্রায় মুখ কালো করে ফেলেছিল। শুভেন্দু চোখ তৎক্ষণাৎ বড় করে ঘাড় কাত করেছিল।

'হয়েছে, ছবি দেখা হয়েছে—তবে কিনা এখানে তো একটা নাটক করে গেল। আপনার দোকানে বসে কিছুতেই গিন্নীকে চা খাওয়াতে রাজী করাতে পারলাম না।'

'তাতে কি, তাতে কি' প্রবোধ দেওয়ার মতন চেহারা করে মোহন সব ক'টা দাঁত ছড়িয়ে হেসেছিল। 'তবে, ভদ্রমহিলা খুব বিদ্বান মনে হল, আধুনিক কবিতা-টবিতা মেলাই পড়া আছে।'

'আপনি বলছেন, আধুনিক কবিতা!' খুশিতে ডগমগ হয়ে শুভেন্দু ধুপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। 'ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া শেখা মেয়ে, তার ওপর বাপের বাড়িতে বিলিতি আবহাওয়ায় মানুষ, তার ওপর ভাই লণ্ডন থেকে গাদা গাদা সব পত্র-পত্রিকা পাঠিয়েছে—শুনলেন তো, বিয়ের আগে ব্যাংলা বই, বাংলা কবিতা একেবারে পড়া ছিল না, তবে কিনা, ঐ যে আপনি বললেন, আধুনিক কবিতা,—মোহনবাবু, আপনাকে কথাটা বলছি, সবাইকে বলি না, বিকাশ অমলেন্দু-দের বললে হয়তো ওরা আমাকে উল্টে ঠাট্টা করবে বলছি, আসলে তা নয়,—অন গড্ মোহনবাবু, একচুল আমি বাড়িয়ে বলছি না, বিদেশী কবিতা ওর প্রায় স—ব পড়া আছে, রিলকে, র‍্যাঁবো, মালার্মে, ভ্যালেরি, ইয়েটস্, পাউন্ড, অডেন ও এলুয়ার উন গারেত্তি—কারো কারো কবিতা ও গড়গড় মুখস্ত বলে যায়, আমি অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে শুনি—না মশাই, ওর মতন আমার এত পড়াশোনা নেই—এত ভাল মেমারিও নেই, সেদিক থেকে আমি ওয়াইফের কাছে হার মেনেছি—হুঁ, তবে কিনা কাল হুট করে এখানে আমাদের এই পদাবলীর আড্ডার জায়গায় ওকে টেনে আনাই আমার ভুল হয়েছে। দেখেছিলেন তো দিনটা কেমন ঘোলা ঘোলা গেছে, যাচ্ছেতাই চেহারা ধরেছিল দুপুরটার—হঠাৎ ওই ওয়েদারে অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে এই ঘরটার ভেতর ঢুকে ওর মন মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল, ওকে দোষ দেওয়া যায় না, এত ছোট জায়গায় এমন অর্ডিনারী দোকানে চা খাওয়া এমনিও অভ্যেস

নেই, ফলে যা হল, ভীষণ ক্ষেপে গেল, তারপর—তারপর তো আপনি শুনলেনই—হি-হি', শুভেন্দু টেনে টেনে হাসলে ঃ 'আমাদের কবিতা নিয়ে, পদাবলী নিয়ে, বিশেষ করে বিকাশ অমলেন্দুর লেখা নিয়ে যা মুখে এল বলল, এক কথায় পদাবলী গোষ্ঠীর একেবারে আদ্যশ্রাদ্ধ করে গেল।'

টেনে টেনে হাসার দরুন শুভেন্দু ভৌমিককে আগের দিনের চেয়েও বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। এমন সুশ্রী পরিচ্ছন্ন চেহারার মানুষটি যে এত বোকার মতন হাসতে পারে মোহনের আগে জানা ছিল না। ফলে অবাক হওয়া সত্ত্বেও মোহন পালের বেজায় হাসি পেল। তা হলেও চেষ্টা করে যতটা সম্ভব গম্ভীর থেকে মোহন আস্তে মাথাটা নাড়ল ঃ 'হুঁ, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কাল ঐ বাজে ওয়েদারের জন্য, ওই ঘোলাটে দুপুরটার দরুণ—'

'তাই বলছিলাম, আমার কাঁধে ভূত না চাপলে কি আর মিসেসকে এখানে টেনে আনতাম! উচিত ছিল আমার বাড়ি থেকে ওকে নিয়ে সোজা চৌরঙ্গী চলে যাওয়া, সেখানে বই দেখার আগে একটা ভাল জায়গায় বসে কফিটফি খেয়ে নিলেই আর কালকের এই নাটকটা হতো না। হি হি—কাল থেকে কথাটা যতবার ভাবছি, কেবল মনে হচ্ছে আমার কাঁধে ঠিক ভূত চেপেছিল মোহনবাবু।'

মোহন আর শব্দ করল না। যেন শব্দ করার ভয়ে পুরু ঠোঁট দুটো জোরে চেপে রাখল। তারপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাইরে ডাস্টবিনটা দেখতে লাগল। উঁহু, কবি শুভেন্দু ভৌমিকের সাধ্য ছিল কি মোহন পালের মনের ভিতর ঢোকা। কেননা মনের একেবারে গভীর নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার জায়গাটায় নেমে গিয়ে মোহন নিজে নিজে হাসছিল, হাসছিল আর বলছিল, কেবল কাল আপনার কাঁধে ভূত চাপবে কেন শুভেন্দুবাবু, বাংলাদেশের কবি হয়ে আপনি এলুয়ার উন গারেত্তি, অডেন, ইয়েটস্, ভ্যালেরি-পড়া কন্যাকে যেদিন বিয়ে করতে গেলেন, সেদিনই আপনার কাঁধে ভূত চেপেছিল।

আশ্চর্য ক্ষমতা এই মোহন পালের; বাইরে থেকে খোঁচা দাড়িভর্তি হোৎকা ফুলো মুখটা দেখে কারো সাধ্য কি বোঝেন যে, মানুষটা ভিতরে ভিতরে এমন রসিক, চমৎকার চিকন কাটতেও জানে এক-এক সময়।

।। ২১ ।।

শনিবার মেলায় যাওয়া হল না। শফীর বাপকে সেদিনই সকালে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই শফীকে সারাদিন আর পাওয়াই গেল না। সন্ধ্যার দিকে একবার ছুটতে ছুটতে এসে মাধুরীকে খবরটা দিয়ে আবার তখনি ছেলে রাজাবাজার ফিরে গেছে। ক'দিন পর রোগা শরীর নিয়ে ইয়াকুব ঘরে ফিরল, শফী তো ব্যস্ত থাকবেই। তা না হলে আর ছেলে কেন। রামানন্দ ও মাধুরী দুজনেই দেখে খুশি হল। এবং তারা আশা করছিল, রবিবারও শফী বাপের কাছ ছেড়ে আসবে না। শনিবার শফী যা বলে গেল, ইয়াকুব মিঞা এখনও খুব একটা ভাল করে চলাফেরা করছে না। ওষুধ, পথ্য হাসপাতালের মতনই আরও কিছুদিন চলতে থাকবে। শফী সব কিছু ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবে। তবে কিনা বুড়া যদি আবার এখনই সরাব গিলতে আরম্ভ করে, তা হলেই মুশকিল। হাসপাতাল থেকে ডাক্তারবাবুরা বার বার সাবধান করে দিয়েছে। সুতরাং বলা তো যায় না, লুকিয়েও ইয়াকুব মিঞা মদ গিলতে পারে, কাজেই এখন থেকে শফীর কাজ হবে বাপকে চোখে চোখে রাখা।

'তাই রাখবি'. মাধুরী প্রথমটা হেসে তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'ঘরে যখন মা নেই, তোর চাচাটাচারাও কেউ কাছে থাকে না, তুই বড় ছেলে, তোকেই তো মানুষটাকে দেখেশুনে রাখতে হবে।'

শফীর মুখটা একটু কালো হয়ে উঠেছিল।

'কাল রোববার, কালও তোর আসা হবে না মনে হয়?' মাধুরী নিজে থেকে শুধিয়েছিল।

শফী অন্যদিকে চেয়ে চুপ থেকে আস্তে মাথা নেড়েছিল।

'সোমবার একবার আসবি? সোমবার তোর ডিম নিয়ে যাবার তারিখ।' একটু চুপ থেকে মাধুরী আবার বলেছিল. 'অবিশ্যি, মঙ্গলবার এলেও চলে।'

'উঁহু', শফী তৎক্ষণাৎ জোরে মাথা ঝাঁকিয়েছিল। এবং যেন একটু রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে মাধুরীকে দেখছিল।

'কি হল!' মাধুরী খুক করে হেসে ফেলে তখন। 'এমন করে তাকাচ্ছিস কেন'—

'মঙ্গলবার এলে কি করে চলবে শুনি? আজ শনিবার. সারাদিন তো বুড়োকে নিয়েই কাটল, বুঝলাম আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আব্বা ঘরে এসেছে। তা বলে কালও কি সারাদিন আমি ঘরে বসে থাকব, না তোমারও এই ইচ্ছে! বেশ, কালকের দিনটাও না হয় বাদ দিলাম। কিন্তুক সোমবারে যদি মেলায় যাওয়া না হয় তো আর কবে যাওয়া হবে শুনি? সাতদিন তো মোটে থাকে নাওভাঙ্গার মেলা।' শফীর ভুরু, চোখ, কপাল সব কুঁচকে উঠেছিল। 'থাক, আমি যাব না, তোমরাই যেও।' কাছে দাঁড়িয়ে রামানন্দ শুনছিল। রামানন্দ মাধুরীর দিকে ঘাড় ফেরাতে মাধুরী হি-হি করে হাসল।

'বলে কিনা চোরের মন ক্ষীরী খেতে—বুড়ো বাপকে দেখবে কে, মেলায় যাবার কথাটা মগজ থেকে ও নড়াতে পারছে না?'

'কি করে পারবে!' রামানন্দ হাসেনি. গম্ভীর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করেছিল, 'তুমি যেমন করে চড়কের মেলায় যাওয়া নিয়ে সবাইকে ক'দিন ধরে কেবল উসকাচ্ছ! আবার বলছ সেখানে গিয়ে চড়ুইভাতি খাওয়া হবে—'

রামানন্দ শফীর দিকে চোখ ফেরাল। চুপ করে ছোঁড়া হাতের নখ খুঁটছিল।

'ঠিক আছে', যেন অনেকটা প্রবোধ দেবার মতন গলার সুর করে রামানন্দ তাকে বুঝিয়েছিল. 'হুঁ', আজ শনিবার তো কেটেই গেল—কাল রবিবারও আমাদের নাওভাঙগা যাওয়া হচ্ছে না. পরদিন সোমবার, আমি বলি কি. সোমবারটাও না হয় বাদ দেওয়া যাক শফী, এই তিনচার দিনে তোর বাপ একটু শক্ত হয়ে উঠবে—আমরা মঙ্গলবার খুব সকালে এখান থেকে রওনা হয়ে যাব. না, খুব দেরি হবে না। তার পরেও মেলা থাকছে, শেষ হতে সেই শুক্কুরবার। এই শনিবার তো মোটে আরম্ভ হল।'

কিন্তু শফীর তাতে বিন্দুমাত্র সায় পাওয়া গেল না। চোখ তুলে আকাশটার দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়ছিল সে বোঝা গেল।

'কি হল, কথা বলছিস না কেন, মাস্টার কী বলল শুনলি!' মাধুরী ছোট করে একটা ধমক লাগাল।

'কেন, সোমবার যেতে দোষটা কি?' মাস্টারের দিকে না. মাধুরীর দিকে শফী চোখ আড় করে তাকাল। 'কাল তো সারাদিনই আমি বুড়োর কাছে থাকব বললাম।'

আবার মাধুরী রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরায়। এবার মাধুরী টিপে টিপে হাসছে।

'ঠিক আছে', রামানন্দ বুঝতে পারছিল সোমবার মেলায় না গেলে ছোঁড়া

একেবারে ভেঙে পড়বে। তা ছাড়া ইয়াকুব যখন বাড়ি এসে গেল, শফীকে এমনিও এখন একটু বেশি সময় ঘরে আটকা থাকতে হবে। এবং সেটা কতদিন তার হয়তো কিছু স্থিরতা নেই। অন্তত ইয়াকুব মিঞা যদ্দিন না সম্পূর্ণ সেরে উঠে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতন হাঁটাচলা, কাজকর্ম করতে পারে। এদিকে মেলায় যাওয়ার দুদিন দেরি হয়ে গেল, তা বলে তার জায়গায় তিনদিন শফীউল্লা অপেক্ষা করে কী করে! এভাবে তার উৎসাহ এখন থেকে যদি ভাঙতে আরম্ভ করে, তাকে দিয়ে হয়তো বুড়ো বাপের সেবা-যত্নটা তেমন ভাল করে হবে না। বাপ ঘরে এসেছে আহ্লাদের কথা, কিন্তু তার দরুণ শফীর ওপর চাপটাও যে খুব বেড়ে গেল তা তোমরা অস্বীকার করবে কেমন করে। যেন ছোঁড়ার মনের ভাবটা বুঝতে রামানন্দর মোটেই অসুবিধা হল না। 'ঠিক আছে, সোমবার আমরা মেলায় যাব। কিন্তু খুব একটা বেশি সময় ওখানে থাকা চলবে না। মেলা দেখে একটু সকাল সকাল আবার তোকে ঘরে ফিরতে হবে, এখন থেকেই কিন্তু আমি বলে রাখছি। আমরাও বেশিক্ষণ থাকব না। সারাদিন দেখার মতন কী-ই বা আসছে মেলায়!'

শফী তাতেই খুশি। মুখে একটু হাসি ফুটল।

তা হলে এখন ঘরে ফিরে যা—মাস্টার যখন বলছে, সোমবারই যাওয়া হবে, তোরই জিত হল।'

মাধুরীর কথা শুনে শফী তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ছোট করে একটা ভেংচি কাটল। তারপর আর দাঁড়াল না।

'মেলায় যাবে, ক'দিন ধরে ছোঁড়ার চোখে ঘুম নেই।'

'স্বাভাবিক, ছেলেমানুষ, আমারই যে দু' রাত চোখে ঘুম নেই।' মাধুরীর চোখের দিকে তাকিয়ে রামানন্দ শব্দ করে হাসল। 'মেলা থেকে আমরা মাটির কলসী, হাঁড়ি, সরা আনব, কুলো, বেতের ধামা, কাঁঠাল কাঠের বারকোশ—তা ছাড়া কাচের মালা, আয়না, চিরুনি, চুলের ফিতে, সোহাগিনী আলতা মনে-রেখো-স্নো, জলে-ভাসা সাবান, বাঁশী, পুতুল, ডুগডুগি অনেক কিছু কেনা হবে। হুঁ, চিনির মঠ, হাতী, বিন্নিধানের খই, ফুটকলাই কিনে খাওয়া হবে—তারপর আছে নাগরদোলায় চড়া, হুঁ, মেলায় সার্কাস আসে, আমরা সার্কাস দেখব—' ছেলেমানুষের মতন রামানন্দ চোখ দুটো নাচাতে লাগল।

মাস্টারের কথা বলার ধরন দেখে মাধুরী কুলকুল করে হেসে ফেলল।

'চুপ, এখনো শেষ হয়নি, সার্কাস দেখব, ম্যাজিক দেখব, সব দেখাটেখা শেষ করে, কেনাকাটা সাঙ্গ করে নিরিবিলি একটা গাছের তলায় ইটের উনুন সাজিয়ে কাঠখড় জেলে রান্না করব, চড়ুইভাতি খাওয়া হবে।'

'ইস—' হাসতে হাসতে মাধুরী প্রায় ঘাসের ওপর বসে পড়ে। ঘরের পিছনে মাদার জঙ্গলটার কাছে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলছিল। শফীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তারা এখানে চলে আসে। এই মাত্র পশ্চিমের দগদগে লালটা মুছে গিয়ে মেঘের টুকরোগুলিকে এখন কালচে ছেঁড়া ছেঁড়া ক'টা চটের টুকরোর মতন দেখাচ্ছে। ওদিকটাই যা অপরিষ্কার, তা না হলে সবটা আকাশ শ্লেটের মতন পরিষ্কার। অন্ধকার হতে না হতে নতুন আলপিনের মতন ঝকঝকে তারা ফুটতে আরম্ভ করল। অবশ্য তারা ফুটবার আগেই শফী চলে গেছে। তারাজ্বলা আকাশের নিচে বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে কালো, রোগা, ছিপছিপে শফীটাকে দূর থেকে কেমন দেখতে, একলা থাকলে মাধুরী এই মুহূর্তে তাই চিন্তা করত, সেই ছবিটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসত। কিন্তু মাস্টার বেদম হাসাচ্ছে—তার মানে ক'দিন ধরে দুপুরে এই ঝোপের কাছে মাটিতে পাটি বিছিয়ে মাধুরী যেমন শফীকে সামনে বসিয়ে হাত ঘুরিয়ে চোখ বড় করে বেশ রসিয়ে রসিয়ে মেলায় কি কি কেনা হবে,

কি কি খাওয়া হবে, কতক্ষণ সেখানে থাকা হবে কেবল তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল, হুবহু ঠিক সেই সুর করে, তেমনি দুচোখ বড় করে হাত নেড়ে রামানন্দও এখন মাধুরীকে সব শোনাচ্ছে। 'ঠাট্টা করছ—তাই না মাস্টার!'

'এই দ্যাখো, আমি কি কোনোদিন মেলা দেখিনি—মেলায় কি কি পাওয়া যায়, চড়কের মেলার কেমন চেহারা, আমার সব যে জানা আছে।'

'কোথায় জানলে তুমি—কলকাতা শহরে থাকতে, তুমি কি চৈত্র মাসে গাঁয়ের মেলা কোনোদিন দেখেছ—নাওভাঙ্গার মেলায় এসেছিলে আগে?'

'না, তা আসিনি, কিন্তু আমার যে একটা ছেলেবেলা ছিল মাধুরী, চিরকাল কি আর কলকাতা শহরে পুড়েছি—চড়কের মেলা, রাসের মেলা—অনেক দেখেছি, পাগলের মতন সারাদিন মেলায় ঘুরেছি, বাঁশী বাজিয়েছি, পুতুল কিনেছি, নাগরদোলায় চেপেছি।'

'কোথায় সেটা?' মাধুরী আর হাসছিল না। আবহাওয়াটা হঠাৎ থমথমে হয়ে উঠল। মাধুরীর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল, বড় হয়ে উঠল। ছেলেবেলায় তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমাদের দেশের গাঁয়ে।'

'অ!' মাধুরী ছোট করে ঢোক গিলল, 'তুমি তা হলে ছেলেবেলায় গাঁয়ে ছিলে—হুঁ, তবে তো মেলাটেলা দেখেইছ।' মাধুরী খুশি হল।

'চৈত্র মাসে নদীর জল প্রায় শুকিয়ে যেত, কচি নরম ঘাসে নদীর ঢালু ছেয়ে থাকত, এমন জায়গায় মেলা। ভাবতে পার! কত মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা। উঁহু, প্লাস্টিক রবার তখন ছিল না। ছিল বাঁশের বাঁশী, সোলার পাখি, কাগজের ফুল। চপ, কাটলেট, প্যাস্ট্রি, পুডিং, কেক, লজেন্স, চকোলেট আমরা চোখেও দেখিনি।' রামানন্দ দাঁত বের করে হাসল। 'আমরা কুড়মুড় করে ছোলাভাজা খেয়েছি, মটরভাজা খেয়েছি মেলায় গিয়ে, আর ঐ যে বললাম, বিন্নিধানের খই, ফুটকলাই, চিনির মঠ, চিনির তৈরী হাতী, পাখি, মাছ। আর জল তেষ্টা পেলে কাঁচা শসা, ক্ষীরাই। উঁহু, রং-করা সরবত, ছাইভস্ম অরেঞ্জ স্কোয়াশ, লিমন স্কোয়াশ সেদিন ছিল না। চা-ও ছিল না, বুঝেছ?'

মাধুরীর চোখ দুটো চকচকে হয়ে উঠল, বড় হয়ে উঠল। এক মনে সে শুনছে। রামানন্দরও চোখ বড় হয়ে গেছে। অন্ধকার, তা না হলে বোঝা যেত রামানন্দর চোখে অন্য একটা রং লেগেছে। 'বাঁশের বাঁশি, মাটির বেহালা, মাটির মালশার ওপর কাঁচা চামড়ার ছাউনি পরিয়ে ডুগডুগি। সেটা আবার দু চাকাওয়ালা একটা বাঁশের ফ্রেমের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে টানা হতো। টানার সঙ্গে সঙ্গে ডুগডুগ করে বাজত। তার শব্দে নদীপাড়ের বাতাসও রিনরিন করে বাজতে আরম্ভ করত।'

'নাওভাঙ্গার মেলায় সেই ডুগডুগি তুমি দেখতে পাবে মাস্টার।'

রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'জানি কলকাতা শহরের মেলায় সেসব নেই, কেবল কলের বাজনা, কলের বাঁশী, কলের গাড়ি।'

'কলকাতায় তো শুনি সারা বছরই মেলা হয়, সারাদিন মেলা, রাতভর মেলা।'

'হুঁ, বজ্জাতের মেলা, বদমাসের খেলা, কুত্তার গলা, শয়তানের ছলা—হা হা...

'ওকি ছড়া কাটছ', মাধুরী খুক করে হাসল। 'শহরটার ওপর দেখছি বেজায় রাগ তোমার, ঘেন্না খুব।'

'হুঁ, তাই বলছি, আমার ছেলেবেলার মেলার গল্প শোন।' রামানন্দ তৎক্ষণাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। 'বাংলাদেশের পড়াগাঁয়ের মেলা—মাটির বেহালা, বাঁশীর সুর, ডুগডুগির শব্দে নদীপাড়ের বাতাস রিনরিন করে বাজত, শুনে দূর থেকে প্রাণ হু-হু করে উঠত। দল বেঁধে সব মেলায় ছুটতাম। আর ভাবতাম, আমার ঠাকুরদা

এই মেলা দেখতে এসেছে, বাবা-কাকারা এসেছে, এখন আমি এসেছি, তারপর আমার ছেলে আসবে মেলা দেখতে, মাটির বেহালা কিনবে, চিনির মঠ দিয়ে ফুট-কলাই খাবে। আমার ছেলে যখন বড় হবে, তখন তার ছেলে আসবে মেলায়, তারপর তার ছেলে। আমরা থাকব না, মরে যাব। মেলা থাকবে। বাঁশের বাঁশি বাজবে, চৈত্রের ঝিরঝির হাওয়া বইবে। আমরা চিনি না এমন সব ছেলেরা দূর দূর গাঁ থেকে মেলা দেখতে আসবে, মেয়েরা আসবে। তারা কাঁচের চুরি কিনবে, পুঁতির মালা কিনবে, শাঁখের আঙটি, কাঠের কাঁকই, নকশা-তোলা আরশি, মনের মতন আলতা, জলে-ভাসা গন্ধসাবান। আর এত পুতুল, মাটির হাঁড়িকুড়ি, কাঁঠাল কাঠের বেলুন চাকি কিনে ঘরে ফিরে যাবে।'

'সব—সব আছে নাওভাঙগার মেলায়, যেমন তুমি ছেলেবেলায় দেখতে। বছর বছর আমরা যাই, দূরে দূরে গাঁয়ের কত মেয়েরা আসে, ছেলেরা আসে, বুড়ো-বুড়িরা আসে। কিছুই হারায়নি মাস্টার। সব থেকে গেছে।'

'সেই জন্যই তো আমার চোখে ঘুম নেই।' মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল না রামানন্দ। অস্পষ্ট হয়ে গেল তার গলার স্বর। তারাজ্বলা আকাশটার দিকে চোখ তুলে দিয়ে বিড়বিড় করে উঠল। 'আবার সেখানে ফিরে যেতে চাইছি, আমি শফীউল্লা হতে চাইছি।'

শনিবার·সন্ধ্যার ভাবনা। তারপর এক সময়ে মাধুরী ঘরে ফিরে গিয়ে উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়েছে। একবার সেখানে উঁকি দিয়ে রামানন্দ নিজের ছোট ঘরটায় গিয়ে ঢুকেছে। শুয়ারের ঝাঁক তার বৈঠকখানার দোকানে বসে খাওয়াটা একেবারে বন্ধ করে দিল। সেদিন পদাবলী গোষ্ঠীর সব ক'টা ছাগল যেভাবে দোকানের সামনে তাকে ঘেরাও করেছিল! রামানন্দ আর সেই রাস্তায় যায়নি। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে সোজা বেলেঘাটা খালপোলের ধারের ছোট একটা দোকানে ঢুকে দাঁড়িয়ে থেকে খানিকটা গলায় ঢেলে বাড়ি ফিরে আসে। উঁহু, মোটেই জমেনি। হুট্ করে একটা অচেনা জায়গায় ঢুকে নেশা করতে ভাল লাগে? দোকানটা যদিও অনেক দিনের, কিন্তু রামানন্দ কোনোদিন সেখানে বসে মদ খায় না, ট্রেনের টিকিট কাটার মতন কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে একটা গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে চার-ছ' আউন্স কিনে এক চুমুকে সবটা গিলে গেলাসটা আবার উপুড় করে রেখে তখনি বেরিয়ে এসেছিল। শেয়ালদার দোকানে সবাই প্রায় মুখচেনা হয়ে গেছে। অন্যরকম আবহাওয়া। ঢুকলেই মেজাজ পাওয়া যায়। অবশ্য জগৎ মণ্ডলদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। জগৎ মণ্ডল, নন্দ-দুলাল আর সেই আলুর আড়তদার, কি নাম? মনে হলেই রামানন্দর হাসি পায়। ওফ্, যা জমেছিল সেদিন! হুঁ, ননীমাধব দত্ত। আটখানা উপন্যাস বাজারে ছেড়েছে, ইয়ার্কি।

কিন্তু ক'দিনই রামানন্দ মনে মনে খুঁজেছে মানুষটাকে। আর দেখলই না। জগৎ, নন্দদুলালরা না-হয় খালাসিটোলা কি অন্য কোনো দোকানে বা চিৎপুর কি হাড়কাটার কোনো মেয়ের ঘরে আসর জমাচ্ছে, তারা তাই বলেছিল যেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক ননীমাধব আর আসে না কেন? শেয়ালদার ওই দোকানের পিছনেই তার আলুর গুদোম। পরে একদিন রামানন্দর মনে পড়েছে। হাড়কাটায় ননী-মাধবেরও একটা জবর আড্ডা আছে। কি যেন মেয়েটার নাম বলেছিল। ইন্দু? ইন্দুবালা কি? ভাল মনে নেই।

যাই হোক, আশায় আশায় রামানন্দ ক'দিনই শেয়ালদার দোকানে ঢুকেছে। কারো দেখা পায়নি। তা হলেও জায়গাটা তার ভাল লাগত। ক'টা মুখ তো বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল।

অপরিচিত, একেবারেই জানা নেই, এমন সব লোকের ভিড়ে মদ খেয়ে আরাম

কোথায়!

সেজন্য খালপোলের দোকানে বসে তার একদিনও খাওয়া হল না। অক্ষয়কে দেখে হাসাপাতাল থেকে ফেরার পথে ওই দোকান থেকেই একটা পাঁইট কি একটা বোতল কিনে কাগজে মুড়ে নিয়ে রামানন্দ সোজা বাড়ি চলে আসে।

ক'দিন ধরে তাই করছে।

একলা ঘরে বসে খাওয়ার আলাদা শান্তি। মাধুরী অবশ্য টের পেয়েছে। একটু যেন বিরক্তও হয়েছে।—বাড়িতেই আরম্ভ করলে মাস্টার! হাসপাতাল থেকে ও ফিরে এলে কিন্তু ঘরে বোতল-টোতল আনবে না। রাগারাগি করতে পারে। খেতে হয় বাইরে খেয়ে আসবে।—কাল দুপুরে রামানন্দকে ভাত খেতে দিয়ে কথাটা বলেছিল ও। শুনে রামানন্দ শব্দ করেনি।

হুঁ, হাসপাতাল থেকে এসে অক্ষয় ঘরে মদের বোতল দেখলে রাগ করবে। মাধুরীর মাথায় এক চিন্তা। রামানন্দর মাথায় কিন্তু অন্য চিন্তা ঘুরছে। মনে মনে সে হাসে। দুঃখও হচ্ছে খুব। কেননা, আজও মাধুরীকে কথাটা বলতে পারছে না। সে সাহসই পাচ্ছে না। মঙ্গলবার, পরশু অক্ষয়েব অপাবেশন হবে।

'শোন মাধু, অক্ষয় যে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবেই তার কিছু ঠিক নেই, ওই অপারেশন থিয়েটারেই তার হয়ে যেতে পারে। কাজেই, এখনই তোমাদের এই ছোট ঘরটায় নিরিবিলি বসে দু' পাত্র খেয়ে নিতে আমাকে বাধা দিও না। হুঁ, যদি অপারেশনের পর অক্ষয় টিকে থাকে এবং শরীরটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে কখনো বাড়ি ফেরে, তখন না-হয় আবার আমাকে সুবিধা মতন একটা শুঁড়ির দোকান খুঁজে নিতে বলবে, বাড়িতে আর বোতল-টোতল ঢোকাব না।'

এভাবে কথাটা বললে ঠিক হবে?

নাকি সরাসরি অপারেশনের ব্যাপারটা দিয়েই শুরু করবে। 'কিছু ভয় নেই মাধুরী, হাসপাতালে এমন রোজ দশটা বিশটা অপারেশন কেস হচ্ছে। কারো পেট চেরা হচ্ছে, কারো পিঠ কাটা হচ্ছে—তুমি জান না, মগজে অসুখ থাকলে আজকাল খুলি চিরে দু' ফাঁক করে আবার দিব্যি সেলাই করে তা জুড়ে দেওয়া হয়—এমন রোগীও সেরে উঠে হাসতে হাসতে ঘরে ফেরে, কাজেই অক্ষয়ের জন্য তুমি মোটে ভাববে না। সারাদিন আমি তার কাছে থাকব, হুঁ, অপারেশনের দিন, বরং সেদিন তুমি মনটাকে ফুর্তিতে রাখতে চেষ্টা করবে, হাসপাতালের কথা একেবারেই চিন্তা করবে না, দুপুরে শফী থাকবে, শফীর সঙ্গে অন্য দিনের মতন গাছতলায় পাটি পেতে গল্পটল্প করবে। বেশ তো, শফীকে না হয় বলে দেওয়া যাবে, বৈঠকখানা বাজার থেকে ছোঁড়া কিছু কুল নিয়ে আসবে। নুন, কাঁচালঙ্কা দিয়ে দুজনে কুল-মাখা খাবে, বা চালতে—চৈত্রে চালতা, মানে মনটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখা—দেখবে টুক করে সেরে উঠে একদিন অক্ষয় সমাদ্দার বাড়ি চলে এসেছে। আর এটাও তো সত্য, যা করার ডাক্তারবাবুরা করবেন, নার্সরা করবে, তরলা আছে, ফুলরেণু আছে—অক্ষয়ের জন্য ওদের ভাবনা তোমার আমার চেয়ে ঢের বেশি। তুমি বাড়ি থেকে খামকা মন খারাপ করে কিছু করতে পারবে না—লাভও নেই—তার চেয়ে...'

এভাবে কথাটা বললে কেমন হয়!

কিন্তু তা-ও কি রামানন্দ পারছে। শনিবার সারাটা বিকেল ইয়াকুবের বাড়ি-ফেরা নিয়ে ও শফীর মেলায় যাওয়া নিয়ে এত সব আলোচনা হল, সন্ধ্যার পর মাধুরী রাঁধতে বসল, রামানন্দ নিজের ঘরে ঢুকে তার ভাঙা ফাইবারের সুটকেস-এর তলা থেকে একটা পাঁইট বের করে নিয়ে ছিপি খুলে,—উঁহু, ঘরে বসে সোডার জলটলের বিলাসিতা চলে না, স্রেফ কাঁচা জিনিস গলায় ঢেলে ঢক-ঢক করে খানিকটা খেয়ে নিল—ভাবল, নেশার ঝোঁকেই কথাটা না হয় বলে ফেলবে—

খুব একটা চিন্তাটিন্তা করার দরকার হবে না, বরং দরকার হলে একটু কড়াও হতে পারবে। 'বুঝলে মেয়ে, অক্ষয়ের পেটের ঘা কেবল ওষুধ গিলে সারবে না, ডাক্তারবাবুরা ঠিক করেছে মঙ্গলবার সকালে তার পেট কেটে পচা নাড়িটা বের করে ফেলবে, তা না হলে অক্ষয়কে বাঁচানো শক্ত, হাসপাতালে শুয়ে থেকে থেকে ওখানেই বেচারাকে মরতে হবে। কাজেই তুমি একদম কান্নাকাটি করবে না। ডাক্তারবাবুদের নিজেদের মতন চলতে দাও।'

অবাক কাণ্ড, ঢুলুঢুলু নেশা হল রামানন্দর—যেহেতু ঘরে বসে মদ খাচ্ছে, বিরক্ত হয়ে মাধুরী দারুণ গজগজ করছিল, আবার ওদিকে দেখা গেল, বেশ করে ঝাল পেঁয়াজ দিয়ে লেঠা মাছের ঝোল রেঁধে 'মাস্টারকে' আদর করে ভাত খেতেও ডাকল। ভাত দিতে দিতে আবার সেই মেলার গল্প।

'হুঁ, নাগরদোলা আছে, ঘোড়াও আছে। বুঝলে মাস্টার, বারোটা কাঠের ঘোড়া গেল-বারে দেখলাম। একদম সাদা রং। যখন এক সঙ্গে ঘোরে এত সুন্দর দেখায় না!'

'হুঁ, ওই একরকম নাগরদোলা আর কি, আমাদের আমলেও ছিল, পুরোনো জিনিস।' ভাতের থালা থেকে রামানন্দ মুখ তুলল।

'ওটাকে নাগরদোলা বলে না পণ্ডিত, তুমি যেন কী মাস্টার!' ভুরু কুঁচকে মাধুরী কথাটা সংশোধন করে দিল। 'চরকি ঘোড়া-আমরা তো চরকি ঘোড়াই বলি।'

'হুঁ, হুঁ, চরকি-ঘোড়া, ঘোড়ার চরকি—চড়ক মেলার ঘোড়ার ভেল্কি, আমার মনেই ছিল না, ঠিক পাল্কি ভেল্কি ঘোড়ার দুল্কি—'

'এই দ্যাখো, মাতলামি শুরু করল।' মাধুরী হি-হি করে হাসল। 'শোনো, শফী বলছে কি, নাগরদোলায় চড়তে ওর ভাল লাগে না। ঘোড়ায় চাপবে। একবার চাপলে দশ পয়সা।'

'হুঁ-হুঁ।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'আমাদের সময়ে এক পয়সা দিলেই একবার চড়া যেত, কিন্তু -'

'তা হলেও এক পয়সা তোমাদের আমলে দাম ছিল বলতে হবে।' মাধুরীর সুরটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'যেখানে দু টাকা আড়াই টাকা ছিল এক মণ চালের দাম, আজ যদি সেটা বেড়ে গিয়ে সত্তর আশী টাকা দাঁড়ায়—'

চমৎকার হিসাবজ্ঞান মাধুরীর। হবে না? অক্ষয়ের সঙ্গে থেকে ডিমের ব্যবসা করছে, হাঁস-মুরগীর ব্যবসা করছে। তা ছাড়া অক্ষয় হাসপাতালে আছে পর থেকে তো একলাই সব কিছুর হিসাব রাখছে মেয়ে।

'তাই তো, তাই তো', মাথা নেড়ে রামানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল। 'আমাদের আমলের এক পয়সার তুলনায় দশ নয়াটা এখন সস্তাই বলতে হবে—খুব সস্তা—'

'আচ্ছা থাক, সেটা ছেড়ে দাও—শফী বলছে কি'—অর্থাৎ এই নয়া পয়সার হিসাবটা মাধুরীর কাছে বড় না, অন্য কথা, শফীর কথা বলতেই যে এই প্রসঙ্গ—রামানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল।

'হুঁ, কী বলছিল ছোঁড়া?'

'দু টাকা খরচ করবে ও ঘোড়ার পেছনে।'

'অ্যাঁ!' অনেকটা নেশার ঝোঁকেই, ভাত মাখা ডান হাতের সঙ্গে বাঁ হাতটাও শূন্যে তুলে দিল রামানন্দ। 'ঘোড়ার পিছনে টাকা, ঘোড়ার টিপ ধরা! কত নম্বর ঘোড়া, কোন্ ঘোড়া? ব্ল্যাক রোজ? সিলভার কুইন? লাকি মুন! প্রিন্সেস? ব্বারভাঙ্গা প্লেট—'

'এই মাস্টার!' এবার মাধুরী ধমক লাগাল। 'মাতলামি করতে হয় তোমার ঘরে

গিয়ে করো, খেতে বসে এসব আমার মোটেই ভাল লাগে না।'

'অঃ আচ্ছা, ঠিক ঠিক, খেতে বসে মাতলামিটা—ঠিকই তো, ভয়ানক বাজে জিনিস—'

'আমি বললাম কি, দু টাকা যদি ঘোড়ার পেছনে খরচ করিস তো মেলার অন্য খরচ কুলোবি কি করে—'

'ঠিকই তো, পুতুল কেনা, বাঁশী কেনা, সার্কাস দেখা, ম্যাজিক দেখা, ফুটকলাই খাওয়া, চিনির মঠ খাওয়া, সরবত খাওয়া—'

'বলে কিনা আমার টাকা আছে, মনতাজের কাছে আমার ক'টা টাকা পাওনা আছে, মনতাজও মেলায় আসছে।'

'মনতাজটা কে?' রামানন্দ ভুরু কুঁচকালো।

'ঐ যে শফীর মেটিয়াবুরুজের মামা—মামার ছেলে। শফীর বয়সী, শফী বলছিল। আমি কোনোদিন ওই ছোঁড়াকে দেখিনি।'

'তা ভালই তো, আমাদের শফীউল্লার যদি টাকা থাকে, দু-চার টাকা ঘোড়ার পেছনে খরচ করুক না, ভাল কথা।'

'তোমার মাথায় কিছু নেই মাস্টার—ভয়ানক মোটা মাথা। হুঁ, ওই যে চরকি-ঘোড়ার কথা বললাম। আমার মনে হয় তুমি কোনোদিন ওতে চাপনি। এমন বন্‌বন্ করে কতক্ষণ ঘোরে—বাপ্, নেমে যাবার পরেও অন্তত দশ মিনিট মাথাটা ঘুরতে থাকে। গা গুলোতে থাকে।'

'তা হলে তোমাদের নাওভাঙগার মেলার ঘোড়াগুলো বোধ করি বেশি ঘোরে।'

'তাই তো বলি—' মাধুরীর গলায় আক্ষেপের সুর শোনা গেল। 'এই মাথা নিয়ে এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ইস্কুলে ছেলে পড়াতে কেমন করে—আরে পণ্ডিত, সব মেলার ঘোড়াই যে একরকম ঘোরে—দু-দুটো লোক এমন জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে চাকাটা ঘুরিয়ে দেয়—বাস্, তারপর আর দেখতে হয় না, চাকায় আটকানো বারোটা ঘোড়া বনবন বনবন করে অন্তত চোদ্দটা চক্কর দেবেই—তারপরও ঘোরে, ওরাই ইচ্ছে করে তখন থামিয়ে দেয়, তা না হলে লোকে যে মাথা ঘুরে মরবে।'

'অঃ তাই নাকি—তবে তো—' যেন এতক্ষণ পর ব্যাপারটা রামানন্দর মাথায় ঢুকল।

'তাই তো বলছি আমি', মাধুরীর দু' চোখ কপালে উঠে গেল। 'একবার তুই দশ নয়া খরচ করে ঘোড়ায় চড়—শখ না মেটে আর একবার চড়—তাই বলে বিশ-বার? আমার হিসেবে তো তাই হয়, দশ নয়া করে দু টাকায় কুড়িবার চড়া যায়—তুমি কি মনে কর মাস্টার, এই চোতের খরায় এতবার ঘোড়ায় চড়লে ওই ছোঁড়া বাঁচবে? এমনি তো রোগা কিটকিটে শরীর—'

'না না না, উঁহু', পাতের ভাত শেষ করে রামানন্দ ঢকঢক করে জল খেল। বড় করে একটা ঢেঁকুর তুলল। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'অত ঘোড়ায় চড়া চলবে না, আমি শফীকে বারণ করব।'

'কাল বিকেলে এই নিয়ে আমার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া। যত আমি বোঝাই—কিছুতেই শুনবে না। এবার ঘোড়ার পেছনে দু টাকা উনি খরচ করবেনই, বলে কি, আমার কিছু হবে না, আমার ভেতরটা ভয়ানক শক্ত, দেখতে রোগা হলে কি হবে—'

'না না। এটা কোনো কাজের কথা নয়—' আসন ছেড়ে রামানন্দ উঠে পড়ল।

'আমি বললাম, রক্তবমি হয়ে মরবি তুই। আমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, ঘেঁচু হবে।'

'ছেলেমানুষ, অতশত বোঝে না—'

নেশার চোটে ভাত খেয়ে নতুন করে রামানন্দর পা টলছিল। দু চোখ ঘুমে

জড়িয়ে আসছিল। কোনোরকমে আঁচানো সেরে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। কেরোসিনের ডিবি জেবলে রান্নাঘরে একা একা মাধুরী কতক্ষণে ভাত খেয়ে উঠল, কখন ধোয়া-মোছার কাজ সেরে তাদের বড় ঘরে শুতে এল রামানন্দ কিছুই টের পেল না। তখন ভুসভুস নাক ডাকছিল মাস্টারের। তা না হলে আলো নিবিয়ে মাধুরী বিছানায় শুয়েও নিজে নিজে অজস্র বকছিল, রামানন্দর কানে আসত। সেই মেলার কথা, ঘোড়ার কথা, শফীর চিন্তা।

বস্তুত রামানন্দ যদি জেগেও থাকত, শফীকে নিয়ে কি নাওভাঙ্গার মেলা নিয়ে মাধুরীর মাথার এই চমৎকার চিন্তার জাল ছিঁড়ে ফেলে দুম করে হাসপাতালের অক্ষয়, অক্ষয়ের অপারেশন সংক্রান্ত সাংঘাতিক কথাটা বলতে হয়তো সাহসও পেত না। নেশা করলে হবে কি। হঠাৎ এভাবে বেচারাকে ঘাবড়ে দিতে, ভয় পাইয়ে দিতে রামানন্দর কষ্টই হতো।

যে জন্য পরদিন রবিবারটাও সে চুপ করে রইল। সোমবার মেলার হাঙ্গামাটা চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে, ভাবল সে।

।। ২২ ।।

একটা অন্যরকম দিন। অন্যরকম মেজাজ। চৈত্র মাস অনেক দেখা হয়েছে জীবনে, সেটা কিছু না, চকচকে নীল আকাশ, পরিচ্ছন্ন রোদ, ফুরফুরে হাওয়া— কিন্তু তা হলেও কেমন একটা বিশেষ দিনের মতন মনে হচ্ছিল সোমবারটা, বিশেষ করে সকালবেলাটা, এমনকি রামানন্দর একবার মনে হয়েছিল, এমন চমৎকার সূর্যোদয় সে আর কোনোদিন দেখেনি।

কলকাতা তো নরক। সূর্যোদয়ের আগে আকাশের মনোহর পদ্ম রং, তার কয়েক মিনিট পরেই দিনমণির আবির্ভাব, যেন একটা গাঢ় রক্তবর্ণ থালা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে, একটু একটু করে রংটা পাল্টাচ্ছে, তেজটা বাড়ছে, তার মানে সরাসরি আর থালাটার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, চোখ ঝলসাচ্ছে, আর ক্রমশ থালাটা ওপরে উঠছে। না, কলকাতার জীবনে এমন সূর্যোদয় রামানন্দ দেখেনি। ছেলেবেলায় ঢের দেখেছে। যখন দেশে ছিল, গাঁয়ে ছিল। এর জন্য বড় মাঠ চাই তো, বা দিগন্ত খোলা নদীতট। দেশে দুটোই ছিল। তারপর এখানে মাধুরীদের কাছে এসেছে পর আবার সেভাবে সূর্য উঠতে দেখে। এবং এটা দেখবার জন্য ক'দিনই রামানন্দ ইচ্ছা করে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে।

আজ অবশ্য যাকে বলে নিজের ইচ্ছায় আলস্যমোচন করে তাকে শয্যা ত্যাগ করতে হয়নি, ভোরের পাখির মতন দুটো মিষ্টি কলকল গলা তার ঘুম ভেঙ্গে দিল এবং তখনি সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বাইরে চলে আসে।

শফীর গলার স্বরটা সে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু আর একটি গলা বুঝতে পারছিল না, যেন এই জন্যই একটা চমৎকার কৌতূহল নিয়ে রামানন্দ দোর খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

পাশাপাশি দুটি কিশোর দাঁড়িয়ে। শফী আর তার মামাতো ভাই। দেখে অবশ্য রামানন্দ বুঝতে পারল এই ছেলেই মনতাজ। যার কথা মাধুরী বলছিল।

হুঁ, মুখটা শফীর মতন নিরীহ, নির্মল তো বটেই, অথচ শফীর মতন ময়লা না, একেবারে ফুটফুট করছে গায়ের রং, প্রায় মাধুরীকে হার মানায়, কেবল রং বলে নয়, যেন চামড়ার মধ্যেও একটা দুরন্ত মেয়েলী লাবণ্য লেগে আছে, পুরুষ ছেলের এত সুন্দর গায়ের চামড়া বড় একটা চোখে পড়ে না। প্রথমটায় বেশ একটু বিমূঢ়,

হয়ে গিয়েছিল রামানন্দ এক সঙ্গে দুটি কিশোরকে দেখে। যেন ভোরের শিশির-ভেজা দুটো টাটকা ফুল। দুজনেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁত ছড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে। অর্থাৎ এতক্ষণ খুব শব্দটব্দ করছিল, হাসছিল, মাস্টারমশায়কে জাগতে দেখে অতর্কিতে দুজন নীরব হয়ে আছে, ওদের চাপা দুষ্টুমি ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে রামানন্দ টের পেল, আর ওদের ঠিক পিছনেই উঠোনে মাধুরী দাঁড়িয়ে। ভোরের প্রথম দেখার পর মাধুরীও টিপে টিপে হাসছিল। মাধুরীর পিছনে একটা ডালিম চারা। ছাগল-টাগলে মুখ দিয়ে নষ্ট করবে ভয়ে খুব যত্ন করে যেটা ও বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। ফলে অগুনতি কচি পাতা ও কলি ফুল নিয়ে ডালিম চারাটা একটা বড় ঝোপের চেহারা ধরেছে। সেই ঝোপের পিছনে সল্টলেকের বালুর ওপর দিয়ে পুবের মস্তবড় আকাশটা দেখা যায়। যে জন্য প্রথমে শফী ও মনতাজ, তারপর মাধুরী, মাধুরীর পিছনে নধর আভায় ছাওয়া ডালিম গাছ এবং তার পিছনে সোনার থালার মতন একটা সূর্য—প্রায় এক সঙ্গে সব ক'টা রামানন্দর চোখে পড়ল। এইজন্য ভয়ানক চমকে উঠতে হয়েছিল তাকে। অবশ্য মধুর পরিবেশটার জন্যই। রামানন্দর মনে হয়েছিল এমন জমকালো অথচ স্নিগ্ধ পবিত্র সূর্যোদয় সে আর জীবনে দেখেনি।

মনটা খুব ভাল লাগছিল তার। মেলায় আসার সময় প্রায় সারাটা রাস্তাই এই ভাল লাগাটা সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

যাই হোক, এখন মেলার কথায় আসা যাক—মেলায় আসার আগে পর্যন্ত এই ক'দিন ধরে যত দৃশ্য, যত ছবি, যতরকম ঘটনা উপঘটনা রামানন্দ মনে মনে ছকে রেখেছিল বা মাধুরীও তার নিজস্ব আশা উৎসাহ মাখানো কল্পনা দিয়ে, এমন কি ভয় ভাবনা দিয়েও কিছু, যেসব চিত্রটিত্র তৈরি করে রেখেছিল, মূল জায়গায় এসে দেখা গেল, সেসব একটার সঙ্গে আর একটা বড় যেন মিলছে না। প্রায়ই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, এর বড় কারণ বোধ করি মনতাজের মাথার বড় পুঁটলিটা। মানে তার পুতুলগুলো। নিজের হাতের তৈরি। এত পুতুল ছোঁড়া নিয়ে এসেছে মেলায় বসে বেচবে বলে।

বাড়িতে তাড়াহুড়ো করে রামানন্দ সব দেখতে পারেনি। পুঁটলি খুলে খুঁটিয়ে একটা একটা করে দেখতে গেলে যথেষ্ট সময়ের দরকার, ওদিকে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে না পড়লে রোদ চড়ে যায়। বালুর ওপর দিয়ে হাঁটা। অনেকটা পথ।

সেজন্য মাধুরীই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। 'মেলায় গিয়ে দেখবে মাস্টার ও তো দোকান সাজিয়েই বসবে, যতক্ষণ খুশি, যতবার খুশি দেখবে।'

তাই দেখল রামানন্দ। কিছু মাটির তৈরি, কিছু তুলোর, আবার কাঠ ও তুলো দিয়েও ক'টা তৈরি করা হয়েছে। সাপ, হরিণ, মানুষ, বানর, গাছ থেকে আরম্ভ করে, বাড়ি, নৌকো, পোল, রিকশা, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, স্টেশন ঘর—হুঁ স্টীমার, লাইট হাউস, কাঠ ও মাটির ওপর রং লাগিয়ে কী সুন্দর একটা বাতিঘরই না তৈরি করেছে মনতাজ। সব দেখে রামানন্দ একেবারে থ। এ যে পয়লা নম্বরের এক শিল্পী গো। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে? কিন্তু তা তো কথা না। সংসারে তুমি কী বিশ্বাস করবে বা না করবে, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু এই জগত চলছে না। এই জীবনে অনেক অবিশ্বাসের জিনিসও রামানন্দকে বিশ্বাস করতে হয়েছে, আবার বিশ্বাসযোগ্য কত কি অবিশ্বাসের ঠোক্কর লেগে খানখান হয়ে ভেঙ্গে গেছে। সেসব আলাদা ব্যাপার।

রামানন্দ খুশি হয়ে মনতাজের পিঠ চাপড়াল। সাবাস! সাবাস!

কিন্তু একটা জিনিস তাকে খুব অবাক করল। দেখা গেল মনতাজের পুতুল এবং পুতুলের দোকান সাজানর ব্যাপারে শফীর উৎসাহটাই বড় বেশি। মনতাজ যেন

তেমন কিছু না। কারিগর এই পর্যন্ত। শফী যেন তার অভিভাবক, এখানে ম্যানেজার শব্দটাই বেশি লাগসই। শফীই দোকানের জায়গাটা বেছে দিয়েছে! ওপাশে সার্কাসের তাঁবু, একটু দূরে নাগরদোলার বিরাট গাছটা দাঁড়িয়ে, বাঁ-পাশে মাধুরীর সেই চরকিঘোড়া। বারোটা সাদা ঘোড়া বনবন করে ঘুরছে! রাজ্যের ছেলেমেয়ের ভিড় ওখানে। একটু দূরে খাবার দোকান। যেন জিলিপি ভাজা হচ্ছে, গজা ভাজা হচ্ছে। বাতাস ম-ম করছে খাবারের গন্ধে। ঠিক তার পাশেই চায়ের দোকান। মানে এই জায়গাটায় লোকজনের আনাগোনা বেশি। একটা ঝুপড়ি মতন মনসা গাছের ছায়ায় শফী নিজের হাতে মনতাজের পুতুলগুলি সাজিয়ে দিয়েছে। কোন্‌টা সামনের দিকে থাকবে, কোন্‌টা পিছনে রাখা হবে এবং এ-পাশে বা ও-পাশে কোন্‌ পুতুলগুলি রাখলে খদ্দেরের বেশি নজরে পড়বে সব শফী ঠিক করে দিচ্ছে। দেখা গেল শফী যেমনটি বলছে মনতাজের তাতেই সায়, যেন নিজস্ব কোনো মতামত নেই। শফীর পছন্দই তার পছন্দ, শফীর ভাল লাগায় তারও ভাল লাগা। এমনকি কোন্‌ পুতুলটার কত দাম তাও ঠিক করার ভার শফীর ওপর। সব দেখেশুনে রামানন্দ নিজের মনে হাসছিল। 'তুমি ক্যাবলাকান্ত আর্টিস্ট', মনতাজের কচি মুখটার দিকে চোখ রেখে রামানন্দর একবার বলতে ইচ্ছে করল, 'কেবল পুতুল গড়তেই শিখেছ, রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে ব্যবসা-বুদ্ধি, বাস্তবজ্ঞান বলতে তোমার ঘটে খোদাতাল্লা বিশেষ কিছু দেয়নি। কাজেই তোমাকে ভুগতে হবে মিঞা।'

হুঁ, খদ্দেরদের সঙ্গে শফীই পটপট্‌ কথা বলছে। আগে রামানন্দর ধারণা ছিল না যে এই ছোঁড়া এতটা চালাকচতুর, এমন নাকেচোখে কথা বলতে জানে। এখন মেলায় এসে দেখছে।

তা হবে, একটু ভেবে রামানন্দ নিজের মনে বলল, ইয়াকুব মিঞা ডিমের কারবারী। এর কিছু কিছু তো শফীকে প্রায় সবসময়ই দেখতে হচ্ছে। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকটা ও বোঝে ভাল।

মাধুরীও রামানন্দর পাশে দাঁড়িয়ে শফীর দোকানদারী দেখছিল। মনতাজ শফীর পিছনে পুতুলের ভিড়ের পাশে অবিকল আর একটি পুতুল হয়ে চুপচাপ বসে। 'বেজায় লাজুক– মুখচোরা ওই ছোঁড়া।'

'হুঁ, তাই দেখছি।' রামানন্দ বিড়বিড় করছিল। 'আমাদের শফী খুব করিৎ-কর্মা।'

'ওই পুতুল বানান-টানানর ব্যাপারেও নাকি শফীর কিছুটা হাত আছে। কাল আমায় বলছিল।'

'তার মানে পুতুল তৈরি করে মেলায় এনে বেচার বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়েছিল মেটিয়াবুরুজের ভাইটিকে, তাই না?'

উত্তরে মাধুরী সরাসরি কিছু বলল না। বা কিছু বললেও রামানন্দ তখন শুনতে পেত না। সার্কাসের তাঁবুর সামনে মাচা বেঁধে তার ওপর সঙ সেজে দাঁড়িয়ে একটা মানুষ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করছে, আর মুখে প্রকাণ্ড একটা চোঙ লাগিয়ে জোরে চিৎকার করছে! আগুনে ঝাঁপ, কুমারীর গলা কাটা, কাগজের টুকরো থেকে হাঁসের আণ্ডা, চুল থেকে ফুল, শূন্যে মানুষ হাঁটা—দশ নয়া দশ নয়া দশ নয়া—'

গলার স্বরটা অদ্ভুত। রামানন্দর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মাধুরী খিলখিল হেসে ফেলল। রামানন্দ শব্দ না করে হাসল।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। মনতাজ যদিও একবার দু'বার সার্কাসের তাঁবুর দিকে তাকাচ্ছে, শফী একদম না। ঐ হল্লা, চিৎকারের মধ্যেই কোন্‌ ফাঁকে এক খদ্দেরকে

এক সঙ্গে তিনটে পুতুল গছিয়ে দিয়ে দাম আদায় করে দু' টাকার কড়কড়ে নোটটা মনতাজের কোলের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। মনতাজ বুঝি সেই মুহূর্তে নাগরদোলার দিকে ঘাড় ঘুরিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শফীর ধমক : 'দ্যাখ: টাকা পয়সা যত্ন করে রাখবি, পরে হিসেবে গোলমাল-টোলমাল হলে আমাকে দুষতে পারবি না।'

'আমার মনে হয় এতে শফীরও কিছু ভাগ থাকবে।' রামানন্দ আস্তে বলল। মাধুরীর কাঠের জিনিসের বেজায় শখ, রামানন্দকে সঙ্গে নিয়ে সকলের আগে সে-দিকে চলল, রামানন্দর কথায় চট করে কান দিল না।

কিন্তু কাঠের জিনিস দেখে মাধুরীর যেন তেমন মন উঠল না। আগের বছর নাকি অনেক বেশি এবং অনেক ভাল জিনিস মেলায় আমদানী হয়েছিল। দুটো তিনটে দোকান ঘুরল। এটা ওটার দাম জিজ্ঞেস করল, শেষ পর্যন্ত একটা কাঁঠাল কাঠের খণ্ডা, একটা ডালের ঘুঁটনি এবং বসে রান্না করবে বলে উঁচু খুরা দেখে একটা ছোট পিঁড়ে কিনল। পিঁড়েটাই তার পছন্দ হল। অন্য দুটো জিনিস কেনার পরেও খুঁতখুঁতি থামছিল না।

বেলা বাড়ছিল। যেমন মানুষের ভিড় তেমনি কলরব। রোদ চড়ছিল। এত লোকের চলাফেরা একটা জায়গায়, ধুলোটুলো খুব উড়ছিল। তার ওপর এলো-মেলো চৈতালী হাওয়া। মাধুরীর কালো চকচকে চুলে এর মধ্যেই একটা সাদাটে ধুলো-ধুলো ছাপ পড়তে আরম্ভ করেছিল। কাঠের জিনিস কিনতে খুব একটা সময় লাগেনি, কিন্তু যেন মুশকিল বাধল মনিহারী দোকানের সামনে গিয়ে। সারি-সারি বেশ কয়েকটা দোকান সওদা সাজিয়ে বসেছে। তেল, সাবান, স্নো, পাউডার থেকে আরম্ভ করে সিঁদুরের কৌটো, আরশি, চিরুনি, চুলের ক্লিপ, কাঁটা, ফিতে, মেয়েদের খোঁপার জাল, রুমাল, ব্রেসিয়ার মায় কাপ, ডিস এবং রং-বেরঙের পাথরের মালা ও কাঁচের চুড়িতে এক একটা দোকান বোঝাই হয়ে আছে। প্ল্যাস্টিকের খেলনা-টেলনাও প্রচুর চোখে পড়ছিল। এত জিনিস এক সঙ্গে এক জায়গায় দেখলে মেয়েরা দিশাহারা হয়ে পড়ে। মাধুরীর অবস্থাটা রামানন্দ বুঝতে পারছিল। এক সঙ্গে চোখের ওপর এত জিনিস দেখে কোন্‌টা কিনবে, কোনটাই বা অপছন্দ করবে ঠিক করতে না পেরে একবার এই দোকানের দরজায় দাঁড়াচ্ছে, একবার সেই দোকানের দরজায় ছুটছে বা দুটো দোকান পিছনে ফেলে দোকানীদের সঙ্গে কথা শেষ না করে মাছির মতন তৃতীয় একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে দোকানীরাও খুব বিরক্ত হচ্ছে। কেননা, দাম করতে করতে হাতের বস্তুটা ফেলে রেখে, যেহেতু তার চেয়েও দেখতে রংদার চকচকে বা মজবুত ঠিক সেই বস্তুটি পাশের দোকানের শো-কেস-এ উঁকি দিয়ে আছে, চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা গরম করে মাধুরী সেদিকে ছুটছে। বিরক্ত হয়ে কোনো কোনো দোকানী দুটো একটা কটু মন্তব্য করতে পর্যন্ত ছাড়ছে না। যেন তাতে মাধুরীর বড় একটা বয়ে যাচ্ছে। তিনবার তিন দোকানে ঢুকে তিনটা জিনিসের দর কষাকষি করার পর তিনটার একটাও পছন্দ না করে দোকানদারদের মুখের সামনে জিনিসগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে অক্লেশে সে চতুর্থ আর একটা দোকানে ঢুকে কাম্য জিনিসটি কিনে নিচ্ছে।

এভাবে চুলের কাঁটা, ফিতে, মাথার তেল, সাবান, আলতা, দুটো কাপ, ডিস ও একটা কাচের মালা কিনতে অক্ষয়ের স্ত্রী প্রায় দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দর হয়রানির একশেষ। মাঝে মাঝে সেও কম বিরক্ত হচ্ছিল কি! শেষটায় মনোহারী দোকানের সারি পিছনে রেখে মাধুরী যখন পোড়া মাটির জিনিসগুলির দিকে এগোতে লাগল, রামানন্দ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। একটা প্রকাণ্ড তুলো গাছের নিচে মাটির হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বসেছে দোকানীরা। আলাদা আলাদা কিছু দোকান ভাগ করা নেই। সাজিয়ে-টাজিয়ে রাখার বালাই নেই—সব ঘাসের ওপর ছড়িয়ে-

ছিটিয়ে রাখা। কাজেই এটা-ওটা পছন্দ করতে মাধুরীকে খুব একটা ছুটোছুটি করতে হবে না, তা ছাড়া মাটির জিনিসের পছন্দ-অপছন্দ আবার কি, সবই তো প্রায় দেখতে একরকম, দামেরও খুব একটা ইতরবিশেষ নেই। কিন্তু রামানন্দর মনে মনে যেটা ভয় ছিল, যদি এক সঙ্গে মাধুরী হাঁড়ি, কলসী, মালসা, গামলা—গামলা-টামলা অবশ্য হাঁস-মুরগীর জন্য, মাধুরীর হাঁস-মুরগীর খাবার দিতে এই সমস্ত পাত্রের খুব দরকার হয়, আর এগুলি ভাঙেও খুব বেশি, গাঁয়ের হাটেও অবশ্য কিনতে পাওয়া যায়—তা হলেও মেলায় এসেছে যখন, হুঁ, একটা মাটির ধনুচির শখ মাধুরীর অনেক দিনের, একটা ফুলদানি, অর্থাৎ যত তুলো গাছটার দিকে তারা এগোচ্ছিল, একটা করে নতুন নতুন জিনিসের কথা মাধুরীর মনে পড়ছিল, তার মানে সওদার ফর্দটা তার বেড়েই চলছিল, রামানন্দ ঘাবড়ে গেল এই জন্য। এত সব জিনিস বয়ে নেবে কে? বাড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন না, সেটা পরে দেখা যাবে, শফী আছে, মনতাজ আছে, অবশ্য মনতাজের আবার পুতুল-টুতুলের ব্যাপার আছে, সব পুতুল কি আর ওরা মেলায় বেঁচে শেষ করতে পারবে!

কিছু কিছু হয়তো আবার পুঁটলি বেঁধে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যা হোক, তখন যেমন করে হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। মাধুরী শখ করে এটা-ওটা কিনছে। কিছু ফেলে রেখে তো আর বাড়ি ফেরা হবে না—চারজন আছে, সবাই মিলে একটা দুটো করে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার খুব একটা অসুবিধা তখন নাও হতে পারে। মুশকিল বাঁধবে এখন। রামানন্দ যা চিন্তা করছিল। তার এক হাতে মাধুরীর এত বড় কাঠের খণ্ডটা, আর এক হাতে পিঁড়ে ও ডালের ঘুঁটনি। চুলের কাঁটা, ফিতে, তেল, সাবান, আলতার শিশি, কাপ, ডিস, মাধুরী দু' হাতে একত্র জড়ো করে নিয়ে কোনোরকমে হাঁটছে, এই অবস্থায় এখন যদি হাঁড়ি, কলসী, গামলা, ধনুচি কেনা হয় এবং একটু দূরেই ছাতিম গাছটার নিচে যেমন হরেক রকম বেতের জিনিসের আমদানী দেখা যাচ্ছে, এব মধ্যে মাধুরী কবে জানি একদিন বলেও ছিল, এবার নাওভাঙ্গার মেলা থেকে ক'টা বেতের জিনিস কিনতে হবে—কাজেই হাঁড়ি, কলসী, গামলা, মালসা কেনা হয়ে যাবার পরেই মেয়ে ধামা, কুলো, ঝুড়ি, ধুচুনি কিনতে লেগে যাবে জানা কথা।

কিন্তু সেসব এখন রাখা হবে কোথায়? তাছাড়া হাতে এত সব রয়েছে।

'শোনো', রামানন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল। 'আগে এগুলো শফীদের কাছে রেখে আসা যাক।'

'আবার ওখানে এখুনি যাবে! মাধুরী আগে আগে হাঁটছিল। বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'তা না হলে সব এক সঙ্গে নিয়ে যাবে কি করে!' রামানন্দ বিরক্ত হল না। হাসল।

'তা-ও বটে! যেন এবার মাধুরী অসুবিধাটা বুঝতে পারল। ফ্যাল ফ্যাল করে নিজের হাতের তেল, সাবান, কাপ, ডিস ও রামানন্দর হাতের কাঠের জিনিসগুলি দেখল। রামানন্দ মনে মনে বলল, 'এই জন্যই বলে, মেয়েছেলে। ঝোঁকের মাথায় চলে। পরিণামের কথাটা মাথায় ঢুকতে দেরী হয়।'

'কিন্তু আমার বড্ড জলতেষ্টা পেয়ে গেল মাস্টার।'

'বেশ তো, আপাততঃ শফীদের কাছে যাওয়া যাক, হাতের জিনিসগুলো সেখানে রাখি, একটু জলটল খেয়ে বিশ্রামও করা যাবে, তারপর এসে মাটির আর বেতের জিনিস কেনা হবে—আমার তো কেমন খিদেই পেয়ে গেছে ছাই।'

'হুঁ, দেখতে দেখতে অনেকটা বেলা হয়ে গেল।' ওপরের দিকে চোখ তুলে মাধুরী সূর্যটা দেখল। 'ছোঁড়া দুটোও বোধ করি এতক্ষণ কিছুই খায়নি।'

'পুতুলের দোকান নিয়ে মেতে আছে।' রামানন্দ গলার নিচে হাসল।

মাধুরী হঠাৎ শব্দ করল না। রামানন্দর পিছনে হাঁটছিল। একটু পরে মাধুরীর গলায় গুমগুম একটা রাগের ভাব প্রকাশ পেল।

'ঐ মনতাজটাকে জুটিয়ে এনেছে। এখন দেখছি দোকান ছেড়ে শফীটা আর নড়তেই পারছে না।'

'তাই তো', রামানন্দ সায় দিল। 'কোথায় ঘোড়ায়-টোড়ায় চড়বে বলে খুব লাফাচ্ছিল সেদিন, সার্কাস দেখবে, ম্যাজিক দেখবে, ফুটকলাই কিনে খাবে, চিনির মঠ খাবে—এখন দেখছি ছোঁড়ার মতিগতি অন্যরকম হয়ে গেল।'

'আমি ভাবলাম ওকে নিয়েই একটু বেশি ঘোরাটোরা যাবে, শফী সঙ্গে থাকলে আমার কেনাকাটার কত সুবিধে হতো, সব দিক থেকেই সুবিধে হতো—তা ছাড়া একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে দুপুরে একটু চড়ুইভাতি করার ইচ্ছে ছিল। চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতিটা এবেলা কিনে না রাখলে হয়? কিন্তু যেমন দেখছি মনতাজের পুতুলের দোকানে আঠা হয়ে লেগে রইল—চড়ুইভাতিটাতি এবার কিছুই বোধকরি হবে না—'

'হবে হবে—' রামানন্দ মৃদু গলায় হাসল। আশ্বাস দেওয়ার মতন চেহারা করে ঘাড় ঘুরিয়ে মাধুরীর বেজার মুখটা দেখল। 'যদি এ বেলার মধ্যেই ওরা সব বেঁচে-টেচে শেষ করতে পারে—হুঁ, তা হলে টাকাপয়সারও আমদানী হবে—আমার তো মনে হয় দুটিতে সেই ধান্দায় আছে, ওবেলা খুব করে আমাদের নিয়ে ঘুরবে, সার্কাস দেখবে, ম্যাজিক দেখবে, নাগরদোলায় চাপা, ঘোড়ায় চড়া, এটা-ওটা কেনা ও চড়ুইভাতি খাওয়া—সব বিকেলের জন্য মুলতুবী রেখেছে—'

মাধুরী কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, রামানন্দ তৎক্ষণাৎ সামনের দিকে ঘাড় ফেরাল। দুটি মানুষ গালভরা হাসি নিয়ে তাদের দু'জনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জগত মণ্ডল, নন্দদুলাল।

'মাই গড্, কতকাল পর দেখা।' যেন ভয় পাওয়ার মতন মনের অবস্থা রামানন্দর। কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে অল্প শব্দ করে হেসে ফেলল। 'মেলায় এলেন বুঝি?'

'হুঁ, আপনি এখানে!' জগত মণ্ডলের আগে নন্দদুলাল কথা বলল, আড়-চোখে মাধুরীকে দেখল, মাধুরীর হাতের জিনিসগুলি দেখল, তারপর রামানন্দর চোখে চোখ রাখল।

'রাজ্যের গেরস্তালির জিনিসপত্তর কিনে নিয়ে চললেন দেখছি—'

'এই আর কি, মানে ইয়ে—' কথাটা গুছিয়ে বলার জন্য সতর্ক হতে গিয়েও রামানন্দ পারল না, এলোমেলো হয়ে গেল। 'হুঁ, মানে ইনি আমার সেই বন্ধুর ওয়াইফ, ঐ যার বাড়িতে, যাদের কাছে আছি, পোলট্রি করছি—বলিনি আপনাকে?' নন্দদুলাল না, সরাসরি জগতের দিকে তাকাল রামানন্দ।

'বলেছিলেন কি? হুঁ, বলেছিলেন যেন, ভাল মনে নেই—' প্রকাণ্ড ঢোক গিলে জগত মণ্ডল কটমট করে মাধুরীকে দেখল। একটা গোলাপী রঙের শাড়ি পরা। গোলাপী জমির ওপর কালো কালো মার্বেলের ছোপ। পায়ে চিক্কণ স্ট্র্যাপের চটি। যার দরুণ মেয়েটির পায়ের পাতার সবটা মাংসই চোখে পড়ে। এখন অবশ্য ধুলো জমেছে। তা হলেও কোমল লাবণ্যটা বোঝা যায়। পা ও পাছা দেখা শেষ করে জগত যুবতীর ঘাড়ের রেখা, গালের রং, কেননা সোজাসুজি এদিকে না তাকিয়ে মাধুরী ওপাশে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল, বেশ একটু সময় লাগিয়ে দেখল, তারপর আবার রামানন্দর দিকে চোখ ফেরাল। 'ভালই হয়েছে, এনার সঙ্গে পরিচয় হল, বন্ধু কোথায়?'

'হাসপাতালে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই গ্যাসট্রিকের পেশেণ্ট। এখনো ওখানে শুয়ে?'

রামানন্দ থুঁতনি নাড়ল।

'তারপর? এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরছেন?' জগত ভুরু কুঁচকোল।

'না না, বাড়ি ফিরছি কোথায়।' রামানন্দ কিছুটা স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল। 'আরো বিস্তর কেনাকাটা আছে—হাতের এই ক'টা জিনিস ঐ ওদিকের একটা দোকানে রেখে আসছি।'

'চলুন', জগত ঘুরে দাঁড়াল। 'কোন্ দোকানে এসব রাখবেন আমরাও সঙ্গে যাচ্ছি, আপনাকে যখন হঠাৎ পাওয়াই গেল, আর ছাড়চিনে—এসো নন্দ, দারুণ ফুর্তি হবে—এমন একটা মেলায় এসে তিনজন একত্তর হওয়া চাট্টিখানি কথা!'

'আমার—' রামানন্দ সত্যি মুশকিলে পড়ল। রীতিমত সাদা হয়ে গিয়ে ঢোক গিলল। 'আমার তো নিজের কিছু না, এঁর, এঁদের আরো অনেক কিছু কেনা-কাটার ছিল।'

'আহা, সে তো বুঝতেই পাচ্ছি।' এবার নন্দ গলাটা লম্বা করে দিল। 'বন্ধু-পত্নীকে নিয়ে মেলায় এসেছেন। তা কেনাকাটার যা আছে, চটপট সেরে নিন। আমরা সঙ্গেই আছি। পালিয়ে যাচ্ছি না।' ঘাড় ঘুরিয়ে জগতের দিকে চেয়ে নন্দ একটু চোখ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে আবার রামানন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুঁ, সঙ্গে আছি, তবে আপনাদের কেনাকাটার জিনিসে ভাগ বসাব সেই ভয় করবেন না কবি।' নন্দ হি-হি করে হাসল। টিপ্পনীটা বুঝতে পেরে রামানন্দ আরও মিইয়ে গেল। মাধুরীকে নিয়ে মেলায় এসে এমন বিপদে পড়বে তার জানা ছিল না।

॥ ২৩ ॥

হুঁ কেবল 'বন্ধুপত্নী', 'বন্ধুপত্নী', গোড়া থেকেই রামানন্দ যা আশঙ্কা করছিল। ঐ বেঁটে, রোগা মানুষটাই বেশি। যার নাম কিনা নন্দদুলাল। অশ্লীল গল্প লেখে কিনা। সেক্স ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না। জগত মণ্ডলও অবশ্য কম যাচ্ছিল না। কিন্তু নন্দই বেশি। 'চার্মিং লেডী', 'ওয়াণ্ডারফুল মহিলা', কখনও বা 'চমৎকার দেখতে', 'আশ্চর্য ফীগার', 'অদ্ভুত চাউনি', 'আমার তো এখনই একে নিয়ে গল্প লিখতে ইচ্ছে করছে।'

'হবে হবে', জগত বন্ধুকে আশ্বাস দিচ্ছিল, 'পরিচয় যখন হল, সব কিছুই হবে। ঐ পদ্মচোখ, কলসী-কোমর, বেত্রলতা তনু, নিম্ননাভি—প্রথম দর্শনের পর থেকেই আমার তুলি নিয়ে বসে যেতে হাত নিশপিশ করছে, কিন্তু এসব এখন না, মেলায় এসেছি মেলার আনন্দ করব, কি বলেন রামানন্দবাবু!' প্রথম দুটো একটা 'হুঁ', 'হাঁ'-এর পর রামানন্দ একেবারে নীরব হয়ে আছে।

না, মাধুরী আর একবারও তাদের সঙ্গে ঘুরতে রাজী হল না। মাটির জিনিস ক'টা কেনার সময়ই বেচারা টের পেয়ে গেছে সাংঘাতিক দুটি জীব মাস্টারের সঙ্গী হয়েছে। সময় সময় নন্দদুলাল মাধুরীর এমন গা-ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছিল, 'এটা কিনুন', 'ঐ গামলাটার ফিনিসটা সুন্দর' বা 'ধুনুচি খুঁজছেন? এই নিন, আমি নিজের হাতে বেছে দিলাম, দেখবেন কেমন টেকে, তা ছাড়া আপনার হাতে জিনিসটা মানাবেও সুন্দর, যখন ধুনো জেবলে ঠাকুরের সামনে আরতি করবেন'—ওপাশে দাঁড়িয়ে রামানন্দ পর্যন্ত টের পেয়েছে, কেমন জোরে শব্দ করে শ্বাস পড়ছিল নন্দর, মাধুরীর সঙ্গে যখন কথা বলছিল, অনেকদিন পর নধর ঘাসের দেখা পেয়ে

গরু-মোষ ঠিক এমন ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলে প্রায় পাগল হয়ে ঘাসের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। অবশ্য মুখের কাছে মুখ নিয়ে শ্বাস ফেলা ছাড়া ঐ ভিড়ের মধ্যে নন্দর আর কিছু করারও ছিল না, তবে ধুনুচিটা, গামলাটা মাধুরীর হাতে তুলে দেবার সময় তার হাতে ক'বারই ইচ্ছা করে নন্দ হাতটা ঠেকিয়ে দিয়েছে, ফলে মাধুরী রীতিমত কুঁকড়ে যাচ্ছিল। কেবল লজ্জা না, দারুণ রেগে যাচ্ছে মেয়ে, মাধুরীর কান, গালের টকটকে লাল রং দেখে রামানন্দ টের পেয়েছে।

কাজেই, আগে সেভাবে কথা হলেও বেতের জিনিস কিনতে মাধুরী কিন্তু আর তাদের সংগে গেল না। শফীদের পুতুলের দোকানে ফিরে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। রামানন্দও ইচ্ছা করে তাকে ডাকল না। কেননা তখন শফী আর মনতাজ মাধুরীর পাশে আছে, জগত ও নন্দর অনুরোধে আর একবার এটা-ওটা কিনতে মেলায় ঘুরবার জন্য রামানন্দ যদি মাধুরীকে ডাকত, মাধুরী হয়তো যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দিত মাস্টারকে, জগত ও নন্দর মতন সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি পুরুষ সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখেও সে কোনোরকম সংকোচ করত না। মাধুরীর চোখ দুটো দেখে রামানন্দ তার ভিতরের ঘেন্না ও রাগটা টের পেয়েছে।

হুঁ, রামানন্দর নিজেরও খুব অস্বস্তি লাগছিল। মেলার আনন্দটা, যেভাবে তারা প্ল্যান করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, হঠাৎ এই দুই অবতারের সংগে দেখা হওয়ার সংগে সংগে মাটি হয়ে গেল। এই জন্য তার খুব দুঃখও হচ্ছিল।

কিন্তু মজা এই, দুঃখ হয়েছে বলে, অস্বস্তি লাগছে বলে যে সে মুখ বেজার করে থাকবে তার উপায় নেই। অন্তত জগত যতক্ষণ সংগে আছে। নন্দটা যদিও একেবারে ছ্যাবলা, যখন যা মুখে আসছিল বলেই যাচ্ছিল। তিনজনে মিলে বিস্তর ঘোরাঘুরি করল। তখন আর মাধুরী সংগে নেই, এই দোকানের সামনে, সেই দোকানের সামনে কাঁচা বয়সের মেয়ে দেখলেই নন্দ রীতিমত উছলে উঠছিল। তা ছাড়া এমন একটা গেঁয়ো মেলায় মেয়েরাই ভিড় করে বেশি। সময় সময় প্রায় ঝাঁক বেঁধে চলছিল। আর সবই কেমন অল্প বয়সের, নধর মাজাঘষা শরীর এক একটির। নন্দর প্রায় বেসামাল অবস্থা। যেন পারলে ঝাঁপ দিতে চায়। 'আঃ, কী টাটকা জিনিস', 'কেমন ফ্রেশ চিজ!' জগত দু'একবার ধমক দিয়েছে, কিন্তু নন্দদুলালের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কথা বলতে বলতে তিনজন একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়েছিল। নন্দ হাত নেড়ে জগতকে বোঝাচ্ছিল। 'বুঝলে ব্রাদার, একেবারে ক্ষেত থেকে তুলে আনা তাজা ফুলকপি, চমৎকার রং গন্ধ। এই যে চোখের ওপর এতক্ষণ দেখলে। কলকাতা শহরের ঠান্ডা ঘরের শুকনো বাসি পচা চালানি মাল না।'

'হুঁ, যাও না, হাত বাড়িয়ে একবার দ্যাখো, কেবল মুখঝামটা না, কেমন লাথি, চড়, ঝাঁটার বাড়ি খেতে হয় বুঝবে।'

জগতের কথায় নন্দ মাথা দুলিয়ে হেসেছিল। 'ঝাঁটা অবশ্য সংগে নেই কারো, হাতে কেবল হাঁড়ি, সরা, ধামা, কুলো, পুতুল, খেলনা দেখলাম। তেজ আছে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো মণ্ডল, যদি একবার সাহস করে হাত বাড়াতে পার, জায়গা মতন হাতের পাঁচটা আঙুল গলিয়ে দিতে পার, দেখবে সংগে সংগে সুন্দরীরা গলে গেছে, নরম হয়ে গেছে। ঐ হাত বাড়াবার আগেই যত ফোঁসফোঁস, মেয়ে জাতটাকে আমার চিনতে একটুও বাকি নেই, হি-হি, হি-হি—'

'গাঁয়ের মেয়েদের আপনি চেনেন না।' এবার রামানন্দ না বলে পারল না। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। 'কেবল ফোঁসফোঁস কেন', নন্দর চোখে চোখ রেখে গম্ভীর হয়ে রামানন্দ বলল, 'হাত বাড়াবার আগেই আপনাকে ছোবল বসিয়ে দেবে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'বেশ তো, একবার পরখ করে দ্যাখো না।' রামানন্দর দেখাদেখি জগতও গম্ভীর

হয়ে গেল।

নন্দ আগের চেয়েও জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'সুযোগ এলে ছেড়ে দেবো ভাবছ? নন্দদুলাল কখনো চান্স নষ্ট করে না।'

'আর কবে চান্স পাবে!' জগত আবার ভক্ করে হেসে ফেলল। 'মেলা যে এখন ভাঙ্গনের মুখে। সব এবার ঘরে ফেরার ধান্দায়। কি বলেন রামানন্দবাবু!'

'হুঁ, তাই।' রামানন্দ থুতনি নেড়ে জবাব দিয়েছে। তার মন ক্রমশ বেশি খারাপ হচ্ছিল। গাছতলায় চাঁদোয়া খাটিয়ে খাবারের দোকান। একটু আগে ঘাড় ঘুরিয়ে সে পশ্চিমের আকাশটা দেখে নিয়েছে। সূর্য প্রায় ঢলে পড়েছে। একটু পরেই বিকেল হবে। এই নাছোড়বান্দা সঙ্গী দুটিকে কিছুতেই এড়ান যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কি এরা অক্ষয়ের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করবে? এখন এই ভয়টাই তাকে বেশি পেয়ে বসল। একটু আগে দুজনকে একটা চায়ের দোকানে বসিয়ে সিগারেট কেনার অছিলা করে শফীদের পুতুলের দোকানে সে উঁকি দিয়ে এসেছে। শফী ছিল না। মাধুরীকে নিয়ে শফী ঘুরতে বেরিয়েছে। দেখে রামানন্দ একটু নিশ্চিন্ত হয়, মনতাজের মুখে সে সব শোনে। শফীকে নিয়ে মাধুরী বেতের জিনিস এবং আরও কি কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কেনার পর আবার ওদিকটায় ঘুরতে বেরিয়েছে। রামানন্দ অনুমান করল মাধুরীর সঙ্গে শফী হয়তো নাগরদোলা, কি চরকি-ঘোড়ার কাছে গেছে। ম্যাজিক, সার্কাস দেখতেও যেতে পারে দু'টিতে। 'তা তুমি কখন যাবে?' রামানন্দ মনতাজকে জিজ্ঞেস করেছিল। কেননা রামানন্দ দেখছিল প্রায় বারো আনা পুতুলই এদের বিক্রী হয়ে গেছে। আর সামান্য ক'টা পুতুল দোকানে আছে। মুখটা শুকনো করে মনতাজ একলা বসে আছে দেখে তার একটু খারাপ লাগছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মতন লাল হয়ে উঠে মুখটা নিচু করে ছোঁড়া যা বলল, শুনে রামানন্দ নিশ্চিন্ত হল। অর্থাৎ একটু আগে মাধুরী মনতাজকে নিয়েও মেলার অনেকটা জায়গা ঘুরে দেখে এসেছে। এখন আবার শফীকে নিয়ে বেরিয়েছে। এতক্ষণ শফীই দোকানে ছিল।

যাই হোক, তবু যে মন খারাপ করে মাধুরী তখনকার মতন একভাবে দোকানে বসে থাকেনি! ফাঁকে ফাঁকে মনতাজকে সঙ্গে নিয়ে বা শফীকে নিয়ে এটা-ওটা কিনছে, মেলা দেখছে। তবে চড়ুইভাতির ব্যাপারটা যে আব হবে না রামানন্দ বেশ বুঝতে পারছিল। তা হলে মাধুরী ওদের কাউকে দিয়ে রামানন্দকে এর মধ্যে একটা খবর নিশ্চয়ই পাঠাত। চড়ুইভাতির হাঙ্গামা আছে। হাঁড়ি, কলসী, চাল, ডাল, কাঠ, তেল, মশলাপাতি সব কিছু চট করে জোগাড় করা মুখের কথা না। তা ছাড়া আর একটা জিনিস আছে। মাস্টারের সঙ্গে দুটি বাইরের মানুষ রয়েছে, ওদের কিছুতেই যে রামানন্দ এড়াতে পারছে না মাধুরীও নিশ্চয় বুঝতে পারছিল। এই অবস্থায় এখানে, বেলাও যখন আর বেশি নেই, ভাতটাত রান্না করার ঝুঁকি মাধুরী এখানে কিছুতেই নেবে না। তখন মাধুরীর চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেছে, জগত মণ্ডল ও নন্দদুলালকে তার মোটেই ভাল লাগেনি, বিশেষ করে নন্দ নামের বেঁটে লোকটাকে। যে কারণে মাটির জিনিসগুলি কেনার পর মাধুরী আর তাদের সঙ্গে আসেনি। সঙ্গে আসা দূরে থাক, এই যে সে শফীর সঙ্গে, মনতাজের সঙ্গে ফাঁক বুঝে বুঝে মেলার এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, রামানন্দ কিন্তু একবারও ওদের কাউকে দেখল না। জগত ও নন্দর সঙ্গে সে কম ঘুরছিল কি! তার মানে এই তিনটি পুরুষের চোখে না পড়ে এমনভাবেই ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকে অক্ষয়ের স্ত্রী কখনও শফী কখনও মনতাজকে নিয়ে মেলায় ঘুরেছে। এক মাইল জায়গা জুড়ে দোকান-পাট বসেছে, ম্যাজিক সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, ভিড়ও খুব হয়েছে, ইচ্ছা করলে এমন দু' তিন জোড়া চোখকে স্বচ্ছন্দে ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়ানটা তেমন কিছু শক্ত

না। চিন্তা করে একটু আগে রামানন্দ মনে মনে হেসেছিল। চালাক মেয়ে মাধুরী, চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকবে কেন।

কিন্তু এখন? বেলা আর বেশি নেই। ভিড়ও পাতলা হচ্ছে। মেলার যাত্রীদের এবার বাড়ি ফেরার পালা। হয়তো বাকি পুতুলগুলি বেচে শেষ করে শফীরাও এই বেলা ফেরার উদ্যোগ করছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে মাধুরী—

'এই যে রামানন্দবাবু, আপনি দেখছি বেজায় গম্ভীর হয়ে গেলেন, নন্দ আর কখন চান্স পাবে বলতে পারেন? আমার মনে হয়, এখানে বসে খামকা, ওই যাকে বলে হাতই কামড়াচ্ছে ও।'

জগতের কথায় রামানন্দকে বাধ্য হয়ে হাসতে হল।

'হবে হবে', নন্দ তেমনি মাথা দুলিয়ে চলেছে, রামানন্দ দেখল না, জগতের চোখের দিকে তাকিয়ে নন্দ ইতিমধ্যে দু'বার চোখ টিপেছে। 'এতবড় মেলাটা কিছু এক ফুঁয়ে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে না. নীড়ে ফিরবে বলে সব পাখি কিছু একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে উড়াল দিচ্ছে না—'

'একটু অন্ধকার হতে দাও। আপনি কি বলেন?' নন্দ রামানন্দর দিকে ঝুঁকে বসল।

'অ, তুমি সেই আশায় আছ. মেলা ভাঙবে. রাত হবে. একটি দুটি পাখি এই ময়দানে ঘুরঘুর করবে, আর তুমি খপ করে গিয়ে হাত বাড়াবে—' জগত এবার উঁচু গলায় হাসল।

জিলিপি, পান্তুয়ার ঠোঙ্গা হাতে ক'টি মানুষ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিকে তাকাচ্ছিল। বোঝা যায় গাঁয়ের মানুষ, মেলা দেখতে এসেছে, খিদে পেতে খাবারের দোকানে ঢুকেছে। রামানন্দর পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি, তার পোশাক-আশাক যেমন থাক, জগত ও নন্দ কড়া ইস্ত্রির প্যাণ্ট, শার্ট চড়িয়ে এসেছে। সুতরাং এ'রা শহরের বাবু, বুঝতে পেরে গাঁয়ের মানুষ ক'টি একটাও কথা বলছে না, কেবল চোখ বড় করে বাবুদের দেখছে, কথা শুনছে, হাসি শুনছে। কথাটা কি নিয়ে হচ্ছে, হাসিটা কেন, তা তারা বুঝতে পারছে না। বোঝার হয়তো তাদের দরকারও নেই। মেলায় দর্শনীয় আর পাঁচটা জিনিসের মতন এপাশের একটা বেঞ্চির ওপর পাশাপাশি-বসা তিনটি বাবুকে চোখে দেখেই তারা তৃপ্ত, মাঝে মাঝে চমৎকৃতও হচ্ছে বলা যায়।

জগতের মুখের হাসি একটু থিতিয়ে আসতেই রামানন্দ ভুরু কুঁচকে জগতের চোখের দিকে তাকাল।

'আপনারা তা হলে আর একটু সময় এখানে থেকে যাবেন। একটু রাত করে ফিরছেন?'

'কেন, আপনি কি এখনি চললেন নাকি?' হালুম করে ওঠার মতন পিঠ সোজা করে নন্দ রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'না, আমি চিন্তা করছি ও'দের জন্য—'

'অ, বন্ধুপত্নী। তাঁকে নিয়ে বুঝি এখনি আপনার কেটে পড়ার মতলব?'

নন্দর চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল।

'অনেকটা রাস্তা কিনা।' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। গলার স্বরটা যেমন তেমন, নন্দর তাকানটা রামানন্দর ভাল লাগল না।

'আরে না না মশাই, অনেকটা রাস্তা কি—এই তো বেলেঘাটা।' জগত মণ্ডল জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'বলে কিনা কত দূর দূর জায়গা থেকে মেয়েছেলেরা এসেছে। আরো কত কচিকচি বউঝি। বেলেঘাটা আপনার বন্ধুর বাড়ি বললেন না?'

বেলেঘাটারও ওদিকে, সল্টলেক। কিন্তু রামানন্দ মুখে সেটা প্রকাশ করল না।

অস্পষ্টভাবে ঘাড় নাড়ল কেবল।

'তা ছাড়া আমরাও ওদিকের রাস্তায়ই ফিরব। কলকাতার বাস ধরতে হবে না!' নন্দ প্রায় ভেংচি কাটার মতন চোখ করে রামানন্দকে দেখল।

'হুঁ, সবাই দল বেঁধে ফেরা যাবে।' রামানন্দর চেহারাটা ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্য করে সান্ত্বনা দেওয়ার মতন গলার সুর করল জগত। 'বসুন বসুন, এখনো রোদ নেবেনি, ফ্রেন্ডের ওয়াইফের জন্য এত দুশ্চিন্তা করলে হয়!' যেন আদর করে, রামানন্দর কাঁধে একটা হাত তুলে দিল জগত।

'তাই তো!' নাকের একটা বিশ্রী শব্দ করে নন্দ হাসল। 'তোমার কানে কথাটা একটু বেখাপ্পাই ঠেকবে মণ্ডল, হুঁ, সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে বিসদৃশ, বলে কিনা নিজের ওয়াইফের জন্যই তুমি কত চিন্তা করো, না পরোয়া করো, আর আমাদের কবি কিনা তাঁর ফ্রেন্ডের ওয়াইফের ভাবনায়—হি-হি।'

'তুমি চুপ কর নন্দ, চুপ কর।' জগত বিরক্ত হল, অন্তত নন্দর দিকে তাকানো দেখে তাই মনে হল। 'বিয়ে-থা করনি, নিজের ওয়াইফ আর ফ্রেন্ডের ওয়াইফের মর্ম বুঝবে কী। পরস্ত্রী অনেক বড়, বুঝেছ? বন্ধুপত্নী অনেক—অনেক বেশি।' নন্দ চুপ করল, আর সেই সঙ্গে, রামানন্দ দেখল না, পিছনের দিকে বাঁ-হাতটা নিয়ে জগত নন্দর পিঠে ছোট করে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিল। 'হুঁ, শুনুন রামানন্দবাবু, দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই।' মুখটাকে তখনি আবার হাসি হাসি করে ফেলল জগত। 'অপেক্ষা করুন, ওই পুতুলের দোকানের ছোঁড়াদের কেউ এসে আপনাকে নিশ্চয়ই খবর দেবে, মানে উনিই আপনাকে খবর পাঠাবেন। তখন না হয় ফেরার কথা চিন্তা করা যাবে, আমার তো মনে হয় আপনার ফ্রেন্ডের ওয়াইফ এখনি ফিরতে চাইবেন না।'

'বটে!' নন্দ বড় করে ঘাড় কাত করল। 'এত জিনিস দেখবার শুনবার রয়েছে মেলায়, হয়তো আরো কিছু কেনাকাটারও বাকি আছে আপনি মশাই সেই কখন মহিলাকে একটা দোকানে বসিয়ে রেখে এসেছেন—আমার মনে হচ্ছে কি, সন্ধ্যের দিকে একটু ঠাণ্ডা পড়লেই তিনি আপনাকে নিয়ে আর একটু ঘুরবেন। ঘোরা-ঘুরি করতে চাইবেন, শত হোক ছেলেমানুষ তো--'

'হুঁ, ছেলেমানুষ, একশবার ছেলেমানুষ', জগত ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'একেবারে ইয়াং, টেণ্ডার এজ, গায়ের রং দেখে চামড়া দেখে বেশ বোঝা গেছে।'

'না, তা ঠিক নয়।' রামানন্দ মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। অক্ষয়ের স্ত্রীকে নিয়ে এই দুটি মানুষের উৎসাহের শেষ নেই। কথার পিঠে কথা বলে চলেছে। বিরক্ত হচ্ছিল সে, একটু ক্রুদ্ধও হচ্ছিল। তা হলেও মনের ভাবটা প্রকাশ না পায়, চেহারাটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছিল। জগতের খোলা প্যাকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট তুলে ধরিয়ে নিয়ে রামানন্দ অল্প শব্দ করে হাসল। আপনারা যা ভেবেছেন ঠিক তা নয়।'

'কি ঠিক তা নয়?' এবার দুজন একসঙ্গে প্রায় হালুম করে উঠল। জগত কটমট করে তাকাল, নন্দ থুতনিটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'আপনি কি বলছেন উনি যথেষ্ট ইয়াং নন, খুবই অল্প বয়েস না মহিলার?' নন্দর দৃষ্টিটা চোখা হয়ে উঠল। জগত সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি কি আপনার ফ্রেন্ডের ওয়াইফের অ্যাক্‌চুয়েল বয়েসটা জানেন, না কি আন্দাজের ওপর এ কথা বলছেন?'

'আপনারা বয়েস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।' রামানন্দ মুখের হাসিটা নিবতে দিল না। 'আমি বলছি কি, উনি খুব একটা আর ঘোরাঘুরি করবেন না, বন্ধুটি হাস-

পাতালে, ও'র মনের অবস্থা ভাল না, আমার তো মনে হয় আমার জন্যও উনি আর অপেক্ষা করবেন না, ওই ছোঁড়া দুটোর সঙ্গে এখন ঘরে ফেরার তোড়জোড় করছেন।'

'ছোঁড়া দুটো কে?' জগত হঠাৎ পিটপিট করে তাকাল। 'পাড়ার ছেলে বুঝি, জানাশোনা? এই জন্যই ওই দোকানে ও'কে বসিয়ে এসেছেন?'

রামানন্দ মাথা নাড়ল।

'হুঁ, জানাশোনা মানে আমার ফ্রেণ্ডের পোলট্রির হাঁস-মুরগির ডিমের খদ্দের ওরা, অনেক দিন থেকে ডিমটিম নিচ্ছে।'

'হুঁ, তবে তো ভাল জানাশোনাই, খুবই পরিচিত বলতে হবে—' জগত চোখ আড় করে নন্দর দিকে তাকাল। 'বেশ ফুটফুটে চেহারা দুটিরই, তাই না নন্দ?'

'হুঁ, ফুটফুটে চেহারা, বয়েসটাও ভাল, এদিক দেখতে গেলে যেমন এদিক আছে, ওদিক দেখতে গেলে তা-ও আছে।'

'তার মানে?' যেন জগত কথাটা হঠাৎ বুঝতে পারল না. চোখ দুটো ঘোলাটে করে নন্দর দিকে তাকাল।

'তার মানে, যদি বলো যে বাঁশ, আমি বলব তাই, যদি বলো যে কঞ্চি, আমি বলব হুঁ, তাই।' নন্দ নতুন করে মাথাটা দুলিয়ে হাসল।

'আরো গুলিয়ে যাচ্ছে, নন্দ আরো গোলমাল করে দিচ্ছ', জগত রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'নন্দর কথার মাথামুণ্ড আপনি কিছু বুঝতে পারছেন রামানন্দবাবু?'

রামানন্দ আবার গম্ভীর হয়ে উঠছিল, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল। মুখের হাসিটা আর ধরে রাখতে পারছিল না।

অ্যাসিডে খাওয়া দাঁত ক'টা ছড়িয়ে দিয়ে নন্দ হি-হি করে এমনভাবে হেসে চলেছে, খাওয়া ভুলে গিয়ে খাবার ঠোঙ্গা হাতে গাঁয়ের ক'টি খদ্দেরও হাসতে শুরু করেছে। যেন শুনতে শুনতে তারা বাবুদের হাসির অর্থটা কিছুটা বুঝতে পেরেছে, দেখতে দেখতে বাবুদের কথাবার্তা কতকটা টের পেয়েছে।

'আহা, গুলিয়ে ফেলার মতন এমন কি শক্ত জিনিস বলা হচ্ছে মণ্ডল?' মেরু-দাঁড়া টান করে বসল নন্দ। 'রসিক ব্যক্তি, তায় আবার এত বড় একটা আর্টিস্ট তুমি—তুমি কি ওই দু' ছোঁড়ার নাকের তলাটা তখন ভাল করে দেখনি। যদি কেউ বলে যে জোয়ান ছেলে, গোঁফ উঠেছে দুটিরই—তুমি অস্বীকার করতে পার না, আবার যদি কেউ বলে যে, উহুঁ, গোঁফ না, শুঁয়োপোকার আঁশ ওটা, মেয়েদের নাকের নিচেও অমন ঢের ঢের আঁশ দেখতে পাবে, তোমাকে তা-ও স্বীকার করতে হবে।'

এবার গেঁয়ো খদ্দেরদের মধ্যে দু'একজন হি-হি করে হাসছিল। নন্দ অবশ্য তা গ্রাহ্য করল না।

'কাজেই, ঐ যে বললাম, বাঁশে বাঁশ, কঞ্চিতে কঞ্চি, জোয়ানও বলতে পার তুমি, এ'ড়ে বাছুরও বলতে পার, এখন রামানন্দবাবুর বন্ধুর স্ত্রী যদি ওই দু' ছোঁড়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরার মতলব করে থাকেন তো বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন, বাহন হিসেবে চমৎকার দুটি বাহন পেয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা, মেয়েরা এমন সঙ্গীই বেশি পছন্দ করে।'

কি ভেবে জগত মণ্ডল কিন্তু আর হাসল না, হঠাৎ একটা উদাস নিশ্বাস ফেলল।

'তা হলে হয়তো আপনার অনুমানই ঠিক রামানন্দবাবু, উনি ওদের সঙ্গে ফিরে গেছেন বা যাব যাব করছেন।'

রামানন্দ কথা বলছিল না।

'এক হিসেবে ভালই হল।' নন্দ আবার জগতকে একটু চোখ টিপে নিয়ে রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'আপনার আর পিছুটান রইল না, এবার পুরোপুরি আপনাকে আমরা পেয়ে যাব—কি বলো মণ্ডল, রামানন্দবাবুকে নিয়ে মেলার আনন্দটা এখন ষোল আনা ভোগ করা যাবে।'

'হুঁ; সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' জগত মণ্ডল হাসল না, আবার খুব একটা গম্ভীর হয়েও থাকল না। 'আপনার বন্ধুপত্নীকে নিশ্চিন্ত মনে ছোঁড়াদের সঙ্গে ফিরে যেতে দিন। ভালই হল। ঘরের কাজকর্ম আছে ও'র, রান্নাবান্না আছে, গেরস্থ ঘরের গিন্নীদের রাত করে বাইরে থাকলে চলে? আমরা আমাদের আনন্দ শেষ করে ধীরেসুস্থে এখান থেকে ফিরব।'

একটা শুকনো ঢোক গিলল রামানন্দ। ফ্যাকাশে চোখ করে দোকানের বাইরেটা দেখল।

'কতক্ষণ আপনারা থাকবেন ঠিক করেছেন! আমার তো মনে হয় অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে, তেমন আর কি-ই বা দেখার রইল এখানে!'

'আপনি অবাক করলেন রামানন্দবাবু, আপনার কথা শুনে আমাদের কাঁদতে ইচ্ছে করছে।' নন্দ তার ছুঁচলো মুখটা সরু করে ফেলল। 'আমাদের তো বায়োতেয়ো বয়েস নেই যে মেলায় এসে বাঁশী কিনব, পুতুল কিনব, ডুগডুগি কিনব, চিনির মঠ, ফুটকলাই কিনে খাব, তারপর নাগরদোলায় চেপে আহ্লাদে আটখান হব। বুড়িয়ে গিয়ে যে আমরা অনেক পাপ করে ফেলেছি মশাই।'

'হুঁ, তাই তো।' নন্দর কথা শেষ না হতে জগত চোখ নাচাল। 'মেয়েছেলে হলেও কথা ছিল। ধামা, কুলো, ধুচনি, পিঁড়ি, কলসী, হাঁড়ি কেনার পর ফিতে, কাঁটা, তেল, সাবান, আলতা, টিপ কিনতে সব ক'টা দোকান চষে ফেলতাম, কেনা-কাটা শেষ করেও নাচুনি কমত না, বলে কিনা বছরের একটা দিন চড়কের মেলায় আসা, খোঁয়াড়ের বাইরে এলে গাই, ছাগী কেমন করে দেখেননি? বুড়ি, ছুঁড়ির এক হাল।'

'হুঁ, জগত থামতে নন্দ বলল, 'কেনাকাটা হয়ে যাবার পরেও ধুলো খেয়ে ঝাঁক বেঁধে চারদিকের তামাসা দেখতে ঘুরঘুর করতাম, এভাবে কি এক জায়গায় চুপচাপ বসে কেবল কচুরি জিলিপি খেতাম!'

'বলে কি কচুরি জিলিপি, আমরা যে অন্য রসের রসিক রামানন্দবাবু।' ঝপাং করে দাঁড়িয়ে পড়ে নন্দ প্যাণ্টের পকেট থেকে চমৎকার লেবেল আঁটা চকচকে একটা শিশি বের করল। শিশিও বলা যায় পাঁইটও বলা যায়।

বামানন্দর চোখ গোল হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে মুখে একটা মদির হাসি ফুটিয়ে তুলতেও সে ইতস্তত করল না।

'বুঝেছি, বুঝেছি—' জগতের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে আড় চোখে চারদিকের খদ্দেরদের দেখে নিয়ে রামানন্দ নন্দর দিকে মুখ ফেরাল। 'ওটা এক্ষুনি পকেটে ঢোকান, পকেটে ঢোকান, হাঁ করে সব কেমন দেখছে দেখুন।'

নন্দ গোঁফ নাচিয়ে হাসল। মাথা ঝাঁকাল।

'না স্যার, বিলিতি জিনিস, দিশি পাঁইট হলে চট করে ধরে ফেলত—গাঁয়ের মানুষেরা ভাবছে ওষুধটষুধ কিছু। হেয়ার লোশন ধরে নিতেই বা ক্ষতি কি।'

' জগত ঘাড় বেঁকিয়ে কটমট করে নন্দকে দেখল। 'তাই তো বলি নন্দ, তুমি আজও জনগণকে চিনতে পারনি, কাজেই তোমাকে দিয়ে গণসাহিত্য কোনোকালেই হবে না। বলে কিনা হেয়ার লোশন, ওষুধ—হুঁ, যার নাম সুরা, বাংলা কথায় যাকে বলা হয় মাল, শিশির নমুনা দেখেই সব বুঝে গেছে। বলছ বিলিতি

লেবেল। ওতে কিছু আটকায় না যে চাঁদ। উপমা দেবো? স্কার্ট পরাও, শাড়ি পরাও, বর্মী লুঙ্গি, স্ল্যাক্স কি যোধপুরী যে-পোষাক দিয়েই বরতনু ঢেকে রাখ না কেন, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই থাকে। বলছ গাঁয়ের লোক—শালা বোবা, কালা, অন্ধ, খঞ্জও সাত হাত দূর থেকে বলে দেবে এটি কে, এটা কী।'

একটা হাসির হল্লা উঠল। শালপাতার ঠোঙ্গা হাতে মানুষগুলি পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। 'বাবুরা আছেন বেশ!' চাপা গলার একটা গুঞ্জনও শোনা গেল সেই সঙ্গে।

নন্দ চট করে শিশিটা পকেটে ঢোকাল।

'তবে চলুন নিরিবিলি কোনো গাছতলায়।'

'এখানে গাছের অভাব কি—খুঁজলে বেণুকুঞ্জ পাওয়া যাবে।' রামানন্দর গলার স্বর ঝরঝরে হয়ে গেল। কে বলবে অক্ষয়ের স্ত্রীর ঘরে ফেরা নিয়ে এতক্ষণ নানা-রকম দুশ্চিন্তায় ভুগছিল এই মানুষ, নন্দর পকেটে মদ দেখে তার গায়ে যেন হাওয়া লেগেছে।

দোকানের বাইরে এসে জগত ও নন্দ গাল ছড়িয়ে একটু হাসল।

।। ২৪ ।।

'কিছুই হল না কিন্তু নন্দবাবু।'

'হবে হবে, হওয়াচ্ছি—জগত!'

নন্দর ডাক শুনে জগত মণ্ডল ঘাড় তুলল। রামানন্দ দেখল মণ্ডলের হাতে একটা কিছু রয়েছে। যেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে মুখ নামিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখছে। মাথার ওপর এক রাশ পাতা নিয়ে গাছের ডালটা ঝুলে আছে। পাতার ফাঁক দিয়ে তারা জ্বলজ্বল করছে। বালুর ওপর শুইয়ে রাখা শূন্য শিশিটা মাঝে মাঝে চিকচিক করছে।

'এখন রাত ক'টা?' জগত নন্দর দিকে চোখ রাখল।

'ক'টা আর হবে, আটটা সওয়া আটটা।' নন্দ সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালল। 'রামানন্দবাবুর যে কিছুই হল না।' সিগারেট ধরিয়ে নন্দ বালুর ওপর পা ছড়িয়ে বসল।

'হবে, হওয়াচ্ছি—' জগত মাথা ঝাঁকিয়ে একদিকে ঘাড় ফেরাল। 'এখনো ম্যাজিক চলছে, সার্কাসের খেলা চলছে, বাঁশি বাজছে, এন্তার ডুগডুগির শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

'হুঁ, মেলা থাকবে, আমার তো মনে হয় সারারাত মেলা চলবে, মেলার জন্যে ভাবনা কি।'

নন্দর দেখাদেখি রামানন্দ বালুর ওপর দু পা এক সঙ্গে টান করে মেলে দিল। 'এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বারোটা শাদা ঘোড়া ঘুরছে, নাগরদোলা শূন্যে পাক খাচ্ছে, দুলছে দুলছে।'

'আমাদের কিন্তু ঘোড়ায় চড়া হল না জগত!' নন্দ হি-হি করে হাসল।

'হবে, হবে', জগতের আগে রামানন্দ কথা বলল, 'ঘোড়ায় চড়া হবে, নাগর-দোলায় চাপা হবে, আমরা তিনজনে পাঁচ টাকা খরচ করব ঘোড়ায় আর নাগর-দোলায়।'

'উঁহু, দশ টাকা।' জগত গলা চড়িয়ে দিল। 'আমি দেবো টাকা।'

'সে তো জানি, সারারাত যখন মেলা আছে, আমরা দশবার করে ঘোড়ায়

চাপব, নাগরদোলায় ঝুলব, কিন্তু রামানন্দবাবুর যে ছাই কিছুই প্রায় হল না।'

'হবে হবে। সবে তো কলির সন্ধ্যে।' জগত ঘাড় নুইয়ে আবার দু' হাতের তেলোয় ধরা গোলমতন পাত্রটা খুঁচিয়ে দেখতে লাগল।

নন্দ বিরক্ত হল।

'আচ্ছা, ওটা নিয়ে তুমি এমন মেতেছ কেন আমায় বলতে পার?—রামানন্দবাবু, আমরা যদি বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করি, মালটাল কখন জোগাড় করা হবে বলতে পারেন—আপনি বিবেচনা করুন, মণ্ডলের কাণ্ডজ্ঞান একটু কম কিনা।'

'আর আমি যে ব্যাঙের ফুটো খুঁজে পাচ্ছি না।' জগত গজগজ করে উঠল। 'কুড়ি নয়া খরচ করে জিনিসটা কিনলাম, এখন দেখছি ফুটো নেই।'

'হা-হা-হা', রামানন্দ বড় করে হাসল। 'আপনি বলছেন ব্যাঙ, ও বেটা বলছিল লক্ষ্মীঘট—তা যাই বলা হোক, ঘটে ছিদ্র না থাকলে আপনার ওয়াইফ যে বেদম বকুনি লাগাবে মশাই।'

'আমি তখনি বললাম, দরকার নেই মণ্ডল, দরকার নেই ওটা কিনে—কুড়িটা নয়া জলে ফেলা হবে—কেমন, এখন হল কিনা!'

'তুমি ভয়ানক বেরসিক নন্দ', জগত রুষ্ট হয়ে ঘাড়টা সোজা করল। 'তোমার ভেতরে আত্মা বলে কিছু নেই।'

'এই দ্যাখো, একেবারে আধ্যাত্মিক মার্গে বিচরণ আরম্ভ করলে—আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা।' নন্দ রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'আপনিও শুনলেন, কত বড় একটা কথা বলে দিলে জগত। 'আমার আত্মা নেই, আমি রোবট।'

'না না না, সে একটা কথা নাকি!' রামানন্দ মৃদু হাসল।

'হুঁ, এক হিসেবে আমি তাই—' নন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'মণ্ডল ঠিকই ধরেছে, আমার আত্মাটাত্মা যা ছিল কুচিকুচি করে কেটে সাবাড় করেছি—তা না হলে পরের আত্মা ঘাঁটাঘাঁটি করতাম কেমন করে, আমাকে যে গল্প লিখতে হয়, আত্মা থাকলেই আত্মদর্শন, তার মানে নানারকম জ্বালা অশান্তি অস্বস্তি ভোগ—কিন্তু সেসব আমি চাইছি না, একেবারে চোখ বুজে থাকতে পারছি নিজের দিকে। বাবা ব্যাঙ্কে এত টাকা রেখে গিয়েছিল সব শেষ করে এনেছি, আমার কোনো গল্পের বই বাজারের মুখ দেখল না—বয়ে গেল, তবু কেমন দরাজ হাতে মেজাজ নিয়ে গল্প লিখে চলেছি। হুঁ, আর দশটা মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণার গল্প, তাদের পেটের জ্বালা, কামজ্বালা, কিছু হতে পারার জ্বালা, কিছু না হতে পারার জ্বালা—নিজের জ্বালার দিকে চোখ কান থাকলে এসব কখন হতো বলুন রামানন্দবাবু!'

'আহা রে, নতুন কথা শোনাচ্ছে আমাদের নন্দদুলাল, চুক্ চুক্ চুক্।' তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে চমৎকার আওয়াজ বের করল জগত। 'যেন আমরা এসব শুনিনি, জানি না। —রামানন্দবাবু!'

'বলুন!' রামানন্দ একটা হাই তুলল।

জগত গলার নিচে হাসল।

'মেলায় এসে আলতা কিনলাম না, সাবান কিনলাম না, স্নো-ক্রিম-পাউডার, চুলের কাঁটা, হাঁড়ি-কুড়ি, খন্তা, বারকোশ, ধামা, কুলো, বাঁশী খেলনা—কিচ্ছু না, সাধ করে বউয়ের জন্য কেবল এই একটা জিনিসই কিনে নিয়ে যাচ্ছি, তা-ও কিনা নন্দ বাদ সাধছে।'

'আহা, কিনেছ বেশ করেছ, তা বলে ওটা নিয়ে বসে থাকবে!' নন্দ খিঁচিয়ে উঠল। 'এইটুকুন মাল তো পকেটে করে এনেছিলাম, তিনজনে মিলে দু'চার ফোঁটা করে গলায় ঢেলেই শেষ, তাতে কিছুই হল না—আমার না, তোমার না, রামানন্দ-

বাবুর না, আর তুমি কিনা নিশ্চিন্দি বসে—'

'হুঁ, বউয়ের জন্য ব্যাঙ্ক কিনেছি থুড়ি লক্ষ্মীঘট, তা ওটার গায়ে যদি ছিদ্র না থাকে মন খারাপ করব না! আপনি বলুন রামানন্দবাবু।'

'সেই এক কথা, ঘটে ছিদ্র নেই, ফুটো নেই!' নন্দ নাক দিয়ে একটা বিশ্রী শব্দ করল। 'আরে বাবা, তোমার গিন্নী কি ছিদ্র করতে জানে না, ফুটো কাকে বলে চেনে না! মাটির জিনিস, খন্তা কি কাটারির মাথা দিয়ে একটু ঠুকলেই তো একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ে।'

'তাই তো বলি নন্দ, আম্মাটাকে না হয় কুচিয়ে কেটে সাবাড় করেছ, তাই বলে ভেতরের রসটুকু ঝেড়েঝুড়ে নিংড়ে বের করে দেবে—এটা কিন্তু ঠিক না।'

'কি রকম?' নন্দ যে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতন চেহারা করল অন্ধকারেও সেটা বেশ বোঝা গেল, ভুরু কুঁচকে সে জগতের মুখটা দেখল। 'তোমার বউয়ের লক্ষ্মী-ঘটের ছিদ্রের সঙ্গে আমার রসের কী সম্পর্ক!'

'হা-হা-হা!' জগত এত জোরে হাসল, যেন এই জন্যই ওপর থেকে ঝুরঝুর করে ক'টা শুকনো তেঁতুলপাতা তিনজনের মাথায়, কাঁধে ছড়িয়ে পড়ল। 'এই ছিদ্রের মধ্যেই তো যত রস ব্রাদার, তা না হলে আর আমি এই নিয়ে মাথা ঘামাই।'

'কি রকম!' এবার একটা কৌতূহল নিয়ে নন্দ বড় করে ঢোক গিলল।

'তার মানে, গিন্নীকে যদি কাটারি, খন্তা দিয়ে এটা ফুটো করতে দেওয়া হয়, তবেই মুশকিল, ফুটো করতে হবে আমাকে, বুয়েছ চাঁদ।'

জগত আর হাসল না। নন্দ চুপ। রামানন্দ আবার একটা হাই তুলল। মাটির ঘটটা এবার শূন্যে তুলে ধরল জগত, তারপর নন্দর দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল।

'তার মানে এমন কায়দা করে আমাকে ছিদ্রটা করতে হবে যাতে টুকুসটাকুস করে বউ এর মধ্যে সিকিটা, আধুলিটা ফেলতে পারে, আর আমিও যাতে, হুঁ, শ্রীমতী যখন বাথরুমে ঢুকেছে কি কাজে বেরিয়েছে, ঠুকুসঠাকুস নাড়া দিয়ে এই ভাণ্ডার থেকে দুটো চারটে মুদ্রা বের করে আনতে পারি।'

এবার রামানন্দ হাসল। নন্দও হাসল।

'খচ্চর, মণ্ডল তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি খচ্চর, আমার বাবার তেজারতী কারবার ছিল, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা রেখে গিয়েছিল, তাই ভেঙে খেয়ে সাহিত্য করছি, আর তুমি কিনা শালা শিল্পকর্ম করছ আর ওদিকে বউয়ের রক্ত-জল-করা জমানো পয়সা চুরি করে—'

'হুঁ, তাই তো', জগত এবার দাঁত ছড়িয়ে হাসল। তার মানে আমি তোমার চেয়েও বেশি রোবট, হি-হি-হি, তবে কিনা নন্দলালের মতন আমি বেরসিক নই, কি বলেন, রামানন্দবাবু।'

'না, তা তুমি নও', রামানন্দ কিছু বলার আগে নন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'হাজার-বার স্বীকার করছি, এদিক থেকে তোমার রস অনেক বেশি, তুমি ঢের বেশি জীয়ন্ত, বউয়ের রোজগারের কড়ি চুরি করতে ওস্তাদ—এখন গলাটা একবার ভেজাবার ব্যবস্থা করো তো।'

'করব, করব, নাওভাঙার মেলায় এসে শুকনো গলা নিয়ে তোমরা ফিরে যাবে, উঁহু, অন্তত জগত মণ্ডল যতক্ষণ সঙ্গে আছে—' মণ্ডলের কথা থেমে গেল। রামানন্দ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখটা উত্তর দিকে ঘোরানো।

'কি দেখছেন মশাই—' বলতে বলতে নন্দও সেদিকে গলা উঁচু করে ধরল। নন্দর দেখাদেখি জগত। মেলার রোশনাই ঠিক ততটা দূরে পৌঁছয় না, তা হলেও বোঝা যায় ওপাশের মেছোভেড়ির পাড় ধরে ধরে তিনটা মূর্তি উত্তরমুখো হয়ে হাঁটছে। মাঝেরটি মেয়েছেলে, আগে পিছনে দুটি বেটাছেলে—দুটি কিশোর,

মাথায় বড় বড় বোঁচকা।

'ওরা ফিরে যাচ্ছে', নন্দ চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনার বন্ধুর গিন্নী আর সেই দুই ছোঁড়া।'

'হুঁ, তাই তো', জগত একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ কথা বলল না। তারপর রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'কেমন, আমি বলিনি মশাই? গিন্নীরা একবার খোঁয়াড়ের বাইরে এলে, তখনি আবার সেখানে ফিরতে চায় না। দেখুন, কত রাত করে উনি ঘরে ফিরছেন।'

'তাই তো, অল্প বয়েস, তার ওপর চারদিকে মেলার এত রং-তামাসা, চট করে সব ফেলে রেখে—তা ছাড়া, ঐ যে বলেছি, বাঁশ বলতে বাঁশ, কঞ্চি বলতে কঞ্চি—চমৎকার দুটি সঙ্গী জুটেছে—' নন্দ হি-হি করে হাসল।

'চলুন, রামানন্দবাবু।' জগত ঝপ করে উঠে দাঁড়াল। 'পা চালিয়ে গেলে ওদের ধরতে পারব, একসঙ্গে ফেরা যাবে।'

'রাখুন মশাই, এখুনি ফিরব!' রামানন্দ আগের মতন মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। 'এদিকে কিছুই হল না, দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি যে মরুভূমির জ্বালা বাড়িয়ে দেয়, আপনাকে কি তা নতুন করে বোঝাতে হবে নন্দবাবু?'

'হুঁ, তা-ও বটে।' নন্দ ঘাড় কাত করল। 'পকেটে করে যেটুকু আনলাম, গলায় ঢেলে জ্বালাই শুধু বাড়ল, তেষ্টা বেড়ে গেল।'

'বসুন।' জগতের হাত ধরে কেমন যেন জোর করে রামানন্দ তাকে বালুর ওপর বসিয়ে দিল। জগতের ঘাড় তখনও ডোঙির দিকে ফেরানো। নন্দও হাঁ করে তাকিয়ে ঝাপসা মূর্তি তিনটা দেখছে। 'ওরা যাচ্ছে চলে যাক, তা বলে আমরা আমাদের আনন্দ নষ্ট করব কোন্ দুঃখে। দেখি দেখি. আপনার হাতের ঘটটা।'

জগত বুঝতে পারল কিনা বলা মুশকিল, নন্দও কি তলিয়ে জিনিসটা দেখল, ওদিক থেকে এদের মনোযোগটা এদিকে সরিয়ে আনতে যেন রামানন্দ কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'বাঃ! ভারি সুন্দব করেছে জিনিসটা।' মাটির পাত্রটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে রামানন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'আলোর সামনে তখনি দেখেছিলাম, লতা-পাতা আঁকা চমৎকার লক্ষ্মীঘট তৈরী করেছে লোকটা। সাইজটাও সুন্দর গোল, অথচ ঠিক গোল না, সামান্য চেপ্টা মতন, উল্টে ধরলে মনে হবে অবিকল বেল ফল।'

'কি বললেন. কি বললেন!' নন্দ আগে ঘাড় ফেরাল। তারপর জগত।

'বিল্বফল, দেখি দেখি! আমার তো মাথায়ই আসেনি।' রামানন্দর কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নেওয়ার মতন করে নন্দ ঘটটা তৎক্ষণাৎ হাতে তুলে নিল। 'হুঁ, তাই তো, অবিকল তাই। ঠিকই বলেছেন রামানন্দবাবু।' নন্দ হো-হো করে হাসল।

'দেখি দেখি!' এবার জগত হাত বাড়াল। 'বাঃ, চমৎকার, ঐ যে বলে বিল্ব-স্তনী, এমন এক জোড়া হলেই হয়েছিল আর কি, এই মাত্র তো সেই জিনিসই আহা, দূর থেকে অন্ধকারেও পরিষ্কার বোঝা গেছে।'

'হুঁ', নন্দ থুঁতনি ঝাকাল। 'জগত কারেক্ট, আমারও চোখে লেগে রয়েছে রামানন্দবাবু, আপনার বন্ধুপত্নীর ওই দুটি সম্পদ, বড় সুন্দর, পরিষ্কার ছিম্-ছাম একজোড়া বেল—বিল্বস্তনী, দারুণ বর্ণনা দিয়েছ জগত!'

'সাধে কি আমি তখন বলেছিলাম, প্রথম দর্শনেই আমার হাত নিশপিশ কর-ছিল, হুঁ, কেবল কি কুচযুগল, তার সব সুন্দর, শ্রোণীভারে অলসগমনা, চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা, নিম্ননাভি, স্তোকনম্রা ক্ষীণ মধ্যমা—ফলে ডমরু সদৃশ গড়ন, বুঝলেন রামানন্দবাবু, এই ছবি আমি আঁকব, এতক্ষণ ওদিকে আবার তাকিয়ে তাই দেখছিলাম, এই মূর্তি আমার তুলির আগায় ধরে রাখতে না পারলে আমি

স্রেফ মরে যাব। উঠুন, চলুন, বলেছি তো, আমার পরিচিত মানুষ মেলায় এসেছে, দেখলাম, পাঁঠার ঘুগনির দোকান সাজিয়ে বসেছে তারাপদ। ওই হারামজাদা চোলাই রাখে। তখন বেটা ব্যস্ত ছিল, এখন ভিড় কমেছে, তিনজনে বেশ খানিকটা করে গলায় ঢেলে হাঁটা আরম্ভ করব, বেশিদূর এগোয়নি ওরা, তা ছাড়া মেয়েছেলের হাঁটা, আমরা ঠিক ধরতে পারব—'

'হুঁ, সেই ভাল', রামানন্দর কাঁধ ধরে নন্দ মৃদু ঝাঁকুনি দিল। 'এখনি উঠে পড়া যাক, এভাবে অন্ধকারে তেঁতুলতলায় বসে থাকার কোনো মানে হয় না। তারপরে চোলাই গিলে তৈরি হয়ে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করি।'

রামানন্দ নড়ছিল না। গুম্ হয়ে রইল।

'বুঝলে জগত', নন্দ জগতের দিকে চোখ রেখে দাঁত ছাড়িয়ে হাসল। 'তুমি আঁকবে, আমি লিখব, তখন থেকে আমার হাত চুলবুল করছে, এমন মনোহারিণীকে নিয়ে যদি গল্প লেখা না হল তো সারাজীবন করলামটা কী—রামানন্দবাবু!'

'খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবেন না।' রামানন্দ ফোঁস করে উঠল। 'আর একটা মানুষের বিয়ে-করা বউ, তার জন্যে আপনাদের লোভের শেষ নেই, তখন থেকে মহিলাকে নিয়ে আপনারা মেতে আছেন, তাঁকে নিয়ে ছবি আঁকবেন, তাঁকে নিয়ে গল্প লেখা হবে—এ সবের অর্থ কী!'

'আর একটা মানুষ মানে আপনার ফ্রেণ্ড, হুঁ, হাসপাতালে শুয়ে আছে, আপনি বলেছেন, ইনি আপনার ফ্রেণ্ডের ওয়াইফ, আপনি আমাদের বন্ধু, এই হিসেবে কি একবার আমরা ও-বাড়ি যেতে পারি না? আপনি এত চটছেন কেন!'

নন্দ শেষ করতে জগত ঠাণ্ডা গলায় হাসল। 'একটু পরিচয় করা, আর কিছু না, মানুষটাকে আর একটু ভাল করে দেখা, তার ঘরদোর. উঠোন, রান্নার জায়গাটা কেমন, আমাদের কি জানতে দেখতে ইচ্ছে করে না! এই জন্যই যাওয়া, চলুন।'

'আমরা কি আপনার বন্ধুপত্নীর বিছানায় বসে গল্প লিখব, না তাকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকা হবে! আপনিও যেন কেমন।' হাসি চেপে রাখতে পারছিল না নন্দ, যে জন্যে তার গোঁফটা জোরে নড়াচড়া করছিল. ভিতরের হাসির তোড়ে থুঁতনিটাও কাঁপছিল, আবছা অন্ধকারে রামানন্দ জিনিসটা তেমন টের পেল না। তা না হলে যেমন বিরক্ত হচ্ছিল সে, ক্রমশ রেগে যাচ্ছিল, হয়তো নন্দকে ঘুষিটুষি বসিয়ে দিত।

'হুঁ, জগত আগের চেয়েও ঠাণ্ডা নরম গলায় হাসল। 'প্রথম দর্শনেই তিনি আমাদের চিত্তপটে আঁকা হয়ে গেছেন—আমার, নন্দর—দ্বিতীয়বার আর না দেখলেও সেই অনবদ্য মূর্তি আমরা তুলির টানে, কলমের আগায় হুবহু ফুটিয়ে তুলতে পারব। তবে কিনা ওখানে যাওয়া মানে মহিলার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া, উঁহু, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, যে ইমপ্রেশন যে ইনটিউশন, অথবা বলতে পারেন মানুষটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ইনস্পিরেশন আমরা পেয়ে গেছি—আমি ঠিক সাহিত্যিক না, অ্যাকিউরেট শব্দটা এখানে বসাতে পারছি না যদিও—ও, হ্যাঁ, এবার এসে গেছে, ইমেজ, যথার্থ শব্দ, তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা আমরা আমাদের ইমেজকে আর একটু প্রখর, আরও ঘনীভূত করতে চাইছিলাম, বুঝেছেন রামানন্দবাবু—'

'উঁহু, উঁহু', রামানন্দ জোরে মাথা নাড়ল, 'আমি চাই না কেউ তাঁর ছবি আঁকুক, কেউ তাঁকে নিয়ে গল্প লিখুক। আপনারা এসব আইডিয়া ছেড়ে দিন।'

জগত চুপ। নন্দ কথা বলছিল না। আসন ছেড়ে উঠে রামানন্দ রীতিমতো পায়চারি করতে লাগল, সেই সঙ্গে মাথাটা বার বার ঝাঁকাচ্ছে, যেন নাটক করছে,

অভিনয় করছে, গলার স্বরটাকেও রামানন্দ সেরকম গম্ভীর গমগমে করে তুলল।

'মশাই, আপনারা কি ভার্জিন সয়েল বলে কিছু রাখতে চাইছেন না, তুলি দিয়ে কলম দিয়ে খুঁচিয়ে ঘেঁটে সব কিছু নোংরা করবেন, অবাক কাণ্ড—'

'হুঁ হুঁ, ভার্জিন সয়েল!' নন্দ গোঁফ নাচাল। রামানন্দ না দেখতে পায়, মুখটা ফিরিয়ে একটু হেসে নিল।

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।' জগতেরও হাসি পাচ্ছিল, তা হলেও চেহারাটা সে গম্ভীর করে রাখল। 'নোংরা' শব্দটা এখানে খুবই আপত্তিকর।'

'হুঁ, বলেছি তো নোংরা—আপনাদের ওই নোংরা শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে এই মহিলা না; কলকাতা শহরে ঢের ঢের মেয়ে পড়ে আছে, মহিলা ছড়িয়ে আছে—আপনারা সেখানে খোঁজ-খবর করুন।'

রামানন্দ হাঁটতে আরম্ভ করল।

'চলে যাচ্ছেন! শুনুন শুনুন!'

রামানন্দ পিছনে তাকাল না। নন্দ জগতের পিঠে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল। 'চলো এগোনো যাক, বেজায় ক্ষেপে গেছে দেখছি রামানন্দ সেন।'

জগত ও নন্দ কাঁধ মিলিয়ে পিছে পিছে এগোতে থাকে।

'কি বলুন, আর কি বলার আছে শুনি!' দুজন পিছু নিয়েছে টের পেয়ে রামানন্দ তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

এবার রামানন্দ যাতে দেখতে পায়, ছুঁচলো থুঁতনিটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নন্দদুলাল হি-হি করে হাসল। তা ছাড়া একটা টিমটিমে আলোও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, ফলে নন্দর হাসি দেখতে রামানন্দর কোনো অসুবিধা হল না। এত বড় একটা টিনের বাক্স কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে মানুষটা। তার পায় ঘুঙুর বাজছে। একটা কমজোরী ছোট্ট ল্যাম্প বাক্সটার সঙ্গে কায়দা করে আটকান।

'এই যে তারাপদ এসে গেছে!' জগতের গলা ভরে উঠল। নন্দর চোখ চকচক করতে লাগল। রামানন্দর তেমন কোনো ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে বলে বোঝা গেল না, তবে হাঁটা বন্ধ করল। জগত লোকটার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'বড্ড দেরি করে ফেললে হে—'

'কি করব, ওদিকের খদ্দের ফেলে আসতে পারি না।'

'আমরা কিন্তু তোমার পাঁঠার ঘুগ্‌নিও একটু একটু করে মালের সঙ্গে খাব? নন্দর গলায় যেন খুশি উপছে পড়ছিল। 'আমাদের জন্যে রেখেছ তো, না কি সব বেঁচে দিয়ে এলে।'

'না না।' তারাপদ হাসল।

'বের করো, আগে আসল জিনিসটা বের করো।' জগত আঙুল দিয়ে টিনের বাক্সটা দেখাল। তারাপদ দু-একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলল।

'বেশ ভাল জায়গায় মাল রেখেছ তো!' নন্দ উঁকি দিয়ে বাক্সের ভিতরটা দেখল।

'পুলিশের উৎপাত, বোঝেন তো।' তারাপদ বিড়বিড় করে উঠল, 'ঘুগ্‌নির সঙ্গেই লুকিয়ে আনতে হয়।'

'ভাল জিনিস এনেছ কিনা কে জানে?' তারাপদ জগতের হাতে কালো মতন একটা বোতল তুলে দিতে জগত সঙ্গে সঙ্গে ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকল।

'বলছেন ভাল জিনিস কিনা, পাগলাডাঙার হারানের নিজের হাতের তৈরী। হারানের চোলাই একবার যে খেয়েছে, সে কি আর এই জীবনে ভুলতে পারে।' তারাপদ দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

'দাও, গেলাস-টেলাস একটা কিছু দাও।'

তারাপদ একটা অ্যালুমিনিয়মের গেলাস বের করে জগতের হাতে তুলে দিল।

'আসুন রামানন্দবাবু!' জগত আদর করে ডাকল।

'আপনারা খান, আমি খাব না।'

'কেন বলুন তো!' হাসি থামিয়ে নন্দ প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মতন চেহারা করল। ইচ্ছা করেই, বোঝা যায়, এমন একটা ভঙ্গি করল। 'এতক্ষণ খাব খাব করছিলেন।'

'তার মানে আপনি রাগটা ভুলতে পারছেন না।' হাতেব গেলাসটা রামানন্দর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জগত হাসল। 'এ সময় রাগ কবতে নেই, গলায় ঢেলে ফেলুন।'

'আমার মেজাজ নেই খাবার—আপনারা খান।'

'প্লিজ, এমন করলে আমরা মনে খুব দুঃখ পাব রামানন্দবাবু।' নন্দ রীতিমত হাতজোড় করল।

'আপনি ভুল করছেন কবি, মেজাজ নেই বলেই তো এই জিনিস গলায় ঢালা, অমৃত খেয়ে মেজাজ ফিরিয়ে আনুন।' জগৎ এবার হাসল না। কড়া করে কথাটা বলল।

'হুঁ, খেয়ে নিন, তারপর যতখুশি আমাদের ওপর রাগ করুন, আমরা কিচ্ছু বলব না।'

'কী মুশকিল', যেন দারুণ অনিচ্ছায় রামানন্দ হাত বাড়িয়ে জগতের হাত থেকে গেলাসটা তুলে নিল।

'ঘুগনি বের কর, ঘুগনি বের কর হে।' তারাপদর কানের কাছে মুখ নিয়ে নন্দ চেঁচিয়ে উঠল।

'সিগারেট ধরান, সিগারেট ধরিয়ে ফেলুন একটা।'

সবটা এক সঙ্গে গিলে মুখটা বিকৃত করে রামানন্দ শূন্য গেলাসটা জগতের হাতে ফিরিয়ে দিতে জগত তার হাতে সিগারেট তুলে দিল। রামানন্দ ঘুগনি মুখে দিল না, জগতের দেওয়া সিগারেটটা ধরাল। 'খুব কড়া।'

'সিগারেট?'

'উঁহু, মাল।'

'হবেই তো, ভাল চোলাই, তার ওপর র খাওয়া হচ্ছে।' এক গাল হেসে জগত এবার গেলাস ভরে বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিল। নন্দর তখন কথা বলার সময় নেই। শ্বাস ফেলার সময় নেই। উপুড় করে সবটা গলায় ঢালল। এবার জগত নিজের জন্য গেলাস ভরল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোতলটা শেষ করে তিনজন আবার হাঁটতে আরম্ভ করল।

'রামানন্দবাবু, কেমন লাগছে!'

'ভাল, আমার মনে আর কোনো গ্লানি নেই। মাইরি বলছি, একেবারে ঝরঝরে লাগছে।'

'বলিনি আপনাকে? অমৃতের গুণ!'

'আর একটু হলে ভাল হতো।'

'আর বেশি আনতে পারেনি তারাপদ, ঘুগনির বাক্সে লুকিয়ে যেটুকু এনেছে।'

'কাল আবার আনবে, কালও আমরা মেলায় আসব। আপনি আসছেন তো!'

এক সেকেন্ড নন্দর দিকে মুখটা ঘুরিয়ে রেখে রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'হুঁ নিশ্চয়, আসতেই হবে, কোথাকার চোলাই জানি বলল, হ্যাঁ, পাগলাডাঙার, এর লোভেই আসতে হবে। ওয়াণ্ডারফুল জিনিস! হেই তারাপদ!'

'থাক, ওকে আর ডাকতে হবে না, আমি বলে দিয়েছি, কাল আবার নিয়ে

আসবে!' একটু চুপ থেকে জগত পরে রামানন্দর মুখের কাছে মুখটা সরিয়ে নিল। 'ও'রা আসবেন তো?'

'কে, মাধুরী? আসতেই হবে, আমি মেলায় এলে ওরা সবাই আসবে, শফী আসবে, পুতুল নিয়ে ওই ফরসা ছোঁড়াটা আসবে।' রামানন্দ আস্তে বলল না, তার গলায় একটা ফুর্তি ঢেউ খেলে উঠল।

'হু', ওরা তো আসবেই, কাল আবার পুতুলের দোকান খুলে বসবে, আপনার ফ্রেন্ডের ওয়াইফ, কি নাম বললেন? মাধুরী, চমৎকার নাম, ও'কে কিন্তু আপনি অবশ্য অবশ্যই সঙ্গে আনবেন।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়', রামানন্দর পা টলছিল, 'আমি এলে মাধুরী না এসে পারবে না, একেবারে ছেলেমানুষ, দেখেননি? মেলার নামে যাকে বলে উন্মাদ।'

'হি-হি, আমি বুঝতে পেরেছি, মেলা ও'র খুব ভাল লাগে, আমি চোখ দেখে বুঝে ফেলেছি,—আহা, কী চোখ, তখন মনে হচ্ছিল বুনো হরিণী সামনে দাঁড়িয়ে!' জগতের পা বেশী টলছিল। 'চলুন একটু জোরে হাঁটি, ওরা বেশী দূর এগোয়নি।

'কিন্তু ব্রাদার, আপনি একটা বড় আর্টিস্ট', রামানন্দ হঠাৎ গলা চড়িয়ে দিল। মাঠের চৌহদ্দি পার হয়ে রাস্তার পাশে প্রায় একটা লাইটপোস্টের নিচে চলে এসেছে তিনজন, বোঝা যাচ্ছিল রামানন্দর চোখ এখন কেমন টকটকে লাল, লাল এবং জগতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে চোখ দুটো আলুর মতন গোল হয়ে উঠল। 'শুভেন্দুদের মুখে শুনেছি, খুবই উ'চুদরের শিল্পী আপনি, সেই হিসেবে তরুণরা আপনাকে দারুণ রেসপেক্ট করে, তরুণীরা সম্মান করে—সেই হিসেবে যদিও আমার বয়েস হয়েছে, তা হলেও আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করি, সুতরাং নিজের সম্মান নিজের মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয়, আশা করি, আপনি সেভাবেই চলবেন।'

'সম্মান নষ্ট হওয়ার মতন মণ্ডল কি করল শুনি?' জগত ও রামানন্দর মতন নন্দর কিন্তু মোটেই পা টলছিল না, বোঝা যায় অনেক টেনেও সে মোটামুটি শক্ত সোজা হয়ে পা ফেলতে জানে। রামানন্দর দিকে থু'তনিটা তুলে ধরে কটমট করে তাকাল। 'কথাটা একটু বুঝিয়ে বলুন স্যার।'

কিন্তু নন্দর দিকে রামানন্দ মোটেই তাকাল না, জগতের দিকে মুখটা ধরে রাখল।

'বুঝলেন, পরের স্ত্রীর ওপর এতটা লোভ, লালসা ভাল না, এ সব নোংরামি ছাড়ুন। জোরে পা চালিয়ে ওদের ধরতে চাইছেন—উদ্দেশ্যটা কী শুনি!'

'ঐ যে বললাম, ইমেজ—'

জগতের কথা শেষ হবার আগেই রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'না, আমি আগেই আপনাকে বলেছি, এই জিনিস আমি অ্যালাউ করব না, অক্ষয় সমাদ্দারের বউকে নিয়ে ছবি আঁকাটাকা আমি টলারেট করব না।'

'আবার ছেলেমানুষী শুরু করলেন রামানন্দবাবু', নন্দ গোঁফ নাচিয়ে হাসল। 'এতে দোষটা কি—জগত আঁকবে, আমি সুন্দর মানুষটিকে নিয়ে জমিয়ে একটা গল্প লিখব—'

"শাট্ আপ!' রামানন্দ অনেকক্ষণ পর নন্দর দিকে মুখ ফেরাল। 'আপনি নাটের গুরু, আপনিই জগতবাবুকে তাতাচ্ছেন। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, নিজে অশ্লীল গল্প লেখেন, ঐ দুই ছোঁড়াকে জুড়ে মাধুরীকে নিয়ে একটা ভীষণ রকম রগরগে ঘিনঘিনে আদিরসের গপ্প লেখার জন্য আপনার হাত চুলকোচ্ছে—তাই না?'

'আহা, এমন বলছেন, যেন উ'কি দিয়ে আপনি আমার মনের ভেতরের সবটা

দেখে নিয়েছেন।'

'উঁকি দিতে হয় না ব্রাদার, আপনার চোখ দেখে বোঝা গেছে।' রামানন্দ ঘুরে দাঁড়িয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। দেখাদেখি জগত এবং নন্দও হাসল।

'রামানন্দবাবু!'

'উঁহু', রামানন্দ আর কারো দিকে তাকাল না। 'আমি তো বলেছি, আগেই বলে দিয়েছি নোংরা শিল্পকর্ম করতে হয় কলকাতা শহরে ঢের মেয়েছেলে পাবেন। এখানে এসব আব্দার চলবে না। এই জিনিস আমি টলারেট করব না।'

'নোংরা শিল্প—আপনার কথা শুনে সেই ছড়াটা মনে পড়ল যে দাদা।' ফ্যা ফ্যা করে হেসে নন্দ জগতের দিকে চোখ ফেরাল।

'শুনিয়ে দাও, আমাদের রামানন্দ দাদাকে বিখ্যাত ছড়াটা শুনিয়ে দাও।' জগতের জিভ জড়িয়ে আসছিল। 'ভা-ল করে শুনিয়ে দাও নন্দদুলাল।'

রামানন্দর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নন্দ একটা নাচের ভঙ্গি করল, তারপর হাত ঘুরিয়ে ছড়া আবৃত্তি করল ঃ 'নোংরা শিল্প খ্যাংরা কাঠি আংরা ভরা চুল্লি। চ্যাংড়ার দল ল্যাং খায় হেমা মারে দিল্লী॥'

'এর অর্থ!' রামানন্দ ঘাড় ফিরিয়ে আগের চেয়েও বড় করে চোখ পাকিয়ে নন্দর দিকে তাকাল। 'এই অশ্লীল লেখক! অর্থটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও, না হলে আমি তোমার নাকের বাঁশি ফাটিয়ে দেবো!' রামানন্দ একটা ঘুষি তুলে দেখাল।

'অর্থ খুব সহজ রামানন্দবাবু, জলের মতন তরল।' জগত হি-হি করে হাসল। 'বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেম মজুমদার যখন দিল্লী থেকে আকাদমী পুরস্কার জিতে আনে, একদল শিল্পী-সাহিত্যিক আধুনিক শিল্পীদের ঠুকে এই চমৎকার ছড়া তৈরী করে।'

'মানে আধুনিকদের শিল্পকর্ম নোংরা আবর্জনা, চুল্লিভরতি আংরা সদৃশ বললেও অত্যুক্তি হয় না।' নন্দ বিশদ করে বুঝিয়ে দিল। 'বালখিল্যদের ল্যাং মেরে শ্রেষ্ঠ লেখক হেমচন্দ্র মজুমদার আকাদমী পুরস্কার লাভ করল।'

'খুব ভাল বলেছিল, সুন্দর বলেছিল।' সামনের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে রামানন্দ আবার হাঁটা আরম্ভ করল। 'ছোঃ, যত সব আধুনিক লেখক, আধুনিক চিত্রকর, আধুনিক কবি।'

'কিন্তু রামানন্দবাবু, আপনিও তো একজন আধুনিক কবি—তা হলে আধুনিক শিল্পীদের ওপর আপনার এত গোঁসা কেন!'

'কে বলেছে আমি কবি, আমি কবি নই, আমি সাধারণ মানুষ, নর্ম্যাল মানুষ—ডিসেন্সি বজায় রেখে সাধারণ কাজকর্ম করে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে আমি ভালবাসি। কবিদের আমি ঘেন্না করি।' একদলা থুথু ফেলে ঘাড় সোজা রেখে রামানন্দ হাঁটতে লাগল। 'হুঁ, আমি পোলাট্রি করছি, অক্ষয় সমাদ্দারের হাঁস-মুরগি দেখতে হয় আমাকে।'

'পোলট্রি করছি!' পিছন থেকে নন্দ নাকের শব্দ করে হাসল। 'বন্ধুটি হাসপাতালে, বন্ধুর বাড়িতে থেকে আচ্ছা করে ঘুঁটনি মেড়ে ডাল ঘোঁটা হচ্ছে।'

'ননসেন্স।' চরকির মতন রামানন্দ ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচোল। 'ভদ্রলোক, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখনি!'

'খবরদার! গালিগালাজ করবে না রামানন্দবাবু।' ঘুষি পাকাবার মতন করে এবার নন্দ ডান হাতটা শূন্যে উঁচিয়ে ধরল। 'তোমার কীর্তির কথা কারো জানতে বাকি? আমরা সব শুনেছি, বিলেত থেকে আসিনি। ওয়াইফের সঙ্গে বনিবনা নেই, এখানে এসে এক গেরস্তঘরে আস্তানা পাতা হয়েছে, আর একটা কচি

বউয়ের সর্বনাশ করা হচ্ছে।'

রামানন্দ তৎক্ষণাৎ একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। নন্দ একটা গাছের ডাল ভেঙে নিল।

এতক্ষণ জগত চুপ করে থেকে সব শুনছিল দেখছিল, যেন নেশার চোখে একটু উপভোগই করছিল। কিন্তু হুট করে দুজন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে ভাবতে পারেনি। অবশ্য তার অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। সোজা হয়ে প্রায় দাঁড়াতেই পারছে না। একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে আছে।

'আ-রে, দু ভাই ঝগড়া করছে, দাদারা একবার দেখুন, দেখুন।' জগত চেঁচিয়ে উঠল।

মেলা ফেরত কিছু গাঁয়ের মানুষ সেখান দিয়ে যাচ্ছে, তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'মাতাল, মাতালের কান্ড।' একজন আর একজনকে বলছিল।

'শিক্ষিত।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'মেলায় গিয়ে খুব টেনে এয়েছে।'

'শহরে থেকে বড় বড় চাকরি করে, এন্তার মাল টেনে বাবুরা টাকা-পয়সা ওড়ায়।'

'চোলাই, মেলায় ওই ছাড়া আর কী পাবে গো!'

'চোলাই, বিলিতি সবই চলে বাবুদের। শখ করে চোলাই গিলতেই নাওভাঙগার মেলায় এয়েছিল কিনা দ্যাখো।'

'এই সেরেছে! হোঁতকা চেহারার লোকটা বেঁটেটার জামার গলাটা কেমন চেপে ধরেছে!'

'বেঁটেও কম যাচ্ছে না, হোঁতকার দু কান ধরে রীতিমত ঝুলছে—'

'আহা, নন্দ তুমি করছ কী! রামানন্দবাবু আপনিও ছেড়ে দিন, প্লিজ ছেড়ে দিন।' গাছের সঙ্গে আর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জগতের হল না। 'দুজন মারা-মারি শুরু করলে যে।' চেঁচিয়ে উঠে কোনরকমে টলতে টলতে জগত দুজনকে ধরতে এল। তার আগেই নন্দ বুদ্ধি করে রামানন্দর কান ছেড়ে দিয়ে মাটি থেকে গাছের ডালটা আবার তুলে নিল। দেখাদেখি রামানন্দও নুয়ে হাত বাড়িয়ে পাথরের টুকরোটা তুলতে গেল। ঠিক তখন নন্দ রামানন্দর কপালে ঘা বসাল। পাথর কুড়ানো হল না, রামানন্দ মাটিতে বসে পড়ল।

যেন তখন জগত মন্ডলের নেশা ছুটে গেছে।

রামানন্দর কপাল কেটে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। নন্দ ঠিক পাথরের মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ডালটা অবশ্য হাত থেকে ফেলে দিয়েছে।

'ছি নন্দ, এটা কি ঠিক হল, এতবড় একটা মানুষকে তুমি এমন করে মারলে?'

'হুঁ, ঠিকই করেছে নন্দবাবু।' কপালটা হাত দিয়ে চেপে ধরার দরুণ হাতে রক্ত লেগেছে রামানন্দর, আলোর সামনে হাতটা মেলে ধরে এক সেকেন্ড দেখল, তারপর জগতের দিকে চোখ তুলে রামানন্দ কেমন করে যেন হাসল: 'এমন একটা পুরস্কার আমার পাওনা ছিল জগতবাবু।'

জগতের মুখে আর শব্দ ছিল না।

'মাতালের কান্ড!' পিছনে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের মানুষগুলি হাসল।

কপালে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ভোরবেলা রামানন্দ হাসপাতালে ছুটে এসেছিল। আজ মঙ্গলবার।

কিন্তু লাভ হল না কিছু।

বিছানায় শুয়ে অক্ষয় দিব্যি হাসছে।

'কি ব্যাপার?'

'আমার আর ব্যাপার কি! আবার তারিখ পিছিয়েছে। কিন্তু, তোমার কপালে এতবড় একটা পট্টি কেন মাস্টার?'

'ও কিছু না, কাল বিকেলে একটা ভিড়ের বাসে উঠতে গিয়ে দরজার হাতলটার সঙ্গে একটু লেগেছিল। সামান্য ছড়ে গেছে।'

'তাই বলে ব্যাণ্ডেজ! নিশ্চয় ভালরকম চোট পেয়েছিলে। বেশ একটু ফুলে-ছিল যেন জায়গাটা মনে হয়? দেখি—'

'ও কিছু না, সেরে যাবে। কিন্তু কবে আবার তারিখ পিছিয়েছে? চোখে-মুখে অন্য রকম উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তুলল রামানন্দ।

'তুমি এমন করছ, মাস্টার!' এবার অক্ষয়ও বিরক্ত চেহারা করে সিলিংটা দেখছিল।

'আরে ওদিকে যে আর একটা মানুষ আমার মাথা খেয়ে ফেলছে, তুমি বুঝতে পারছ না?'

'অপারেশনের কথা বলেছ?'

'না, বলব না।' রামানন্দ জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক করেছি কিছুই বলা হবে না, যেদিন তুমি বাড়ি যাবে সঙ্গে করে ওকে এখানে নিয়ে আসা যাবে, তারপর ট্যাক্সি করে একসঙ্গে সবাই ফিরব।'

'নাও ঠ্যালা।' অক্ষয় নাকে হাসল। 'ভুলিয়ে-ভালিয়ে মানুষটাকে তো রাখতেও পারছ বেশ, তুমি আদমী কম নও।'

'তা ছাড়া উপায় কি?' রামানন্দ প্রায় খিঁচিয়ে উঠল। 'কান্নাকাটি আমি চোখের ওপর দেখতে পারব না। তোমার স্ত্রীকে বাবা তখন সামাল দেওয়া আমার কম্ম না, তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল।'

'কিন্তু অপারেশনের পরেও তো আবার আমাকে এই বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে। তখন এক মাস থাকতে হবে কি দু' মাস থাকব তার ঠিক কি।'

'হুঁ, দু' মাস থাকবে তুমি! লাখপতি কিনা। এই নিয়ে তো কাল রাত্তিরে আমার সঙ্গে লেগেছিল। হাতে আর টাকা নেই। অথচ দিনের পর দিন কেবিন ভাড়া করে তুমি দিব্যি এখানে শুয়ে আছ।'

'মানে এখন তোমার কাঁধে সবটা দোষ চাপাচ্ছে মাধু, তাই না?' অক্ষয় আর হাসল না। 'যেন, তোমার ইচ্ছেয় আমি এখানে আছি, তুমি ইচ্ছে করলেই যে-কোনো একদিন আমাকে এখান থেকে খালাস করে নিয়ে যেতে পার?'

রামানন্দ চুপ করে রইল।

'দেখা যাক না, টাকা না থাকে অপারেশনের পর থেকে আমি ফ্রী বেড্-এ চলে যাব। অশিক্ষিত মেয়েছেলে নিয়ে এখানেই মুশকিল।'

কথাটা বলেই অক্ষয় দেওয়ালের দিকে চোখটা ঘুরিয়ে নিল।

রামানন্দ ভয়ানক রেগে গেল। রাগটা সরাসরি প্রকাশ করল না। তবে কথা

বলার সময় চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল।

'তুমিও তো এক তাজ্জব মানুষ বাবা! ভাবখানা এমন, যেন এখানে চিরটা কাল শুয়ে থাকতে পারলে আর কিছুই চাও না। এত মধু হাসপাতালে। একবার বলতেও শুনি না, মাস্টার, আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে, আমার আর এখানে ভাল লাগছে না।'

দেওয়ালের দিক থেকে অক্ষয় মুখটা ফেরাল না, সেদিকে চোখ রেখে অনেকটা নিজের মনে বিড় বিড় করার মতন করে বলল, 'আমার ইচ্ছেয় আমি এখানে পড়ে আছি কিনা। ডাক্তাররা যেভাবে বলবে তাই করতে হবে।'

'হুঁ, তা করতে হবে ঠিকই—তা হলেও ইচ্ছা-শক্তি বলে একটা কথা আছে কিনা, যে আমি সকাল সকাল ভাল হয়ে উঠব, আমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার বউকে দেখব, ঘরদুয়ার দেখব—'

'তুমি কি বলছ এমন একটা ইচ্ছে থাকলেই আমি ভাল হয়ে উঠতাম, বিনা অপারেশনে বাড়ি চলে যেতাম?' অক্ষয় এদিকে মুখটা ঘোরাল।

'আমার তো তাই মনে হয়।' রামানন্দ বেশ জোর দিয়ে মাথাটা ঝাঁকাল।

'এটা তোমার রাগের কথা মাস্টার—যদি তাই হতো, তো বেবাক রুগী দু'-একদিন থেকেই ঘরে ফিরে যেত। ছ' মাস আট মাসের রুগীও যে এখানে শুয়ে আছে তা তুমিও জান।'

'ওরাও তোমার মতন আর কি।'

'মানে নার্সের সঙ্গে পীরিত করছে?' অক্ষয় নতুন করে নাকের তলায় হেসে উঠল। একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'তোমার রাগটা কোথায় আমি বেশ বুঝতে পারি। তা না হলে ভাল করে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে বললে মাধুরী যে খুব একটা অস্থির হতো আমার তো মনে হয় না—অপারেশনের ব্যাপারটাও ওর বেশ সয়ে যেত। আমার গিন্নীকে তুমি যতটা নরম মনে কর, ততটা নরম ও নয়, বুঝেছ?'

'যাক, এসব বাজে কথা রাখো—কবে আবার অপারেশনের তারিখ পড়েছে শুনি?'

'শুক্রুরবার।'

'মানে পরশু?'

অক্ষয় মাথা ঝাঁকাল।

'আমি চলি।'

'আরে বোসো বোসো, এক একদিন এমন পাগলামি করো মাস্টার তুমি! আজ টুলটা টেনে একবার বসতেই চাইছ না।'

'অনেক বসেছি, হাসপাতাল তোমার ভাল লাগতে পারে, আমার একদম ভাল লাগে না।'

'দাও তো, মিটসেফের ওপর থেকে আমার ছোট আরশিখানা দাও।'

হাত বাড়িয়ে রামানন্দ আরশিটা তুলে নিয়ে অক্ষয়কে দিল।

'এই দ্যাখো, মুখটা কী যাচ্ছেতাই জঙ্গল হয়ে আছে। আরশি সরিয়ে অক্ষয় রামানন্দর দিকে তাকাল। 'তুমি কি হাসপাতালের কম্পাউন্ডে কোথাও নাপিত ব্যাটাকে দেখলে?'

'দেখিনি।' রামানন্দ গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল।

'আজ দু'দিন আমার কেবিনে ব্যাটা উঁকিই দিচ্ছে না, অথচ পই পই করে বলে দিয়েছি, রোজ মুখটা কামিয়ে দিয়ে যাবে।'

'বিছানায় শুয়ে আছ, রোজ এত কামাবার দরকারটা কি!' রামানন্দ খোঁচা না দিয়ে পারল না।

অক্ষয় সঙ্গে সঙ্গে আরশিটা বালিশের পাশে নামিয়ে রাখল। নিজের মনে হাসল। আগের মতন সিলিং-এর দিকে চোখ দুটো তুলে দিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'তুমি এমন বলছ মাস্টার—শুয়ে আছি বলে একগাল দাড়ি নিয়েই যেন আমাকে মরতে হবে।'

'মরতে হবে কে বললে তোমাকে, আচ্ছা লোক তো!' রামানন্দ ধমকের সুরে করল, 'অপারেশন হলেই মানুষ মরে যায়, তুমি মরবে, এসব কার কাছে শুনেছ শুনি? আর আমি বললামই বা কী—দু' দিনেই এমন কিছু অপরিষ্কার হয়ে ওঠেনি তোমার মুখ যে, এই নিয়ে একেবারে বিলাপ করতে হবে। যখন বাড়িতে ছিলে এর চেয়ে ঢের বেশি জঙ্গল হয়ে থাকত তোমার দাড়ি। এখন তো আমি দেখি প্রায় রোজই লোকটা এসে কামিয়ে দিয়ে যায়।'

'উহুঁ, পরশু আসেনি, কালও আসেনি।'

'কাল আসেনি—আজ আসবে, এই তো সকাল হল।'

'আসল কথা কি জান মাস্টার!' হলদে দাঁত ছড়িয়ে অক্ষয় আবার হেসে ফেলল। চমৎকার মানুষ বটে এই অক্ষয় সমাদ্দার। রাগ অভিমান বলতে ভিতরে কিছু রাখে না। সব সময় হাসছে, রগড় করছে। অসুখের আগে বাড়িতে থাকতেও অক্ষয়কে ঠিক এমনটাই দেখা গেছে। আজ হাসপাতালে এভাবে একটানা ক'দিন শুয়ে থেকেও রসে ভাঁটা পড়ল না। বরং ক'দিনে যেন আরও বেশি সরল হাসি-খুশি ঠান্ডা অমায়িক হয়ে গেছে লোকটা। প্রায় সাধুসন্তের কথা মনে করিয়ে দেয়—হুঁ, মেজাজের দিক থেকে, বিশুদ্ধ বিশ্বাসী সুন্দর একটি প্রাণ। কড়া কথা শোনাতে, কি এই মানুষের ওপর চটতে প্রায় ইচ্ছাই করে না।

যে কারণে অক্ষয়ের এই হাসি রামানন্দকে হাসতে বাধ্য করাল, তা হলেও যতটা সম্ভব গম্ভীর থেকে ভুরু কুঁচকে রাখল সে।

'হুঁ, শুনি তোমার আসল কথাটা?'

'কাল তুমি আসনি, কালই অর্ডার হয়ে গেছে, আজ থেকে ফুলরেণু এই কেবিনে ডে টাইমে আর থাকছে না।'

'ডে টাইমে থাকছে না, তবে কি নাইট টাইমে আসছে?' এখানে আসার পর থেকে মাঝেমধ্যে দুটো একটা চমৎকার ইংরেজী শব্দ অক্ষয় ব্যবহার করছে, করতে পারছে। শুনে রামানন্দর আরও হাসি পেল। 'কে আসছে এখন তবে? তরলা বোস?'

'আরে না না। তরলা যেমন আছে থাকবে—ও ঠিকই আছে। মানে ফুলরেণুকে এই ওয়ার্ড থেকে বদলী করে দিয়েছে।'

'কেন!' একটু অবাক হতে গিয়েও রামানন্দ পরে হাসল, মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝেছি—হুঁ, বদলী তো করবেই, তুমি চুটিয়ে পীরিত করছিলে ছুঁড়ির সঙ্গে যে জন্যে—'

'না গো মাস্টার—রোগীর সঙ্গে পীরিত করল বলে কোনো নার্সকে হুট করে বদলী করেছে শোনা যায় না। সে অন্য কারণ। অফিসিয়াল ব্যাপার।' অক্ষয় আর একটা ইংরেজী ব্যবহার করল। 'তরলা তাই বলল আমাকে, একেবারে এক্সরা ওয়ার্ডে চালান দিয়েছে ছুঁসকিকে।'

'এখন বুঝি চোখের মণি ফুলরেণু ছুঁসকি হয়ে গেল।' রামানন্দ খোঁচা না দিয়ে ছাড়ল না।

'শোনো শোনো, যে গেছে তার জন্য কাঁদব নাকি! নতুন যিনি আসছেন, তিনি কালই একবার এই কেবিনে উঁকি দিয়ে গেছেন। মানে এখানকার কাজকম্ম বুঝে

নিচ্ছিল—নামটা কি শুনবে?'

'দরকার নেই আমার নাম শুনে। আমি চলি।'

'সোহিনী, সোহিনী তালুকদার।' অক্ষয়ের রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চোখ গোল হয়ে উঠল। 'একটু থেকে যাও মাস্টার, সোওয়া আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকবে। যাকে বলে মোহিনী মূর্তি। আমি হলপ করে বলতে পারি, কোনো বেটা পুরুষ, সে যতবড় বিশ্বামিত্র হোক, ঐ ছুঁড়িকে দেখলে ঠিক থাকতে পারবে না—কোমর বলো, পাছা বলো, বুক বলো—'

'তুমি মর, মরে যাও বাঁদর কোথাকার।' বড় কবে একটা ধমক লাগিয়ে রামানন্দ দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

অক্ষয় খিকখিক করে হাসছিল।

'যে জন্য, যে কারণে আজ আর মুখটা এমন জঙ্গল করে রাখলে চলছে না, বুঝেছ', রামানন্দর দিকে মুখটা ধরে রেখে অক্ষয় একভাবে হেসে চলল। 'যাবার সময় পরামানিক বেটাকে দেখলে তুমি কিন্তু এখুনি পাঠিয়ে দেবে মাস্টার।'

রামানন্দ অস্পষ্টভাবে ঘাড় নেড়ে অক্ষয়ের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

'হুঁ, এই প্রসন্ন মেজাজে, চিত্তকে এভাবে সর্বদা সবস রাখা, ঠান্ডা রাখা, রাগ না করা, উত্তেজিত না হওয়া—অক্ষয়ের মধ্যে যেটা দেখছে, রামানন্দ আজকাল চেষ্টা করছে এমন হওয়া যায় কিনা। এটা ভাল। ঋষির মতন নির্বিকার থেকে যাওয়া। যেন একটা চমৎকার রসের মধ্যে ডুবে থেকে অন্য সব বোধ হারিয়ে ফেলা, অন্য যে-কোনো বিষয়ে উদাসীন অনাসক্ত থাকা। এখন অবশ্য হাসপাতালের নার্স-দের সুন্দর সুন্দর মুখ বা শরীর দেখে অক্ষয় কামরসে ডুবে আছে বলা যায়। তার আগে? মাধুরীকে নিয়ে অপার রসসাগরে সে নিমজ্জিত ছিল সন্দেহ কি। যে জন্য কোনো ব্যাপারেই অক্ষয়ের রাগ নেই, ঈর্ষা নেই, অভিমান নেই—খিটখিটে হওয়া, একটুতে মাথা গরম করা—অক্ষয়ের মধ্যে কোনোদিন এসব দেখা গেল না।

তাই চিন্তা করছিল রামানন্দ।

অক্ষয়ের মধ্যে যে রস আছে, সেদিক থেকে রামানন্দ যেন বঞ্চিত। হলই বা। ঋষিদের বেলায় যেমন ভগবৎ-রস বলে একটা কথা আছে, ভক্তি-মার্গের সাধনা আছে, তেমন একটা রস, একটা সাধনা নিয়ে রামানন্দ এককালে মগ্ন ছিল না কি, হুঁ, যদি রসের কথাই ওঠে? কাব্যরস। কাব্যচর্চা।

কিন্তু তেমন করে ডুব দিয়ে সে থাকতে পেরেছিল কোথায়! একটুতে সে অস্থির হয়েছে, উত্তেজিত হয়েছে, মাথা গরম করেছে। রগচটা গোঁয়ার বলে বন্ধু-মহলে রীতিমত একটা বদনাম পর্যন্ত আছে না তার? সহজেই সে ক্ষেপে যায়।

যেন ইদানীং অক্ষয়কে দেখে তাব চোখ খুলেছে।

সর্বদা মেজাজ প্রসন্ন রাখা, হাসতে পারা, খোলামেলা মন নিয়ে থাকা—চারটিখানি কথা না।

রামানন্দ একটু একটু চেষ্টা করছে। সব সময় সফল হচ্ছে না। কিন্তু কাল পেরেছিল। প্রায় সাধুসন্তের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল সে। এখন অবশ্য সবটা জিনিস মনে হলে তার হাসি পায়। কাল নন্দদুলাল বাঁশ দিয়ে বাড়ি মারল, একটু রাগ করল না সে, বরং আগে যেটুকু উত্তেজনা আস্ফালন পেয়ে বসেছিল তাকে, বাঁশের বাড়ি খেয়ে সে অদ্ভুত ঠান্ডা সংযত স্থির হয়ে গেল।

কি বলেছিল সে জগতকে? এই তার পুরস্কার? নন্দবাবুর কাছে এমন একটা আঘাত তার পাওনা ছিল? দারুণ কথা বলেছিল রামানন্দ।

জগত মন্ডলের অন্তরের অবশ্য তুলনা হয় না। তৎক্ষণাৎ একটা রিকশা ডেকে রামানন্দকে তুলে দিয়ে সে-ই রাত করে এতটা রাস্তা পার হয়ে এক ডাক্তারের

ডিসপেনসারীতে ছুটে গেল। কপালটা বেশ খানিকটা ছুড়ে যাওয়াতে কম্পাউন্ডার মশাইকে দিয়ে তখনি ওষুধপত্র লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে রামানন্দকে একটা টিটেনাস ইনজেকশান পর্যন্ত দিইয়ে দিলে। অবশ্য আর একটা রিকশাও ডাকা হয়েছিল নন্দর জন্য, জগতই ডেকেছিল। নন্দদুলালের মুখে আর তখন কথা ছিল না, অন্য রিকশায় পিছনে পিছনে আসছিল—সেই যে মুখ নীচু করে ছিল, সারা রাস্তা নন্দদুলাল আর মুখ তোলেনি, কথা বলেনি। আর ওদিকে গম্ভীর হয়ে কেবল রিকশায় উঠে বসতে বলা ছাড়া জগতও নন্দদুলালের সঙ্গে সারা রাস্তা আর একটাও কথা বলল না। রামানন্দর তখনকার ওই ব্যবহারটাই জগতকে বেশি লজ্জিত, সঙ্কুচিত এবং বলা যায়, প্রায় বিমোহিত করে তুলেছিল। অন্যদিকে নন্দদুলালকে, হুঁ, রামানন্দর ঐ মহানুভবতা, ক্ষমাশীলতা, যাই আখ্যা দেওয়া যাক, নন্দদুলালকে প্রায় পথে বসিয়ে দেওয়ার মতন করে ছেড়েছিল।

সবটা অবশ্য নেশার ঝোঁকেই করেছিল নন্দ। কিন্তু ওই ঘটনাটার পর তিনজনেরই নেশাটা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। কেটে গিয়েছিল বলা যায়। তা না হলে জগতের নির্দেশক্রমে তার পরের ক'টা কাজ পর পর এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে, একেবারে নির্ভুল নিয়মে শেষ হতে পারত না। হুঁ, যদি ছিঁটেফোঁটাও মাতলামি করত তিনজনের কেউ।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে জগত আবার সেই রিকশাটা দিয়েই রামানন্দকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়। বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয় মানে কি, একেবারে অক্ষয়ের ঘরের দরজায় মনসা গাছটার কাছে রামানন্দকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তখন একটা রিকশা বিদায় করে দিয়ে আর একটা রিকশায়, অর্থাৎ নন্দ যেটায় বসেছিল, জগত চেপে বসেছিল। সেই মনসাতলা থেকেই দু'জন ফিরে গেল।

তবু জগত রিকশা থেকে একবার নেমেছিল, নন্দ আর নামলই না।

বেচারার চেহারা ও আচরণ দেখে রামানন্দর কেমন মায়া লাগছিল।

যাই হোক, অক্ষয়ের ঘরের কাছে গিয়ে খুব অবাক করে দেওয়ার মতন ব্যবহার করেছিল দু'জন।

নন্দ না হয় অপরাধ করেছিল। যে কারণে রিকশা থেকে নামা দূরে থাক, ঘাড় সোজা করে অক্ষয়ের ঘরের দিকেও তাকাতে পারছিল না।

কিন্তু জগত? রামানন্দর সঙ্গে একবার সে অক্ষয়ের উঠোনে অন্তত উঁকি দিতে পারত, মাধুরীর ঘরদুয়ারের চেহারাটা কেমন দেখে নিতে পারত, অর্থাৎ সেই ফাঁকে যদি অক্ষয়ের রূপসী স্ত্রীকে আর একবার দেখে নেওয়া যায়—কিছুই করল না।

অথচ এই জিনিস নিয়েই মেলায় ঝগড়ার সৃষ্টি। রামানন্দর সঙ্গে দু'জন অক্ষয়ের বাড়ি যাবে, অক্ষয়ের যুবতী গিন্নীকে আর একবাব দেখবে।

যাক, এসব কিছুই অক্ষয়কে বলল না রামানন্দ। মাধুরীকে, শফীকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় যাওয়ার কথাটাই সে বেমালুম চেপে গেল। এবং কপালের ব্যান্ডেজের ব্যাপারেও মিথ্যা কথা বলা ছাড়া উপায় ছিল না।

রাত্রে মাধুরী ভীষণ রাগারাগি করেছিল। রামানন্দ নিজেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকে অন্ধকারে মাদুরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল। খায়নি।

মাধুরীও ডাকতে আসেনি। তাতেই ওর রাগের মাত্রাটা বোঝা গেছে।

শফী রাত্রে ছিল। মনতাজ চলে গিয়েছিল। ঘরে ঢোকার সময় রামানন্দ শফী ও মাধুরীকে রান্নাঘরের দরজার কাছে দেখতে পায়। খুব একটা স্পষ্ট না, উঠোনে আলোটালো ছিল না এবং রান্নাঘরের ঝাঁপটাও আধখানা বন্ধ ছিল, আবছা দুটো ছায়ামূর্তির মতন দেখাচ্ছিল ওদের। সম্ভবত রিকশার ঠুনঠুন শব্দ শুনেই দু'জন

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। উঁকি দিয়ে বাইরে নিশ্চয় রিকশা দুটোও দেখেছিল। রিকশা করে তিনজন কোথা থেকে এসেছিল, তা আর তাদের বলে দেবার দরকার ছিল না। মেলায় রামানন্দকে মাধুরীরা আর কতক্ষণ পায়, দুপুরের পর থেকে বাকি সবটা সময় তো সে ওই বন্ধু দুটোর সঙ্গে কাটিয়েছে। তারপর এত রাত করে রিকশায় করে তিনজনের একত্র ফেরা এবং চুপি চুপি রামানন্দকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া এবং কোনো রকম সাড়া শব্দ না করে রামানন্দ যেমন চোরের মতন তার ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে অন্ধকারে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল, মাধুরীর কিছু আর বুঝতে বাকি ছিল না।

বাকি যে ছিল না, পরে শফীর সঙ্গে ওর কথা শুনে রামানন্দ আরও ভাল টের পায়।

চালাক মেয়ে, মাধুরীর অনুমান চোদ্দ আনাই নির্ভুল হয়েছিল। 'বুঝলি শফী, মদ খেয়ে এসেছে—ওই যে তখন মেলায় লোক দুটো জুটে গেল, তারপর আর মাস্টারকে চোখেই দেখা গেল না। তুই দেখেছিলি?'

না, শফী দেখেনি। ছোঁড়া নিশ্চয় মাথা নেড়েছিল।

তখন মাধুরীর গলা সেতারের গমকের মতন অদ্ভুত গমগম করে উঠেছিল। এক সঙ্গে রাগ এবং অভিমান মিলে যেমন ওর গলার স্বর হয়। 'মেলায় যাবে বলে কি মাস্টার আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল, উঁহু, কক্‌খনো তা মনে করিস না। মদ খেতে গিয়েছিল, আগে থেকে ওদের সব ঠিকঠাক ছিল, দেখলি না? অ, তুই তখন দোকানে, মনতাজ ছিল আমার সঙ্গে, লোক দুটোর দেখা পেয়ে, তোকে বলব কি, মাস্টার যেন হাতে স্বর্গ পেল, তারপর সেই যে আমাকে দোকানে বসিয়ে রেখে পিঠটান দিল, আর মানুষটাকে দেখলাম না, এখন রাত দুপুরে খুব টেনেটুনে বেহুঁশ হয়ে ঘরে ঢুকেছে, ওই দুটোও খুব খেয়েছে, আমি কাল সকালে পষ্টাপষ্টি বলে দেবো মাস্টারকে—দরকার নেই আর তোমার এখানে থেকে।'

উত্তরে শফী কি কিছু বলেছিল? রামানন্দ শোনেনি। খুব কৌতূহল হচ্ছিল তার। হুঁ, তারপর মাধুরী কী বলে শুনতে। শফী চুপ করে থাকবে জানা কথা। এই ব্যাপারে তার কী বলার আছে, তা ছাড়া এককালে যে রামানন্দ তার মাস্টারমশায় ছিল। স্যার। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে, বিশেষ করে মদটদ খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে হুট করে কিছু মন্তব্য করতে ছোঁড়া ইতস্তত করবে জানা কথা। এটা যদিও রামানন্দর অনুমান। তবে ফিসফিসিয়ে ছোঁড়া কিছু বলেছিল কিনা ঈশ্বর জানে।

একটু পরে আবার মাধুরীর গলা শোনা গেছে।

'বলতে কষ্ট লাগে, বুঝলি শফী—এমনি তো মানুষটা খুব ভাল, একেবারে কাদার মতন, ব্যোমভোলা শিব—তার ওপর কষ্টের জীবন, বউটা চলে গেছে, চাকরিটাকরি ছেড়ে দিয়ে কেমনতর যেন হয়ে আছে দেখছিস না! তা ছাড়া ওর বন্ধু। রোজ হাসপাতালে ওকে দেখতে যায়—খোঁজখবর করছে, এদিক থেকে মানুষটার কাছে আমাদের অনেক ঋণ—'

আবার মাধুরী চুপ। নিশুতি রাত খাঁ খাঁ করছিল। কোথায় যেন একটা পেঁচা ডেকে উঠেছিল। খুব মজা লাগছিল রামানন্দর কথাগুলি শুনতে।

'কিন্তু না, এভাবে কেবল মদ খেলে—তা ছাড়া আমারও তো একটা সংসার; কত টাকা লাগছে ওর চিকিচ্ছের জন্যে, আর তুমি এভাবে এখানে পড়ে পড়ে খাবে—এসে সামান্য ক'টা টাকা বুঝি ওর হাতে দিয়েছিল, তারপর আর দাওনি, দেবেই বা কোথা থেকে, চাকরি নেই, এদিকে তোমার নেশার খরচ আছে—উঁহু, ও কিছু বলবে না, আমরা যদি শাক-ভাতও খেতে আরম্ভ করি আর তুমি যদি চিরকাল এভাবে এখানে পড়ে পড়ে খাও, কিছু বলবে না ও—এমন মানুষ, মুখ

বুজে সহ্য করবে। কিন্তু তা বলে আমি সহ্য করব কোন্ দুঃখে—'

রামানন্দর কানের কাছে মশা পিনপিন করছিল। তার যেন মনে হল শফী ঘুমিয়ে পড়েছে, বা চোখে ঘুম নিয়ে বেচারা ঢুলছিল—যে জন্য মাধুরী নিজের মনে কথা বলছিল।

'ঠিক আছে, এখন কিছু বলা হবে না, আসুক তো ও হাসপাতাল থেকে—তা ছাড়া আমার কি—বন্ধুকে যদি চিরকাল ঘাড়ে করে রাখতে চায়, আমি বলার কে—'

তারপর আবার বেশ কিছুক্ষণ মাধুরীর গলা শোনা যায়নি। রামানন্দর মনে হল, ও-ঘরের আলো নিবে গেছে। বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে একটুও আলো দেখা যাচ্ছিল না। তার অর্থ ওরা শুয়ে পড়েছিল। হুঁ, তাই। শফীর নাক ডাকার শব্দ বেশ মোটা হয়ে এবার রামানন্দর কানে আসছিল। মাধুরীও কি ঘুমিয়ে পড়ল! বোঝা গেল না, কেননা ঘুমোলে কখনও ওর নাক ডাকতে শোনেনি রামানন্দ। তার নিজের ঘুম চটে গিয়েছিল। নতুন করে কপালটা টাটাতে শুরু করেছিল। শোয়া ছেড়ে উঠে বসে একটা সিগারেট ধরাল। বাঁশ হাতে নন্দদুলালের তখনকার মুখটা হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে আবার মাধুরীর গলা অন্ধকারে রীতিমত ঝলমল করে উঠল। যেন ওঘরে একটা মিষ্টি বাজনা বাজছে। সেতার বাজছে। কেবল রাগ না তেজ না, তার সঙ্গে দুঃখ—একটা আক্ষেপের রেশ ছিল বলে গলার স্বরটা এত সুন্দর শোনাচ্ছিল। তার ওপর এমন বিষণ্ণ খাঁ খাঁ রাত। যেন জ্যোৎস্না থাকলে, ফুরফুরে হাওয়া, গাছপালার নড়াচড়া ইত্যাদি থাকলে এতটা মিষ্টি করুণ লাগত না এই গলা।

'অ্যাঁ, ভালমানুষের মতন কেমন হেসেখেলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় গেল, এটা-ওটা কেনাকাটা করল, আ-রে মা! কোথা থেকে আপদ দুটো এসে জুটল, ব্যস্ মাথাটা ঘুরে গেল, আর ঠিক থাকতে পারল না, কোনোরকমে আমায় পুতুলের দোকানে বসিয়ে দিয়ে—অ্যাঁ, না হল আমার ম্যাজিক দেখা, না হল সার্কাস দেখা, ওরা দুটিতে দোকান নিয়ে বসেছিল, কিন্তু তোমার তো বাবু অবসর ছিল, তোমার ভরসায় নেচে মেলায় গেলাম, আর একেবারে সারাদিন ডুব দিয়ে রইলে—কত কি করব সাধ ছিল, চড়ুইভাতির জন্য একটা সুন্দর জায়গা পর্যন্ত মনে মনে বেছে রেখেছিলাম—ওই ভেড়ির উত্তরপাড়ে পলাশ গাছটার নিচে—কিছুই হল না। আচ্ছা, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠবে না—তখন বুঝবে, তখন মাধুরী কেমন কড়া শক্ত হতে জানে একবার দেখবে—আজ কিছু বললাম না, মদ খেয়ে মাতলামি করে কোন্ খানাখন্দে পড়ে গিয়ে কপাল ফাটিয়ে না কি লোকের সঙ্গে মারামারি করে এত বড় এক পটি মাথায় বেঁধে চুপিচুপি ঘরে ফিরে ঘুমোচ্ছ ঘুমোও, কাল মজা দেখবে, কাল সকালে মাধুরীর আসল মূর্তি দেখে নিও—'

গুজগুজ করে নিজের মনে হাসছিল রামানন্দ। হাসির তোড়ে সিগারেটটা ভাল করে টানতে পারছিল না। তা হলেও আবছা অন্ধকারে তার কপালের ব্যান্ডেজটা অক্ষয়ের তেজী গিন্নী লক্ষ্য করেছিল। তার অর্থ রামানন্দ যে মাতাল হয়ে মেলায় কিছু করতে গিয়েছিল সেটা ভাল করে ওর মনে শেকড় গেড়েছে—চিন্তা করে রামানন্দর একটু খারাপও লাগছিল। যে জন্য ভোর হওয়া মাত্র জামাটা গায়ে চড়িয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। মাধুরী বুঝি তখন পায়খানায় ছিল। শফী নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিল।

কিন্তু এখন! বাস থেকে নেমে বালুর ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা একটা করে রাত্রির সব কথা তার মনে পড়ছিল। যে জন্য হাঁটার বেগটা ক্রমশ ঢিলে হয়ে আসছিল। হাসপাতালে অক্ষয়কে যা হোক একটা মিছা কথা বলে বুঝ দেওয়া

গেছে—মাধুরীকে এভাবে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

হুঁ, তার হাঁটার বেগ কমে আসছিল, কিন্তু বাড়ির সামনে পাকুড় গাছটার কাছাকাছি পৌঁছতে হাঁটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

॥ ২৬ ॥

গুণ্ডা চেহারার দুটো ছেলে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেন? হুবহু কলকাতার মাস্তানদের মতন। চোঙ্গা প্যান্ট আঁটো শার্ট গায়ে, পায়ে চকচকে ছুঁচলো জুতো, কদমফুলের মতন ছাঁট মাথায়। কটমট করে এদিকে চেয়ে আছে।

শফী ও মাধুরীকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, দুটিতে চুপ করে কেমন যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে ওপাশে মাদার ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে। তারাও এদিকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। যেন রামানন্দ কখন ফেরে অপেক্ষা করছে। কি ব্যাপার!

'স্যার, আপনাকে খুঁজছিলাম।' মাস্তানদের একজন সরে এসে রামানন্দর প্রায় থুতনি ঘেঁষে দাঁড়াল।

'তোমরা কোথা থেকে এসেছ?'

'পাইকপাড়া থেকে।'

'পাইকপাড়া থেকে! হঠাৎ আমার কাছে কেন? কি হয়েছে সেখানে?'

'স্যার, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন!' এক-পা দু-পা করে দু' নম্বর মাস্তান রামানন্দর কাছে সরে এল।

'আজ যে বাইশে মার্চ, মঙ্গলবার—'

'হুঁ, বাইশে মার্চ মঙ্গলবার', রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'তাতে হয়েছে কি!

'চলুন।'

'কোথায় যাব?'

'পাইকপাড়া।'

'কেন?'

'বিকেলে আপনাকে এসে পাওয়া যাবে কি যাবে না তার তো কিছু ঠিক নেই, কাজেই এবেলা চলে এলাম, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন। আজ পাইক-পাড়ার সোনালী বাসরের ফাংশন, আপনাকে চীফ-গেস্ট করা হয়েছে, মনে আছে নিশ্চয়?'

'ও, সেই মহিলা, সেই অধ্যাপিকার চেলা তোমরা? তিনি তোমাদের পাঠিয়ে-ছেন বুঝি।'

'চেলাফেলা আমরা কারো নই—আমাদের ওপর ভার পড়েছে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার, নিতে এসেছি।'

'আমি যাব না, আমি তো মহিলাকে বারণ করে দিয়েছি। রাস্তা ছাড়।'

'না, তা বললে চলবে কেন, শুনছি ওদের নেমন্তন্নের কার্ডফার্ড ছাপানো হয়ে গেছে, প্রোগ্রাম ছাপানো হয়ে গেছে, চারদিকে পোস্টার পড়েছে—সব জায়গায় আপনার নাম রয়েছে—এখন আপনি যাব না বলে আব্দার করলে চলবে কেন। আপনার আব্দার শুনছে কে?'

ভুরু দুটো কপালে তুলল রামানন্দ।

'অবাক কাণ্ড, আমার ইচ্ছে না হলেও যেতে হবে? জোর করে ধরে নিয়ে যাবে তোমরা?'

'হুঁ, জোর করেই ধরে নিয়ে যাব। সিধে আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বেঁকাতে হয়, জানেন তো স্যার।'

'মগের মুলুক পেয়েছ—জোর করে নিয়ে যাবে!' রামানন্দ ভেংচি কাটল। 'রাস্তা ছেড়ে দাও, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দাও, ভালয় ভালয় বলছি।'

'বেশি তেওড়ামী করবেন না স্যার—' এক নম্বর মাস্তান চোখ লাল করল। 'আমরা তেওড়ামী পছন্দ করি না।'

গলার সুরটা একটু নরম করল রামানন্দ।

'আমি ফাংশন-টাংশন সভাসমিতি ভালবাসি না। কোনোদিন কোথাও যাই না. এসব নিছক লোক দেখানো হইচই ব্যাপারে, এতে সাহিত্য সংস্কৃতির বিশেষ কাজ হয় বলে আমি মনে করি না, যে জন্য আমি এগুলো থেকে সর্বদা দূরে দূরে থাকি।'

'শুনুন স্যার', দু' নম্বর মাস্তান ভুরু কপাল কুঁচকে চোখ দুটো ছোট করে ফেলল। 'ওদের ক্লাবের অ্যানুয়েল ফাংশন, কালচারেল ব্যাপার, আপনাকে প্রধান অতিথি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বক্তৃতা-টক্তৃতা করবেন। আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি, এখন সেখানে গিয়ে চীফ-গেস্টের চেয়ারে বসবেন কি বসবেন না, বক্তৃতা করবেন কি করবেন না, সে মামলা সেখানে গিয়ে মেটাবেন, ওদের ভাল করে আর একবার বুঝিয়ে-টুঝিয়ে বলবেন, হয়তো আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারে—আমাদের কাজ আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া, চলুন।'

রামানন্দ চুপ করে রইল।

কপাল ভুরু তেমনি কুঁচকে রেখে দু' নম্বর আবার বলল, 'আসলে আপনার আপত্তিটা কোন্ জায়গায়, অসুবিধেটা কোথায় বলুন তো? বক্তৃতা করতে গেলে তোতলামি এসে যায়? না কি তেমন জুতসই শব্দফব্দ জিভের আগায় চট করে আসতে চায় না? ভিড় দেখলে নার্ভাস ব্রেক্-ডাউন হয়? আজকাল সভাসমিতিই তো সব মশাই, বক্তৃতা করবার জন্য, সেই সঙ্গে কাগজে ছবি ও নাম ছাপাবার জন্যে এক একজন কেমন পাগল দেখছেন না? এতে করে সকাল সকাল লীডার-টিডার হয়ে যাওয়া যায়। রাতারাতি ভি আই পি বনে যাওয়া যায়—এই চান্স আপনি নষ্ট করছেন কেন!'

অসহায় চোখে রামানন্দ মাদার ঝোপের কাছে দাঁড়ানো শফী ও মাধুরীকে দেখল। দু'জন ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছিল। তারা যে একটু ভয় পেয়েছে, ভাবনায় পড়েছে, মুখ দেখে বোঝা গেল।

হুঁ, শফী ও মাধুরী ভয় পেয়েছে বইকি। রামানন্দ তখন বাড়িতে ছিল না। যেমন করে লোক দুটো হুট করে উঠোনে ঢুকে প'ড়ে রামবাবু, রামবাবু বলে চেঁচাচ্ছিল। বস্তুত মাস্টারকে আজ পর্যন্ত এখানে রামবাবু বলে কাউকে ডাকতে শোনা যায়নি। তাই মাধুরী প্রথমটা বুঝতে পারেনি। শফীও বুঝতে পারেনি। দু'জন এক সঙ্গে দরজায় উঁকি দিতে লোক দুটো লাফিয়ে ঘরের পৈঁঠায় উঠে যায়।

'আপনারা কাকে খুঁজছেন?' শফী সাহস করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

'সেই ভদ্দরলোককে, ইস্কুলের মাস্টার, কবিতাটবিতা লেখে, মোটা মতন দেখতে।'

এবার বুঝতে পেরে শফী মাথা নেড়েছিল।

'তিনি বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতা তো একটুখানি জায়গা না বাছা', ভেংচি কাটার মতন চেহারা করে একজন সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়েছিল। 'কলকাতার কোন্ জায়গায়! রাস্তার নাম কি, বাড়ির নম্বর কত?'

'হাসপাতালে।' বিড়বিড় করে শফী উত্তর করেছিল।

'হাসপাতাল কি শহরে একটা!' আর একজন তৎক্ষণাৎ চোখ লাল করে শফীকে ধমক লাগায়। 'কোন্ হাসপাতালে?'

'মেডিকেল কলেজ।' কোনোরকমে ঢোক গিলে শফী উত্তর করেছিল।

দু'জনের চেহারা দেখে, বলার ধরন দেখে শফী খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল। এভাবে লাফ দিয়ে ঘরের পৈঁঠায় উঠেছে দেখে মাধুরীর মুখটা রীতিমত ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। এবার শফীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শফীকে যত না দেখছিল, তার চেয়ে তারা ঢের বেশি তাকাচ্ছিল দরজার দিকে চৌকাঠের কাছে, মাধুরী যেখানে দাঁড়িয়ে। এমন বিশ্রী চোখে তাকাচ্ছিল যে, শেষটায় মাধুরীকে একটা পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

এতে যে লোক দুটো আরও বেশি অসন্তুষ্ট হল, তাদের চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেছে। চেহারা এবং গলার স্বরে আর যেন ছিঁটেফোঁটা রসকষও ছিল না!

'কে আছে মেডিকেল কলেজে?' শফীর দিকে চোখ নামিয়ে এক সঙ্গে লোক দুটো ধমক লাগায়।

'এই বাড়ির লোক, এই বাড়ির কর্তা।'

'কি হয়েছে কর্তার?'

'গ্যাসট্রিক আলসার।'

'আরে শালা, রাম ব্যারাম!' মুখটা বিকৃত করে একজন বিড়বিড় করে উঠেছিল।

'তা এই ভদ্দরলোক কখন ফিরবে? মাস্টার?' আর একজন রেগে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল।

'ঠিক বলা যাচ্ছে না।' শফী বুদ্ধি করে উত্তর দিয়েছে।

'নাও ঠ্যালা!' তৎক্ষণাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে একজন আর একজনের চোখে চোখ রেখে, যাকে বলে নীরব ভাষায় কিছু বলাবলি করল।

'ঠিক আছে।' দু'জন পৈঁঠা থেকে নেমে দাঁড়াল। 'আমরা অপেক্ষা করছি, আমরা ওই পাকুড় গাছের কাছে আছি। বাড়িতে ঢোকার এই তো রাস্তা?'

শফী ঘাড় কাত করেছিল।

দু'জন পাকুড় গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে রোদ চড়চড় করছিল। এই জন্যই গাছতলার ছায়াটা দু'জনে বেছে নিয়েছে, শফী ও মাধুরীর বুঝতে কষ্ট হল না।

পৈঁঠা থেকে তারা নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মাধুরী হাতের ইশারায় শফীকে ডেকেছে এবং ফিসফিসিয়ে কিছু বলতে শফীও তখনি গাছতলায় ছুটে গেছে।

'আপনারা কোথা থেকে এসেছেন জানতে পারি কি?' বেশ সমীহ গলায় শফী প্রশ্ন করেছিল।

'কেন, কি দরকার তোর?' চোখ পাকিয়ে শফীকে আর একটা ধমক লাগিয়েছিল লোক দুটো। 'যেখান থেকেই আসি, আমরা এখনি যাচ্ছি না, ভদ্দরলোকের সঙ্গে দেখা না করে যাব না, তখন জানতে পারবে কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি।'

মুখটা কালো করে শফী মাধুরীর কাছে ফিরে গেছে। মাধুরী ততক্ষণে প্রায় দরজার বাইরে চলে এসেছে। অবশ্য চৌকাঠ ছেড়ে নিচে নামেনি। ফিসফিসিয়ে শফী তাকে কিছু বলতে মাধুরী আরও বেশি ভয় পেল।

কিন্তু পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে লোক দুটো রাস্তার দিকে না তাকিয়ে বার বার কেবল এদিকেই তাকাচ্ছিল। শফীর সঙ্গে আর একবার চোখাচোখি হতে একজন হাত নেড়ে শফীকে ডাকল। শফী আবার গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

'ওই ভদ্দরলোক তোর কে হয়?'

'মাস্টারমশায়?' পাল্টা প্রশ্ন করতে গিয়ে শফী আর একটা ধমক খেল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাকে আমরা খুঁজছি।'

'আমার কেউ হন না, ইস্কুলে তাঁর কাছে পড়তাম।' শফী উত্তর করেছিল।

'এখন পড়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বুঝি?'

'হুঁ', শফী ঘাড় নেড়েছিল। তারপর চোখের দিকে তাকিয়ে দু'জন আবার মৌন ভাষায় কিছু একটা বলাবলি করে পরে শফীর মুখটা দেখল।

'ওই মেয়েছেলেটি তোর কে হয়!' আঙুল তুলে একজন ঘরের দরজাটা দেখাল।

মাধুরীর কথা বলছে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় গুঁজে শফী মিনমিনে গলায় বলল, 'আমার কেউ হয় না।'

'এই ছোঁড়া! মুখের দিকে তাকা।'

ধমক খেয়ে শফী ঘাড় সোজা করে তাকাল।

'কেউ হয় না, অথচ দিব্য ঘরে-টরে ঢোকা হচ্ছে, ফিসফিস গুজগুজ করে কথা-টথা বলা হচ্ছে—তাই না!' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো লোকটা।

আর একজন প্রায় উটের মতন শফীর দিকে গলাটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'মেয়েছেলেটা মাস্টারের কে হয়?'

উটকো, বেখাপ্পা এক একটা প্রশ্ন। শফীর এত খারাপ লাগছিল! তাব ইচ্ছা করছিল ঘুষি মেরে দুটোরই নাক ফাটিয়ে দেয়। দুজন, তাই সে কিছু করতে সাহস পাচ্ছিল না।

'কিছু হয় না।' আস্তে বলল সে।

'বাঃ, কেউ কারো হয় না, অথচ সবাই এই বাড়িতে দলা পাকিয়ে আছে। ভারি মজা তো!' লম্বা গলাটা গুটিয়ে নিয়ে লোকটা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল, হাসল একটুখানি।

'চাঁটি মার, ঠিক কথা বেরিয়ে পড়বে।' সঙ্গী মোটেই হাসছিল না, কাঠের মতন শক্ত করে রেখেছে মুখটা।

'এই! বাড়ির কর্তা ক'দিন হাসপাতালে আছে রে?' এই লোকটা আবার শফীর দিকে গলা বাড়িয়ে দিল।

'দিন কুড়ি।' শফী লোকটার চোখের দিকে তাকাল না।

'ঐ সুন্দর মেয়েছেলেটা বুঝি কর্তার বউ?'

অন্যদিকে চোখ রেখেই শফী মাথা ঝাঁকাল।

'জবর জায়গায় মাস্টার এসে আস্তানা গেড়েছে, বুঝলে হে—' তখনি আবার ঘাড় সোজা করে এই লোকটা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'আগুনের মতন চেহারা মেয়েটির।'

'ওটার তো বউ-টউ চলে গেছে শোনা যায়, একটা লোফার নাকি।' কাঠের মতন শক্ত করে রাখা মুখটা বেঁকিয়ে সঙ্গীটি থুথু ফেলল। 'কেন যে উল্লুকটাকে

ওরা ধরে নিয়ে যেতে চাইছে, আমার শালা মাথায় ঢ়ুকছে না।'

'তা তুই এখানে কেন', এই লোকটা এবার শফীকে বড় করে একটা ভেংচি কাটল। 'ঐ মেয়েটা যদি তোর কেউ না হয় তো ওর ঘরে-টরে এমন করে ঢুকছিস, এর অর্থ কি? কোথায় থাকিস তুই?'

'রাজাবাজার।'

'এখানে এসেছিলি কেন?'

'ডিম নিতে।'

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল। সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'বুঝলে হে, ডিমও খাওয়া হচ্ছে, মুরগির গায়ের গন্ধও সোঁকা হচ্ছে—'

রাগে অপমানে শফীর মাথার ভিতর আগুন জ্বলছিল। কি করবে সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। ঠিক তখন মাঠের ওপর রামানন্দকে দেখা যায়। শফীর মনে একটু সাহস বাড়ে। মাস্টারকে দেখে মাধুরীর গলায়ও জল আসে।

মাস্টার যখন লোক দুটোর সঙ্গে কথা বলছিল মাধুরী ঘরের পৈঁঠা থেকে নেমে মাদার ঝোপটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শফীও সেখানে ফিরে যায়। দুজনে দাঁড়িয়ে লোক দুটোর কথা শুনছিল।

'আমার মনে হয় কি, কাল মেলায় মাস্টার গোলমাল করে এসেছে, কপালে পটি দেখে রাতেই তোকে বলেছিলাম; সেই গোলমালের ব্যাপার নিয়েই গুণ্ডা দুটো আজ এখানে এসেছে।'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।' বিড়বিড় করে শফী উত্তর করল।

তারা দেখতে পাচ্ছিল রামানন্দ ক্রমাগত মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর লোক দুটো চোখ লাল করছে, হাতের মুঠো পাকাচ্ছে কখনও।

'ক্লাব' 'ফাংশন' ইত্যাদি টুকরো টুকরো কয়েকটা শব্দ এলোমেলো হয়ে ভেসে আসছিল। মাধুরী এ-সবের এক বর্ণও বুঝতে পারছিল না। শফী কান পেতে শুনছিল।

'আমার মনে হয় ওরা কোনো পার্টির লোক।' মাধুরীর দিকে চোখ ফিরিয়ে শফী এক সময় ফিসফিসিয়ে উঠল।

'কিসের পার্টি!' চোখ দুটো গোল করে ফেলেছিল মাধুরী।

শফী কথা বলেনি, চোখ দুটো ছুঁচলো করে আবার পাকুড় তলার দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে রেখেছে।

'কি হল, বুঝতে পারলি কিছু?'

'হুঁ।' শফী ঘাড় ফেরাল। 'যা ভেবেছি—স্যারকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে, স্যার একদম রাজী হচ্ছে না।'

'অ্যাঁ, কোথায় নিয়ে যাবে!' অস্ফুট আর্তনাদের মতন গলার স্বর করল মাধুরী।

'বোঝা যাচ্ছে না কিছু।' শফী আবার চুপ থেকে পাকুড় গাছতলায় তিনজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কি হল স্যার, চলুন, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আমরা আসিনি।'

'আমি তো বলেছি, আমার ওসব ভাল লাগে না।' রামানন্দর স্বর আগের চেয়েও নরম হয়ে গেছে। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে গাছের পাতা দেখল।

'ঠিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা!' এক নম্বর মাস্তান দু' নম্বরের দিকে চোখ ফেরাল। 'কি করা যায় হে—'

'ঐ তুমি যা বলেছ, সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না।'

এক নম্বর হুট করে চোখ দুটো আবার লাল করে ফেলল। 'দেখুন, আমরা পিসফুলি কাজটা শেষ করতে এসেছি। কোনোরকম গোলমালের মধ্যে যাবার ইচ্ছে নেই। আপনাকে সেখানে পেৌঁছে দিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ। তার অতিরিক্ত কিছু আমরা করব না। সেখানে গিয়ে আপনি বক্তৃতা করবেন কি নাচবেন সেটা ওরা দেখবে, ওরা বুঝবে। পারেন তো সোনালী বাসরের সভ্যসভ্যাদের হাতে-পায়ে ধরে ছেড়ে-দে-মা কেঁদে-বাঁচি করে যদি অব্যাহতি পান সেই চেষ্টা করে দেখুন। কিন্তু এখানে, বিশেষ করে একটা গেরস্থ বাড়ির সামনে, কোনোরকম হাঙ্গামা করা আমরা চাই না।'

'আপনারা গিয়ে বলুন রামানন্দবাবুর শরীর খারাপ হয়েছে, আসতে পারবেন না।'

'তা আমরা কেন বলতে যাব—মিথ্যে কথা!' এক নম্বর ধমক লাগাল। আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি আপনি সুস্থ আছেন, বরং হাসপাতালে আর একটা অসুস্থ লোককে দেখে এই তো গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে চমৎকার মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে এলেন।'

'চলুন স্যার চলুন।' দু নম্বর কিন্তু মোটেই আর রাগ করছিল না, গরম হচ্ছিল না। বরং রামানন্দর চোখে চোখ রেখে ছেলে-ভুলানো চেহারা করে হাসল। 'এখানে তো গাড়িটাড়ি পাওয়া যাবে না—আমাদের সঙ্গে কষ্ট করে একটু হেঁটে বড় রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে—সেখানে ট্যাক্সি মিলবে—ট্যাক্সি করে আপনাকে নিয়ে সাঁ করে আমরা পাইকপাড়া চলে যাব।'

রামানন্দ চুপ।

একটু চুপ থেকে দু নম্বর আবার বলল, 'আপনার তো স্যার এখন সারাদিন অবসর, চাকরি-টাকরি ছেড়ে দিয়েছেন শুনেছি, খামকা ঘরে থেকে করবেনটা কী! সেখানে কত ভাল ভাল লোক আসছে, নাচ গান কবিতা পাঠ আবৃত্তি ড্রামা নিয়ে এলাহী প্রোগ্রাম ওদের—এসব দেখলে-শুনলেও তো মনটা একটু ভাল লাগবে। চলুন।'

গাছের দিক থেকে চোখ নামিয়ে রামানন্দ এবার জোরে মাথা ঝাঁকাল; 'আপনারা বুঝবেন না আমার মেন্টাল কন্ডিশন। এ সব দেখা শোনার মতন মেজাজ আমি অনেকদিন হারিয়ে ফেলেছি—আমি এখন সব কিছু থেকে অ্যালুফ হয়ে আছি—এবং আরো অ্যালুফ থাকব, দয়া করে আপনারা চলে যান।'

'এখানে থেকে সারাদিন আপনি করবেন কি শুনি?' দু নম্বরের গলার আওয়াজ গরম হয়ে উঠল। 'এখন তো মোটে বেলা দশটা। ঘরে থেকে আপনি কোন্ কাজটা করবেন বুঝতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, আমার হাতে কাজ আছে।' রামানন্দ তাদের কারো মুখের দিকে তাকাল না, গলাটাও রুক্ষ করে ফেলল। 'ঘরে থেকে কী করা না করা তার কৈফিয়ত আপনাদের কাছে দেবো না—রাস্তা ছাড়ুন, আমি ঘরে যাই।'

'অ্যাঁ, আবার যে দেখছি আপনি মেজাজ দেখাতে আরম্ভ করলেন স্যার।' রাস্তাটা আগলে রেখে এক নম্বর নতুন করে রুখে উঠল। 'যা বলছি শুনুন, যদি জামা-কাপড় বদলাবার থাকে চট করে বদলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন।'

'আমি যাব না, একবার বলেছি, আপনার যা খুশি করতে পারেন।' রামানন্দ বাড়ির দিকে পা বাড়াল, সঙ্গে সঙ্গে এক নম্বর মস্তান খপ করে তার হাত চেপে ধরল। 'এই! আবার বলছি, তোমার এসব তেওড়ামী আমাদের কাছে চলবে না—'

'শফী!' মাধুরীর চোখ কপালে উঠল। 'গুণ্ডাটা মাস্টারের হাতটা কেমন চেপে ধরেছে দ্যাখ।'

শফী দেখছিল। আস্তে মাথা নাড়ল।

'আমি বললাম তোমাকে, কোনো পার্টি-টার্টির ব্যাপার হবে। স্যার হয়তো ওদের সঙ্গে আগে ছিল, এখন ছেড়ে এসেছে—বা বলা যায় না কিছু, এখানে আসার আগে কলকাতায় স্যার তলে তলে কী সব করত—সে জন্য এদের আক্রোশ, তা না হলে এমন করে দুটো মানুষ স্যারকে চেপে ধরবে কেন!'

'আবোলতাবোল কী সব বলছিস তুই, কিসের পার্টি—কোথাকার পার্টি, এর মানে কি—'

এক সেকেন্ড মাধুরীর মুখটা দেখে শফী আবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিল।

'তুমি এ সব কিছুই বুঝবে না, কলকাতায় থাকলে বুঝতে, পার্টি মানে রাজনৈতিক দল। কলকাতায় এখন হামেশা যা হচ্ছে। একটা না, অনেক দল, অনেক পার্টি, একদলের লোক আর একদলের লোককে মারছে, রাতদিন বোমা ফাটছে, ছোরা মারা হচ্ছে, পাইপগান মেশিনগানের গুলি ছুটছে—'

'অ্যাঁ! তুই বলিস কি, মাস্টার এসবের মধ্যে কোনোকালে ছিল কেউ বিশ্বাস করবে! আমি বিশ্বাস করি না, যার কাপড়ের কাছা ঠিক থাকে না, নিজের ডান হাত বাঁ-হাত যে মানুষ গোলমাল করে ফেলে সে কিনা—'

'কী মুশকিল।' শফী চাপা ধমক লাগাল। 'তুমি চুপ করো তো, কিছুতে কিছু না থাকলে এভাবে দু-দুটো মানুষ এখানে ছুটে এসে স্যারকে খুঁজবে কেন! ওরা একটা হাঙ্গামা করতে চাইছে দেখছ না?'

'তুই কি বলতে চাস সঙ্গে করে গুন্ডা দুটো বোমা পটকা ছোরা পিস্তল নিয়ে এখানে এসেছে—'

'তা কি করে বলব, আরো লোক থাকতে পারে এদের সঙ্গে, হয়তো পেছনে কোথাও বোমা-টোমা নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

মাধুরীর যেন শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। কাঁপছিল সে। শফীর একটা কাঁধ ধরে রাখল।

'দেখছিস! কথায় কথায় লোকটা চোখ লাল করছে, সারাক্ষণ ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে—মনে হয় পকেটে অস্ত্রটস্ত্র আছে।'

'হুঁ', শফী এর বেশি কিছু বলল না। মাধুরীর মতন তার মুখও শুকিয়ে এইটুকুন হয়ে গেছে।

'তা হলে বোঝা যাচ্ছে আপনারা জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছেন।' রাগে উত্তেজনায় রামানন্দ থরথর করে কাঁপছিল।

'সেটা মশাই আপনার ওপর নির্ভর করছে।' এবার দু নম্বর কথা বলছিল। 'আপনি যদি আপসে যেতে না চান, জোরজবরদস্তি করা ছাড়া আর উপায় কি!'

'হুঁ, এর নাম সংস্কৃতি, এর নাম কালচার?' রামানন্দও কম জোর চেঁচাচ্ছিল না। 'পাইকপাড়ার ওরা গুন্ডা পাঠিয়েছে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে। সভ্য শহরের সভ্য ক্লাব।'

দু নম্বর মস্তান সব ক'টা দাঁত ছড়িয়ে একটা বীভৎস হাসি হাসল—

'সব সভ্য দেশেই এটা হয় স্যার, সব যুগেই হয়েছে, শিল্পের নামে সংস্কৃতির নামে কালচারের ধুয়া ধরে অনেক গুন্ডামী হয়েছে। আমরা লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু কখন কোন্ দেশে কি নিয়ে গুন্ডামি হয়, জবরদস্তি চলে, আমাদের ভাল জানা আছে। বন্দুকের ভয় দেখিয়ে স্যার বই লেখানো হয়, ছবি আঁকানো হয়, গান গাওয়ান হয় তার খোঁজ রাখেন? শুনেছি স্রেফ গুন্ডামী করে হিটলার একটা সংস্কৃতিকে আকাশে তুলে ধরতে গিয়ে অনেক সংস্কৃতি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধোঁয়া করে ছেড়েছিল।'

'দরকার কি এর সঙ্গে এত কথা বলে', এক নম্বর দু নম্বরকে পাল্টা ধমক লাগাল। 'সিধা রাস্তায় যখন চলতে চাইছে না উল্লুকটা, আমাদের বাঁকা রাস্তা ধরতেই হবে।'

'ইস্, স্যারকে উল্লুক বলছে লোকটা—' শফী হিসহিস করে উঠল।

'চুপ চুপ!' পিছন থেকে মাধুরী তার দুটো কাঁধ আঁকড়ে ধরল, 'দ্যাখ পকেট থেকে কি একটা বার করেছে লোকটা।'

রামানন্দর মুখে আর শব্দ নেই। তেমন একটা কাঁপছিল না অবশ্য। কিন্তু হাত দুটো শূন্যে তুলে ধরেছে। যেন সে এখন একটা কলের মানুষ।

'যাও, জামাটা পাল্টে এসো।' তার নাকের সামনে পিস্তলটা ধরেছে এক নম্বর মাস্তান।

'আমার আর জামা নেই।' রামানন্দ আস্তে বলল। দু নম্বর মস্তান ছোট করে একটা ধমক লাগাল।

'আরে মশাই, ছেঁড়া জামা গায়ে রেখে আপনি চীফ-গেস্টের চেয়ারে বসবেন কি করে! ঘরে গিয়ে খুঁজে দেখুন, যদি একটা চাদর-টাদর অন্তত থাকে তো শার্টের ওপর জড়িয়ে নেবেন।'

ঘাড় নিচু করে রামানন্দ বাড়িতে এসে ঢুকল। পিছনে শফী ও মাধুরী। দুজনের একজনও কথা বলছিল না।

রামানন্দ তার ঘরে ঢুকে ফাইবারের সুটকেসটা হাতড়াতে লাগল।

'কি খোঁজা হচ্ছে?' মাধুরী দরজায় উঁকি দিল। গলা দিয়ে তার স্বর বেরচ্ছিল না, তা হলেও যেন সে জিজ্ঞেস না করে পারে না।

'জামা।'

রামানন্দ তখনও তার সুটকেশ খুঁজছিল।

'তোমার আর জামা কোথায়? দুখানা ছিল, দুটোই তো গায়ে দিয়ে দিয়ে ছিঁড়েছ।' মাধুরী আর সেখানে না দাঁড়িয়ে বড় ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে চট করে অক্ষয়ের একটা ধোয়া পাঞ্জাবি বের করে নিয়ে ফিরে এল। 'নাও।'

এতক্ষণ পর তার মুখের দিকে তাকাল রামানন্দ। শফীর মুখটাও দেখল। দুটো মুখই নীল, রক্তশূন্য হয়ে আছে। যেন যন্ত্রের মতন তারা হাত পা ফেলছে, নড়াচড়া করছে। একটু জোরে কথা বলতে পারছে না। ভয়ে রামানন্দর দশা হয়েছে এই দুটো মানুষেরও, কেননা পিস্তল উঁচিয়ে রেখে গুণ্ডাটা গাছতলায় তেমনি দাঁড়িয়ে। যেন একটু জোরে কেউ কথা বললে, হইচই করলে, এমনকি কাঁদাকাটা করলে পাগলা কুকুরের মতন গুণ্ডা দুটো ছুটে এসে তিনটা মানুষকেই যে সাবাড় করে দেবে—এক সেকেণ্ডের জন্যও তারা ভুলতে পারছিল না।

তা হলেও উঠোন থেকে বেরোবার সময় রামানন্দ দেখল মাধুরীর চোখ বেয়ে টুপটাপ জল ঝরছে। শফীও যেন মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কান্না লুকোলো।

'আরে আমি ফিরে আসছি, কান্নাকাটির হয়েছে কী!' চাপা গলায় রামানন্দ দুজনকেই সান্ত্বনা দিল।

তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু কাজ হল না। শফী ও মাধুরী ঠিক ধরে নিয়েছে রামানন্দ আর ফিরবে না। ফিরতে পারে না। মেরে ফেলবে, নয়তো কোথাও নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবে।

একটা মানুষকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় ধারেকাছের নিরস্ত্র দুর্বল মানুষগুলি অসহায় চোখে যেমন করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, শফী ও মাধুরীর তাকানো দেখে রামানন্দর অবিকল তাই মনে পড়ছিল।

দরজার ঝোপটার কাছে দুটিতে দাঁড়িয়ে থাকে, আর অগ্রসর হয় না, রামানন্দই

হাতের ইশারা করে এগোতে বারণ করে।

মাস্তানদের একজন সামনে আর একজন পিছনে, নরম বালুর ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় রামানন্দর আর সন্দেহ রইল না, পাইকপাড়ার সোনালী বাসরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে—এটা আসলে ওপর-রং, বাইরের শোভা, ওই ক্লাবটা নির্ঘাৎ কোনও একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের আড্ডা।

উঁহু, রামানন্দ ঘুণাক্ষরেও রাজনীতি করে না, অন্তত সুজ্ঞানে কোনও দলের সঙ্গে কোনোদিন সে মিশেছে মনে করতে পারে না।

তাতে কি, তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বধ করা হবে না ঠিকই, এই বিশ্বাস তার আছে। তবে রাজনীতি করে না, কোনও দলে নেই এমন নিরীহ নিরপেক্ষ শিল্পী সাহিত্যিকদেরও তাদের দরকার হয়!

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য একজন কবিকে কি ঔপন্যাসিককে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা অনুষ্ঠানের সভাপতি বা প্রধান-অতিথির আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসে এমন কতবারই হয়েছে।

শিল্পীকে সম্মান জানানো, শ্রদ্ধা জানানোটা সেখানে কিছু না। আলো, মাইক, তেরপল, চেয়ার ইত্যাদির মতন এইসব অনুষ্ঠানে একজন কবিকে, একজন সাহিত্যিককে কাজে লাগানো, ব্যবহার করা শুধু। তার অতিরিক্ত কিছু না।

যেন রাগ করে রামানন্দ এক সময় কপালের ব্যাণ্ডেজটা টান মেরে খুলে ফেলল। উইণ্ডস্ক্রীনের কাছে টাঙ্গানো ছোট আরশির মধ্যে কপালটা দেখল। বেঞ্জিন ভেজানো তুলোটা একটা বোলতার মতন কামড় খেয়ে লেগে আছে। দেখে রামানন্দর হাসি পেল। তেমন আর কি কেটেছিল, তা হলেও তোড়জোড় করে জগত মণ্ডল তাকে রিকশায় বসিয়ে ডিসপেনসারীতে নিয়ে তো গেল, আর কম্পাউণ্ডার মশাইও ঘটা করে কত বড় একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। একটা পয়সা নেননি। এই সহৃদয়তার দাম দেয় কে!

॥ ২৭ ॥

এক সঙ্গে অনেক মুখ জানালায় উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখে যাচ্ছিল। কেউ কথা বলছিল না। কথা বললেও খুব চাপা গলায় ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে জানালা থেকে সরে পড়ছিল। কেননা তখনি আবার নতুন এক দল এসেছে জানালায় উঁকি দিতে। যেন একটা আজব জন্তুকে ধরে এনে চিড়িয়াখানার খাঁচার মধ্যে পুরে রাখা হয়েছে।

সকলের চোখেমুখে কৌতূহল উপচে পড়ছিল। তারা মজাও কম পাচ্ছিল না। বাচ্চা ছেলেমেয়ের তো সীমা-সংখ্যাই ছিল না, দল বেঁধে বয়স্করাও একবারের জায়গায় দু'বার করে জানালায় উঁকি দিচ্ছিল।

স্বাভাবিক। কথাটা প্রায় রটে গেছে, প্রধান অতিথিকে একরকম জোর করে বেলেঘাটার ওদিকে সল্ট লেকের একটা টালির ঘর থেকে ধরে আনা হয়েছে। মানুষটা কিছুতেই আসতে চাইছিল না।

তাছাড়া, প্রধান অতিথির বেশভূষাটাও কেমন অদ্ভুত। একটা ছোটখাটো পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে এসেছে। মনে হয়, অন্য কারো গায়ের জামা। তা না হয় হল, কিন্তু সদ্য পাট-ভাঙ্গা ফরসা জামার সঙ্গে দারুন ময়লা একটা ধুতি পরে এসেছে, যে জন্য সকলেরই হাসি পাচ্ছিল। পায়ে ছেঁড়া চটি। তা হোক ছেঁড়া চটি, ভদ্রলোকের দু' পায়ে এত বেশি ধুলো জমে আছে যে দেখে কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না,

ঐ পা নিয়ে মানুষটা ডায়াসে উঠে বসবে। হুঁ, সল্ট লেকের বালু, কেউ কেউ বলাবলি করছিল, অনেকটা বালু পার হয়ে এসে তার পরে তো ট্যাক্সি চাপতে হয়েছিল। উপায় কি!

কিন্তু সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছিল যেটা, প্রধান অতিথি মশায়ের আলুথালু চুল। পাগলের মতন দেখাচ্ছিল মাথাটা। তার ওপর সারা মুখে দাড়ির জঙ্গল। যেন কতকাল কামানো হয় না।

কেবল কি চুলদাড়ি, হাতের নখগুলি কত বড় হয়েছে আর কত ময়লা জমেছে নখে, তা-ও পাইকপাড়ার শিক্ষিত সভ্য মানুষদের চোখ এড়াল না।

আর একটা জিনিস। সেই বেলা এগারটায় প্রধান অতিথিকে এ পাড়ার বিশিষ্ট উকিল ভূদেববাবুর একতলার বৈঠকখানায় এনে তোলা হয়েছে। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ, কেবল বন্ধ কেন, রীতিমত একটা তালা-ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছিল।

যেন শুধু তালা ঝুলিয়েই পাইকপাড়ার ক্লাবের ছেলেমেয়েরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি, দু'জন দু'জন করে বাইরের রকটায় বসে দরজা পাহারা দিচ্ছিল।

সভা আরম্ভ হবার আগেই মানুষটা পালিয়ে যেতে পারে এই ভয়?

একটা আরাম-কেদারায় পিঠ ঢেলে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে প্রধান অতিথি মশায়। কখনও সিলিং দেখছে, কখনও দেওয়ালের ছবি, ক্যালেণ্ডারের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

পাশেই একটা টেবিলে ভাতের থালা, তরকারির বাটি দেখা যাচ্ছে। প্রায় পাঁচ-ছ'টা বাটি। সব ক'টাই রুপোর বাটি।

বোঝা যায়, খুব ঘটা করে বেঁধে প্রধান অতিথির মধ্যাহ্ন আহারের জন্য ভাত, ডাল, মাছ ভাজা, মাছের কালিয়া ইত্যাদি আনা হয়েছিল। সঙ্গে দই মিষ্টি।

কিন্তু মানুষটি কিছুই স্পর্শ করেনি। যেমন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল টেবিলে, সব পড়ে আছে।

কেবল ভাত তরকারী কেন। এখন বেলা তিনটে। একটু আগে একটি ছেলে চা এনে রেখে গেছে। সেই চা-ও পড়ে আছে। যেন রাগ করে মানুষটা তা-ও ছোঁয়নি।

তবে হ্যাঁ, সিগারেট টানছে খুব। একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে। ক্লাবের ছেলেরা চার প্যাকেট ফিল্টার টিপ্ড রেখে গিয়েছিল। প্রধান অতিথি এর মধ্যেই দুটো প্যাকেট সাবাড় করে এখন তৃতীয় প্যাকেটের মোড়ক খুলে একটা সিগারেট বের করে নিয়ে ধরিয়ে খুব মৌজ করে টানছে আর ওদিকের দেওয়ালের একটা ক্যালেণ্ডারে রাজহাঁসের ছবিটা খুঁটিয়ে দেখছে।

পাইকপাড়ার মানুষের কাছে ভূদেববাবুর বৈঠকখানায় চুপচাপ বসে থাকা এই ভদ্রলোকটিকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক অদ্ভুত এবং কিছুটা যেন রহস্যজনক বলেই মনে হচ্ছিল।

অনেকেই কবিতা লেখে, উপন্যাস লেখে, নাটক লেখে। পাইকপাড়ার মানুষ সেই সব শিল্পীকে যে কোনোদিন চোখে দেখেনি, এমন তো নয়। পাইকপাড়া এবং পাইকপাড়ার আশেপাশেই কম করেও ডজন দুই কবি, প্রায় আটজন ঔপন্যাসিক এবং চার-ছ'জন নাট্যকার রয়েছেন। তাঁরা সবাই কম-বেশি নামযশ করেছেন, ব্যবসায়ের দিক থেকেও রীতিমত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন বা করতে চলেছেন।

কাউকে এমন আলুথালু মাথায়, মুখে দাড়ির জঙ্গল নিয়ে থাকতে দেখা যায় না। জামা-কাপড়েও কেউ এত উদাসীন অন্যমনস্ক এবং রুচিশূন্য নন।

আর এমন একটা চমৎকার অনুষ্ঠানে যদি প্রধান অতিথি কি সভাপতি করে

আর কাউকে নিয়ে যাওয়া হতো? কলকাতা, কলকাতার বাইরে কত জায়গায়ই তো আদর করে এ'কে ওঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, হেসে আনন্দ করে তাঁরা এই সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসছেন।

আর এই কবি ভদ্রলোককে কিনা একরকম জোর করে, যাকে বলে ধরেবেঁধে এখানে আনতে হয়েছে! এসেছে পর থেকে এখন পর্যন্ত কারো সঙ্গে একটা কথা বলেনি, একটু হাসছে না।

একটু আগে এই বাড়ির একটি ফুটফুটে মেয়ে, যার নাম রিংকু, বছর সাত-আট বয়স—হুঁ, ভূদেববাবুর বড় মেয়ের দিকের নাতনী, মেঘের মতন কালো কুচকুচে চুল, ধবধবে গায়ের রং ও যাকে বলে তার বিশ্ব জয়-করা হাসিটি নিয়ে ভিতরের দিকের দরজার পর্দাটা ঠেলে দাদুর বৈঠকখানায় ঢুকে প্রধান অতিথি মশায়কে আদর করে ভাত খেতে বলতে এসেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোমড়া মুখ করে বসে থাকা ঐ বিদঘুটে চরিত্রের মানুষটি ভুরুটুরু কুঁচকে এমন ধমক লাগিয়েছিল, বেচারা রিংকুর চাঁদের টুকরোর মতন ছোট্ট মুখখানা গাঢ় নীল হয়ে উঠেছিল, কাঁদ-কাঁদ হয়ে তখনি সে পর্দা সরিয়ে আবার বাড়ির ভিতর ফিরে যায়। অথচ রিংকুকে দেখলে আদর করে না, আব্দার করে ও যদি কাউকে কিছু বলে তো তার সেই আব্দার রক্ষা করে না, পাইকপাড়াটায় এমন মানুষ নেই। পাইকপাড়ায় নেই, রিংকু-দের বারাসতেও নেই। রিংকুর মা মীরা পর্দার এদিকে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তখনি মীরা বুঝে গেছে, প্রধান অতিথি করে যে ব্যক্তিটিকে আনা হয়েছে, যাব নাম রামানন্দ সেন, হেনা ওরা যার কাব্যকর্মের গুণকীর্তন করে বাঁচে না, সেই মানুষটার ভিতরে আর যাই থাক, রসকষ বলে কিছু নেই।

বলতে কি, মীরা খুবই আঘাত পেয়েছিল ঐ কবি ভদ্রলোকের ব্যবহারে। এমন কি মনে মনে লোকটাকে ভদ্রলোক ভাবতেও তার আটকাচ্ছিল। চাষার অধম—রিংকুর কান্না-ছলছল মুখটা আদর করে কোলে টেনে নিয়ে তার বলতে ইচ্ছে করছিল।

অথচ এই সোনালী বাসরের ফাংশনের ব্যাপারে পাইকপাড়ার আর দশটি ছেলেমেয়ের চেয়ে ভূদেব উকিলের বড় মেয়ে এই মীরার উৎসাহ কি কম! আজ না হয় বিয়ে হয়ে ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে বারাসতে চলে গেছে। বাবার প্রেসার বেড়ে যাওয়াতে তাঁকে দেখতে মীরা পরশু এখানে আসে। কাল বিকেলেই আবার বারাসাত ফিরে যেত, কিন্তু শুধুমাত্র পাড়ার ক্লাবের এই "অ্যানুয়েল" ফাংশনের জনাই মীরা আজও কলকাতায় থেকে গেছে। সোনালী বাসর যখন ছোট ছিল, এইটুকুন ছিল, চাঁদার বাক্স হাতে নিয়ে মীরা পাড়ার মানুষের দোরে দোরে ঘোরাঘুরি করেনি? ক্লাবটাকে দাঁড় করাতে সেও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিল।

'উঁহু, হেনা সেনের সিলেক্শন মোটেই ঠিক হয়নি, এমন একটা গোঁয়ার-গোবিন্দকে আমাদের এ-পাড়ার এতবড় একটা ফাংশনে চীফ গেস্ট করে আনার কোনো মানেই হয় না।' আর দশটা সমবয়সী গিন্নীবান্নি গোছের মেয়ের কাছে, মহিলার কাছে—যারা ভদ্রলোককে অনুষ্ঠানের আগেই একটু দেখে নিতে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে অবসর হয়ে পান চিবোতে চিবোতে ভূদেব উকিলের বাড়িতে জড়ো হয়েছিল—মীরা না বলে পারেনি। শুনে তারা সকলেই খুব দুঃখ পেয়েছিল। 'না, এক ফোঁটা দুধের মেয়েকে, রিংকুর মতন এমন মিষ্টি মুখের একটা বাচ্চাকে এভাবে ধমকানটা ভদ্রলোকের মোটেই ঠিক হয়নি।' এবং সঙ্গে সঙ্গে তারাও স্বীকার করল, মানুষটা যে ভালরকম একগুঁয়ে জেদী তাতে সন্দেহ কি, কেননা তাদের কানেও কথাটা এসেছে, কবি মশায়টি এখানে আসতে চায়নি, একরকম জোর করেই নাকি তাকে সেই বেলেঘাটার সল্ট লেকের কাছাকাছি কোন একটা জায়গা থেকে এত টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে আনা হয়েছে। বেশ তো, ইচ্ছা না থাকতে পারে,

ইচ্ছের বিরুদ্ধেও একজন কবিকে, শিল্পীকে বা একজন মিনিস্টার কি প্রফেসারকে, হুঁ, যদি লোকে তাঁকে চায়, অন্তত সামাজিক দায়িত্বের কথা চিন্তা করেও আর একটা জায়গায় যেতে হয় বইকি, সেখানকার সভাসম্মেলন, কি এই ধরনের পাড়ার ছেলেমেয়েদের ক্লাবের ফাংশন-টাংশনে বক্তৃতা-টক্তৃতাও করতে হয়, তাতে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয় না। যাঁরা গুণী জ্ঞানী, নিজের ইচ্ছাটাকে সব সময় তাঁরা বড় করে কক্ষনো দেখেন না। 'না হয় অনিচ্ছা নিয়েই এই কবি ভদ্রলোকটি এসেছে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। আর এক বাড়ি থেকে এত যত্ন করে মাছ ভাত রান্না করে খেতে দেওয়া হল, একবার সেসব ছুঁয়েও দেখল না পর্যন্ত। একটা কচি মেয়েকে দিয়ে বলে পাঠানো হল—উঁহু, তিনি কিছুতেই টলবেন না, জেদ করে চা-টা পর্যন্ত খেলেন না, ছি ছি, ভদ্রতা বলেও একটা কথা আছে যে—এমন সৃষ্টি-ছাড়া মানুষকে আমাদের পাড়ায় না আনলেই হতো। কী দরকার ছিল ওকে টেনে আনার!' ভূদেববাবুর বাড়িতে মীরার সঙ্গে পাড়ার ক'জন মহিলার এই ধরনের আলাপ-আলোচনা এবং ভূদেববাবুর নাতনী রিংকুর প্রতি রামানন্দবাবুর রূঢ় আচরণ ও ভাত বা কিছুই না খেয়ে রামানন্দবাবুর গোমড়া মুখ হয়ে একভাবে বসে থাকার সব খবরই সোনালী বাসরের ছেলেমেয়েদের কল্যাণে সেক্রেটারী হেনা সেনের কানে মুহুর্মুহু আসছিল। প্যাণ্ডেল সাজানো নিয়ে হেনা ব্যস্ত ছিল। ডেকরেটারের লোকজন তাদের কাজ শেষ করে দিয়ে সকালেই চলে গেছে। তা হলেও তো কাজ থেকে যায়, যেমন ডায়াসের ওপর ঠিক কোন জায়গায়টায় মাইকটি বসানো হবে, আলোটা কোনদিকে রাখলে ঠিক হবে, নীচে মাটিতে ক' সারি চেয়ার পাতা হবে, সতরঞ্চি বিছিয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের বসবার জায়গাটা কোনদিকে রাখলে সুবিধে হয় ইত্যাদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ক্লাবের বড় ছেলেদের দিয়ে হেনা করাচ্ছিল। তাছাড়া, নাটকের ব্যাপার আছে। রামানন্দর কাব্যনাটিকা নগ্ন গোধূলি অভিনয় করার উপযোগী করে সুন্দর একটা স্টেজ বাঁধা হয়েছে। এই স্টেজেই অবশ্য ছেলে-মেয়েদের নাচ গান আবৃত্তি ক্যারিকেচার মূক অভিনয় এবং ক্লাবের নিজস্ব কনসার্ট পার্টির মিউজিক শোনাবার ব্যাপারগুলি এক এক করে সারতে হবে। স্টেজের জন্যও আলাদা করে আলো পাখা খাটানো হচ্ছিল। হেনা সেন দাঁড়িয়ে সেসব কাজও দেখছিল। আর ও বার বার চোখ রাখছিল হাতের ঘড়ির দিকে। চারটে বাজে। কাটায় কাঁটায় পাঁচটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার কথা। এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হোক হেনা চাইছে না। বিশেষ করে সবচেয়ে দূরের মানুষটিকে অর্থাৎ প্রধান অতিথি রামানন্দকে যখন আনা হয়ে গেছে তখন ঘড়ির কাঁটা ধরে পাঁচটায় ফাংশন আরম্ভ করতে না পারার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

হুঁ, কবি রামানন্দ সেনকে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা, অথচ আজকের এই অনুষ্ঠানে রামানন্দই সব। তিনি প্রধান অতিথি, তাঁর কাব্য-নাটিকা স্টেজে নামানো হচ্ছে।

ক্লাবের ছেলেমেয়েরা একটু পর পর ভূদেব উকিলের বৈঠকখানার টুকরো টুকরো খবরগুলি হেনাদির কানে এনে তুলে দিচ্ছিল।

সোনালী বাসরের প্যাণ্ডেল থেকে ভূদেব উকিলের বাড়ির দূরত্ব দু'শ গজের বেশি না। অথচ এখন পর্যন্ত হেনা কবির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়নি। ট্যাক্সি করে তাঁকে বেলেঘাটা থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা এবং কবি এখানে পেঁছোবার পর গাড়ি থেকে তাকে নামিয়ে ভূদেববাবুর বাড়িতে রাখা, দুপুরে কবির খাওয়া-দাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা, সব কিছুই সরাসরি সোনালী বাসরের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী পুলিনের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল হেনা।

অবশ্য এক সময় কবির সামনে ক্লাবের সেক্রেটারীকে নিজে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিট আগে কবিকে যথোচিত সম্বর্ধনা

জানিয়ে তাঁকে প্যাণ্ডেলে এনে বসাবার দায়িত্ব হেনাকেই নিতে হবে। এই কাজের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিলে তো চলবে না, এবং সেটা উচিতও হবে না।

কথা হচ্ছে, এখনকার এই সমস্ত টুকরো টুকরো খবর, অর্থাৎ রামানন্দ সেন এখানে এসে কিছু খেলেন-টেলেন না, গোমড়া মুখ করে একলা বসে আছেন, একটা বাচ্চা মেয়ে আদর করে কবিকে ভাত খাবার জন্য সাধতে গিয়ে দারুন ধমক খেয়ে কাঁদকাঁদ হয়ে ফিরে এসেছে এবং এই নিয়ে ভূদেববাবুর বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে ঘোর আলোচনা চলেছে—শুনে হেনা সেন খুব যে একটা বিস্মিত এবং বিব্রত বোধ করছিল তা নয়। জেদী একরোখা মানুষ, বিরক্ত হয়ে রাগ করে এখানে ভাত-টাত খাবে না বা কেউ খাবার জন্য অনুরোধ করতে গেলে আরও বেশি রেগে যাবে, রামানন্দ সেন এমনটা, হেনা আগে থাকতেই আশঙ্কা করেছিল। কবির মেজাজ-মর্জি নিয়ে ভূদেববাবুর বাড়িতে মেয়েদের জটলা, বিশেষ করে সেখানে মীরা দেবীর মেয়ে রিংকুর ব্যাপারটা যখন রয়েছে, এমন কিছু অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত না।

হেনা ভয় করছিল অন্য জিনিস।

এখন পর্যন্ত জিনিসটা চাপা আছে। জানার মধ্যে ক্লাবের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী পুলিন জানে, ক্লাবের দুটি বড় ছেলে জানে, আর জানে হেনা এবং যাকে বেলেঘাটা থেকে ধরে আনা হয়েছে সে, অর্থাৎ স্বয়ং কবি। হুঁ, বাইরের দুটি মস্তান গোছের ছেলের সাহায্য নিয়ে রীতিমত রিভলবারের ভয় দেখিয়ে রামানন্দকে প্যাইকপাড়ায় আনতে হয়েছে।

হেনার ভয় ছিল ট্যাক্সি থেকে নেমেই না রামানন্দ চেঁচামেচি করে এখানকার সকলকে খবরটা জানিয়ে দেয়।

কিন্তু অবাক হবার মতন ব্যাপার, গাড়ি থেকে নেমে রামানন্দ কাউকে কোনো কথাই বলছে না। এসেছে পর থেকে একভাবে চুপ করে ভূদেব উকিলের বৈঠক-খানায় বসে আছে।

কিন্তু তাই বলে কি ভয়টা কেটে গেছে! হেনা এক মনে ভাবছে, এখন রামানন্দ চুপ করে আছে ঠিকই, কিন্তু যখন আসরে বক্তৃতা করতে দাঁড়াবে তখন না মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সব ফাঁস করে দেয়!

সঙ্গে সঙ্গে হেনার আর একটা মন বলছে, উঁহু, রামানন্দ সেন এতটা নির্বোধ না, রামানন্দ নিশ্চয় বুঝতে পারছে, এতবড় একটা অনুষ্ঠানে এত লোকের সামনে তার নিজের মুখ থেকে এমন একটা ব্যাপার প্রকাশ পেলে পাল্টা তাঁকেই হাস্যাস্পদ হতে হবে। দু' একজন প্রবীণ হয়তো শুনে খুবই উত্তেজিত হবে, এমন একটা নোংরা কৌশলের আশ্রয় নেওয়ার জন্য খুবই রাগারাগি করবে, ক্লাবের পরিচালক-পরিচালিকাদের অনেক কটু কথা শোনোবে এবং বলা যায় না, কবির প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা জানিয়ে অভিমান করে তৎক্ষণাৎ সভামণ্ডপও ত্যাগ করতে পারে—কিন্তু বাকি সব দর্শক? একটা হাসির রোল পড়ে যাবে প্যাণ্ডেলে। বোমা পটকা ছোরা রিভলবারের হিড়িক চলেছে কলকাতা শহরে। আর ঠিক এমন দিনে সোনালী বাসরের অ্যানুয়েল ফাংশনে এক কবিকে, রিভলবারের ভয় দেখিয়ে চীফ গেস্টের চেয়ারে এনে বসাতে হয়েছে—শুনে সবাই জিনিসটা উপভোগ করবে, কারণ যেভাবেই তাঁকে আনা হোক, কবি যখন শেষ পর্যন্ত এসে গেছে—এবং আসরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও করছে, এই নিয়ে রামানন্দ কাউকে গালাগাল করছে না, কান্নাকাটি করছে না, মাথার চুল ছিঁড়ছে না, চেয়ার টেবিল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে না বা কোনো টেলিফোন বুথে ছুটে গিয়ে থানায় খবরও দিচ্ছে না—সুতরাং এর চেয়ে রসাল উপাদেয় জিনিস সাধারণ দর্শক-

দের কাছে আর কী হতে পারে! রামানন্দর কাব্যনাটিকা দেখতে এসেছে সবাই, এই চমকপ্রদ ঘটনাটাকেও উপরি পাওনা হিসেবে অতিরিক্ত আর একটা অভিনয় হিসাবে তারা ধরে নেবে।

হুঁ, সবটাই অবশ্য হেনার চিন্তা। তার মনগড়া ভাবনা। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে সে বলতে পারে না। যে জন্য হাতের ঘড়ি দেখতে গিয়ে মুহুর্মুহু হেনা ঘামছিল। অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে তার কান মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

একে তো রামানন্দ সেনের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর স্বভাবচরিত্র এখন পর্যন্ত পাইকপাড়ার মানুষ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। হুঁ, যদি প্রকৃতপক্ষে এগুলি সত্য হয়, রামানন্দ সেন মদ্যপ, বেকার, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, একটা গেরস্থ ঘরের বউয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতিয়ে ওই বাড়িতেই বসবাস করছে। একমাত্র ক্লাবের দু' তিনটি ছেলে এবং হেনাই এসব জানতে পেরেছে। আর হেনা বিশ্বাস করে না যদিও, তা হলেও, যতটা হেনার কানে এসেছে যদি তার এক-চতুর্থাংশও সত্য হয় এবং পাইকপাড়ার মানুষের কাছে সেসব প্রকাশ পায় তো এর পরিণামটা কী হবে ভেবে হেনার বুক দুরদুর করছিল। এই মানুষকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে, এই মানুষের কাব্য-নাটিকা অভিনয় করা হচ্ছে, এই মানুষকে ধরেবেঁধে আনা হয়েছে, সকলেই জানে এসবের জন্য সোনালী বাসরের সেক্রেটারী হেনাই দাযী। সে-ই উদ্যোগী হয়ে এসব করছে।

কবি রামানন্দ সেনকে নিয়ে একটা বিশ্রী চিন্তা ঢুকল অধ্যাপিকা হেনা সেনের মাথায। মিস সেনের নীতিজ্ঞান রুচিবোধ এমন কি ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে পাইক-পাড়ার অভিভাবক মহলে নানা প্রশ্ন উঠবে, এতকাল যা হয়নি। এতদিন পর্যন্ত হেনার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ ছিল। যে সোনালী বাসরেব সম্পাদিকা এমন এক সচ্চরিত্রা বিদুষী মহিলা, সেই বাসরে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিতে অভিভাবক-অভিভাবিকারা এতটুকু ইতস্তত করেনি। কিন্তু রামানন্দর ব্যাপারটা জানা মাত্র তাঁদের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠবে, সোনালী বাসরে ছেলেমেয়েদের যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে যাবে, হয়তো পাড়া থেকে ক্লাবটাই তাঁরা তুলে দিতে চাইবেন। কিন্তু সেখানেই কি ব্যাপারটা থামবে। রাণী পার্বতীসুন্দরী কলেজে কথাটা উঠবে। কলেজ কমিটির মিটিং-এ মিস সেনকে নিয়ে তুমুল আলোচনা হবে।

বলতে কি, এই ক'টা দিন, সব বুঝে, সব জেনেশুনেও হেনা প্রায় একটা ঝোঁকের মাথায় এগিয়ে চলেছিল—আমরা শুধু কবিকে দেখছি, তাঁর কাব্যকর্ম দেখছি, তাঁর ব্যক্তিক আচার-আচরণ চালচলন জীবনযাত্রার পদ্ধতি—কিছুই আমাদের দেখবার দরকার নেই। কবি হিসাবে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা জানাব—কবি রামানন্দকে আমরা এখানে আনছি, ব্যক্তি রামানন্দকে আমরা জানি না, চিনতে চাই না।

কিন্তু এখন? রামানন্দ সত্যি এসে যাওয়ার পর থেকে হেনা যেন মনেব আর সেই জোর পাচ্ছে না, অবসন্ন বোধ করছে, যেন অনুতাপও কিছুটা হচ্ছিল। কী দরকার ছিল এমন এক কবিকে আনার। এই শহরে কবির অভাব ছিল?

তা ছাড়া, ডায়াসে উঠে রগচটা জেদী খামখেয়ালী রামানন্দ কী কেলেঙ্কারী করবে তা-ই বা কে বলতে পারে! এখন চুপ করে আছে। তারপর যে বিস্ফোরণ হবে না তার ঠিক কি!

'হেনাদি!'

হেনা চোখ তুলল। সোনালী বাসরের সহসম্পাদক পুলিন দত্ত সামনে দাঁড়িয়ে। যেন এক ফাঁকে বাড়ি গিয়ে পুলিন পোশাক-টোশাক বদলে এসেছে।

'চলুন, পৌনে পাঁচটা বাজে', পুলিন হাসছিল। 'কবিকে আসরে এনে বসাতে হবে।'

হাতের ঘড়িটা আর একবার দেখে হেনা হঠাৎ চুপ করে রইল। প্যাণ্ডেলের মধ্যে বাচ্চাদের কলরব শুরু হয়েছে। তারা ডায়াসের সামনে মাটিতে বিছানো শতরঞ্চিটা ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছে। বড়রা এক এক করে আসতে আরম্ভ করেছে।

'আমি না গেলে হয় না!' শুকনো চেহারা করে হেনা উত্তর করল।

'আপনিই তো সব। তা ছাড়া আমি একা সাহস পাব না। এসে অবধি কবি যেমন চেহারা করে ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে বসে আছে—দেখলে ভয় করে।'

'ভয় করে!' সামান্য রুষ্ট হবার মতন ভ্রূভঙ্গি করল হেনা। 'সব আমার ওপর ছেড়ে দিতে চাইছেন?'

পুলিন শব্দ করল না।

'ওয়েদারটা চমৎকার করেছে।' প্যাণ্ডেলের বাইরে এসে হেনা আকাশ দেখল।

'হুঁ।' পুলিন দেখছিল সেক্রেটারির পরনে হলুদ ও লালে মেশানো জমকালো প্রিন্টের শাড়িটা। খোঁপাটাও আজ বেশ টেনেটুনে আঁট করে বাঁধা হয়েছে। যে জন্য পিছন থেকে ঘাড় ও কাঁধটা কেমন সরু কচি কচি দেখাচ্ছিল।

তবু তো হেনা সেনের তেমন আর কি একটা বয়েস হয়েছে! কিন্তু যারা ইতিমধ্যে বুড়ী হয়ে গেল, প্রৌঢ়ার খাতায় নাম উঠে গেছে, তারা? যেদিকে তাকাচ্ছিল পুলিন দেখছিল, খোঁপায় শাড়িতে জুতোয় ব্লাউজে, কথায় হাঁটায় হাসিতে উচ্ছ্বাসে কচি থাকবার জন্য, আঁটোসাঁটো দেখাবার জন্য, যুবতী সাজবার জন্য কী বিপুল প্রচেষ্টা পাইকপাড়ার মহিলাদের আজ!

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটা প্রকাণ্ড অবদান এটা। চিন্তা করে পুলিন মনে মনে হাসল।

দলে দলে মহিলারা প্যাণ্ডেলের দিকে ছুটছিল।

কেবল এই পাড়ার না, অন্য সব পাড়ার মেয়েরাও যেন আসছিল।

'আমাদের প্রচারটা খুব ভাল হয়েছে হেনাদি, পোস্টারে দারুন কাজ হয়েছে দেখছি।'

'হুঁ।' হেনা সংক্ষেপে উত্তর করল। পুলিন জানে না হেনার মাথার ভিতর চিন্তার ঝড় বইছিল।

ভূদেব উকিলের বৈঠকখানায় ঢুকে পুলিন দত্ত তো বটেই, হেনাও কম অবাক হল কি! কোথায় গোমড়া মুখ! রামানন্দ সেন হাসছে, হুঁ, তাদের দেখতে পেয়ে হাসছে, একা একা এতক্ষণ সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ে শূন্যে আঙটি তৈরি করছিল। হেনা ও পুলিন ঘরে ঢুকতেই আরাম-কেদারা ছেড়ে কবি উঠে দাঁড়াল।

'এই যে মিস সেন—আপনাদের আর কত দেরী?'

'আপনি বসুন।' হেনা বিব্রত হয়ে উঠল। 'ছি, আপনি দাঁড়াচ্ছেন কেন!'

'বসেই বা থাকা যায় কতক্ষণ?' সিগারেটটা ঠোঁটে রেখে রামানন্দ বলিষ্ঠ দু' হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল।

'তাই তো, অনেকক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি!' কথাটা খুব স্পষ্ট করে বলতে আটকাল হেনার. বিড়বিড় করে বলল, কেননা ঘরে ঢুকেই উত্তেজিত ক্রুদ্ধ একটা মানুষকে দেখতে হবে, সেভাবে সে তৈরি হয়ে এসেছিল, রামানন্দর এই প্রফুল্ল সহজ মূর্তি তাকে অন্যভাবে অসহায় বিমূঢ় করে দিল। যে জন্য সরাসরি রামানন্দর চোখে চোখ রাখতে পারল না। কিন্তু দৃষ্টি আড় করে টেবিলের ওপর ঢাকা দেওয়া ভাত-তরকারির থালা-বাটিগুলি দেখতে গিয়ে সে আর একটা বড় রকম হোঁচট খেল।

'কেন যে কিছু খেলেন না—', কাঁপা কুণ্ঠিত গলায় হেনা বলল।

রামানন্দ শব্দ করে হাসল।

'আপনার দেখা একবারও পেলাম না, আমি খাব কেন বলুন!'

লজ্জায় আনন্দে অধ্যাপিকা হেনা সেনের মুখটা টুকটুকে লাল হয়ে উঠল। বস্তুত এমন চমৎকার ব্যবহার রামানন্দর কাছ থেকে সে আশা করেনি। কে বলবে সেদিনের সেই গাছতলার রাগী বদমেজাজী রামানন্দ এটি! পুলিন দত্তও হতভম্ব। একটু আগে কি এখানে এই মানুষকে সে দেখে গেছে? মেজাজ মর্জি চেহারা—সব দিক থেকে একটা মানুষ এক মুহূর্তে এমন বেমালুম বদলে যেতে পারে, নিজের চোখ দুটোকে পুলিন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

এই অবস্থায় শতকরা নব্বুইটি যুবতীর মতন হেনার গলায়ও একটা আদুরে চমক খেলা করে উঠল।

'সত্যি, খুব অপরাধ হয়েছে আমার, আমাকে ক্ষমা করুন, প্যান্ডেলের ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম—ছি ছি, একবার নিজে এসে আমার খোঁজ করা উচিত ছিল।'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।' রামানন্দ আর হাসল না, হেনাকে সান্ত্বনা দিতে প্রায় তব কাঁধে হাত রাখতে গেল, সেটা অবশ্য হেনা আব হতে দিল না, সামান্য পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পুলিনের ঠোঁটে একটা চোরাহাসি উঁকি দিতে দেখে—বিশেষ করে রামানন্দ একবারও পুলিনের দিকে না তাকিয়ে কেবল তাকেই ক্রমাগত দেখছে আর কথা বলছে, হেনা নতুন করে অস্বস্তি বোধ করল। আমি বাইরে কোথাও খাই না। কিছুই খাই না।' রামানন্দর গলার স্বর গমগম করে উঠল। কাজেই আপনার ব্যস্ত হবার কারণ নেই মিস সেন।'

'চা-টাও কিন্তু খেলেন না।'

'খাব খাব, চা তো একটা নেশা। সিগারেট টানছিলাম খুব। তার মানে আর একটা নেশা করছিলাম। দেখুন এর মধ্যেই দু প্যাকেট খতম করে ফেলেছি।'

পুলিন একভাবে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁটের চোরা-হাসিটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। দেখে হেনা মনে মনে বিরক্ত হল।

'তুমি একটু ওদিকে যাও পুলিন, প্রেসিডেণ্ট আসবার সময় হয়ে গেছে—আমি রামানন্দবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'হুঁ, আপনি যান, মিস সেনের সঙ্গে আমি ঠিক প্যান্ডেলে গিয়ে হাজির হব, আপনাদের দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই।' রামানন্দ কিন্তু এবারও পুলিনের দিকে তাকাল না, হেনার দিকে চোখ রেখে শব্দ করে হাসল। হেনা দেখল চোরা হাসিটাকে বেঁকিয়ে ঠোঁটের দু'ধারে ঝুলিয়ে দিয়ে পুলিন ঘাড় গুঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ পুলিন যা বুঝবার বুঝে গেছে। হেনাকে এতক্ষণ না দেখে রামানন্দর মেজাজ খারাপ ছিল, গোমড়া মুখ করে বসে ছিল। হেনা সেন এসে সামনে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দর মেজাজ তোফা খুলে গেছে, মুখে হাসি ফুটেছে। সত্যি কি তাই, হাতের পিঠ দিয়ে কপালের একটা চুল সরিয়ে হেনা চাপা নিশ্বাস ফেলল, পুলিন যদি তাই মনে করে থাকে করার কিছু নেই।

'ভাল কথা', রামানন্দ বলল, 'প্রধান অতিথিকে তো ধরেবেঁধে নিয়ে এলেন। প্রেসিডেণ্ট, মানে আপনাদের এই অনুষ্ঠানের সভাপতিটি কে, এখন পর্যন্ত কিন্তু আমার জানা হয়নি।'

'কেন, ওরা আপনাকে আনতে গিয়েছিল—প্রেসিডেণ্টের কথা আপনাকে বলেনি?' হেনা চোখ বড় করল ও গলায় যতটা পারল বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল।

'নাঃ', রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। অবশ্য আমিও জিজ্ঞেস করিনি—তা ছাড়া যেমন দুই মস্তানকে পাঠিয়েছিলেন—ওদের কেবল দিশা ছিল কতক্ষণে মাঠের ওপর

দিয়ে টেনে হিঁচড়ে আমাকে এনে ট্যাক্সিতে তুলবে, কথা বলার ওদের সময়ই ছিল না।' এবার রামানন্দ টেনে টেনে হাসছিল।

লজ্জায় হেনার মুখ আবার টুকটুকে লাল হয়ে উঠল। কথা বলতে পারল না। মাটির দিকে চোখ রেখে জুতোর ডগা দিয়ে মেজে ঘষল।

'অবশ্য ওই দুই জোয়ানকে পাঠিয়ে ভালই করেছিলেন, আমাকে আনতে পারলেন; তা না হলে কি আর ভাল কথায় আমি আসতাম! ওরা ঠিকই বলেছিল, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না, হি—হি, জলসা, ফাংশন কি সভা-সম্মেলনের নাম শুনলেই যে আমার গায়ে জ্বর আসে, আপনাকে সেদিনই বলেছিলাম। তাই না?'

প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল হেনার, রামানন্দ কী নিয়ে খোঁচা দিচ্ছে হেনার চেয়ে এই জিনিস আর কে ভাল জানে, আর জানে যারা তাঁকে আনতে গিয়েছিল এবং সোনালী বাসরের একটি কি দুটি ছেলে।

'আমাকে ক্ষমা করুন কবি।'

'না না, আর তো আমার মনে কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ নেই, রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, যখন ওরা আমাকে এনে ট্যাক্সিতে তুলল তখনই আমার সব রাগ বিদ্বেষ জল হয়ে গেল, বরং একটু ভালই লাগতে লাগল, ভাবলাম একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসা যাবে মন্দ কি, আপনার সঙ্গেও আর একবার দেখা হবে।'

এক পলক হাতের ঘড়ি দেখে হেনা আবার চুপ করে রইল।

'আচ্ছা', রামানন্দ এবার মিটিমিটি হাসছিল, হেনা ঘাড় গুঁজে আছে তাই দেখল না, 'আপনাদের এই ক্লাব, নামটা সুন্দর, সোনালী বাসর, হুঁ, বাসরের সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা নাচ গান নাটক আবৃত্তির সঙ্গে রাজনীতির চর্চাটাও বেশ ভাল মতন রেখেছে, তাই না? জোর পার্টি করছে?'

হেনার মুখটা হঠাৎ সাদা হয়ে উঠল।

'আপনি একথা বলছেন?' করুণ চোখে সে রামানন্দর মুখের দিকে তাকাল।

রামানন্দর মিটিমিটি হাসিটা এবার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'বলছি এই জন্যে, যেমন অস্ত্রটস্ত্র নিয়ে আপনার বীর শিষ্য দুটি আমাকে ধরে আনতে গিয়েছিল!'

'ভয় ছিল আপনি কিছুতেই আসবেন না, আপনাকে আমাদের কাছে আনা সম্ভব হবে না, যে জন্য, আর কোনো উপায় না দেখে—' হেনার মুখের সাদা ভাবটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক রং ফিরে এল, একটু থেমে থেকে উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, 'আপনাকে যে আমরা কী সাংঘাতিক ভালবাসি এটাই কি তার প্রমাণ নয়?'

'ভালবাসেন!' রামানন্দ আস্তে মাথা ঝাঁকাল। 'তা হলে বলতে হয় বড় নির্মম অত্যাচারী এই ভালবাসা, ভীতিপ্রদও বটে।'

হেনা হঠাৎ কথা বলল না। গাল দুটো নতুন করে লাল হয়ে উঠল তার। রামানন্দর চোখে চোখ রেখে মৃদু গলায় আবৃত্তি করলঃ

স্থবির শয্যার পাশে
নিঃসঙ্গ মোমের আত্মদানের মতো
ক্রমাগত আমি জ্বলেছি,
ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর হিংস্র অরণ্যে ঘুরে
অবিরাম তাকে খুঁজেছি—
চৈত্রের উদ্দাম রোদে
বিবর্ণ বিশুষ্ক কাঁটাগুল্ম পাশে রেখে
অযুত বছর অঝোরে কেঁদেছি—
তারপর আর কাঁদা হয় নাই,

আর খোঁজা হয় নাই,
অথবা মোমের মতন জ্বলেপুড়ে শেষ হওয়া—
ঘরের বিছানায় আরাম করে বসে
মুখে সিগারেট গুঁজে, বিমূর্ত তুলির টানে
কবিতার রং ঢেলে
বিশুদ্ধ উজ্জ্বল মুখ, সুঠাম তনু
এঁকেছি অনেক।

রামানন্দ চুপ করে শুনল।

'এই কবিতা ভোলা যায়! এই কবিকে কাছে না টেনে পারা যায়? বলুন আপনি?' হেনা একটা সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করল। 'একটি মুখ হারিয়ে ফেলে অনেক মুখের মধ্যে কবি নিজেকে বিলিয়ে দিল।'

'সভাপতিটি কে, নিশ্চয় একজন বড় সাহিত্যিক, না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁদরেল পণ্ডিত কেউ? সিনেমার কোনো নামকরা অভিনেতা—অভিনেত্রী? তাঁকেও নিশ্চয় আপনারা এভাবে ধরে এনেছেন? অভিনেত্রী হলে তিনি সভানেত্রী হচ্ছেন, তাই না?'

হেনা ফিক্ করে হাসল।

'তিনি ঘরের লোক, পাড়ার মানুষ—তাঁকে দিয়ে আমাদেব ভয় নেই, মানে যাঁকে আমরা সভাপতি করছি, হয়তো এসেও গেছেন, সকালেও বিপুলানন্দ মর্নিং-ওয়াক্ করতে বেরিয়ে ঘুরেটুরে আমাদের প্যাণ্ডেল দেখে গেছেন।' একটু চুপ থেকে হেনা আবার বলল, 'অবশ্য আগে আমরা ঠিক করেছিলাম কাউন্সিলার বিভূতিদাকে সভাপতি করা হবে—কিন্তু বিভূতিদা নিজেই বললেন, বিপুলানন্দ থাকতে আর কারো সভাপতি হওয়া এখানে মানায় না। উচিতও না অন্য কাউকে এই চেয়ারে বসনো।'

'গুণীটি কে?'

'পাইকপাড়ার বিপুলানন্দ রায়, আপনারা অবশ্য এভাবে পরিচয় দিলে চিনবেন না, মিনিস্টার বি রায়—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যমন্ত্রী।'

রামানন্দ ঘাড় নাড়ল।

'এখন বুঝেছি, এখন চিনেছি, এটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন, এবার আপনাদের মগজের তারিফ না করে পারা গেল না। চমৎকার হয়েছে!'

'চলুন।' আর এক পলক হাতের ঘড়ি দেখল হেনা। 'আর দেরি করা যায় না।'

'চলুন।' সিগারেটের প্যাকেট দুটো রামানন্দ পকেটে ঢোকাল।

রাস্তায় অসংখ্য ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে।

হুঁ, কবি রামানন্দ সেনকে দেখতে চাইছে। না কথাটা ঠিক হল না। তারা চীফ গেস্টকে দেখতে চাইছে।

রামানন্দ ভাবল, আমি কবি না হয়ে যদি মুদি দোকানের খাতা লিখিয়ে হতাম তা হলেও ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখতে রাস্তার দুপাশে এভাবে ভিড় করে দাঁড়াত। যেহেতু একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমাকে চীফ গেস্ট করে আনা হয়েছে।

অবশ্য মুদিদোকানের খাতা লিখিয়েকে কেউ প্রধান অতিথি করে আনবে না, আনবে কি, আজকাল কিছুই বিশ্বাস নেই, আনতেও পারে। সে যাই হোক, চীফ গেস্ট না হয়ে একজন কবি যদি এভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটত, নিশ্চয় ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে এতটা উৎসাহ কৌতূহল দেখা যেত না। কত দিন তো কত রাস্তা দিয়ে হাঁটে রামানন্দ।

রাস্তার দু'পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তারা বিড়বিড় করে কি সব যেন বলাবলি করছিল।

রামানন্দকে তারা যেমন দেখছিল, হেনা সেনকেও কম দেখছিল না।

সেই সঙ্গে ঠোঁট টিপে অনেকেই হাসছিল।

অথচ এ-পাড়ার মেয়ে, সবাই চেনে হেনা সেনকে, রোজই মানুষটাকে দেখছে তারা।

কিন্তু আজ যেন তাদের দেখার চোখের মধ্যে অন্য কিছু ছিল।

এটা রামানন্দ বুঝতে পারছিল না, হেনা বুঝতে পারছিল। যে কারণে প্যান্ডেলের সবটা রাস্তা তাকে ঘাড় গুঁজে হাঁটতে হচ্ছিল। এবং প্রায় স্পষ্ট দু'টো-একটা কথা কানে আসছিল বলে থেকে থেকে সে লাল হয়ে উঠছিল।

যে কারণে কবিকে নিয়ে প্যান্ডেলের ভিতর হেনা ঢুকে পড়ামাত্র প্যান্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে রাস্তার চার-পাঁচটা ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল চালিয়ে জোরে শিস দিয়ে উঠল। হাততালিও দিল দু-একজন। হেনার চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠল।

॥ ২৮ ॥

ভূদেব উকিলের বৈঠকখানায় পর্দার এপারে ভূদেব উকিলের মেয়ে মীরা এবং পাড়ার যে ক'জন মহিলা অপেক্ষা করছিল তারা বড় করে নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে পর্দার ওপারের মানুষ দুটির কথাবার্তা শুনছিল। ভাল বোঝা যাচ্ছিল না, তবে পর্দার ফাঁক দিয়ে দুজনের মাথা নাড়া মুখ নাড়া এবং হাসিটাসিটা তারা খুবই দেখতে পাচ্ছিল।

দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে মীরা এদিকে চোখ ফেরাল। 'যাই বলুন আপনারা, গুণী মেয়ে আমাদের এই মিস সেন, হুঁ, সোনালী বাসরের সেক্রেটারিটি। ঘরে ঢুকেই বদমেজাজী গোঁয়ার কবিটির মুখে কেমন বাহারের হাসি ফুটিয়ে তুলল।'

'আমার তো লোকটার চেহারা দেখে মোটেই কবির মতন মনে হল না, কেমন যেন ফেরিওয়ালা-ফেরিওয়ালা দেখতে।'

'আপনি এ কথা বলছেন মিসেস হালদার—', মিসেস নন্দী ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন। 'আর আমার মেয়ের মুখে শুনি, হেনা নাকি বলে, এত বড় কবি রবিঠাকুরের পরে দেশে আর জন্মায়নি।'

'বলে কিসে আর কিসে—চাঁদে আর জোনাকি পোকায়', হালদার-গিন্নী গাল ছড়িয়ে হাসল। 'তা'লে আমি বলব, হেনা সেনের মাথা খারাপ হয়েছে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে কিনা জানি না।' ভূদেববাবুর মেয়ে মীরা সঙ্গে সঙ্গে ভুরু দুটো পাকিয়ে তুলল। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই গোঁয়ার-গোবিন্দটার সঙ্গে আগে থাকতেই হেনার খাতির ছিল, তাই বেছে বেছে ওটাকে আমাদের ক্লাবের অ্যানুয়েল ফাংশনে নিয়ে এসেছে।'

'তা হলে শুনুন, ইচ্ছে ছিল না কথাটা এখানে বলি, কেননা আমার দুই ছেলেমেয়েও বাসরে আছে—', চ্যাটার্জি-গিন্নী এই প্রথম মুখ খুলল। 'কাল বালিগঞ্জ থেকে আমার ননদ এসেছিল বেড়াতে, কথায় কথায় ছেলের মুখে শুনল, আজ তাদের ক্লাবের ফাংশন। তক্ষুনি ননদ জানতে চাইলে কারা কারা আসছেন। ছেলে তার পিসীকে বি রায়ের নাম বলতে পিসী খুবই খুশী হল। কবি রামানন্দর নাম বলতেই, ননদের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে ছিলাম, মনে হল আমার নন্দা ধপ্

করে আকাশ থেকে পড়ল। সে কি রে—চোখ পাকিয়ে তপুর পিসী সঙ্গে সঙ্গে বলল—বসুমতী, ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে দেশ, অমৃত, সারস্বত, গল্প-ভারতী পাঁচ গণ্ডা কাগজ আমার ঘরে রাখা হয়—তোর পিসার আবার একটু সাহিত্যের বাতিক আছে—ইঞ্জিনীয়ার হলে হবে কি, তাতে অবিশ্যি আমারই লাভ, দুপুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ক'টা কাগজ পড়ি—গল্প উপন্যাস কবিতা কিছুই আমি বাদ দিই না, উঁহু, কোনোদিন তো ঐ নামের কোনো কবির কবিতা চোখে পড়েনি, রামানন্দ সেন, কোথা থেকে আবিষ্কার করল তোদের হেনাদি এই রত্নটিকে!'

'তা হলে, আপনারা শুনুন—ভাবছিলাম কথাটা বলব না, বিয়ের আগে এই ক্লাবের জন্য আমরা কী না করেছি—জানি না, এখন তিনি সোনালী বাসরের নতুন সেক্রেটারী হয়েছেন, অধ্যাপিকা মানুষ, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু কোন্ বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে যে ক্লাবের এত বড় একটা ফাংশনের ব্যাপারে এই লোকটাকে আমদানি করল মিস সেন, ঈশ্বর জানে। আমার বারাসতের বাড়ির পাশেই থাকেন ভদ্রলোক, ওঁর বিশেষ বন্ধু, হুঁ নিশিকান্ত চক্রবর্তী নাম, রিংকুর বাবার বয়সী, ও তো ডাক্তার—তা হলে হবে কি, নিশিবাবু একজন মস্ত বড় কবি—তার ওপর ডক্টরেট করেছেন, এখন ইউনিভার্সিটির লেকচারার, দেখুন, একসঙ্গে কতগুলো গুণ থাকে একটা মানুষের—ছুটির দিন সকালবেলা ওঁর চেম্বারে এসে আড্ডা জমানো চাই-ই, আর বললে বিশ্বাস করবেন না মিসেস হালদার, মিসেস নন্দী—কার্তিকেরও বুঝি এত রূপ থাকে না। ফরসা মোটাসোটা, তেমনি উঁচু লম্বা, কী নাক কী চোখ—পরশু এসে যখন চীফ-গেস্টের নামটা শুনলাম, আমি তো একেবারে থ—নামটাই তো বিদ্ঘুটে, সেকেলে, রামানন্দ—আজ তো কবি মহারাজকে চোখেই দেখলাম, উঃ, যেমন জামাকাপড় তেমনি চেহারা—আমাকে যদি একবার খবর দিত ওরা, ক্লাবের ফাংশনের দিন একজন চীফ গেস্ট আনা হবে—তৎক্ষণাৎ ওঁকে দিয়ে নিশিবাবুকে বলাতাম, এক কথায় ভদ্রলোক রাজী হতেন। কিন্তু খবর দেবে কে—তা ছাড়া, হেনাই দেখছি এখন ক্লাবের সর্বেসর্বা—কোথা থেকে খুঁজেপেতে নিজের খাতিরের এক চাষাড়ে চেহারার কবিকে ধরে নিয়ে এল।'

'তাই তো!' মিসেস হালদার গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। 'যাকে আনা হচ্ছে একটু নামধাম তো থাকতে হবে, দেখতে-শুনতেও সভ্যভব্য হওয়া চাই—চীফ গেস্ট—পদটি তো যা-তা নয়, যেখানে কিনা এত বড় একটা নামী মানী মানুষ, দেশের একজন নেতা, মিনিস্টার বি রায়কে সভাপতি করা হল—এমন একটা হতকুচ্ছিত চেহারার মানুষকে চেয়ার দিয়ে মন্ত্রীর পাশে বসাচ্ছেই বা হেনা সেন কোন্ লজ্জায়, আমার তো মাথায় আসছে না।'

'আপনারা দেখবেন এর জের কদ্দুর গড়ায়—', মীরা জোরে মাথা ঝাঁকাল, শূন্যে ডান হাতের তর্জনীটা দু'বার আন্দোলিত করল। 'পাঁচটা ছেলেমেয়েকে নিয়ে এই ক্লাব, হেনার নিজস্ব বলতে এখানে কিছু নেই, আর এই বছর ক্লাবের অ্যানুয়েল ফাংশনে কিনা সে এমন একটা কাণ্ড করে বসল—দেশ জুড়ে কেউ কোনোদিন নাম শোনেনি এমন এক ভূতকে এনে বসিয়ে দিলে মিনিস্টারের পাশে! মিসেস হালদার ঠিকই বলেছেন, চক্ষুলজ্জা থাকলে হেনা সেন এই কাজ করত না। আমি আরও বলব, হেনার এটা দুঃসাহস—যেহেতু গার্জিয়ানরা চুপ করে থাকেন, কোনোদিনই মিস সেনের কাজের দোষ দেখতে পান না, মিস সেনের সব কিছু ভাল—আর সেই সুযোগ নিয়ে হেনা যা খুশী করছে।'

উত্তেজনায় মীরা কাঁপছিল।

মিসেস চক্রবর্তী হাতের ঘড়ি দেখল।

'চলুন, সময় হয়ে গেছে, এবার প্যান্ডেলের দিকে যাওয়া যাক, এখনি ফাংশন আরম্ভ হবে।'

'আপনারা যান, আমি যাব না। হেনা সেনের সিলেক্ট করা একটা ফোর্থ ক্লাস কবির বক্তৃতা না শুনলেও আমার ঘুম হবে—অ্যাঁ, আমাদের বাড়ি এটা, আর এই বাড়িতে বসে কিনা আমার একফোঁটা মেয়েকে এভাবে লোকটা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গেল—অপরাধ কী? না, আমার রিংকু তোমাকে আদর করে খেতে বলেছিল—আচ্ছা!' দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে মীরা এবার নিজের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। 'এই চৈত্রে আবার ইলেকশন হচ্ছে না! এবার ওই হেনা কী করে সেক্রেটারী হয় আমিও দেখে নেব। পাইকপাড়ার মেয়ে আমিও, বিয়ে হয়ে গেছে বলে কিছু বিলেত চলে যাইনি, বারাসতে থাকি—এবার ইলেকশনের সময় এক মাস এসে আমি পাইকপাড়ায় থাকব—তুমি যা খুশী করবে, আর বছর বছর সেক্রেটারীশিপটি তোমার থেকে যাবে, এবার আর সেটি হতে দিচ্ছি না। রামা শ্যামা যাকে খুশী, যেহেতু তোমার খাতিরের লোক, প্রধান অতিথি করবে—এই একটা পয়েন্টই আমি এবার গার্জিয়ানদের সামনে তুলে ধরব, সাত জন্মে রামানন্দ সেনের নাম কেউ শুনেছে কিনা বা রামানন্দ সেনের এক ছত্র কবিতা কেউ কোনোদিন কলকাতার অন্তত একটাও নামকরা কাগজে ছাপা হতে দেখেছে কিনা—অ্যাঁ! তা-ও ভয় পেয়ে শুনেছি লোকটা এখানে আসতেই চায়নি, স্বাভাবিক, সব শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস এখানে, এখানকার একটা ক্লাবের কালচারাল ফাংশনে দাঁড়িয়ে দু'কথা বলার মতন বিদ্যাবুদ্ধি পেটে থাকলে তো সাহস পাবে—আর ঐ মানুষকে হেনা শুনছি কাকে কাকে পাঠিয়ে একরকম জোর করে নিয়ে এসেছে—এ বছর চীফ-গেস্ট কবল তার জানা মানুষকে, আশকারা পেলে সামনের বছর হয়তো প্রেসিডেণ্ট করে বসবে আবার তার আর-এক জানা মানুষকেই—পাইকপাড়াটাকে মগের মুলুক পেয়েছে ওই ছুঁড়ি।'

'মীরাদি, আমরা চলি।' মিসেস নন্দী আস্তে বলল।

মীরা শব্দ না করে শুধু ঘাড়টা কাত করল।

'একবার উঁকি দিয়ে আসতে পারতেন।' মিসেস চক্রবর্তী ঘর থেকে বেরোবার আগে মীরার দিকে আর একবার তাকাল।

'আপনারা যান ভাই, আমার শরীরটাও বিশেষ ভাল নেই।'

আর বাক্যব্যয় না করে হালদার-গিন্নী চক্রবর্তী-গিন্নী নন্দী-গিন্নী এবং তাদের সঙ্গে রামানন্দকে দেখতে এসেছিল এমন আরও দু-একটি মহিলা ভূদেব উকিলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

'খুবই কাঁচা কাজ করেছে এটা হেনা সেন।' রাস্তায় নেমে হালদার-গিন্নী একবার মন্তব্য করল।

'মীরাদির লেগেছে, রিংকুর ব্যাপারটা তো আছেই, তা ছাড়া ক্লাবের ফাংশনে ঐ লোকটাকে আমদানি করাতে খুবই চটে গেছে, সোনালী বাসরের জন্য এককালে মীরাদিও খুব খেটেছিল।'

'আমিও শুনেছি, বিয়ের আগে মীরা বোস নাকি ক্লাবটার সেক্রেটারিও হয়েছিল, খুবই অল্প সময়ের জন্য, মাস দু'তিন, তার পরেই বরের সঙ্গে বারাসত চলে যায়।'

গেট-এর মুখে ব্যস্ততার মধ্যেও পুলিনের সঙ্গে ক্লাবের আর দুটি বয়স্ক ছেলের, যাকে বলে বেশ একটু ফিসফাস রগুড়ে আলোচনা চলছিল।

'আরে বাবা, মিষ্টি চেহারার ওই গুর্ণ, এসেই যেমন রাগারাগি দাপাদাপি করছিল রামানন্দ—এখন একেবারে ঠান্ডা, মেড়ার মতন কেমন মুখ বুজে আমাদের হেনাদির সঙ্গে সুড়সুড় করে প্যান্ডেলে ঢুকল।'

'তোরা তো তখন দেখিসনি, উকিলের বৈঠকখানায়, এসেই যেমন ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে গুম মেরে বসে ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল রামানন্দ বুঝি সামনে পেলেই কাউকে ঘুষিটুসি বসিয়ে দেয়—ব্যস্, যেই না হেনা সেন ঘরে ঢুকল, একেবারে কাদাজল—'

'সব বেটাই তাই, কবি হোক মন্ত্রী হোক ডাক্তার হোক প্রফেসার হোক—মেয়েমানুষ দেখলেই হয়ে গেল। তায় কিনা হেনা সেনের মতন সুন্দর আঁটোসাঁটো শরীরের যুবতী।'

'দেখছিস না, মাথার চুল পেকে শনের নুড়ি, শুকনো খেজুরের মতন গায়ের চামড়া কুঁচকে দলা পাকিয়ে আছে, আমাদের মৎসমন্ত্রী, এসেই আর কারো খোঁজ নেই, কেবল হেনা কোথায়, হেনা গেল কোথায়—যেন হেনা সেনকে যতক্ষণ না প্যাণ্ডেলের মধ্যে দেখছিল হার্ট ফেল্ করার অবস্থা!'

'বুড়ো হলে হবে কি, বাঁদরামি ঠিক থেকে যায়।'

পুলিন আর দাঁড়ায় না, ওপেনিং সঙ আরম্ভ হয়ে গেল। কাজেই সহ-সম্পাদককে পড়ি-মরি করে ওদিকে ছুটে যেতে হল। তাতে এদিকের গেট-এর মুখের আলোচনাটা কিন্তু বন্ধ হল না। বরং সেখানে আরও দুজন এসে পড়াতে ফিসফাস গুজগুজটা জমল ভাল।

'রামানন্দর রগের চুল পাকতে আরম্ভ করেছে।'

'দেখেছি—বললাম তো, কবি হোক মন্ত্রী হোক ডাক্তার হোক প্রফেসার হোক—সব বেটা আলুর দোষে ভুগছে। ঐ দ্যাখ, ডায়াসের ডান দিকে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল হরগোবিন্দ বসাক বসে আছে, হুঁ, রামানন্দর ঠিক পেছনটায়, সত্তর ছুঁয়েছে বয়েস, এটিরও মাথার চুল শনের নুড়ি, ভক্তকবি তুলসীদাসের ওপর রিসার্চ করে ডক্টরেট হয়েছিল জানিস তো, নিরামিষ খায়, কেমন প্যাটপ্যাট করে বাচ্চা মেয়ে দুটোকে দেখছে।'

'ছুঁড়ি দুটো প্রিন্সিপালের গলায় কিন্তু মালা দিল না। কেমন চেহারা হয়েছে বুড়োর দ্যাখ্।'

'উঁহু, প্রিন্সিপাল মালা পাবে কেন, প্রেসিডেন্ট আর চীফ গেস্টই শুধু পাবে। এই তো নিয়ম।'

'সেটা কাজের কথা না। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের, মানে যাঁরা ডায়াসের ওপর সভাপতি আর প্রধান অতিথির সঙ্গে বসেন, তাঁদেরও মালা দিতে হয়—দেওয়া উচিত—আফ্টার অল একটা কলেজের প্রিন্সিপাল।'

'তবে তো আমাদের কাউন্সিলার বিভূতিদাকেও মালা দিতে হয়। প্রেসিডেন্টের চেয়ারের ঠিক পেছনেই বসে আছে।'

'নিশ্চয়, আমাদের ক্লাবের জন্য কাউন্সিলার অনেক কিছু করেছে। চারদিকে গোলমাল চলছে, পুলিস কোথাও আজকাল কোনো রকম মিটিং-ফিটিংয়ের পারমিশনই দিচ্ছে না, কিন্তু ও সি-কে বলে বিভূতিদা আমাদের পারমিশন ঠিক পাইয়ে দিলে, কর্পোরেশনকে বলে রাস্তার আলোর লাইন থেকে লাইট পাইয়ে দিলে—এই অবস্থায় লোকটা কি ক্লাবের কাছ থেকে একটা মালা আশা করে না?'

'একটা মালার দাম তিন টাকা।'

'চুপ, ওই দ্যাখ, মন্ত্রীমশাই হেনা সেনের পাছায় ঠিক হাতটা ঠেকিয়ে দিলে।'

'আলুর দোষ, বললাম না?'

'আপনারা চুপ করুন, চুপ করুন—', মাইক গর্জন করে উঠল। পুলিন দত্ত আবার গেট-এর কাছে ছুটে এল।

'এই প্রতুল, তুমি ভাই একটু মেয়েদের ওদিকটায় যাও, ভীষণ চেঁচামেচি

করছে, একটা কালচারাল ফাংশন, অ্যাণ্ডাবাচ্চা সব সঙ্গে করে এনেছে—সন্তোষ, তুই ভাই ডায়াসের সামনেটা দ্যাখ, ছোঁড়াগুলো এত পাজি, সবটা শতরঞ্জি জুড়ে বসে অনবরত কথা বলছে।'

॥ ২৯ ॥

'আমাদের ফাংশন আরম্ভ হয়ে গেছে—দয়া করে আপনারা চুপ করুন। দুধের বাচ্চাকে মাই দিয়ে কান্না থামান—'

'ইস্, অনেক লোক হয়েছে—' ·

'তাই তো, প্যাণ্ডেলে আর জায়গা হচ্ছে না।'

'পাড়ার তো বটেই—বে-পাড়ার মানুষ কত এসেছে, একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। মেয়েছেলেই বেশি।'

'নাটক হবে শুনেছে। তা ছাড়া নাচগানও আছে।'

'হ্যাঁগা দিদি, কার নাটক? বিশ্বরূপায় এই নাটক হয়েছিল?'

'কাগজটা দেখুন না। বিশ্বরূপা-রংমহলের নাটক এরা করবে না।'

'তাই তো, উঁহু, ছাপার ভুল, নগ্ন গোধূলী কেন, লগ্ন-গোধূলী হবে।' একজন আর একজনকে বোঝাল। 'নতুন বই মনে হয়।'

'তার মানে গোধূলী লগ্নের বিয়েটিয়ে নিয়ে একটা নাটক, কেমন দিদি?'

হালদার-গিন্নী চক্রবর্তী-গিন্নীর কনুইয়ে একটা চোরা-চিমটি কাটল। চক্রবর্তী-গিন্নীও সামনের সারির মহিলা দুটির কথা শুনছিল।

'এখনো দেশে কত মূর্খ অশিক্ষিত মেয়েছেলে আছে!' চক্রবর্তী-গিন্নীর কানের কাছে হালদার-গিন্নী মুখটা নিয়ে চাপা গলায় হাসল। 'রামানন্দ সেনের নগ্ন-গোধূলী কাব্য-নাটিকার ব্যাখ্যা হচ্ছে।'

ওপেনিং সঙ থামতে মাইকটা আবার গর্জন করে উঠল। 'আপনারা চুপ করুন, চুপ করুন! দুধের বাচ্চার কান্না থামান।'

'কবিটিকে দেখলেন, মধুবাবু?'

'হুঁ।' মধুবাবু ঘাড় কাত করলেন।

'যেমন চেহারা তেমনি পোশাক কবির'—মধুবাবু চাপা গলায় হাসলেন। 'আমি তো প্রথমটা ভাবলাম আমাদের মিনিস্টারের সঙ্গে দারোয়ান-টারোয়ান এসেছে।'

'অ, আপনি বুঝি মৎস-মন্ত্রীর দারোয়ানকে দেখেননি! এর চেয়ে ঢের ভাল পোশাক মশাই দারোয়ানের, চেহারাটাও চমৎকার।'

'তাই নাকি, আমি দেখিনি—কিন্তু এ একেবারে প্রোলিটারিয়েট চেহারা—দেখে মনে হয় না ভেতরে কালচারের ছিঁটেফোঁটাও আছে।'

'কিন্তু ক্লাবের ছোঁড়ারা তো বলছে, দারুণ কবি, আধুনিক কবিদের শীর্ষে।'

মধুবাবু নাকের নিচে হাসলেন।

'আজকালকার ছোঁড়াদের কথা! হুজুগে পড়ে কী যে না বলছে, কী যে না করছে—'

'আসল কথাই হল সেইখানে—', মধুবাবু বিজ্ঞের মতন ঘাড় কাত করলেন। বুড়োদের সঙ্গে, প্রবীণদের সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ নেই, কিছু একটা জিজ্ঞাসাবাদ নেই—খরচ-পত্তর করে এতবড় একটা ব্যাপার না হয় জুড়েছ—কিন্তু মন্ত্রীর পাশে এমন একটা লোককে তোমরা এনে বসালে কি করে! দেখে আপনার

মনে হয় এই লোকের মুখ দিয়ে দুটো ভাল কথা শোনার মতন কিছু বেরোবে?'

'আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি—কাগজে নামটা দেখেই অবশ্য ভক্তি ছুটে গিয়েছিল, রামানন্দ সেন, বুঝি ঊনবিংশতি শতাব্দীর মানুষ! এমন সেকেলে নামের কোন কবি কি করে আধুনিক কবি হয়ে গেল মাথায় আসছিল না—এখন চোখের সামনে কবি মহারাজের মূর্তি দেখে বাকি সন্দেহটুকু দূর হল—হুঁ, একটা প্রাইমারী টিচারও এর চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট কেতাদুরস্ত থাকে বলে আমার ধারণা।'

'আপনি বলছেন কেতাদুরস্ত—কেমন একটা গুণ্ডার চেহারা করে বসে আছে দেখুন। লাল লাল চোখ; লোকটার দিকে, পাশে বসলে কি হবে, মিনিস্টার একবারও কিন্তু তাকাচ্ছে না।'

'আমার তো মনে হয় মন্ত্রীমশায় এই জন্য খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অস্বস্তিবোধ করছেন এমন এক কবির পাশে বসে।'

'কার আমদানি?'

'এরাই, ক্লাবের ছেলেমেয়েরাই কোথা থেকে জোগাড় করেছে।'

হাতের তেলো দুটো ঘুরিয়ে শিববাবু ভেংচি কাটলেন। 'মানে নতুনত্ব একটা কিছু করা চাই?'

'তা ছাড়া আর কি!' শিববাবুর কথা বলার ধরন দেখে কালীবাবু হাসলেন। 'এসেই যখন পড়েছি, কি আর করা যায়, নিজেদের ছেলেমেয়েরাও যখন এর মধ্যে আছে—ঐ আমাদের মিনিস্টারের মুখ থেকে দুটো ভ্যালুয়েবল কথা, সারগর্ভ কিছু শোনা যাবে, এটাই লাভ, হা-হা।'

'আপনারা চুপ করুন।'

কালীবাবু ও শিববাবু চুপ থেকে একটা শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে ডায়াসের ওপর উপবিষ্ট কয়েকটা মূর্তির মধ্যে বেছে নিয়ে একটা মূর্তির দিকেই তাকিয়ে রইলেন। শুকনো খেজুরের মতন চামড়া কুঁচকে গেলে হবে কি, পাকা মর্তমান কলার মত রঙ এখনও হাসছে, চুনট করা শান্তিপুরী ধুতি, সাদা নাগরা, গরদের পাঞ্জাবি, দু' হাতের আঙুলে পদ্মরাগ মণি, পুষ্পরাগ মণি, হীরা ইত্যাদি জ্বলজ্বল করছে, একটু আগে সামনে দিয়ে যখন ডায়াসের দিকে যান, ল্যাভেণ্ডার ডিউ-এর গন্ধ—যা কিনা রূপসী যুবতীদের গা থেকে উঠে আসে, মন্ত্রীমশায়ের গা থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

'একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে না!'

'সরাসরি অ্যাসেম্বলী থেকে এখানে চলে এসেছেন যে।'

'তাই হবে, বাজেট নিয়ে খাওয়াখাওয়ি চলেছে সেখানে, তুমুল উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন আমাদের মিনিস্টার সাহেব—'

'এরা এত দেরী করছে কেন!'

'মাইকটা গোলমাল করছে।'

'হ্যাঁ রে শর্মিলা, আমার কেমন ভয় করছে, আবার রামানন্দবাবু কেমন গুম মেরে আছেন, যেন এখনি উঠে আসতে পারলে বাঁচেন।'

'হুঁ, তাই তো, হেনাদিকে দেখছি না!'

'এই মাত্র গ্রীনরুমের দিকে গেছেন।'

'হেনাদি কাছে না থাকলে আমার মনে হয় না রামানন্দবাবুকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা কথাও বলাতে কেউ রাজী করাতে পারবে। দেখছিস না, কী রকম বিচ্ছিরি চোখ-টোখ লাল করে চুপচাপ বসে আছে, যেন এসব অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না, সবই পোশাকী ব্যাপার, কারো দিকে তাকাচ্ছেও না, কারো কোনো

কথা শ্নছে বলেও মনে হচ্ছে না। কেবল রাগে ফ্লছে।'

'আগে কি প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস হবে, না তার আগেই চীফ গেস্ট-এর বক্তৃতা হবে!'

'কি জানি', উর্মিলার দিকে তাকাল না শর্মিলা। 'এসব নিয়ম-টিয়ম আমি জানি না—আমার ভয় করছে, সত্যি না তোর কথাই ঠিক হয়—রামানন্দবাবুকে কিছু বলতে হয়তো শেষ পর্যন্ত রাজী করানো যাবে না।'

'মনে হচ্ছে হেনাদি আসতে দেরী করলে এখনি লাফিয়ে ডায়াস থেকে নেমে প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে যাবে। ভীষণ উসখুস করছে, দ্যাখ।'

'আমার পাশের ওই মহিলা বলছিল, এমন বদমেজাজী গ্ন্ডা-গ্ন্ডা চেহারার লোকটা কবিতা লেখে কেমন করে!'

'তা তো বটেই।' শর্মিলা নিজের মনে হাসল। 'সাধারণ মানুষ এরা, কি করে জানবে—'

'আপনারা দয়া করে চুপ করুন। এত কথা বলবেন না।'

'মাইকটা ঠিক হয়েছে যেন!'

'তোর মনে আছে শর্মিলা, রামানন্দ সেনের 'ইচ্ছে করে'-র ক'টা লাইন?'

'উর্মিলা সুর করে চাপা গলায় আবৃত্তি করলঃ

'আমার ইচ্ছে করে
তোমার সবুজ চুলের ভেতর
মুখ লুকিয়ে রাখি,
বুকের গন্ধে নাক গ‍ুঁজে দেই—
তোমার ঘুমের শ্বাসে শ্বাস মিলিয়ে
ডোরাকাটা বাঘ হয়ে বড় বড় হাই তুলি।'

উর্মিলা থামতে শর্মিলা সুর করে বললঃ

'অন্ধকারে কাঁদিও না
তারা খসে পড়বে,
তারারা কী ভয়ংকর জান না তুমি
একটি নক্ষত্রে কোটি বৈশ্বানরের জ্বালা—
চুপ করে থাকো,
চুপ থাকা ভালো, কবরের
মতন স্তব্ধ নিঃসঙ্গ—
তবু যদি ফুল, বিষের মতন নীল
ঘাসফুল ফোটে।'

'ভোলা যায় না, সত্যি ভোলা যায় না', উর্মিলা একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'মহিলা ঠিকই বলেছে, একটা গোঁয়ারগোবিন্দ বদমেজাজী মানুষের হাত দিয়ে কি করে এমন আশ্চর্য কবিতা বেরোল—'

'সাইলেন্স্'

'এই চুপ! সভাপতির ভাষণ শুরু হয়েছে—'

'উঁহু, প্রধান অতিথিকে কিছু বলতে অনুরোধ জানাচ্ছে সভাপতি—'প্রধান-অতিথি মহাশয় আমাদের কিছু বলুন।'

'ছেঃ, মিনিস্টার দেখছি কবি ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত, দায়সারা গোছের মতন করে কথাটা শেষ করল—'

'উঁহু, মনে হল যেন ঠাট্টা করল, কেমন একটা সারকাস্টিক টোন শুনলেন না!'

'অস্বাভাবিক কি, এতবড় একজন মিনিস্টার, পাশেই চেয়ার নিয়ে বসেছে

কোথাকার হাঁদাকান্ত এক কবি—একেবারে মফঃস্বলের চেহারা, এই মানুষ এমন একটা কালচারাল ফাংশনে—'

'দেখুন, দেখুন, উঠে দাঁড়িয়েই গোঁয়ারটা হাতের মুঠ দুটো কেমন পাকাচ্ছে। চোখ দুটো দেখলে মনে হয় গাঁজা টেনে এসেছে—'

'চুপ করুন—আপনারা কথা বলবেন না।'

'হুঁ, গাঁজা-টানা চোখ, ঘুষি পাকাচ্ছে, গলার রগ ফুলে উঠছে—বক্তৃতা করতে উঠে কী কেলেঙ্কারি বাঁধাবে কে জানে—শুনুন কী বলছে—'

ঃ 'সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! ভদ্রমহিলাগণ! প্রগতিপরায়ণা যুবতী ভগিনীগণ এবং আমার তরলমতি যুবক ভাইগণ—'

সঙ্গে সঙ্গে তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে, গালে জিভ লাগিয়ে বা ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুকচাক ইসউস ছ্যাঁকছ্যাঁক নানা রকম শব্দ প্যান্ডেলের এমাথা থেকে ওমাথা ছড়িয়ে পড়ল।

'সম্বোধনটা পর্যন্ত কবতে শেখেনি—সাধারণ ভেকোরাম জানা নেই, শুনলেন নৃপতিবাবু', অধ্যাপক প্রাণেশ চক্রবর্তী অধ্যাপক নৃপতি গুপ্তর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন। দুজনই পাইকপাড়ার মানুষ।

নৃপতিবাবু ঘাড় নেড়ে কেবল একটা শব্দই উচ্চারণ করলেন,—'হোপ্‌লেস!'

ঃ 'আমাব এখানে আসার ইচ্ছে ছিল না, এসব হাবিজাবি জিনিস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান মোটেই সহ্য হয় না—কিন্তু আমার ব্যাড-লাক, জোর করে আমাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে—' এই পর্যন্ত বলে প্রচন্ড শব্দ করে রামানন্দ কাশল, উত্তেজনায় কাঁপছিল। 'একটু জল।' কেশে হাঁপাচ্ছিল, একটি ছেলে ছুটে গিয়ে কাচের গ্লাসে করে জল নিয়ে এল, এক সঙ্গে সবটা গলায় ঢেলে রামানন্দ আবার শুরু করলঃ 'হুঁ, জোর করে—তবে এখানে আমাকে নিয়ে আসার জন্য সঠিক কী প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ কবা হয়েছিল সেটা অবশ্য আমি বলব না, বলা উচিত হবে না, কেননা আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে আন্তরিক ভালবাসেন বলেই যে এভাবে আমাকে ধবে আনা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে ওই যে মিষ্টি চেহারার অধ্যাপিকাটি, মিস সেন, মনে হল আমাকে সত্যি খুবই ভালবাস্েন, প্রায় আমার প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতন অবস্থা—'

এবার আর শুধু ইসউস চুকচাক ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ না, প্যান্ডেলের মধ্যে কোথাও কেউ মুখের ভিতর আঙুল গুঁজে জোর সিটি দিয়ে উঠল। একটা অস্পষ্ট হাততালি এবং সেই সঙ্গে একটা ইচ্ছাকৃত কাশির শব্দও শোনা গেল।

আশ্চর্য, কথাটা বলেই রামানন্দ দাঁত ছড়িয়ে হাসল, অথচ তখনও দু' চোখ লাল, গলার রগ ফোলা, হাতের মুঠ পাকানো, যেন অতিরিক্ত রেগে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে আর কিছু করতে না পেরে হাসছে। খুব অস্বাভাবিক লাগছিল হাসিটা।

'অ্যাঁ, বেটা জঙ্গল থেকে এসেছে!' প্রফেসার চক্রবর্তী প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।'

'ভদ্রতা রুচি কালচার বলতে কিছুই নেই দেখছি লোকটার।' প্রফেসার গুপ্তর ভুরু কপালে উঠল। 'এখনি বসিয়ে দেওয়া উচিত, দরকার কি এমন চীফ-গেস্টকে দিয়ে বক্তৃতা করানোয়।'

'ডায়াস থেকে উল্লুকটাকে নামিয়ে দিতে পারছে না কেউ!' অধ্যাপকদের চেয়ারের পিছন থেকে আর একজন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। 'দেখুন না, মিনিস্টারের মুখটাও কেমন লাল হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রিন্সিপাল তো লজ্জায় মাথা গুঁজে আছেন। যেমন বেছে বেছে একটা উজবুককে ধরে আনা হয়েছে—'

'সেক্রেটারী মিস সেনকে তো দেখছি না?'

'গ্রীনর‍ুমে আছেন।—মেয়েদের এখনও কী সব শেখাচ্ছে-টেখাচ্ছে।'

ঃ 'তিনি আমার প্রেমে পড়েছেন মানে, এককালে আমি কিছ‍ু দ‍ুষ্কর্ম করেছিলাম, অর্থাৎ ক'টা কবিতা লিখেছিলাম, মহিলার সব কণ্ঠস্থ, পাগলের মতন নাকি ভালবাসেন সেসব ছাইভস্ম লেখা।—জল!' আবার একটি ছেলে কাচের গ্লাসে করে জল নিয়ে এল। রামানন্দ খানিকটা চুম‍ুক দিয়ে খেয়ে তখনি গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে দাঁতে ছড়ানো অস্বাভাবিক হাসিটা নিবিয়ে ম‍ুখটা গম্ভীর করে বলল, 'হ‍্ঁ‍, কাজেই, যখন এসে গেলাম, তখন মনে মনে ঠিক করলাম কিছ‍ু বলব, চমৎকার স‍ুযোগ পাওয়া গেছে, নিশ্চয় বহ‍ু শিক্ষিত, গ‍ুণীজ্ঞানীরা এখানে রয়েছেন—কাজেই এই স‍ুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না। না, কোনো পাবলিক মিটিং-এ—সাংস্কৃতিক অন‍ুষ্ঠান, বিচিত্রান‍ুষ্ঠান, জলসা ইত্যাদি নিত্যই চারদিকে কত কি ব্যাপার হচ্ছে—আমি কোথাও বক্তৃতা করিনি, কোথাও কোনোদিন যাইনি। কিন্তু আজ দেখলাম আমার ভেতরে অনেক কথা জমা হয়ে আছে—সেগ‍ুলো বের করে দেওয়া দরকার, না হলে আমি শান্তি পাব না। নর্দমার জঞ্জাল ও ময়লা জল নিকাশের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে কী দ‍ুরবস্থা দাঁড়ায় আপনারা দ্যাখেননি? আমার অবস্থাও তাই দাঁড়াবে—'

'উপমায় কালিদাস।' নিচু গলায় একজন মন্তব্য করল।

'হ‍্ঁ‍', আর একজন হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'তবে কিনা গলার আওয়াজটা অবিকল ফাড়া বাঁশের মতন শোনাচ্ছে, মাইকটা না ফেটে যয়।'

ঃ 'ব‍ুঝলেন—আমার অবস্থাও তাই দাঁড়াবে, অলরেডি দাঁড়িয়েছে—এক বন্ধ নর্দমার মতন, অনেক জঞ্জাল, এত ময়লা জল গলা পর্যন্ত জমে আছে—কাজেই আমাকে সব বেব করে দিতে হবে।'

'বের করে দিন, বের করে দিয়ে পাতলা হয়ে যান দাদা।' পিছনেব সারির দর্শকদের মধ্যে একজন টিটকারি দিল এবং সেখান থেকেই আর একজন মন্তব্য করল—'যেমন চেঁচাচ্ছে আমাদের কবি মশাই, যেন ইলিক্‌শন-এর মিটিং এটা।'

'আপনারা চুপ কর‍ুন, চুপ কর‍ুন।'

ম‍ুঠি পাকানো হাত দ‍ুটো শ‍ূন্যে নাচাতে নাচাতে রামানন্দ বলে চললঃ 'হ‍্ঁ‍, আমাকে আপনারা ভালবাসেন, কিন্তু কেন? যেহেতু এককালে আমি দ‍ুষ্কর্ম করেছিলাম? ক'টা কবিতা লিখেছিলাম? আহা, কী ট্রাজেডী! আপনারা জানেন না আমি আর সেই রামানন্দ নেই, অন্য মান‍ুষ হয়ে গেছি, এখন আমি হাঁস-ম‍ুরগি নিয়ে আছি—আপনারা জানেন না, কেউ কবিতা লিখছে শ‍ুনলেও আমার ঘেন্না হয়—কবিদের দেখলে থ‍ুথ‍ু ছিটোতে ইচ্ছে করে, এককালে আমি এক কবি দলের আড্ডায় ছিলাম -সেই আড্ডায় প্রস্রাব করে চলে এসেছি—কুকুর যেমন তুলসীগাছ দেখলেই ঠ্যাং তুলে প্রস্রাব করে স‍ুখ পায়। তেমনি কবিদের আড্ডা দেখলে আমিও প্রস্রাব করে অগাধ আনন্দ পাই—'

'আপনি চুপ কর‍ুন, বসে পড়‍ুন।' সামনের সারির চেয়ার থেকে এক ভদ্রলোক র‍ুখে দাঁড়াল।

'কেন, আপনি কি কবি, আপনার খ‍ুব লাগছে?' রামানন্দ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। তার বক্তৃতা থেমে গেল।

'আমি কবি কি ডাক্তার, অ্যাডভোকেট কি ইঞ্জিনীয়ার আপাতত আপনার তা না জানলেও চলবে। কিন্তু এখানে এসব ভাল্‌গারিটি চলবে না। একটা সাংস্কৃতিক অন‍ুষ্ঠানে এভাবে বক্তৃতা করা চলে না।'

'সাংস্কৃতিক অন‍ুষ্ঠান! কালচার‍্যাল ফাংশন।' চেহারাটাকে বিকৃত বীভৎস করে তুলতে রামানন্দ এক সেকেন্ড দেরি করল না, আর সেই অবস্থায়, একট‍ু আগে যা করছিল, দাঁত ছড়িয়ে অদ্ভুত সেই হাসিটা হাসল। 'অনেক সংস্কৃতি অনেক কালচার

এই শহরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে দাদা—কালচারের জলে ধুয়ে ধুয়ে মহানগরীর আজ কী চমৎকার রূপটি দাঁড়িয়েছে সকালে খবরের কাগজখানা খুললে চোখে পড়ে—', কিন্তু রামানন্দকে আবার থেমে যেতে হল, একটা গোলমালের মতন সৃষ্টি হল, সামনের সারির সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও তিনচারজন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, পিছনের সারির চেয়ার ছেড়েও দু-একজন এদিকে এগিয়ে আসছিল, তা ছাড়া রামানন্দর ঠিক পিছনে বসা ছিলেন কাউন্সিলার চৌধুরী, তালগাছের মতন লম্বা শরীরটা নিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রামানন্দর কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু যেন ফিসফিস করে বলতে গেলেন, রামানন্দ জোরে মাথা ঝাঁকাল। কেবল তাই না, মুঠি পাকানো হাত দুটো, জলে ডুবে যাবার আগে মানুষ যেমন করে, আরও ঊর্ধ্বে শূন্যে তুলে ধরে চিৎকার করে উঠলঃ 'না না না, আমি বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করব না, যতক্ষণ না আমার ভেতরের সব ময়লা নিষ্কাশিত হয়, সব কথা বলা শেষ হয়, সব আবর্জনা নিঃশেষে নির্গত হয় ততক্ষণ আমাকে সময় দিতে হবে—আপনাদের প্রোগ্রাম দীর্ঘ কি হ্রস্ব আমি জানি না, কিন্তু আমাকে বক্তৃতা করার জন্য এখানে প্রধান অতিথি করে আনা হয়েছে, বক্তৃতা শেষ না করে আমি কিছুতেই বসব না, কিছুতেই না।'

॥ ৩০ ॥

রামানন্দর কথার তোড়ে, প্রবল মাথা ঝাঁকানির সামনে তিষ্ঠোতে না পেরে নিরুপায় অসহায় চেহারা করে কাউন্সিলার তখনি ধপ্ করে বসে পড়লেন। ঘামছিলেন ভদ্রলোক, পকেট থেকে রুমাল তুলে কপাল গলা মুছতে ব্যস্ত, কাজেই কাউন্সিলারের দিকে আর কারো চোখ নেই, তখন সমস্ত প্যাণ্ডেলের দৃষ্টি রামানন্দর দিকে এবং রামানন্দ যাঁর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আবার চুপ করে আছে—হুঁ, সভাপতি, মৎসমন্ত্রীর দিকে। কেননা তিনিই প্রধান অতিথিকে ভাষণ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রধান অতিথিকে ভাষণ ক্ষান্ত করতে বলার অধিকারও একমাত্র তাঁরই আছে, অন্য কারো নয়।

কিন্তু দেখা গেল মন্ত্রীমশাই একবারও ঘাড় তুলছেন না। ভিতরে একটা উত্তেজনা আছে নিশ্চয়ই, পাকা সবরি কলার রং ঈষৎ লাল হয়ে উঠেছে, এতৎসত্ত্বেও, যেন রামানন্দর এতবড় শরীরটা দেখে, বীভৎস হাসি ও চিৎকার শুনে, তা ছাড়া গাঁজাখোরের মতন তার বিকট লাল চোখ ও শূন্যে তুলে ধরা মুঠি পাকানো হাত দুটো দেখে, মনে হল ভয় পেয়ে নিতান্তই বেগতিক দেখে, সভাপতি স্রেফ চুপ করে আছেন। পাথর হয়ে আছেন।

নিচেয় চেয়ার ছেড়ে যাঁরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা বেশ একটু থমকে আছেন, অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন—সভাপতির কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় থেকে শেষে যেন নিরাশ হয়ে নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফিসফিস করে কি সব বলাবলি আরম্ভ করলেন।

প্যাণ্ডেলের সর্বত্র একটা চাপা কলরব, গুঞ্জন চলছিল। দেখতে দেখতে মাইকটা তখনি আবার গর্জন করে উঠলঃ আপনারা চুপ করুন, বসে পড়ুন—

কাজেই নতুন উৎসাহ নতুন উত্তেজনা নিয়ে রামানন্দ বলে চললঃ 'হুঁ, কবিদের ওপর ঘেন্না বিদ্বেষ, কেননা শিল্পকর্মের নামে তারা অবিরত অকথ্য কুকর্ম করছে। কুকাজ। আমি কবিতা পড়ি না, রাস্তায় কোনো কবিকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নেই, তার চেয়ে গাছতলায় বসে মুচি জুতো সেলাই করে—তার কাজ

দেখি, দু' দণ্ড সেখানে দাঁড়াই, বাজারে মেছুনি বঁটি দিয়ে বোয়ালের পেট কাটে, চোখ ভরে সেই দৃশ্য দেখি, সেসব দৃশ্য অনেক বেশি সত্য স্বাভাবিক সুন্দর; ধাঙগড় ডাস্টবিনের ময়লা সাফ করে—আমি তাকিয়ে থাকি—অথবা যদি তখন রাস্তা দিয়ে একটি বেশ্যা যায়, চোখ দুটো আমি সেদিকেই ঘুরিয়ে রাখব—তবু কবিকে দেখব না, কবির দিকে তাকাব না, কেননা আমি জেনে গেছি, একটা বেশ্যা একটি কবির চেয়ে অনেক বেশি সৎ সবল সুস্থ স্বাভাবিক। এমন কি প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার মাঝখানে দুটো কুকুর রতিক্রীড়া করে—সেই দৃশ্য দেখে আমার মনে তেমন কোনো বিকার উপস্থিত হয় না, কবিতা পড়ে মন যত বিকারগ্রস্ত, বিষাক্ত হয়—'

'আহা, কী বলছে রে দাদা!'

দুটো ছেলে হাততালি দিয়ে উঠল, পিছন থেকে একটি ছেলে মুখে আঙুল গুঁজে জোর সিটি মারল। একজন হি-হি করে হাসল।

'দাদার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে—তাই রাস্তায় বেশ্যা দেখতে ভালবাসে, চোখ ভরে কুত্তা-কুত্তীব কুকর্ম দেখে, হি-হি—'

কিন্তু এসব হাসিঠাট্টা টিটকিরি সিটি হাততালি মুহূর্তের মধ্যে চাপা পড়ে গিয়ে তিন-চারটে ক্রুদ্ধ গলা একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। 'পার্ভার্ট, পার্ভার্ট—লোকটাকে আপনারা কেউ বসিয়ে দিতে পারছেন না। যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছে! ঘাড় ধরে ডায়াস থেকে নামিয়ে দিন, প্যান্ডেল থেকে বের করে দিন—রবীন্দ্রনাথ নজরুল জীবনানন্দর দেশের মানুষ হয়ে আমরা কবিদের সম্পর্কে কবিতা সম্পর্কে এই সমস্ত উক্তি সহ্য করছি কেমন করে—'

ঃ 'তাই তো, বিশ্বকবির দেশের লোক, নজরুলের দেশের মানুষ, জীবনানন্দর রূপসী বাংলার মানুষ—কবিদের সম্পর্কে কাব্য ও কবিতা সম্পর্কে এসব উক্তি আমরা সহ্য করছি কেমন করে—' রামানন্দ চুপ করল না, বসল না, গলার আওয়াজ ছোট করল না, বরং হাতের মুঠ আর একটু বেশি শক্ত করে লাল চোখ আরও লাল করে মাথা ঝাঁকিয়ে থুতনি নেড়ে ক্রমাগত বলে চলল, 'হুঁ, কাব্য কবিতা আমাদের মধ্যে ভগবৎপ্রেম জাগ্রত করে, আমাদিগকে অনন্ত সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দেয়, ভূমার আনন্দ নিয়ে আসে, কাব্য কবিতা আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করে, না কি বিশ্বভ্রাতৃত্ব—' রামানন্দর গলার স্বর আর এক ডিগ্রী চড়ে গেল। 'ভাইগণ! ভগিণীগণ! ভদ্রমহোদয়গণ! ভদ্রমহিলাগণ! এই সমস্ত ছেঁদো কথা দিয়ে, মিথ্যা যুক্তি ছড়িয়ে কবির দল আমাদিগকে অনেক ঠকিয়েছে, আর যে-যার খুশি মতন কাব্যের জঞ্জাল সৃষ্টি করে গেছে—'

'গাঁট্টা মেরে অসভ্যটাকে বসিয়ে দিন।'

'ঘাড়ে ধরে প্যান্ডেল থেকে উল্লুকটাকে বিদায় করে দিন।' একসঙ্গে পাঁচজন ডায়াসের কাছে ছুটে এল।

রামানন্দর ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঃ 'হুঁ, অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে—রেডিওর সেই আশ্চর্য কণ্ঠধ্বনি শুনতে শুনতে ছোরা নিয়ে স্টেনগান নিয়ে আমরা নিরীহ পথচারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, রাত দশটার পর ব্রহ্মসংগীত কানে নিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সঙ্গমে লিপ্ত হই—অহো, কবিতা ও সঙ্গীতের কী অমোঘ শক্তি! হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না—গদ্‌গদ গলায় মহিষী ঘরে বসে হার্মোনিয়ামে সুর মিলিয়ে গাইছে, পাশে বসে মেয়ে তালিম নিচ্ছে, আর অফিসে কাছারীতে বাজারে বন্দরে ঘুরে ঘুষ কালোবাজার স্মাগলিং-এর একাধিক অন্ধকার জটিল পথ চমৎকার চিনে নিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।'

'আবোলতাবোল বকছে, পাগলের মতন যা মুখে আসছে বলছে, এ সমস্ত

বলার জায়গা কি এটা?'

'মাননীয় সভাপতি কি এই উন্মাদকে থামিয়ে দিতে পারছেন না—'

দর্শকদের মধ্যে একজন লাফিয়ে ডায়াসে উঠতে গেল, কিন্তু তার আগেই সেক্রেটারি হেনা সেন ব্যস্ত হয়ে মঞ্চের ওপর উঠে সভাপতির কানে কানে কিছু বলতে মৎস্যমন্ত্রী ঈষৎ ঘাড় নেড়ে একটা হাতের তেলো রামানন্দর দিকে প্রসারিত করে তাকে নিবৃত্ত করার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলেন। রামানন্দ গ্রাহ্যই করল না, মন্ত্রীর ফরসা শুকনো হাতের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। তার গলা গমগম করে বেজে চলল:

'কাজেই কবিতা দিয়ে কতটা উপকার হচ্ছে, কল্যাণ হচ্ছে, মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে সংগীত ও কবিতা কতটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, জানতে বুঝতে কি আজও আমাদের বাকি আছে? তবে হ্যাঁ, কবিতার একটা শক্তি আছে—যৌন-সুড়সুড়ি জাগাতে, কাম-কণ্ডুয়ন সৃষ্টি করতে এই শিল্পের জুড়ি নেই, এদিক থেকে কবিতার অবদান অসামান্য। যে কারণে আজও কবিতার অনেক পাঠক, কবিতা নিয়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে বিস্তর আলোচনা; এবং এটা লক্ষ্য করে কবির দল আরও বেশি করে কামজ-প্রেম, রূপজ-প্রেম, মেয়েদের স্তন নিতম্ব ঊরু গাল ঠোঁট ইত্যাদি শরীরের বাছা বাছা অংশগুলো নিয়ে নানা অলঙ্কার বসিয়ে বিচিত্র উপমা সাজিয়ে সরস উপাদেয় কাব্যসৃষ্টিতে মত্ত। হুঁ, রূপসৃষ্টি রসসৃষ্টি—তার অর্থ ঈশ্বরভক্তি, বিশ্বপ্রেম, ভূমাদর্শন দিব্যানুভূতি ইত্যাদির আওয়াজ তুলে কবির দল যখন কবিতাকে জলচল করতে পারল না, শিবম্ সত্যম্ সুন্দরম্-এর ধোঁকা লাগিয়ে পাঠকচিত্ত ভোলাতে অক্ষম হল, তখন বিচিত্র সব অলঙ্কার ও রূপ রস গন্ধের কড়া আতর ছিটিয়ে বারবনিতার মতন কবিতাকে সাজিয়ে আসর মাত করতে উঠে-পড়ে লাগল। কিন্তু আর না। কবিদের সব চালাকি সব বদমায়েসি ধরা পড়ে গেছে। কবিতা সৃষ্টির নামে যুগের পর যুগ জঞ্জাল সৃষ্টি, দূষিত বীজাণু ছড়ানো আর চলবে না —চলতে দেওয়া উচিত হবে না। আমার যদি ছেলে থাকত, আর যদি দেখতাম সেই ছেলে কবিতা লিখছে, আমি তাকে খুন করতাম—উঁহু, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে না বলে না, বিকৃতিতে ভুগছে বলে —নিজে ভুগছে এবং আরও দশটা মানুষের ভোগবার রাস্তা তৈরি করছে। কবিতা, কাব্যরসের নামে একটা ভয়ংকর বিকার, একটা সাংঘাতিক ছলনা মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে সরিয়ে নেবার অপচেষ্টায় সে মত্ত। সে ক্রিমিন্যাল। এমন অপরাধ কোনোমতেই তাকে করতে দেওয়া উচিত হবে না—'

'অনেক হয়েছে দাদা, ঢের বকেছেন, আপনি যে কত বড় কবি—কবিতা নিয়ে কতটা বলার ক্ষমতা রাখেন বোঝা গেছে—এবার দয়া করে বসে পড়ুন।'

'অ্যাঁ, কতটা বলার ক্ষমতা রাখি—', কোন্ দিক থেকে কথাটা এল বোঝা গেল না, যেন এই জন্য রামানন্দ আরও বেশি ক্ষেপে গেল, উত্তেজিত হয়ে উঠল। ডাইনে বাঁয়ে সামনে, একসঙ্গে সমস্ত দর্শককে উদ্দেশ্য করে ভেংচি কাটল, তারপর অট্টহাস্য করে উঠল: 'হ্যাঁ, আপনারা জানেন কবিতা কাকে বলে, সত্যিকার কবিতা কী, আপনারা চেনেন—'

'থাক, আমাদের চিনতে হবে না, আপনি বসে পড়ুন—'

'কেবল বসে পড়া না, পাগলকে এখান থেকে বের করে দিন—আর এসব টলারেট করা যাচ্ছে না।'

'উঁহু, আমি এখনই বসব না, আমার বক্তব্য শেষ হয়নি।'

একসঙ্গে চারটি যুবক ডায়াসে উঠে রামানন্দকে ঘিরে দাঁড়াল, তারা আস্তিন

গুটোচ্ছিল, তাদের চোয়াল কঠিন হয়ে গেছে। 'আপনি নামুন, প্লিজ, আপনি এখান থেকে নেমে গিয়ে নিচে চেয়ারে বসুন।' একজন রামানন্দর কাঁধে ধাক্কা দিল।

'উঁহু, আমার কথা শেষ হয়নি—আমাকে এখানে চীফ-গেস্ট করে আনা হয়েছে—মাননীয় সভাপতি যতক্ষণ না আমাকে—'

দেখা গেল সভাপতি মৎস-মন্ত্রী, কাউন্সিলার বিভূতি চৌধুরী, বুড়ো প্রিন্সিপাল—সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পুলিন ও সেক্রেটারী হেনা সেন ছুটে এল। একটা বড় রকম গোলমাল বেধে যাচ্ছে প্রত্যেকে আশঙ্কা করছিল। আস্তিন গুটানো চারটি ছেলেকে হেনা নিবৃত্ত করতে গিয়ে থমকে রইল, সকলেই সোনালী বাসরের, তারা রামানন্দকে আর সহ্য করতে পারছে না বুঝতে পেরে হেনা সরাসরি তাদের কিছু বলতে পারছিল না—ওদিকে নিচে দর্শকদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন প্রবীণ দাঁড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে পাইকপাড়ার দুজন তরুণ প্রফেসারও রয়েছেন, চীফ-গেস্টের বক্তৃতা বন্ধ করে দেবার জন্য তাঁরা ভীষণ চেঁচামেচি করছিলেন। যেন সকলেই ক্রুদ্ধ, সকলেই এই কবিকে নিয়ে ক্ষুব্ধ উত্তেজিত। রামানন্দর দিকে তাকাল। 'আপনি অনেকক্ষণ বলেছেন—আমাদের প্রোগ্রাম খুব বড়, প্রেসিডেণ্ট এখন বক্তৃতা করবেন—দয়া করে আপনি—'

ঃ'না না না—সত্যিকার কবিতা কী, সত্যিকার কবিতা কেমন এই বালখিল্যদের কাছে আমাকে শিখতে হবে! হুঁ, কাব্যের সঠিক ব্যাখ্যা—' হাতের মুঠ খুলে ফেলে দুটো হাতই শূন্যে ছড়িয়ে রামানন্দ প্রায় লাফাতে আরম্ভ করল। তাই তো, যেন সে যাত্রার আসরে নেমেছে, গলা কাঁপিয়ে ঘুরে ঘুরে চারদিকে তাকিয়ে পার্ট বলে যাচ্ছেঃ 'সত্যিকার কবিতা কী, সত্যিকার কবিতা কেমন—কেউ দেখেনি সেই কবিতা কেউ পড়েনি, সত্যিকার কবিতা বলতে যা বোঝায় আজও তা লেখা হয়নি, রবীন্দ্রনাথ পারেননি, সেক্‌শপীয়র পারেননি, কালিদাস, গ্যেটে আগেই হেরে গেছে, ঝাঁকের ঝাঁক কবি কবিতা লিখতে চেয়েছে—শেলী, কীটস্‌, ব্রাউনিং, র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, মালার্মে, ইয়েটস্‌, পাউণ্ড, অডেন, পাস্তারনেক, জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত, শুভেন্দু ভৌমিক, বিকাশ চাটুয্যে—উঁহু, কাউকে দিয়ে হল না—সব ঘোল খেয়েছে, আসলে সত্যিকার কবিতা—'

'হুঁ, রবীন্দ্রনাথ সেক্‌শপীয়র পারেননি—তুমি পেরেছ ইডিয়ট, তুমি রামানন্দ সেন—' বলতে বলতে দুটি ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামানন্দর ঘাড়ে মুখে ঘুষি বসিয়ে দিতে তার ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোল। লালার সঙ্গে মিশে সেই রক্ত টুপটুপ করে জামায় পড়ছিল, আর সেই অবস্থায়ও দু' হাত শূন্যে নাচিয়ে ডায়াসের ওপর ঘুরে ঘুরে গলা কাঁপিয়ে যেন যাত্রার আসরে নেমেছে, রামানন্দ বকে চললঃ 'আসলে সত্যিকার কবিতা লেখা যায় না, ফর্মের খাঁচায় ঢুকে পড়ে মেপে মেপে শব্দ বসিয়ে, ভেবে ভেবে ছন্দে গেঁথে গদ্য লেখার ছেলেমানুষী খেলাকে যারা কবিতা বলতে চায় বলুক, আমি বলি না; আমি কখনো মনে করি না এর নাম কবিতা—কবিতা থাকে রক্তে, আত্মায়, এর প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, যেমন গাছে ফুল ফোটে, নক্ষত্রপাত হয়, বাজ পড়ে, গাছ জ্বলে যায়, আলো নিবতে পাখি ঘরে ফেরে—কাগজ কলম নিয়ে বসে এই জিনিস হয় না, ছোঁ মেরে আকাশের রামধনুকে কেউ মাটিতে নামিয়ে আনতে পেরেছে? কবিতা, আসল কবিতা, খাঁটি কবিতা, একবারই লেখা হয়, এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবে, বিদ্যুত-তরঙ্গের মতন, রক্তে হৃদপিণ্ডে এর ছন্দ বেজে ওঠে। হুঁ, একজনের মধ্যেই এই কবিতার সৃষ্টি, একজনই এর পাঠক, একজনই বোদ্ধা—আমার মন ছাড়া আর কারো মনের গভীরে আমি প্রবেশ করতে পারি? আমার মধ্যে হেমারেজ হচ্ছে, অন্যের তা দেখবার জানবার বুঝবার কথা না, আর একজনকে জানাতে যাওয়াও বাতুলতা—প্রথম রাজদর্শনের পর কিশোরী তার

কবিতা নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে—'

'মারুন, উল্লুকটাকে আরও দু' ঘা বসিয়ে দিন—'

'প্রলাপ বকবার আর জায়গা ছিল না তোমার!'

পিঠে কানে মাথায় একসঙ্গে কিল ঘুষির শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হল, কিন্তু রামানন্দ মুখ বন্ধ করছিল নাঃ 'সন্তানের মুখে প্রথম স্তন গুঁজে দিয়ে মা বোঝে সত্যিকার কবিতা কী, কবিতা কেমন—মুখে বিষ নিয়ে, আগুনে ঝাঁপ দেবার মুহূর্তে কি বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েও কিছু মানুষ কবিতা লিখেছে—হুঁ, তা-ও সত্য, কিন্তু ঘরের কোণায় টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে মেপে মেপে শব্দ বসিয়ে পঙক্তি সাজিয়ে ধ্বনিমাধুর্যে শ্রুতিমধুর করে তুলে আমার জ্বালা আমার পুলক আমার রক্তক্ষরণ আমার হৃৎপিণ্ডের ভূমিকম্প পাঁচজনের পাতে পরিবেশন করব—কবিতার নামে আর একটি বুজরুকি, আর একটা ধাপ্পা, হা-হা হাসি পায়—'

'থাক থাক, উন্মাদকে মেরে কী হবে, আর দরকার নেই।' একটা হাত তুলে ধরে বুড়ো প্রিন্সিপাল বিড়বিড় করে উঠলেন।

'মার খেয়েও এই কবি ভদ্রলোক হাসছে।' কাউন্সিলার চৌধুরী খুবই বিস্ময়-বোধ করছিলেন। হেনা সেনের চোখ ছলছল করছিল, হেনার পাশে অসহায় দর্শক হয়ে পুলিন দাঁড়িয়ে, এবং সোনালী বাসরের আরও দুটি-একটি ছেলেমেয়ে, অর্থাৎ রামানন্দ সেনের কবিতা তারা পড়েছে—কিন্তু বাকি সবাই ক্রুদ্ধ উত্তেজিত অস্থির অশান্ত, প্রবীণ নবীন সবাই, তারা হইহই করছিল। 'একটা মাথা-খারাপ লোককে এখানে এনে এভাবে অনুষ্ঠানটা মাটি করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না', 'গলা ধাক্কা দিয়ে বাঁদরটাকে বের করে দাও', 'পাইকপাড়ার মানুষকে উনি কবিতা শেখাতে এসেছেন, সাহিত্যের জ্ঞান দিচ্ছেন!'

গোলমাল দেখে প্যাণ্ডেলের প্রায় সব মানুষ আসন ছেড়ে উঠে পড়েছে। মেয়েরা ভয় পেয়ে কলরব করছিল, দুধের শিশুগুলি ক্রমাগত চিৎকার করছিল। 'আপনারা চুপ করুন, আপনারা যে যার জায়গায় বসে পড়ুন।' মাইকটার গর্জন থামছিল না। দেখা গেল ততক্ষণে রামানন্দর জামার কলার ধরে, আস্তিন ধরে টানতে টানতে তাকে ডায়াস থেকে নামিয়ে প্যাণ্ডেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখনও দেখা গেল, রামানন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে, তখন আর অবশ্য হাসছে না, ঠোঁট দুটো ভীষণ কাঁপছে, মাঝে মাঝে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছছে, যেন এই অবস্থায়ও সে কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু আর তাকে টুঁ শব্দটি করতে দেওয়া হল না।

দু' মিনিটের মধ্যে রামানন্দকে একেবারে রাস্তার মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আস্তিন গুটানো ছেলে কটি হন হন করে প্যাণ্ডেলের দিকে ফিরে গেল। শেষবারের মতন ওদিকে তাকিয়ে রামানন্দ নিজের মনে আর একটু হাসল। 'হুঁ, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।' তারপর আর দাঁড়াল না, বাসস্টাণ্ডের দিকে এগোতে লাগল।

'এই যে স্যার! এক সেকেণ্ড।' অর্থাৎ হাত তুলে মানুষটা রামানন্দকে দাঁড়াতে বলছে। ঐরাবতের মতন প্রকাণ্ড শরীর। ধবধবে জামা কাপড়। চোখে পুরু লেনস্-এর চশমা। থপথপ পা ফেলে যতটা সম্ভব দ্রুত রামানন্দর দিকে ছুটে আসছিল।

'কি স্যার, চিনতে পারলেন না!' কাছে এসে গাল ছড়িয়ে বিরাট পুরুষ হাসল।

'তাই তো, কোথায় যেন দেখেছিলাম।' অপ্রস্তুত হয়ে রামানন্দ বিড়বিড় করছিল।

'হা-হা', হেসে; যেন রামানন্দর খুবই অন্তরঙ্গ, খুবই কাছের মানুষ, তার দু' হাত জড়িয়ে ধরল লোকটি। 'ঐ যে বৈঠকখানা বাজারের দোকানে? জগতবাবু নন্দবাবু আমি আর আপনি একদিন খুব আনন্দ করে—মনে পড়ে?'

'আর বলতে হবে না।' রামানন্দ খুশি হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। 'এখন চিনেছি।'

'আসুন স্যার, ট্যাক্সি ডাকা যাক—বাস-এ উঠতে পারবেন না।' আলুর আড়তদার ঔপন্যাসিক ননীমাধব দত্ত রামানন্দর হাত ছাড়ল না, চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

॥ ৩১ ॥

কৌতূহলের চোখ নিয়ে সবাই মানুষটাকে দেখছিল। মোহন পালও দেখছিল। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বের করল। প্যাকেটের চেহারা দেখেই নবকিশোর, অরুণাভ, পলাশ ও উৎপলের চোখ গোল হয়ে গেল। খুব ভাল সিগারেট, দামী সিগারেট। মোড়ক ছিঁড়ে ভদ্রলোক একটা সিগারেট শুভেন্দুর দিকে বাড়িয়ে দিল, অমলেন্দুকে একটা দিল, এবং মোহনবাবুকেও একটা অফার করল। কিন্তু মোহন হাতজোড় করে মাথা নাড়ল। 'আমি ধূমপান করি না।'

সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক অনেকটা ধোঁয়া একসঙ্গে গিলে ফেলে কাশল। নাকের ছিদ্র ও মুখ দিয়ে বাকি ধোঁয়া বেরিয়ে এল।

'আমি আন্দাজে আন্দাজে এখানে চলে এসেছি, বুঝলেন। কেননা পদাবলী কাগজে রামানন্দবাবু এককালে লিখতেন। ভাবলাম, এই ঠিকানায় খোঁজ করলে রামানন্দ সেনের বন্ধুবান্ধব অনেকের সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে।'

অমলেন্দু ও শুভেন্দু পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিছু বলল না।

আজ বিকাশ অনুপস্থিত।

দুদিন ধরেই সে এখানে আসছে না। বস্তুত বিকাশ উপস্থিত থাকলে ভদ্রলোকের মুখে এমন মজার ঘটনাটা শুনে কী মন্তব্য করত বলা মুশকিল।

'তা আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কেন?' মোহন পালও খুব মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি শুনছিল। রামানন্দবাবুকে নিয়ে ঘটনা। মোহন এই ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না।

'আমার এটা রোগ।' গাল ছড়িয়ে ভদ্রলোক হাসল। 'আধুনিক কবি, শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করা। আর খুঁজেপেতে কোথায় সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে ছুটে যাওয়া।'

'ভাল রোগটাই বাগিয়ে বসেছেন মশাই।' ত্যাঁদড় পলাশ টিপ্পনি কাটল।

'তা মশায়ের করা হয় কী?' অমলেন্দু প্রশ্ন করল।

'বৈঠকখানা বাজারে আমার আলুর আড়ত আছে।'

'আলুর বিজনেস—চমৎকার জিনিস!' শুভেন্দু উৎসাহের চোখে ভদ্রলোকের মুখটা দেখল। 'তা হলে তো আপনি বড়লোক মশাই।'

'খুব ভাল, খুব ভাল।' অমলেন্দুও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। 'আলু পেঁয়াজ তেল ডাল—সব এখন অবাঙ্গালীদের হাতের মুঠোয়—এসব বড় বড় ব্যবসা ওরাই করছে—আপনি বাঙ্গালী হয়ে—সত্যি প্রশংসা করতে হয়।'

'একদিকে আলুর কারবার অন্যদিকে সাহিত্যের নেশা—আধুনিক সাহিত্য পড়া, সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করা, সাহিত্য সভার নাম শুনলেই সেখানে ছুটে যাওয়া—সত্যি দাদা আপনার তুলনা হয় না।' পলাশ মিষ্টি করে হাসল ও সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল। 'একটা নিচ্ছি দাদা।'

'হুঁ, হুঁ, হুঁ', ভদ্রলোক জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'এতে আর কথা আছে—নিন আপনারাও নিন,' প্যাকেটটা নবকিশোর ও অরুণাভর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ভদ্রলোক শুভেন্দুর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'শিল্পীদের আসরে, সাহিত্যিকদের মজলিশে বয়সের কোনোরকম বাছ-বিচার থাকে না, এ তো চিরকালের কথা, সিগারেট কেন—একসঙ্গে বসে—হে'—হে'।'

'আপনার ওদিকেও একটু অভ্যেস আছে নাকি!'

অমলেন্দুর প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক একটু সলাজ হাসি হাসল। 'সামান্য।' চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলল, 'এই মাঝে-মধ্যে কখনো-সখনো।'

'সত্যি দাদা, আপনার তুলনা হয় না।' পলাশ জোরে জোরে সিগারেটটা টানতে লাগল। যেন ভদ্রলোক এখানে থাকতে থাকতে ওই প্যাকেট থেকে আবার এক শলা ধরিয়ে নেবার ইচ্ছা। তার মতলবটা বুঝতে পেরে নবকিশোর ও অরুণাভ পরস্পর চোখ টেপাটেপি করল এবং ঠোঁট টিপে হাসল। তারাও সিগারেট ধরিয়েছে। কিন্তু আর একটা লোকের দামী সিগারেট দেখে পলাশের মত হন্যে হতে পারছিল না।

'আপনি কি পদাবলী পড়েন?' মোহন পাল প্রশ্ন করল।

'পড়ি বইকি—সব ক'টা সংখ্যা পড়েছি—তবে কিনা এই সংখ্যায় রামানন্দবাবুর লেখা দেখলাম না।'

এই কথার উত্তরে কেউ কোনোরকম শব্দ করল না।

'যাকগে—কথা হচ্ছে যে ভাগ্যিস আপনি সেখানে ছিলেন—তা না হলে রামানন্দবাবুকে আরও দুর্ভোগ পোহাতে হতো, তাই না?' কথাটা শেষ করে মোহন একটা বড় নিশ্বাস ফেলল।

'হুঁ, হতো বইকি, ঐ যে প্যাণ্ডেল থেকে ও'কে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে এল—নিশ্চয় ছোঁড়াগুলো আবার ঘুরে এসে রামানন্দবাবুকে মারধর করত।'

শুভেন্দু ও অমলেন্দু চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে টান হয়ে বসল।

'গোলমাল যে একটা হবে, আমি গোড়া থেকেই আশঙ্কা করেছিলাম। ডায়াস থেকে আমাকে রামানন্দবাবু অবশ্য তখন দেখেননি। কেননা আমি পেছন দিকে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। যেতে একটু দেরি করে ফেলেছিলাম। যাই হোক—কিন্তু আমি এখন আপনাদের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি আপনারা কেউ সেখানে যাননি, কাউকে দেখলাম না।'

'না, আমাদের কাউকে নেমন্তন্ন করেনি।' শুভেন্দু গম্ভীর হয়ে উত্তর করল।

'এই জন্যই তো হারামজাদারা সুবিধে পেয়েছিল।'

'তা হঠাৎ পাইকপাড়ার ওরা এমন ক্ষেপে গেল কেন, আদর করে রামানন্দকে চীফ গেস্ট্ করে নিয়ে গেল? ডায়াসে উঠে রামানন্দ কি পাগলামি-টাগলামি করেছিল—আবোলতাবোল কিছু বলেছিস?'

'কী যে বলেন!'

অমলেন্দুর চোখে চোখ রেখে ভদ্রলোক ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। তারপর বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'খুব ন্যায্য কথা বলেছিলেন তিনি; আধুনিক কবি, প্রগতিশীল মন তাঁর—খুবই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তাঁর ভাষণে যতটা বলার বলেছিলেন—কিন্তু ঐ যে বললাম, আপনাদের কাউকে দেখলাম না। তার মানে কোনো আধুনিক শিল্পীকেই তারা নেমন্তন্ন করেনি—আপনাদের সঙ্গে পরিচয় আছে কিনা জানি না, আমার সঙ্গে আছে, রামানন্দবাবুর সঙ্গেও আছে, বিখ্যাত গল্প-লেখক নন্দদুলাল ভট্চাজ, আর্টিস্ট জগত মণ্ডল—উহুঁ, এ'দেরও দেখলাম না—তখনই বুঝলাম যে খুব গোঁড়া রক্ষণশীল ক্লাব ওটা—তার মানে ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে ক্লাব হলেও আসলে ছেলেদের বাপ কাকা জ্যাঠারাই ক্লাবটা

চালায়, তা না হলে এমন একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার করল বেটারা! রামানন্দবাবু বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছেন কি চারদিক থেকে 'বসে পড়ুন' আওয়াজ উঠল।'

শুভেন্দুরা আর কিছু বলছিল না।

'খুব চমৎকার ভাষণ হয়েছিল রামানন্দবাবুর। কাব্যের ওপর নতুন আলোকপাত করেছিলেন, তাঁর কাছে অবশ্য এমনটাই আশা করেছিলাম—বোঝা গেছে কত চিন্তা করেছেন তিনি আধুনিক কবিতা নিয়ে, কিন্তু দেখলাম পাইক-পাড়ায় সোনালী বাসরের কারোর এসব কথা সহ্য হয়নি। ভয়ানক গোঁড়া ও পুরোনো পন্থী'—একটু থেমে ভদ্রলোক অযথা শব্দ করে হাসল। 'তাদের ওটা যে একটা রক্ষণশীল ক্লাব, আমার মতন একজন সাহিত্যিকের কাছে যখন নিমন্ত্রণ পত্র এল, তখনই আমি বুঝে গেলাম।'

প্রায় একসঙ্গে সব ক'টা চোখ কালো প্রকাণ্ড শরীরের মানুষটার দিকে ঘুরে গেল। রুদ্ধশ্বাস হয়ে সকলেই কথাটা শুনল।

'আপনি কি তা হলে সাহিত্যও করেন—মানে কেবল সাহিত্য পড়া না, সাহিত্য সভায় ছুটে যাওয়া না, তার চেয়েও বড়, জটিল ব্যারাম যেটা, মানে—' যেন কলম দিয়ে লিখছে— দু' আঙুলের এমন একটা ভঙ্গি করে পলাশ ভদ্রলোকের চোখের সামনে ডান হাতটা নেড়েচেড়ে দেখাল।

'হুঃ আপনাদের আশীর্বাদে আমার আটখানা উপন্যাস বাজারে চালু আছে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল মোহন পালের দোকানটা। সবগুলি চোখের তারা স্থির হয়ে রইল। প্রায় তিন সেকেন্ড পর একসঙ্গে অনেকগুলি নিশ্বাস পতনের শব্দ শোনা গেল। মোহন পাল ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'আপনার পুরো নামটা কি দাদা?' পলাশ ভুরু কুঁচকোল।

'ননীমাধব দত্ত।'

পলাশ শুভেন্দুর দিকে ঘাড় ফেরাল, শুভেন্দু অমলেন্দুর মুখ দেখল, অমলেন্দু তার থুঁতনিটা উঁচু করে ধরে উৎপল, অরুণাভ ও নবকিশোরের চোখের দিকে তাকাল।

সকলেই নীরব। লক্ষ্য করে ননীমাধব বুঝি একটু লজ্জায় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে মাথা ঝাঁকোল। 'উহুঃ, আমার নাম আপনারা শুনবেন না, আমার বই যে আপনারা পড়েননি, আমি খুব ভাল করে জানি—আমি তো নিজেই বুঝি, সেকেলে ধাঁচের লেখা আমার, আপনাদের মতন এত আধুনিক লেখকমহলে এই লেখা এসে পৌঁছোবার কথাই না। এই জন্যই বলছিলাম আমার মতন একজন প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকের কাছে যখন ওরা ওদের ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানের নেমন্তন্ন চিঠি পাঠাল, তখনই বুঝে গেলাম শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ওদের ধারণাটা আজও কোন্ খাতে বইছে, হা-হা।'

'তা হলেও আপনি একজন শিল্পী, একজন লেখক—এদিক থেকে আপনার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে।' বলতে বলতে মোহন পাল এবার এসে প্রায় টেবিলটা ঘেঁষে দাঁড়াল।

ক'দিন থেকেই শুভেন্দুরা মোহনবাবুর ওপর অসন্তুষ্ট। সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে মানুষটা ইদানিং বড় বেশি মুখ খুলতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে শুভেন্দু ও বিকাশ মোহন পালের এই বাচালতা মোটে সহ্য করতে পারছে না। আজ বিকাশ অনুপস্থিত। শুভেন্দু মুখটাকে হাঁড়ির মতন করে রাখল।

ননীমাধবের এত সব জানবার কথা না। মোহন পালের কথা শুনে খুশি হল।

'হুঃ, আমার লেখা একটু সেকেলে ধাঁচের, মানে ভাষাটা স্টাইলটা—কিছুতেই তেমন আধুনিক করতে পারছি না—এদিক থেকে নিজের অক্ষমতা আমি স্বীকার

করবই—তবে কিনা আধুনিক কবি ঔপন্যাসিক গল্প-লেখকদের লেখার আমি এক-জন বড় ভক্ত। আধুনিক চিত্রশিল্পীদের আঁকা চিত্রও আমাকে খুব টানে। যে কারণে নেমন্তন্নর চিঠিতে রামানন্দ সেন প্রধান অতিথি হয়ে পাইকপাড়ায় যাচ্ছেন দেখেই আমি সেখানে ছুটে গেলাম।'

শুভেন্দু বা অমলেন্দু কিছু বলছে না দেখে অগত্যা মোহন পালই বিড় বিড় করে বলল, 'তাই তো, এভাবে ওরা রামানন্দবাবুকে অপমান করল, রামানন্দবাবুর কিছুতেই উচিত ছিল না সেখানে যাওয়া—হুঁ, রক্ষণশীল ক্লাব, রামানন্দ সেনের মতন এত বড় একজন বৈপ্লবিক আধুনিক শিল্পীর আইডিয়া, মতবাদ তাদের হজম হবে না এ তো জানা কথা।' একটু চুপ থেকে মোহন ননীমাধবের চোখের দিকে তাকাল। 'বলছেন গায়ে হাত দিয়েছিল, খুব একটা মারধর করেছিল কি?'

'না, ঐ টানাহেঁচড়াই বেশি করেছিল, দুটো একটা কিল ঘুষিও যেন বসিয়ে-ছিল, দেখলাম ঠোঁটটা সামান্য কেটে গেছে—তবে হ্যাঁ, প্যান্ডেলের বাইরে এনে শেষ পর্যন্ত যে কী করত বলা যায় না—তৎক্ষণাৎ আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে—'

'আপনি খুব উপকার করেছেন—আপনি যে কতখানি সাহস ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন—', মোহন পাল একবারও আর শুভেন্দু কি অমলেন্দুর দিকে তাকাল না। এখানে এই দুজন কবিই বয়স্ক। বাকি কবিরা চ্যাংড়া। এতবড় একটা ব্যাপার—রামানন্দকে একটা জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করেছে শোনার পরও শুভেন্দুবাবু অমলেন্দুবাবু কী করে প্রথম থেকে প্রায় চুপ করে আছেন ভেবে এই দুটো মানুষের ওপর মোহনের কেমন যেন একটা ঘেন্না, বিদ্বেষের ভাব জাগল। আস্তে আস্তে নিজের আসনে ফিরে গেল।

'আটখানা উপন্যাস বাজারে আপনার—আপনি যে দেখছি মশাই একজন দিক্‌পাল সাহিত্যিক—', পালাশের হাতের সিগারেট ততক্ষণে শেষ। হাত বাড়িয়ে ননীমাধবের প্যাকেট থেকে আর এক শলা তুলে নিয়ে ধরিয়ে ফেলল।

শুভেন্দু চোখ টেরা করে পলাশকে দেখে মুচকি হাসল। তারপর অমলেন্দুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে আবার একটু হাসল।

ননীমাধবের দৃষ্টি তখনও মোহন পালের দিকে। অর্থাৎ জরুরী কথাটা শেষ হয়নি।

'তাই ভাবলাম একবার পদাবলী অফিসে গিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবকে খবরটা দিই। তিনি তো খেয়ালী মানুষ, হয়তো সাতদিন এদিকে না-ও আসতে পারেন। তা ছাড়া, ভাবলাম পদাবলীর কবিদের সঙ্গে এই সুযোগে আমার একটু পরিচয়ও হয়ে যাবে।'

'বেশ করেছেন, খুব ভাল করেছেন।' ননীমাধব দত্তর প্যাকেট থেকে অমলেন্দু আর এক শলা সিগারেট তুলে নিল।

'আমি যে আপনাদের আধুনিক ঢং-এর লেখা কবিতা কত ভালবাসি—', মোহন পালের ওদিক থেকে তেমন আর কোনো সাড়া না পেয়ে ননীমাধব এদিকে ঘাড় ফেরাল। 'কি, ওতে সিগারেট আছে আর?' ননীমাধব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'হুঁ, হুঁ, আছে আছে—একটা আছে', এবার অমলেন্দু ঘাড় কাত করে টেরা চোখে শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'না, না, একটা শলা থেকেও যা না থেকেও তাই। সিগারেট আনতে দিচ্ছি—এই, কী নাম তোমার হে ছোকরা—এদিকে এসো।'

'রমেশ!' শুভেন্দু ডাকল।

ননীমাধব পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বের রকল। 'যাও, দু' প্যাকেট ফিলটার টিপ্‌ড উইল্‌স—'

নোটটা হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে রমেশও দেখা গেল শুভেন্দুর দিকে মুখটা আড় করে ধরে ঠোঁট টিপে হাসছে।

অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে থেকে মোহন পাল হিসাবের খাতায় চোখ নামাল। আরও দু' প্যাকেট আসছে, যেন সেই উত্তেজনায় উল্লাসে চেয়ারের পিঠে মাথাটা রেখে বেশ মৌজ করে সিগারেট টানতে টানতে পলাশ ননীমাধবের দিকে তাকাল।

'তা হলে আপনি আধুনিক কবিতার একজন ভক্ত?'

'নিশ্চয়—', ননীমাধব উৎসাহের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। 'নিজে এক লাইন কোনোদিন কবিতা লিখিনি। প্রথম কলম ধরেই আমি গদ্য লিখতে আরম্ভ করি, তার মানে উপন্যাস শুরু করি—অথচ কবিতা পড়তে, বিশেষ আপনাদের আধুনিক কবিদের কবিতা পড়তে এত ভাল লাগে! অনেক সময় অর্থ বুঝি না, তা হলেও পড়তে কেমন একটা নেশার মতন লাগে।'

'অর্থ খুঁজবার দরকার কি? বনে গিয়ে ফুলের নাম না জানলেও কিছু এসে যায় না, বুনোফুলের গন্ধটা যে আপনাকে নেশা ধরিয়ে দেয় সেটাই বড় কথা। নেশা ধরানোটাই কবিতার সব।' উৎপল বুঝিয়ে দিল।

'ভারি মজার তো!' পলাশ মাথাটা সোজা করে ধরল। 'আপনি নিজে গদ্য লেখেন অথচ কবিতার ভক্ত, আর এই যে দেখছেন আমাদের মোহনবাবু, মোহন পাল মশাই, এতবড় একটা চায়ের দোকানের মালিক, সারাদিন মাথা গুঁজে হিসাবের খাতা লেখেন, তিনি শুধু পদ্য ভালবাসেন—গদ্যের ওপর মহা খাপ্পা; আমরা কেউ উপন্যাস লিখব শুনলেই তিনি রেগে যান—মোহনের কেবল ভয়, আমরা গদ্যে হাত দিলে ধর্মচ্যুত হব—যে জন্য আমাদের রাতদিন উপদেশ দেন: স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়—'

শুনে ননীমাধব দাঁত ছড়িয়ে নীরবে হেসে ঘাড় তুলে মোহন পালকে দেখল। হিসাবের খাতায় মন দিয়েছে এই জন্য মানুষটা এত গম্ভীর হয়ে গেল কি! চিন্তা করে ননীমাধব মোহনবাবুকে আর ডাকল না। তা না হলে গদ্য পদ্য লেখা নিয়ে চায়ের দোকানের এই মালিকটির সঙ্গে ননীমাধবের একটু কথা বলার যেন ইচ্ছে হচ্ছিল, অর্থাৎ ননীমাধব মোহনবাবুকে বোঝাতে পারত, রবিঠাকুর একসঙ্গে গদ্য পদ্য অর্থাৎ এক হাতে দেদার কবিতা এবং আর এক হাতে গল্প উপন্যাস লেখার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বঙ্কিমবাবুও ঢাউস ঢাউস উপন্যাস লিখে বন্দেমাতরম-এর মতন গান লিখে গেছেন।

'সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে আমার এত ভাল লাগে!' নতুন প্যাকেট এসে যেতে ত্রস্ত হাতে মোড়ক ছিঁড়ে এক শলা ধরিয়ে নিয়ে ননীমাধব বলল, 'পদাবলী গোষ্ঠীর কবিদের সঙ্গে পরিচয় করে আজ আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, ভাষা দিয়ে সেটা বোঝাতে পারব না।'

'আপনার চোখমুখ দেখেই আনন্দটা খুব বোঝা যাচ্ছে।' পলাশ টিপ্পনি কাটল। 'ঠিক কিনা অমলেন্দুদা!'

'নিশ্চয় নিশ্চয়!' অমলেন্দু বেশি করে ঘাড় কাত করল, 'তা ছাড়া কেমন দরাজ হাতে উনি আমাদের সিগারেট খাওয়াচ্ছেন।'

'সিগারেট আবার একটা খাওয়া!' ননীমাধব নাকে হাসল।

'কেন, আরো ভালো জিনিস কিছু পদাবলীর কবিদের খাওয়াবার ইচ্ছে আছে নাকি আপনার!'

'এই পলাশ!' শুভেন্দুরও হাসি পাচ্ছিল, তা হলেও পলাশটা খুব বাড়াবাড়ি করছে দেখে তাকে ডেকে ইশারা করল।

'না না, তাতে কি, নিশ্চয় খাওয়াব, কেন খাওয়াব না, কী খাবেন বলুন, পুটি-

রামের রাধাবল্লভী? রাজের চমচম? সন্তোষের সন্দেশ?' ননীমাধব বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল।

'আজ না, আজ না, আর একদিন হবে।' মাথা নেড়ে শুভেন্দু বলল এবং এই ফাঁকে একটু হেসেও নিল। 'আপনার দেখছি এ-পাড়ার সব ক'টা মিষ্টির দোকানের সঙ্গে পরিচয়—'

'কেন, বৈঠকখানা বাজারে সারাদিন আলুর আড়তে থাকি বলে কি আমার এ-পাড়ায় আসা-যাওয়া নেই!' ননীমাধব পকেট থেকে হাতটা সরিয়ে আনল।

'কেন থাকবে না,' অমলেন্দু ভুরু কুঁচকোল। 'বাজারে যার আটখানা উপন্যাস চালু, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় তাকে ঘোরাফেরা করতেই হবে।'

'কাজেই এ পাড়ার চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকানের খোঁজও তাকে রাখতে হয়।' শুভেন্দু যোগ করল।

শুনে ননীমাধব খুশি হল।

'আপনার পাবলিশার কারা?' প্রশ্ন করল।

'চণ্ডীমাতা।'

পলাশের চোখ গোল হয়ে গেল।

'এই নামে তো কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কোনো পাবলিশিং কনসার্ন নেই—অমলেন্দুদা', পলাশ অমলেন্দুর দিকে ঘাড় ফেরাল, 'আছে নাকি? আপনার চোখে পড়েছে?'

অমলেন্দু মাথা নাড়ল।

ননীমাধব চুপ থেকে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসছিল।

'কোথায় সেটা? চিৎপুর?' ননীমাধবের চোখে চোখ রেখে পলাশ বিড়বিড় করে উঠল।

'চিৎপুরের ওরা বটতলার লেখকদের বই ছাপে—', ভুঁড়ি টান করে ননীমাধব সোজা হয়ে বসল। মুখটা হঠাৎ গম্ভীর করে ফেলল। 'আমার প্রকাশক হাতীবাগান-গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে চণ্ডীমাতা পাবলিশিং হাউস!'

পলাশ অপ্রস্তুত হল। কেননা, পরিষ্কার বোঝা গেল, চিৎপুর বলাতে ননী-মাধব মনে মনে বিরক্ত হয়েছে।

'হেদোর মোড় পর্যন্ত আমাদের চোখ যায়, বুঝলেন না?' যেন ননীমাধবকে সান্ত্বনা দিতে অমলেন্দু মিষ্টি করে হাসল।

'তারপরেও অবশ্য কিছু বইয়ের দোকান, পাবলিশিং হাউস আছে—আমরা তেমন খেয়াল করি না!'

'এবার ওদিকে গেলে খেয়াল করবেন। খুব বড় একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, ওদিকে গেলেই চোখে পড়বে—চণ্ডীমাতা পাবলিশিং হাউস।'

'একদিন আমরা দল বেঁধে যাব—গিয়ে দেখে আসব।' শুভেন্দুও ননীমাধবকে সান্ত্বনা দিল।

'যাবেন', ননীমাধব এবার খুশি হয়ে ঘাড় কাত করল। 'আপনারা যদি যান, উমেশ, মানে সেখানকার ম্যানেজার, আমার বন্ধুস্থানীয় লোক—দারুণ খুশি হবে। চণ্ডীমাতা অবশ্য কবিতার বই ছাপছে না। তা হলেও আধুনিক কবি সাহিত্যি-কদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সে সর্বদাই লালায়িত—'

'আমি ভাবছি কি', পলাশ হাসল, 'কবিতা লেখা একদম ছেড়ে দিয়ে উপন্যাসে হাত দেবো, এত বড় একটা পাবলিশার যখন আপনার হাতে রয়েছে—বই ছাপতে আর কোনো অসুবিধেই থাকবে না আমাদের।' কথাটা বলে পলাশ চোখ টেরা করে মোহন পালকে দেখল।

হিসাবের খাতা থেকে মোহন চোখ তুলল। সবই সে শুনছিল। যেহেতু সেকেলে ঢঙের লেখক, সদ্য পরিচিত এই ঔপন্যাসিকটির সঙ্গে পদাবলীর কবির দল যে খুব রগড়ে কথা-টথা বলছে, টিপ্পনি-ঠিপ্পনিও কাটছে—সবাই টের পাচ্ছিল মোহন। তা না হয় করল। বাইরের কোনো লেখক, বিশেষ একটু পুরোনোপন্থী সাহিত্যিক দেখল তো আর কথাই নেই, এই কবির দলটা চিরকালই এমন ঠাট্টা-ইয়ারকি মেরে কথা বলে এসেছে—আজ কুড়ি বছর মোহনের এসব দেখা, এদের স্বভাব তার খুব ভাল জানা আছে—কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, প্রত্যেকটা মানুষ কেমন চুপ করে আছে, মোহন পালের কিছুতেই জিনিসটা সহ্য হচ্ছিল না। হিসাবের খাতা বন্ধ করে আবার চেয়ার ছেড়ে উঠল। এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল। তারপর ননীমাধবের সামনে দাঁড়াল। 'ট্যাক্সি করে রামানন্দবাবুকে আপনি কি একেবারে বাড়ি পৌঁছে দিলেন?'

'না, আমি তাই চেয়েছিলাম, রামানন্দবাবু বললেন—দরকার নেই, আমি এখানেই নেমে পড়ব।'

'এখানে কোথায়?'

'শেয়ালদা।'

'অ, বুঝতে পেরেছি', মোহন মাথা নাড়ল। শেয়ালদায় ট্যাক্সি থেকে নেমে আপনি আপনার আলুর আড়তে চলে এলেন, রামানন্দবাবু নিশ্চয় বেলেঘাটার বাস ধরল?'

এক সেকেণ্ড ননীমাধব কথা বলল না। তারপর, এত বড় একটা মুখ, পাহাড়ের মতন শরীর, কিন্তু যেন সাত বছরের একটি শিশুর মতন ফিক করে হাসল।

'হুঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন—তবে, তবে ঠিক তখনি তিনি বাস ধরলেন না, দুজনে একত্র একটু বসলাম।'

মোহন নীরব হয়ে গেল। কথাটা যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না। ফিক করে হেসে কথাটা সেরেই আড়তদার কবিদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে টিপে টিপে হাসল।

'বুঝতে পারলেন না, মোহনবাবু!' শুভেন্দু মোহন পালকে বুঝিয়ে দিল। 'একত্র বসে দুজন একটু সেবাটেবা করলেন।' যেন বোতল উপুড় করে গেলাসে ঢালা হচ্ছে—মোহন পালের সামনে হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গিও করল শুভেন্দু। মোহনবাবুর মুখটা আবার থমথমে হয়ে উঠল।

'কেমন, আমি ঠিক ধরেছি কিনা, ননীবাবু?' শুভেন্দু ননীমাধবের দিকে তাকাল।

ননীমাধবের কালো পুরু ঠোঁটে শিশুসুলভ হাসিটা তখনও ঝুলছিল।

'দেখলাম, স্বদেশীতে রামানন্দবাবুর আপত্তি নেই। তা ছাড়া বৈঠকখানার দোকানে আর একদিন, একটু আগে বলেছি আপনাদের, জগতবাবু নন্দদুলাল-বাবু রামানন্দ সেন ও আমি—'

যেন সবটা কথা শোনার আর ধৈর্য নেই, অত্যন্ত নীরস অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ। বিরক্ত ভুরু কুঁচকানো চেহারা করে অমলেন্দু হঠাৎ শুভেন্দুর দিকে তাকাল। 'আমি এখন উঠব শুভেন্দুবাবু।'

শুভেন্দু ইঙ্গিতটা বুঝল। আড়চোখে ননীমাধবকে একবার দেখে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে অমলেন্দুর চোখে চোখ রাখল। 'না না, বসুন, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। এই ভদ্রলোকের—'

অর্থাৎ এই ভদ্রলোক, যার নাম ননীমাধব দত্ত, বৈঠকখানায় যার আলুর আড়ত আছে, আবার উপন্যাসও লেখে, হুঁ, এমন বিদঘুটে আজব মানুষটার কথা শেষ হোক অথবা উঠে চলে যাক, তারপর আমাদের জরুরী আলোচনা আরম্ভ হবে।

শুভেন্দুর চোখেমুখে এমন একটা ভাব এত বেশি প্রকট হয়ে উঠল যে, ননীমাধব কথা থামিয়ে রীতিমত গম্ভীর হয়ে থেকে এবং বলতে কি, বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বয়স্ক কবি দুটির দিকে চোখ রেখে জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল।

শুভেন্দু ওদিকে ঘাড় ফেরানো মাত্র ননীমাধব একটা পোশাকী হাসি হাসল।

'আচ্ছা, আজ আমি উঠব শুভেন্দুবাবু, অনেকক্ষণ বসলাম—আপনাদের অনেকটা সময় নষ্ট করলাম—'

'না না, ছি, সেকি!' শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ চমৎকার হাসিহাসি চেহারা করে ফেলল। 'আমাদের কথা ছেড়ে দিন, আমাদের জরুরী আলোচনা চিরকালই লেগে আছে মশাই—সেটা একটা কথা না—তবে কিনা—যাক গে, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে সত্যি খুব আনন্দ হল।'

'আর একদিন আসবেন।' অমলেন্দুও ঘাড় বেঁকাল। 'অনেকক্ষণ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

'হুঁ, সাহিত্যালোচনা হবে আর সেই সঙ্গে আপনার বড় জিনিস ভাল জিনিস খাওয়া যাবে।' ত্যাঁদড় পলাশ নতুন প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল।

'আধুনিক কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করা, তাঁদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা আমার একটা নেশা।' বলতে বলতে ননীমাধব চেয়ার ছেড়ে উঠল। নতুন সিগারেটের প্যাকেট দুটো টেবিলে থেকে গেল।

'আপনার সিগাবেট ফেলে যাচ্ছেন কিন্তু।' লোলুপ চোখ দুটো টেবিলের দিকে, তা হলেও পলাশ ননীমাধবকে মনে করিয়ে দিল।

আপনারা খাবেন। চলি আজ', দু'হাত একত্র করে একসঙ্গে সকলের কাছে বিদায় নেবার কাজটা সেরে পাহাড়েব মতন শরীরটা নিয়ে ননীমাধব বেরিয়ে গেল।

'হবিদাস পাল!' সিগারেটের প্যাকেট দুটো তৎক্ষণাৎ হাতে নিয়ে পলাশ হো-হো কবে হেসে উঠল। মাত্র দোকানের চৌকাঠ পার হয়েছে, কাজেই ননীমাধবের কানে যেন হাসিটা পেঁছাল বলেই মনে হল।

'তা হলেও হরিদাস পাল তোমাকে দু প্যাকেট ফিলটার টিপ্‌ড উপহার দিয়ে গেল।' শুভেন্দু না বলে পারল না।

'ওফ্', অমলেন্দু নাক সিঁটকাবার মতন চেহারা করল। 'কী খারাপ যে লাগছিল লোকটাকে—এ বোব, আমার মাথা ধরেছিল, আর এমন আনকুথ চেহারা—

'তা হলেও মহাপুরুষ—বাজারে আটখানা উপন্যাস চালু আছে।' শুভেন্দু নাকে হাসল।

॥ ৩২ ॥

'মোহনবাবু!' পলাশ ঘাড় ফুলিয়ে মোহনবাবুকে ডাকল। 'আপনার দোকান আজ ধন্য হয়ে গেল, কত বড় একটা অথরের পায়ের ধুলো পড়ল—'

মোহন পালের গালের পেশী শক্ত হয়ে আছে। শব্দ নেই মুখে। একদৃষ্টে রাস্তার ডাস্টবিনটা দেখছে।

'মোহনবাবুকে খুব চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে মনে হয়।' শুভেন্দু আস্তে বলল।

'মোহনবাবু!' অমলেন্দু ডাকল।

এবার মোহন পাল উঠে দাঁড়াল, দুটো হাত পিছনে নিয়ে, অনেকটা দার্শনিকের মতন, মন্থর পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কী যেন একটু চিন্তা করল। তারপর শুভেন্দুদের টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়াল।

'শুভেন্দুবাবু!'

'বলুন।'

জলদগম্ভীর স্বর মোহনের। শুভেন্দু, অমলেন্দু, পলাশ, উৎপল, নবকিশোর—সকলেই চোখ তুলে মানুষটাকে দেখছিল। মোহন কাউকে দেখছিল না। দেওয়ালের দিকে চোখ।

'আপনারা সব শুনলেন?'

'কী শুনলাম মোহনবাবু?' নিতান্ত ভালমানুষের মতন চেহারা করে শুভেন্দু উত্তর করল।

'পাইকপাড়ার ক্লাব রামানন্দবাবুকে অপমান করেছে, মারধরও করেছে—'

'হুঁ,' শুভেন্দু মাথা ঝাঁকাল। 'আড়তদার সাহিত্যিকটি তো তাই বলে গেল শুনলাম।'

'কিন্তু এভাবে কি আপনাদের চুপ করে থাকা উচিত!' দেওয়াল থেকে মোহন চোখ নামাল।

'আমাদের কী করতে হবে বলুন? লাঠি-সোটা, বোমা, রিভলবার নিয়ে পাইকপাড়ায় ছুটব?'

শুভেন্দু চোখমুখের এমন একটা ভঙ্গি করল—মোহন অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

'তা ছাড়া রামানন্দবাবু আজকাল কোথায় আছেন, কী করছেন আমরা প্রায় কিছুই জানি না', রুক্ষ স্বরে অমলেন্দু বলল, 'আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যে ঐ মানুষ কিছু করবে না তা আপনিও জানেন। অনেকদিন আমাদের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছেন। পাইকপাড়ার কোন্ ক্লাবের সংস্কৃতি না সাহিত্য সভায় তিনি কী করে এসেছেন, কী বলে এসেছেন তা তিনিই ভাল জানেন, আর জানেন ওই আমাদের আলুর আড়তদার ননীমাধব দত্ত। হুঁ, তিনিও একজন ভয়ানক বড় সাহিত্যিক, এখন এরাই রামানন্দ সেনের বন্ধু।'

'আশ্চর্য, এককালে তিনি আপনাদের এত কাছে ছিলেন, তাঁকে নিয়ে পদাবলী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। কত গৌরব করতেন আপনারা সবাই রামানন্দ সেনকে নিয়ে!'

'সে আর-এক রামানন্দকে নিয়ে, বুঝেছেন মোহনবাবু, সেই রামানন্দ অনেকদিন মরে হেজে ভূত হয়ে গেছে।'

অমলেন্দু থামতে শুভেন্দু বলল, 'রামানন্দ মার খেয়েছে, অপমানিত হয়েছে শুনে এখানে বসে আপনি বেজায় দুঃখ করছেন—কিন্তু আলুর আড়তদারের মুখে শুনলেন তো, মার-টার খাবার পর দিব্যি শেয়ালদা ফিরে গিয়ে বৈঠকখানা বাজারে বসে প্রাণভরে দেশী মদ গিলল?'

'আমার কী মনে হয় জানেন শুভেন্দুবাবু?' অমলেন্দুর ভুরু জোড়া হঠাৎ কপালে উঠল।

শুভেন্দু তার চোখে চোখ রাখল।

'কী মনে হয়?'

'কবিরা শিল্পীরা কখন সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে বেড়ায় জানেন?'

শুভেন্দু একটু হাসল।

'হাসবেন না, কাল রাত্রেও আমি চিন্তা করেছি। হঠাৎ রামানন্দ সেন পাইকপাড়ায় ছুটে গেল কেন। কোনোদিন তো তার এসব বদ নেশা ছিল না। একটি সাহিত্য বাসরে কি সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠানে আমি সভাপতি হব বা চীফ গেস্ট হব—উহুঁ, ইচ্ছে ছিল না, আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, এটা কোনো কাজের কথা না। তারিখটা তুমি জানতে—অন্য কোথাও সরে গিয়ে দিব্যি এড়াতে পারতে—না, আসলে রামানন্দ

মনে মনে তা চাইছিল। বুঝেছেন মোহনবাবু—', অমলেন্দু এবার মোহন পালের দিকে চোখ ঘোরাল। 'সেই রামানন্দ সেন অনেক দিন আগেই মরে গেছে, এখন কঙ্কালটা আদাড়ে-পাদাড়ে ঘোরাফেরা করছে—কবিতা লিখছে না মানে লিখতে পারছে না, হি ইজ স্পেন্ট্ আপ, অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ কি সহজে শেষ হতে চায় মশায়—যেমন আপনি আপনার এই দোকানে বসে মাঝে মাঝে কবি রামানন্দ সেনের স্মৃতি রোমন্থন করেন, তার জন্য দুঃখ করেন, তেমনি রামানন্দর কঙ্কালটাও কবি রামানন্দ সেনের জন্য খুব দুঃখ করছে—যে জন্য, যে কারণে সেই নামটাকে বাঁচিয়ে রাখতে, সেই রামানন্দকে ফিরিয়ে আনতে কঙ্কালটা এখন এসব সভায় অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে, প্রধান অতিথি হয়ে ভাষণ-টাষণ দিচ্ছে।'

'না না, জিনিসটা আপনারা এভাবে নেবেন না।' মোহন পাল উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'রামানন্দ সেন ফুরিয়ে গেছেন এ আমি বিশ্বাস করি না। সাময়িক লেখা বন্ধ রেখেছে। আর একদিন বলেছি—আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন না ঠিকই, তিনি হয়তো অন্য কিছু খুঁজছেন, শিশুর মতন, পাগলের মতন আপন-ভোলা হয়ে নতুন কোনো ইমেজ, অন্য কোনো আইডিয়ার পেছনে—'

'রাখেন মশাই!' শুভেন্দু প্রায় ধমক দিয়ে মোহন পালকে থামিয়ে দিল।

পলাশ ফিক করে হাসল।

'কবিতা আর কবিদের কাব্যভাবনা নিয়ে মোহনবাবুও আজকাল বেজায় চিন্তা করছেন—'

'সকল কবির কথা কি আর মোহনবাবু চিন্তা করছেন—' অমলেন্দু খোঁচা দেওয়ার মতন করে মাথা ঝাঁকাল। 'একমাত্র রামানন্দ সেন ছাড়া মোহনবাবুর চোখে আর কেউ কবিই নয় এখনে, তাই না মোহনবাবু।'

'না, সে কথা বলিনি আমি।' মোহন পালের কান লাল হয়ে উঠল। চপ কাটলেট খারাপ হয়েছে কি ডিমে পচা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কি সস্তা দামের বাজে চা দোকানে চালানো হচ্ছে—কতদিন খদ্দেরদের কতরকম অভিযোগ মোহনবাবুকে শুনতে হয়, কিন্তু কোনোদিন মানুষটাকে এমন উত্তেজিত বা গরম হতে দেখা যায় না। 'আমি শুধু বলেছি', মোহনের গলার স্বর কাঁপছিল, 'আপনাদের বাঁধাধরা রাস্তায় রামানন্দবাবু আর চলতে চাইছিলেন না, ভাল লাগছিল না তাঁর, যে কারণে আপনাদের পদাবলী কাগজেও তিনি আর কবিতা লেখেন না—'

'থামুন থামুন।' শুভেন্দু ঠিক তেমন করে ধমক দিল না এবার, কিন্তু গলার স্বরে যথেষ্ট তিক্ততা ছিল। 'ঐ তো বললেন পাগলের মতন নতুন ইমেজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা আমাদের নাগালের বাইরে, ভাবনার বাইরে—তারপর একদিন এমন সব কবিতা লিখতে থাকবে রামানন্দ সেন, আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে—বেশ, ভাল, আপনার কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু কথা হচ্ছে, পাগল হয়ে শিশু হয়ে তিনি যদি আগুনে ঝাঁপ দেন, দেশী মদ গিলে ভাগাড়ে পড়ে থাকেন আর একটা ভদ্রপাড়ায় গিয়ে সাহিত্যের নামে আগড়বাগড় কথা বলে লোককে চটিয়ে তুলে মারধর খেয়ে আসেন তো সেজন্য কি আমরা দায়ী—'

'আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না।' মোহন পাল আবার নিজের আসনে ফিরে গেল। সেখান থেকে গলা বড় করে বলল, 'রামানন্দ সেন আগড়বাগড় কথা বলেছিল—তা হলে এই যে এতক্ষণ আর একজন সাহিত্যিক এখানে বসে গেলেন, তিনিও ঠিক তাই বলতেন, কই, তিনি তো তা বললেন না, খুবই নতুন কথা নতুন জিনিস রামানন্দ তাঁর ভাষণে বলতে চেয়েছিলেন পাইকপাড়ায়, ওই ভদ্রলোক সেখানে নিজে উপস্থিত ছিলেন—'

'হুঁ, তিনিও একজন মস্ত বড় পণ্ডিত কিনা—আপনার মতোই শিল্প সাহিত্য কাব্যটাব্য খুব বোঝেন, খুব চিন্তা করেন এসব নিয়ে—', অনেকটা নিজের মনে শুভেন্দু বিড়বিড় করে উঠল।

কিন্তু তাহলেও কথাটা সবাই শুনল। মোহন পালও শুনল। কিন্তু মোহন তাতে নতুন করে কিছু আর উত্তেজিত হল না। বরং গলার স্বরে একটা থমথমে অভিমান শোনা গেল।

'না, আমি আর এসব কী বুঝি—আপনাদের কাছ থেকে শুনে ঐ যা দু-চারটে কথা সময় সময় বলা—আপনারা বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তি, আমি চায়ের দোকান চালাই, আমি বুঝি ক' পেয়ালা চায়ে কতটা চিনি লাগবে, কতটা দুধ লাগবে, পাঁচ কেজি মাংস নামাতে কতটা পেঁয়াজ লাগবে, কতখানি তেল। তা হলেও একটি শিশু যদি আগুনে হাত পোড়াতে যায়, একটি পাগল যদি গাড়ি-ঘোড়া না দেখে রাস্তা পার হতে ছোটে, আর সেই পাগল কি শিশুটি যদি আপনাদের বাড়ির মানুষ হয়, তখন কি আপনারা হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকেন?'

'না, তা থাকব কেন!' এবার অমলেন্দু কথা বলল।

'কাজেই, আপনাদের কথা মতন রামানন্দবাবু যদি সেই অর্থে পাগল হয়ে শিশু হয়ে একটা কাজ করে ফেলেন, হুঁ, না হয় পাইকপাড়ার ওই ফাংশনে আবোলতাবোল বকতে আরম্ভ করেছিলেন, তা বলে ওরা মানুষটাকে এভাবে অপমান করবে, মারধর করবে? এর কি কোনো প্রতিকার নেই?'

'কী করতে হবে বলুন, থানায় ডাইরী করতে ছুটব এখন?' ডান হাতের তেলোটা শূন্যে ঘুরিয়ে শুভেন্দু মোহন পালের দিকে কথাগুলি ছুঁড়ে দিল। 'কিন্তু ব্যাপার তো কালই চুকে গেছে, তা ছাড়া আমরা কেউ সেখানে ছিলামও না।'

'থানায় ডাইরী করার কথা হচ্ছে না।' বাইরে ডাস্টবিনটার দিকে চোখ দুটো ধরে রেখে মোহন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'পদাবলীর তরফ থেকে অন্তত ওদের কাছে একটা কড়া প্রতিবাদ জানানো উচিত ছিল।'

শুভেন্দু নীরব। অমলেন্দু নীরব। পলাশ চোখ বুজে সিগারেট টানতে লাগল। নবকিশোর, উৎপল ও অরুণাভ উসখুস করছিল। মেঘে রৌদ্রে মেশানো এলোমেলো দিন, কখনও উজ্জ্বল লাগছে, কখনও বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। মাথার ওপর পাখাটা বিশ্রী আওয়াজ করছিল। বোঝা যায় পাখার অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। এটা এখন সবাই বুঝে গেছে যে, কারো মাথায় ভেঙে না পড়া পর্যন্ত এই পাখা মোহন পাল বদলাবে না। আগে হলে তবু কথা ছিল, ইদানিং সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে মানুষটা যেমন মাথা ঘামাচ্ছে—পাখা ভেঙে পড়লেও আর একটা নতুন পাখা লাগাবার মতন বৈষয়িক বুদ্ধি মোহন পালের মাথায় ঢুকবে না জানা কথা। অথচ এইমাত্র ঘটা করে বলল যে, চায়ের দোকান চালানো ছাড়া আর কিছুই মোহন বোঝে না, তার শুধু জানা আছে ক'কাপ চায়ে কতটা দুধ চিনি লাগবে, পাঁচ কেজি মাংস রাঁধতে কত পেঁয়াজ, কী পরিমাণ তেলের দরকার। মাংস! শুনতে কতই ভাল লাগে। বাইরের লোক জানুক না জানুক, কিন্তু শুভেন্দুরা জানে, আজ এক মাসের উপর মোহন রেস্টুরেন্টে মাংস জাতীয় কিছু উনুনে চাপানো হয়-নি। চপ্ হয়েছে দিন সাতেক। কাট্‌লেট দিন দশ বারো। সবই আঙুলে গোনা যায়। উত্তর দিকের দেওয়ালে কালো বোর্ডটা ঠিকই ঝুলছে। এবং তাতে খড়ি দিয়ে চা, টোস্ট, চপ্, কাটলেট, গ্রীল, ডেভিল, পুডিং, মোগলাই পরটা, ফাউলকারী, মাটন কারী কত কি নিত্য মোহনবাবু লিখে রাখছে। সেই সাত-সকালে দোকান খুলেই ধুপধুনো জেবলে গণেশ প্রণামটা সেরেই মোহন বোর্ডএর গায়ে গুটি গুটি অক্ষর

বসিয়ে মেনুটা লিখে ফেলে। একদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। কাজেই দোকানে ঢুকে সুদীর্ঘ খাদ্যতালিকা দেখতে দেখতে কপালের ঘাম মুছে আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে কোনো খাদ্যরসিক খদ্দের যদি হঠাৎ উৎসাহ নিয়ে ফাউলকারী, মটন কি খাসীর মাংস চেয়ে বসে, মোহন তৎক্ষণাৎ এমন একটা বুদ্ধিমার্জিত হাসি হাসে—তাকিয়ে দেখার মতন। উঁহু, হেসে মোহন পাল কিন্তু খদ্দেরের চোখের দিকে কখনও তাকাবে না। মেনু বোর্ডের ওপর চোখ দুটো ধরে রেখে আস্তে আস্তে মাথা নাড়বে, 'স্যার, ছিল তো, এইমাত্র ফুরিয়ে গেল।' অথবা 'একটু সময় লাগবে স্যার, এখনো মাংসটা উনুন থেকে নামেনি।' তেমনি চপ্, কাটলেট্, গ্রীল, ডেভিল, পুডিং, মোগলাই পরটা—'স্যার এখনো তৈরী হয়নি। আপনাকে একটু বসতে হবে, একটু ওয়েট্ করতে হবে।' পাঁচ-দশ-পনেরো-বিশ—হয়তো আধ ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট ডেভিল কি মোগলাই পরটা খাবার আশায় খাদ্য-রসিক বাবুটি দোকানে বসে থেকে ভাঙ্গা পাখাটার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শুনল। কিন্তু তারপর?

না, এত অগাধ সময় কারো হাতে নেই কলকাতা শহরে যে মাংস, মোগলাই পরটা বা ডেভিল খাবার জন্য এক ঘণ্টার ওপর একটা চায়ের দোকানে বসে কাটাবে! মোহনবাবু সেটা ভাল জানে। অগত্যা চা, টোস্ট বা একটা ডিম কি ভেজিটেবল চপ্, তা-ও যদি কপালগুণে তৈরী হয়ে থাকে, খেয়ে তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মী খদ্দের বিল মিটিয়ে মৌরী চিবোতে চিবোতে দোকান থেকে বেরিয়ে যাবেন জানা কথা।

বিশেষ করে দুপুরের পর থেকে এবং বেশির ভাগ বিকেলে, সন্ধ্যার দিকে, মোহনবাবু যেটাকে 'পিক্-আওয়ার' বলেন—চপ্, কাটলেট্, ফাউলকারী, মাটনকারী-খাইয়ে খদ্দেরদের আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মোহনবাবুর দোকানে তেমন খদ্দের আসে কি? শুভেন্দুরা কোনোদিনই দেখে না। দু' দিন মাংস খেতে এসে মাংস না পেলে তৃতীয় দিন আবার এই দোকানে ঢুকবে এমন বোকা কলকাতা শহরে কেউ নেই। যেখানে পায়ে পায়ে চায়ের দোকান আর রেস্টুরেণ্ট—বিশেষ করে হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়।

'না, বলা হচ্ছে সেই একটি দুটি বাইরের খদ্দের সম্পর্কে—কোনোদিন যারা মোহন রেস্টুরেণ্টে ঢোকেনি, কিন্তু একদিন কৌতূহল নিয়েই হোক বা ততটা খেয়াল করেনি বলেই হোক, বা চটকদার সাইন বোর্ডটা দেখে হোক, হুট করে এখানে ঢুকে পড়ল, তারপর যখন চমৎকার মেনু-বোর্ডটার ওপর চোখ রেখে এটা ওটা চাইবে, তারপর নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে, কি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতন মাংসের বদলে নিরামিষ চপ খেয়ে রেস্টুরেণ্টে খাবার শখ মেটাবে।

হুঁ, এমন একটি দুটি বিরল বিভ্রান্ত হতভাগ্য খদ্দেরকে দেখেই না শুভেন্দুরা ক'দিনই মোহনবাবুকে বেশ কড়া করে শুনিয়েছে—'মশাই, রোজ ঘটা করে এত বড় একটা মেনু লিখে রাখার দরকার কি, এটা আপনার খুব অন্যায়, যেখানে কোনো-দিনই আপনার দোকানে মাটনকারী, ব্রেস্ট কাটলেট, পুডিং, পরোটা হয় না—'

কবিদের কড়া কথা শুনে মোহনবাবু রাগ করেছে এই অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারবে না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরতি গলাটা ছড়িয়ে দিয়ে শব্দ না করে মোহন হাসে। তারপর এক সময় শুভেন্দুদের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে—'এটা হল বিজনেস ট্যাকটিক্স—বুঝছেন, কেবল নেই নেই বললে ব্যবসা আর একদম চলবে না যে।'

আপনার ব্যবসার এমনিও বারোটা বেজে গেছে—শুভেন্দুরা প্রায়ই বলে। কিন্তু তাতেও মোহনের মন খারাপ হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেছে, মোহন পালের পরম শত্রুও একথা বলবে না।

তা ছাড়া মোহন পালের শত্রুই নেই। যারা আছে সবাই মিত্র। হুঁ, এই কবির দল। আগেই বলা হয়েছে পদাবলী গোষ্ঠীর কবিদের ভাগ্যের সঙ্গে মোহন পাল নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছে—তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বিকারচিত্তে দোকানটাকে আজ এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে লজ্-ঝড় পাখাটা কারো মাথার ওপর না ভেঙ্গে পড়ে। দেওয়ালের প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে, প্রত্যেকটা চেয়ার টেবিল বুড়ো মানুষের দাঁতের মতন নড়বড় করছে।

ফাউলকারী, মাটনকারী দূরে থাক, ক'দিন ধরে চপ কাটলেটও ভাজা হচ্ছে না। শুভেন্দুবাবুদের ক' কাপ চা তৈরী করে দিয়ে রমেশ সেই দোকান থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার ওধারে দাঁড়িয়ে পানের দোকানের লোকটার সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়েছে, মোহনবাবু কি তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না আর!

এখন বেলা তিনটে বাজে। মোহনবাবুর ভাষায় দোকানের এখন বেচাবিক্রীর চূড়ান্ত প্রহর প্রায় শুরু হয়ে যাবার কথা।

কিন্তু ঐ যে, ব্যবসা চুলোয় যাক, মোহন পালের ভ্রূক্ষেপ নেই। এতকাল বলে বলেও ভদ্রলোককে কিছুতেই আর সংশোধন করা গেল না—আর আজ তো কথাই নেই।

শুভেন্দু অমলেন্দু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, কবি রামানন্দ সেনের ভাবনায় একটা চায়ের দোকানের মালিক কেমন বিভোর আত্মহারা অস্থির অন্যমনস্ক হয়ে আছে।

আজ মোহনবাবু খুবই উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ। রামানন্দর হয়ে শুভেন্দুরা একটা কথাও বলছে না।

এই অবস্থায় মোহন পালের সঙ্গে হাসিঠাট্টা ইয়ারকি কিছুই চলে না।

তা না হলে শুভেন্দু বা অমলেন্দু হয়তো বলতে পারত, মোহনবাবু, আপনি নিশ্চয় জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন—যদি তাই হয় তবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পূর্বজন্মে আপনি কবি ছিলেন—আর যদি তা না হয় আগামী জন্মে নির্ঘাৎ আপনাকে কবিতা লিখতে হবে।

চমৎকার একটা হাসির রোল উঠত। মোহনবাবুও হাসত সন্দেহ নেই।

কিন্তু আজ আবহাওয়া অন্য রকম। মোহন পালের মতন শুভেন্দু অমলেন্দুর মুখও থমথম করছে। তাঁরাও ক্ষুব্ধ কুপিত। এবং কিছুটা বিষণ্ণ। পদাবলী গোষ্ঠী থেকে আপনাদের প্রতিবাদ করা উচিত। যেন পদাবলীর কত বড় একজন মিত্র রামানন্দ সেন—কাগজটাকে ডুবিয়ে দিয়ে যে লোক সরে পড়েছে!

'বুঝলেন মোহনবাবু, আপনি আমাদের বলছেন, আমরা চুপ করে শুনলাম। আজ যদি বিকাশ এখানে উপস্থিত থাকত, আপনার এই কথার উত্তরে সে কী বলত একবার চিন্তা করে দেখেছেন?'

'আমার চিন্তা করার কিছু নেই মশাই। আমার সব চিন্তা শেষ হয়েছে।' একটা হতাশার সুর শোনা গেল মোহনের গলায়। 'এটা এখন আর আমার বুঝতে বাকি নেই, রামানন্দ সেনকে আপনারা কোনোদিনই ভালবাসেননি, আপনারা ভেতরে ভেতরে মানুষটাকে ভয়ানক ঈর্ষা করতেন, হিংসা করতেন।'

'কি করে বুঝলেন?' শুভেন্দু চটল না, ঠোঁট বেঁকিয়ে হঠাৎ কেমন করে হাসল।

'ঐ তো, যেহেতু রামানন্দ সেন আর আপনাদের কাগজে লেখেন না, তিনি আপনাদের শত্রু হয়ে গেলেন।'

'আপনি ভুল করছেন মোহনবাবু!' এবার অমলেন্দু গলার স্বর চড়িয়ে দিল।

'রামানন্দ সেন আমাদের কাগজে আর লেখেন না বলে যে আমরা তাকে শত্রু মনে করছি তা নয়, এই পদাবলী কাগজের ভেতর দিয়েই কবি রামানন্দ তার কবিতার যত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছে, যেতে পেরেছে—আধুনিক কবিমহলে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ার মূলে আছে এই একটি কবিতাপত্র, বিশ্বাস না করেন, বাইরে যে-কোনো একটি তরুণ কবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'হুঁ, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ঝাঁকের ঝাঁক কবি ঘুরে বেড়ায়—যে কোনো একটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করার কিছু অসুবিধেও নেই আপনার।'

শুভেন্দু মাথা ঝাঁকাল, তারপর চেহারাটা অতিরিক্ত গম্ভীর করে ফেলল। 'বুঝেছেন মোহনবাবু, পদাবলী ছিল বলে আজ বাংলা দেশ রামানন্দকে চেনে, তার প্রতিভা বলুন মেধা বলুন—যদিও রমলা বলে যে, রামানন্দর ওটা প্রতিভা না, একটা চমক শুধু—যাই হোক, পদাবলী কাগজই সেটা সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছিল। কেবল রামানন্দর কবিতা ছাপা হতো এটা ঠিক না, রামানন্দকে নিয়ে পদাবলী যত আলোচনা করেছে, একজন কবিকে নিয়ে এত ঢাক-ঢোল এই দেশের আর কোনো কাগজ পিটিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই—কিন্তু রামানন্দ সেন সব ভুলে গেছে। আমাদের রাগ সেইখানে। কত বড় অকৃতজ্ঞ বেইমান! তাকে আমরা হিংসা করছি যত না, ঘেন্না করছি অনেক বেশি।'

'তাই তো, এত করা হয়েছে রামানন্দবাবুর জন্য, তোমার ওয়াইফ ঠিকই বলেছেন, একটা সেকেন্ড গ্রেড জিনিয়াস, অথচ এই কাগজের জন্য, মানে কাগজ বার করার ব্যাপারে রামানন্দবাবুকে একেবারে কিছুই করতে হতো না, আপনিও চোখের ওপর দেখেছেন মোহনবাবু।' শুভেন্দু চুপ করতে অমলেন্দু মোহন পালের দিকে তাকাল, 'তিনি লিখেই খালাস ছিলেন—সম্পাদক করে আমরা তাকে মাথায় বসিয়ে রেখেছিলাম, ওদিকে বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, লেখা সংগ্রহ করা, প্রুফ দেখা, প্রেসে ছুটোছুটি—স্টলে স্টলে কাগজ দেওয়া—সব এই মানুষটি করেছে,' আঙুল দিয়ে শুভেন্দুকে দেখিয়ে দিল অমলেন্দু, 'আর করেছেন বিকাশবাবু—'

'ওফ, বিকাশদা যা করেছে পদাবলীর জন্য এবং এখনো যা করছে!' পলাশ প্রায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠার মতন ভঙ্গি করল। 'তুলনা হয় না, তুলনা হয় না।'

'বিকাশ?' শুভেন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'পদাবলী ওর প্রাণ, প্রাণেরও বেশি কিছু যদি থাকে তবে তাই। আমি আর কী করেছি, কতটা করছি, হুঁ, টাকা দিচ্ছি, জলের মতন টাকা ঢেলে যাচ্ছি—কিন্তু টাকাই সব না, বিকাশ এই পত্রিকার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে বললে অত্যুক্তি হয় না—ঐ একটা লোকের জন্য আজও পদাবলী দাঁড়িয়ে আছে—'

মোহন পাল কি এসব শুনছিল? নাকের ডগায় একটা মাছি বসে আছে। ঘাড় গুঁজে হিসাবের খাতা দেখছে। গায়ের ময়লা পশমী চাদরটা চেয়ারের হাতলে ঝুলছে। হুঁ, হিসাবের খাতা দেখছে, কিন্তু কথাগুলি তার কানে আসছিল বইকি।

মোহন পাল মনে মনে ঠিক করেছে, ভবিষ্যতে আর রামানন্দকে নিয়ে এদের কাছে কিছু বলবে না, বলে লাভ নেই। খামকা তর্কে মোহন হেরে যাবে জানা কথা। সবাই বেশি লেখাপড়া জানে, কাব্য কবিতা এবং একটি কবিকে নিয়ে হাজার কথা বলে মোহনকে এরা ভূত বানিয়ে ছাড়বে। তার চেয়ে চুপ থাকা ভাল। সত্যি তো, রামানন্দ তার কে, কবি রামানন্দ সেন তার কতটা! চা চপ নিয়ে মোহন পালের কারবার।

তবু ন্যায় বলে একটা কথা আছে, নীতি বলে শব্দ আছে। সেদিক থেকে এই শিক্ষিত কবির দলটাকে মোহন কিছুতেই যেন ক্ষমা করতে পারছিল না।

'ভাল কথা, দু' দিন ধরে বিকাশদা আসছেন না কেন—এমন তো বড় হয় না?' পলাশ প্রশ্ন করল।

'আমিও কাল থেকে তাই ভাবছি।' পলাশের চোখে চোখ রেখে শুভেন্দু একটু চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'কেমন একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে—ওর বাড়িতে টেলিফোন নেই যে ডেকে কাউকে জিজ্ঞেস করব।'

'আমার মনে হয় অসুখ-বিসুখ করেছে।' অমলেন্দু হাতের পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিল।

'বুঝলাম, একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল—', শুভেন্দু এইমাত্র বিকাশের প্রশংসা করল, আবার এই মুহূর্তে বিকাশের ওপর সে বিরক্ত অসন্তুষ্ট যেন কম না মনে হল। এবার কাগজ বেরোতে অনেক দেরি হয়ে গেল, ভাবলাম আসছে সংখ্যা একটু তাড়াতাড়ি বের করে ফেলব—এখনই প্রেসে ম্যাটার দেওয়া দরকার, অন্নদা কালও আমাকে রিং করেছিল। কিন্তু সব ক'টা লেখা বগলদাবা করে সেই যে রবিবার বিকেলে বিকাশ এখান থেকে উঠে বাড়ি গেল—আজ বুধবার—তার দেখা নেই!'

'একটা খবর দেওয়া দরকার ছিল বইকি—' অমলেন্দু ভুরু কুঁচকোল। 'অথবা কাউকে দিয়ে লেখাগুলো এখানে পাঠিয়ে দেওয়া।'

'আমার মনে হয় কি, হাঁপানি রুগী বুড়ো বিকাশদার বাবা অক্কা পেয়েছে।' পলাশ হি-হি করে হাসল।

এটা হাসবার সময় না। তা হলেও শুভেন্দু পলাশের কথায় সামান্য হাসল।

'তা হলে তো বিকাশ বেঁচে যায়—ঐ টিংটিং-এ স্বাস্থ্য নিয়ে নব্বই ছুঁই ছুঁই করছে বেটা আর রাতদিন বিকাশকে জ্বালিয়ে মারছে—বিকাশ রোজই একবার করে বাপকে নিমতলা পাঠায়—উহুঁ, তা হলেও বিকাশ অন্তত একবার এখানে ঢুঁ মেরে যেত, অন্তত লেখাগুলো আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেত—'

'তবে কি বিকাশবাবুর ওয়াইফের কিছু হল? শুনছিলাম যেন শীগগির আবার হসপিটালে যাচ্ছে?'

শুভেন্দু মাথা নাড়ল।

'তা হলেও বিকাশ আসত, দু'দিন তিনদিন বউয়ের বাচ্চা হওয়ার ব্যাপার নিয়ে মেতে থাকবে সেই পাত্রই সে নয়। তা ছাড়া এবার পয়লা না, দুটো যেখানে অলরেডি এসে গেছে। ডেলিভারি সংক্রান্ত কোনো রকম অ্যাকসিডেণ্ট? উহুঁ, তাতেও বিকাশের আসা বন্ধ থাকত না—অন্তত কামিং ইস্যুর কবিতাগুলো, প্রবন্ধ দুটো এখানে সে ঠিক রেখে যেত, আমরাই সব দেখে দিতাম।'

অমলেন্দুকে চিন্তাগ্রস্ত দেখাল।

'তবে কি বিকাশবাবু নিজে অসুস্থ!'

'কী অসুখ করবে?' শুভেন্দুর যেন তা-ও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না। 'মাঝে মাঝে পেটে একটা পেইন হয়—তেমন কিছু না—অসুখ হয়ে বিকাশ একদিনও বিছানায় শুয়ে আছে, আজ চৌদ্দ বছরের মধ্যে আমি দেখিনি।'

'তাই তো—', অমলেন্দুর অবশ্য অতকাল ধরে কবি বিকাশ চাটুয্যের সঙ্গে পরিচয় নেই, তা হলেও শুভেন্দুর কথায় সায় দিয়ে আস্তে মাথা ঝাঁকাল।

'আমার মনে হয়, বিকাশদার পাড়ায় কোনো রকম গণ্ডগোল-টণ্ডগোল হচ্ছে, যে জন্য', পলাশ বলতে যাচ্ছিল।

শুভেন্দু ধমক লাগাল। 'বাজে কথা রাখ তো ছেলে। তিনদিন ধরে হাজরায় গণ্ডগোল হচ্ছে আর বিকাশ চুপ করে ঘরে বসে আছে! বলে কিনা কার্ফু চুয়াল্লিশ ধারার মধ্যেও মোহন রেস্টুরেণ্টর আড্ডায় না এসে যে থাকতে পারে না—

আমরা কেউ পারি না, হাজারটা গোলমাল লেগে থাকে কলকাতা শহরে কিন্তু একদিনের জন্যও এখানে একত্র হয়ে আমরা কাব্যালোচনা বন্ধ রাখিনি, কাগজও নিয়মিত বের করে যাচ্ছি—কি বলেন মোহনবাবু?' যেন এই ফাঁকে মোহন পালকে একটু সন্তুষ্ট করতে চাইল শুভেন্দু।

কিন্তু আজ মোহন নির্বিকার নীরব। মাথাটাও তুলছে না। একমনে হিসাব লিখছে। কাজেই শুভেন্দুর চোখমুখের বিমর্ষতা বিষণ্ণতা দূর হল না।

'তবে আপনাকে একটা কথা বলছি অমলেন্দুবাবু', শুভেন্দুর গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল। 'শনিবার সন্ধ্যার পর এখান থেকে বেরিয়ে, আপনারা সবাই চলে গেলেন, বিকাশ আমাকে নিয়ে গোলদীঘির একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। কাগজ নিয়ে অনেকক্ষণ আমাদের কথা হল। দেখলাম পদাবলীকে ঠিক এভাবে রাখার ইচ্ছে যেন বিকাশের নেই—'

অমলেন্দু হাতের নখ খুঁটতে লাগল। উৎপল পলাশ নবকিশোর ও অরুণাভ চুপ থেকে শুভেন্দুর কথা শুনছিল।

'অবশ্য আমার দিকে তাকিয়েই বিকাশ কথাটা বলছিল, আজ পর্যন্ত আট থেকে দশ হাজারের মতন টাকা আমি পদাবলীর জন্য ঘর থেকে বের করে দিয়েছি। গত যুদ্ধের পর একটা আশা জেগেছিল। চমৎকার বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছিল। প্রায় সেলফ্ সাফিশিয়েন্ট হতে চলছিল পদাবলী—কিন্তু পুজোর পর থেকে মার্কেট আবার ডাউন হতে থাকে। তা হলেও আমরা আশা ছাড়িনি। ভাবলাম পলিটিক্যাল আনরেস্ট, ডিপ্রেশান ইত্যাদির দরুণ আর পাঁচটা বাজারের মতন সাহিত্যের বাজারের এই মন্দা পদাবলী নিশ্চয় কাটিয়ে উঠতে পারবে—ঠিক এই অবস্থায় আজ দু'মাস ধরে রামানন্দ উল্লুকটা এক লাইন লেখা পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করল না! দুম করে কাগজের সার্কুলেশান পড়ে গেল—এ সময় এখন পর্যন্ত একটা ভাল বিজ্ঞাপন যোগাড় করা সম্ভব হল না—তাই বিকাশ বলছিল, কাগজ বন্ধ করে দাও—'

শুভেন্দু থামতে উৎপল পলাশ নবকিশোর অরুণাভ রীতিমত চেঁচামেচি করে উঠলো।

'না না, তা হয় না, এটা করবেন না শুভেন্দুদা। এখন পদাবলী বন্ধ করে দেওয়া সুইসাইডের সামিল হবে—রামানন্দদা লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে পদাবলী একটা দারুণ সেট্‌ব্যাক খেল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা জানি দু'মাস কোনো রকমে চালিয়ে গেলেই আমরা এই ক্রাইসিস ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারব। কেননা কবি রামানন্দ সেন যখন অন্য কোথাও আর লিখছে না—হুঁ, তখন বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের রামানন্দর নাম ভুলতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না—খুব সহজেই এ দেশের মানুষ একজন কবি বা শিল্পীকে ভুলে যায়। কাজেই দু' মাস পর থেকে আবার পদাবলীকে স্বাভাবিকভাবেই পাঠক-পাঠিকারা নিতে আরম্ভ করবে। এটাই নিয়ম। দেখবেন।'

অমলেন্দু কিছু বলছিল না।

শুভেন্দু চুপ থেকে পলাশ উৎপলদের কথা শুনছিল, তাদের মুখ দেখছিল। মোহন পাল সব শুনে পাথরের মতন নীরব স্তব্ধ উদাসীন থেকে হিসাবের খাতা দেখছে।

'অনেক টাকা পদাবলীর পেছনে আপনি ঢেলেছেন—', এবার উৎপল কথা বলল, 'অস্বীকার করার উপায় নেই—কিন্তু এখন থেকে আমাদের উচিত হবে যে-যার পকেট খরচ বাঁচিয়ে কিছু কিছু কাগজের জন্য কন্ট্রিবিউট করা।'

'আমি দু' মাস আগেই এমন একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম।' পলাশ লজ্‌ঝড় পাখা-

টার দিকে চোখ তুলে দিয়ে সিগারেট টানছিল। এবার সোজা করে তাকাল।

'আমরা সবাই কিছু কিছু দেবো শুভেন্দুদা', নবকিশোর অরুণাভ একসঙ্গে বলল। উত্তরে শুভেন্দু কিছুই বলছিল না। একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে একটা গোপন অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে তরুণ কবি ক'টিকে দেখছিল, তাদের কথা শুনছিল, কেননা কে কত টাকা সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে শুভেন্দুর খুবই জানা আছে। কিছুটা পারে অমলেন্দু। প্রফেসরী করে, মাঝে মাঝে বাজারে দুটো-একটা নোট-বইও ছাড়ছে। কিন্তু অমলেন্দু নীরব, ঘাড় গুঁজে হাতের নখ খুঁটছে। খুবই চিন্তান্বিত বোঝা যাচ্ছিল।

তা হলেও শেষ পর্যন্ত অমলেন্দুর দিকে চোখ রেখেই শুভেন্দু বলল, 'দেখলাম খুবই মন খারাপ করে ছিল বিকাশ, বুঝলেন অমলেন্দুবাবু, এ প্রায় ভেঙে পড়ার মতন অবস্থা। আমি একটু ধমক-টমক দিলাম—আমার টাকা যাচ্ছে সেই জন্য তোমার মন খারাপ করার কোনো অর্থই হয় না। বললাম, তোমরা যতক্ষণ আমার পাশে আছ আমি কাগজ চালিয়ে যাব। রামানন্দ সেন নেই—স্কাউন্ড্রেলটা পদাবলী গোষ্ঠী ছেড়ে চলে গেছে—এটা মনে রেখে জেদ করে আমাদের কাগজ বের করে যেতে হবে। আমরা দেখাব রামানন্দ ছাড়াও বাংলা দেশে কবি আছে তাদের নিয়ে একটা কবিতা-পত্র সুন্দর চলছে।'

ঘাড় তুলে অমলেন্দু অল্প হাসল।

'কি বললেন বিকাশবাবু?'

'চুপ করে রইল।'

'না, এখনই হুট করে কাগজটা বন্ধ করা ঠিক হবে না—তবে সঙ্গে যদি অন্য কোনো রকম ফীচার-টিচার—' অমলেন্দুর কথা হঠাৎ থেমে গেল।

মোহনবাবু কাশছে। একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে মোহনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে হাফপ্যাণ্ট, একটা হাফ শার্ট গায়ে। খাড়া খাড়া চুল মাথায়। নাকটা খুব উঁচু। চোখে সাংঘাতিক পুরু লেনস্, সচরাচর এই বয়সের ছেলেদের চোখে যা দেখা যায় না, বোঝা যায় চোখটা ভীষণ খারাপ। রোগা চেহারা। হাতে একটা রেশনের থলে।

'কি ব্যাপার!' শুভেন্দু বিড়বিড় করে উঠল। 'বিকাশের ভাইটাই বলে মনে হচ্ছে না অমলেন্দুবাবু?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' অমলেন্দু ঘাড় নাড়ল। মোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলছে ছেলেটি।

বেশ একচোট কেশে নিয়ে মোহন মাথা নাড়ল।

'হুঁ, হুঁ, পদাবলীর অফিস এটা—কি চাই তোমার?' যেন হিসাবের খাতা দেখার দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিরক্ত গলার স্বর মোহন পালের।

শব্দ না করে ছেলেটি রেশনের থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা খাম তুলে মোহনের হাতে দিতে গেল। মোহনবাবু কিন্তু খামটা ধরল না। ওপরে নামটা দেখেই থুঁতনি নেড়ে শুভেন্দুদের টেবিলটা দেখিয়ে দিল। 'ওখানে ওখানে, এসব এখানে না।'

'মোহনবাবুর রাগ এখনো পড়েনি।' উৎপল নিচু গলায় হাসল। অমলেন্দু শুভেন্দু কথা বলল না। ছেলেটি এসে সামনে দাঁড়াতেই শুভেন্দু হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে খামটা তুলে নিল। হুঁ, শুভেন্দুর কাছেই চিঠি। বিকাশের হাতের লেখা।

শুভেন্দু খামটা ছিঁড়ে ফেলল। একবার পড়া শেষ করে আর একবার পড়ল চিঠিটা, তারপর অমলেন্দুর হাতে তুলে দিল। 'পড়ে দেখুন।'

চিঠি পড়া শেষ করে অমলেন্দু চুপ করে রইল। শুভেন্দুর ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। কপালের শিরাটা ফুলে উঠেছে। যেন তার দু' হাতের মুঠও শক্ত হয়ে উঠল। একদৃষ্টে রোগা ছেলেটিকে দেখছিল।

'বিকাশবাবু তোমার দাদা হন?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

'বিকাশবাবু বাড়িতেই ছিলেন?'

ছেলেটি ঘাড় কাত করল।

'কই দেখি লেখাগুলো?'

শুভেন্দু টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসল। ছেলেটি থলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে পাণ্ডুলিপির গোছাটা বের করে টেবিলে রাখল।

'একটু চা খাবে?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

'এখন বাড়ি ফিরে যাবে?'

ছেলেটি ঘাড় কাত কবল। শুভেন্দু চুপ করে রইল। ছেলেটি শূন্য থলেটা হাতে ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

'তোমবাও পড়ে ফ্যালো', বিকাশের চিঠিটা পলাশদের দিকে ঠেলে দিয়ে শুভেন্দু চেহারাটা বিকৃত করে হাসল। 'এই চিঠি কেবল আমাকে লেখা নয়, সকলকেই লেখা, পদাবলী গোষ্ঠীকে লেখা।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে একসঙ্গে পলাশ, উৎপল, পিছন থেকে ঘাড় লম্বা করে দিয়ে নবকিশোর ও অরুণাভ রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলল।

'দাউ টু ব্রুটাস!' ঘাড় সোজা করে পলাশ শুভেন্দুর দিকে তাকাল। 'বিকাশদা সামনে থাকলে ঠিক বলতাম, ঠিক শুনিয়ে দিতাম কথাটা।'

শুভেন্দু কিছু বলল না।

অমলেন্দু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল, বিড় বিড় করে বললঃ ট্রুথস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন।'

'তাই তো, বিশ্বাস করতে কেমন ইচ্ছে করছে না', অমলেন্দুর চোখে চোখ রেখে উৎপল হিসহিস করে উঠলঃ 'চাকরি করতে বিকাশদা ডিগবয় চলল!'

'হাঁপানির রুগী টিংটিং-এ বুড়োটার কারসাজি—বিকাশদাকে ঠিক বাইরে চাকরি করতে পাঠাল, শেষ পর্যন্ত বুড়োই জিতে গেল, ভাবতেও যেন কেমন লাগে শুভেন্দুদা।'

শুভেন্দুর চোখ পলাশের দিকে ছিল না। তার কপালের শিরা লাফাচ্ছিল। হাতের মুঠ এইমাত্র শিথিল হয়ে গিয়ে আবার শক্ত হয়ে উঠল। থুঁতনিটা ডেলা পাকিয়ে আছে।

'আমাদের কাছে সরলভাবে কথাটা বলে যাওয়া উচিত ছিল বিকাশবাবুর—এসব চাকরি কিছু একদিনে ঠিক হয় না।' অমলেন্দু আস্তে বলল।

'সেই সাহস নেই, বুঝলেন!' শুভেন্দুর গলার আওয়াজ গমগম কবে উঠল। 'ক'দিন ধরে মুখটা ভার দেখছিলাম, তার মানে বাপের সুপুত্তুর হয়ে চাকরিতে ঢুকে পড়ার তালে ছিল—কিন্তু শনিবার রাত্রে গোলদীঘির বেঞ্চিতে বসে আমার সঙ্গে এই অভিনয়টা না করলেই পারত—ঠিক এই অবস্থায় পদাবলী চালিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না, আমাকে পরামর্শ দিচ্ছিল, মানে হয় কি না হয় সেটা আমি দেখব—আমার কাগজ—তোমার আর কাগজে থাকার ইচ্ছে নেই, কলকাতায় থেকে কাব্যচর্চা পোষাচ্ছে না—বেশ তো, মুখ ফুটে বললে কেউ কিছু তোমায় ফাঁসী দিত না—' একটু চুপ থেকে শুভেন্দু আবার বলল, 'চমৎকার! ছোট ভাইকে দিয়ে

চিঠি লিখে কথাটা জানাতে হল, তার হাত দিয়ে ম্যানাসক্রিপ্টগুলো ফেরত পাঠাতে হল—আঁ, বিকাশ চাটুয্যে যে এত কাওয়ার্ড কেউ কোনো দিন কল্পনা করতে পেরেছিলে!' চেয়ারে বসে থেকেও শুভেন্দু কাঁপছিল।

'সত্যি, ভাবতেও কেমন হাসি পায়। ডিগবয়ের জঙ্গলে বিকাশদা ঘাড় গুঁজে একটা অয়েল কোম্পানীর হিসাবপত্র দেখছে, কবিতা লেখা শিকেয় ঝুলছে।' কিন্তু পলাশ হাসল না। হাসল আর একজন।

সত্যি হাসল, না কি কাশল? সব ক'টা কৌতূহলী চোখ এক সঙ্গে মোহনবাবুকে দেখছিল। ঠিক বুঝতে পারছিল না শুভেন্দুরা, হাসি লুকোবার জন্য মোহনবাবু বাঁ হাতের তেলোটা মুখের সামনে এভাবে আড়াল করে ধরেছে, না কি কাশির বেগ কমাতে মানুষটা এমন করছে।

আশ্চর্য কিছু না, শুভেন্দু অমলেন্দু পলাশ উৎপল নবকিশোর অরুণাভ—সকলের মাথায় তখন এক চিন্তা, রামানন্দ সেন সরে গিয়ে পদাবলী প্রায় ডুবতে বসেছে, ঠিক এই মুহূর্তে পদাবলীর আর এক মহারথী সরে গেল। হুঁ, পদাবলী যার প্রাণ, প্রাণের চেয়েও বেশি কিছু ছিল, দোরে দোরে ঘুরে বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, লেখকদের বাড়ি বাড়ি হেঁটে লেখা জোগাড় করা, স্টলে স্টলে ছুটোছুটি করে কাগজ বিলনো, আর ফাঁক পেলেই মোহনের দোকানে বসে প্রুফের গাদায় মুখ গুঁজে দিয়ে চোখের বারোটা বাজানো—এক কথায় বুকের রক্ত ঢেলে একটা কবিতাপত্রকে বাঁচিয়ে রাখার বলিষ্ঠ মানসিকতা নিয়ে যে ক্ষ্যাপার মতন ছুটছিল, সেই কবিতাপ্রেমিক বিকাশ চাটুয্যে আর নেই—নব্বুই বছরের বদমেজাজী এক কফের রুগী বাপের কাছে হেরে গিয়ে সুড়সুড় করে আসামের জঙ্গলে চাকরি করতে ছুটল—কাজেই পদাবলী এখন একেবারে ডুববে—দেখে মোহন কি খুশি হচ্ছিল? এই জন্য হাসল? যেহেতু একটু আগে রামানন্দ সেনের ব্যাপার নিয়ে কবিদের কাছে খুব জব্দ হয়ে মুখ ভার করে হিসাবের খাতার ওপর ঝুঁকে থেকে ভয়ংকর গোঁসা নিয়ে অভিমান নিয়ে মানুষটা ক্রমাগত ফুলছিল?

'মোহনবাবু! আপনি কি খুশি হয়েছেন? রামানন্দর মতন আর একজন পদাবলী গোষ্ঠী থেকে কাটল—এবার কাগজ ঠিকই বন্ধ হচ্ছে।' গলা উঁচু করে শুভেন্দু না বলে পারল না।

মোহন পাল এদিকে চোখ ফেরাল। মুখের সামনে থেকে হাতটা সরিয়ে নিল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরতি ফুলো ফুলো গাল দুটো ছড়িয়ে হাসল।

'রামানন্দবাবুর সরে যাওয়া আর বিকাশবাবুর কেটে পড়া কি এক কথা হল! রামানন্দ সেন একটা আইডিয়ার পেছনে ছুটছে—বিকাশ চাটুয্যে ভাল চাকরি করে বেশি টাকা রোজগার করবে বলে সরে গেল—এখন কাগজ রাখবেন কি বন্ধ করে দেবেন সেটা আপনারা বুঝুন।'

শুনে শুভেন্দুর মুখটা চুণ হয়ে গেল।

॥ ৩৩ ॥

অক্ষয়ের পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে এনেছে মাস্টার।

এই জন্য অবশ্য মাধুরীর খুব একটা হায়-আফসোস ছিল না।

তার কেবল জানতে কৌতূহল ছিল, এভাবে লোক দুটো মাস্টারকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল কেন, সারাটা দিন কোথায় নিয়ে তাকে আটকে রেখেছিল!

এসব তুমি কিছু বুঝবে না বাপু, মাধুরীর চোখে চোখ রেখে রামানন্দ গম্ভীর

হয়ে বলতে চেয়েছিল, শহুরে কাণ্ডকারখানা, আদর করে তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাইবে, যেতে রাজী না হলে ছোরা-পিস্তল দেখাবে—আবার সেখানে গিয়ে যদি তাদের মনের মত কথা-টথা বলতে না পার, কিলঘুষি মেরে তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। একেবারে প্রাণেও মেরে ফেলতে পারে। এদের দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

'তোমাকে কি ওরা মারধর করেছিল!'

'হুঁ, কিলঘুষি মেরেছিল, বিস্তর টানাহেঁচড়াও করেছিল, তাই তো জামাটা ছিঁড়ে গেল।'

'তা রাত্তিরে আবার কোথা থেকে খেয়েটেয়ে এসেছিলে?'

'ঐ একটি বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল—'

'তুমি একটা তাজ্জব মানুষ বটে', মাধুরী কেমন করে জানি, হাসেনি, হাসতে গিয়ে ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে দিয়েছিল। 'কোথায় গিয়ে মারধর খেলে, এদিকে বলছ রাস্তায় আবার কোন্ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, ব্যস, তখনি মদের দোকানে ঢুকে গলা পর্যন্ত গিলে রাত বারোটায় টলতে টলতে ঘরে ফিরলে। তাই না?'

রামানন্দ আর কিছু বলছিল না। নিজের ময়লা শার্টটা গায়ে চড়াল। রাজা-বাজারে যাচ্ছে। একটু আগে মনতাজ এসেছিল। শফীকে নাকি তার বাপ আবার মারধর আরম্ভ করেছে। হাতে মারতে পারে না। এখনও ভাল করে চলাফেরাই করছে না ইয়াকুব মিঞা। কিন্তু তা হলে হবে কি, বিছানায় শুয়ে থেকেই ঘটিটা বাটিটা বা হাত বাড়িয়ে খাটিয়ার নিচে থেকে জুতোটা খড়মটা তুলে নিয়ে শফীকে ছুঁড়ে মারছে। শিয়রের কাছে একটা লাঠি রাখে। লাঠিটা ছুঁড়ে মারছে কখনও। কাল বিকেলে একবার এই কাণ্ড করেছে। জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল। আজ সকালে শফী বাপকে দুধ খেতে দিয়েছিল। দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ইয়াকুব হাতের বাটিটা এমন জোরে শফীর দিকে ছুঁড়ে মারে—শফীর কপাল কেটে গিয়ে রক্ত বেরোয়। খবরটা নিয়ে মনতাজ দুপুরে ছুটে এসেছিল। মাধুরী অস্থির হয়ে পড়েছে। একবার গিয়ে দেখে এস তো মাস্টার—মা-মরা একটা ছেলে, বুড়োটা তার সঙ্গে এমন করছে কেন, কারণটা কি!

রামানন্দকে এমনিও বেরোতে হতো।

দুপুরে ভাত খেয়ে একটু গড়িয়ে নিয়ে এতটা সময় সে বসে থেকে কেবল উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখছিল, ছায়াটা আর একটু লম্বা হল কি না, বিকেল হতে আর কত বাকি। মনতাজ এখনও মাধুরীর আশেপাশে মাছি হয়ে ঘুরছে। দুপুরে এখানে ভাত খেয়েছে। মাধুরীর আদরের স্বাদ পেয়ে ছোঁড়ার প্রায় বেহুঁশ অবস্থা। শফীর মুখে এই দিদিটির কথা মনতাজ আগেও শুনেছে, কিন্তু মানুষটা যে এত ভাল এত মিঠে এত নরম, এমন অদ্ভুত মমতায় গড়া, তার জানা ছিল না, পরশু তো মেলায় মেলায়ই সারাদিন কাটল। কানে অনেক শুনলেও পরশুই প্রথম দিদিকে সে চোখে দেখে। গতকাল আর আসা হয়নি। আজ শফীর খবরটা নিয়ে ছুটে এসেছে। শফীই তাকে পাঠিয়েছে। অবশ্য শুধু হাতে আসেনি। প্রায় দেড় কেজি ওজনের একটা বোয়াল মাছ ও একটা পাকা কুমড়ো নিয়ে এসেছে। আর কিছু কাঁচ আমড়া। সবই বৈঠকখানা বাজার থেকে কেনা। দেখে মাধুরী খুশী হয়েছিল, কিন্তু মনতাজকে আগে একটা বকুনি লাগিয়েছিল। কেননা জিজ্ঞেস করে মাধুরী জানল যে, এসব শফী পাঠায়নি, মনতাজ তার নিজের পয়সা দিয়ে কিনে এনেছে।

বকুনি খেয়ে মনতাজের টুকটুকে ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ঘাড় গুঁজে মিটিমিটি হাসছিল। বোঝা গেছে মাধুরীর আদরের মতন বকুনিটাও সে কম উপ-ভোগ করেনি।

এই অবস্থায় মাধুরী কি দুপুর বেলা ছোঁড়াকে ভাত না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারে!

বোয়ালের ঝাল, মুড়ো দিয়ে কুমড়োর ঘণ্ট ও আমড়ার অম্বল রেঁধে নতুন ভাইটিকে যত্ন করে খাইয়েছে। তার আগে দুজনে খালের জলে ডুব দিয়ে স্নান করেছে। একসঙ্গে রামানন্দও স্নান করতে গিয়েছিল। মেটিয়াবুরুজে বড় বড় দীঘি পুকুর থাকলে কি হবে, রামানন্দ দেখল শফী মিঞা যেমন সাঁতারে তুখোড়, এই ছোঁড়া তেমনি আনাড়ী, তার চেয়ে মাধুরী ঢের ভাল সাঁতার জানে। কাজেই কোমর-জল কি গলা-জলে নেমে আর এগোতে সাহস পাচ্ছিল না মনতাজ। মাধুরী বেশ দূরে গিয়ে তাকে ডাকাডাকি করছিল, কিন্তু ডাকলে হবে কি, সাহসে কুলোল না বলে ছোঁড়া এগোতে পারেনি। অগত্যা মাধুরীকেই কোমর-জলে ফিরে আসতে হয়েছে। তখন কিন্তু দিদির কোমর জড়িয়ে ধরে, কখনও দিদির কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে পা দাবড়ে মনতাজ খুব জলটল ছিটিয়ে হি—হি করে হেসেছে।

যাই হোক, শফী নেই বলে মাধুরীর স্নানের আনন্দটা কম হয়নি। কিন্তু তা হলেও ওর চোখের কোণায় একটা দুশ্চিন্তা থেকে থেকে চিকিয়ে উঠতে দেখেছে রামানন্দ।

'খুব একটা রাত করবে না ফিরতে।' জামা গায়ে চড়িয়ে রামানন্দ ঘরের পৈঠা থেকে উঠোনে নামবার সময় মাধুরী এসে সামনে দাঁড়াল। 'সকাল সকাল ফিরবে।'

'উঁহু রাত হবে না।' রামানন্দ মাথা নেড়েছে। 'সকাল সকাল ফিরব।'

কিন্তু মাধুরী কথাটা বিশ্বাস করল কি? এক কথায় যে রাজাবাজারে শফীকে দেখতে যেতে মাস্টার রাজী হয়েছে, তার মানে রাস্তায় শেয়ালদা-বৈঠকখানা বাজার পড়বে, মাধুরী হয়তো ততটা তলিয়ে চিন্তা করল না। ভেবে রামানন্দ মনে মনে হাসল। আজ সন্ধ্যার দিকে ননীমাধব দত্ত রামানন্দর জন্য সেখানে অপেক্ষা করবে! কাল একবার বৈঠকখানার দোকানে বসে খুব খাওয়া হয়েছে, আজ আবার সন্ধে ছটার মধ্যে সেখানে উপস্থিত থাকতে আড়তদার রামানন্দকে নেমন্তন্ন করেছে।

মুখ ফুটে আড়তদার কথাটা বলেনি, তবে হাবেভাবে বোঝা গেছে রামানন্দকে নিয়ে আজ একটা ভাল জায়গায় গিয়ে বসবে। 'বসবার ইচ্ছে রাখি—' বলে আড়তদার তার জালার মতন মোটা ভুঁড়িটা নাচিয়ে ভীষণ হেসেছিল।

সম্ভবত হাড়কাটার সেই মেয়েমানুষটার ঘরে নিয়ে গিয়ে রামানন্দকে বসাবার ইচ্ছে। রামানন্দ অনুমান করেছিল। মেয়েটার নামটা ঠিক মনে করতে পারছিল না সে।

'শফীদের ঘর খুঁজতে তোমার অসুবিধে হবে না?' মাধুরী এবার পিছন থেকে কথা বলছিল।

'না, তা হবে কেন।' উঠোনের বাইরে এসে রামানন্দ আর ঘাড় ফেরায়নি। 'মনতাজ যখন সঙ্গে যাচ্ছে', আস্তে বলল সে।

'মনতাজ, শফী যদি কাল সকালে না আসে তুই কিন্তু আসবি—তুই চলে আসিস।'

মনতাজ তখন রামানন্দর পাশে পাশে হাঁটছিল। 'হুঁ, আসব।' ঘাড় ঘুরিয়ে সে দু-তিনবার মাধুরীকে দেখেছে।

মাদার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে মাধুরী দুজনকে দেখছিল। বিকেলের বাদামী রোদে সল্ট লেকের বালুতে তখন কী চমৎকার রং ধরেছে!

'তা তুই সঙ্গে না এলেও কিন্তু আমি শফীদের ঘর খুঁজে পেতাম।'

মনতাজ কথা বলছিল না।

'না কি তোর মাধুদিদি বিশ্বাস করছিল না!' রামানন্দ নাকের শব্দ করে

হাসল। 'নেশাটেশা করে কোথাও যদি পড়ে থাকি।'

মনতাজ ফিক করে হাসল। বাদামী আলোয় অদ্ভুত লাগছিল ছোঁড়ার চেহারাটা।

'না, তা হবে কেন, দিদি বলছিল যে এতটা সময় যখন তুই থেকেই গেলি আর একটু অপেক্ষা করে মাস্টারমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যা, শফীদের বস্তিটা যা ঘিঞ্জি শুনি, আর ঘরের নম্বর-টম্বরেরও নাকি বেশ গোলমাল আছে, মাস্টারের খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে, কোনোদিন তো যায়নি সে-সব জায়গায়।'

ছোঁড়ার গালের রং ঠোঁটের রং, নাক চুল গায়ের চামড়া, সবই এত সুন্দর এত লাবণ্যযুক্ত, যখন কথা বলছিল রামানন্দ এক-একবার হাঁটা বন্ধ করে তাকে দেখছিল।

'তোরা ক'ভাই?'

'দু' ভাই।'

'বোন আছে?'

'তিন বোন।'

'বিয়ে হয়েছে?'

'দুটোর হয়েছে। একটার এখনো হয়নি।'

রামানন্দ ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে তার থুতনিটা একটু আদর করে নেড়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল। পুরুষ বা নারী, সুন্দর রং সুন্দর নাক-চোখের একটা মোহ আছে যে! বিশেষ করে এই বয়সের একটি মেয়ে কি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এমন নির্জন খাঁ-খাঁ প্রান্তরের ওপর দিয়ে যখন হাঁটতে হয়। 'এমন চমৎকার পুতুল গড়তে শেখা হল কার কাছে শুনি!'

আবার এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে মনতাজের চোখ দুটো দেখল রামানন্দ।

কথা না বলে মনতাজ হঠাৎ ঢোক গিলল। কোন্ দিকের জলা ছেড়ে উঠে পানকৌড়ির ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দ করে উড়ে যায়। মেয়েদের মতন কালো মিশমিশে লম্বা পালকের চোখ দুটো আকাশে তুলে দিয়ে ছোঁড়া খানিকটা সময় দেখল, তারপর রামানন্দর মুখের ওপর চোখ দুটো নামিয়ে এনে একটা দুষ্টুমির হাসি হাসল।

'হাসছিস কেন?' হাতের তেলো দিয়ে রামানন্দ তার থুতনিটা আর একটু ঘষে দিল।

এবার মনতাজ মাটির দিকে চোখ নামাল।

'আমি আর ক'টা পুতুল তৈরী করেছি, সবই তো শফীর হাতের তৈরী।'

'অ্যাঁ!' মনতাজের কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে আনল রামানন্দ। 'শফীর তৈরী! ওই বেটা পুতুল তৈরী করতে জানে নাকি!' শব্দ করে হাসতে গিয়ে রামানন্দ গম্ভীর হয়ে গেল। কেমন যেন জব্দ হয়ে গেল।

'ভীষণ ভাল হাত শফীর।' মনতাজ তখনও টিপে টিপে হাসছে। 'কাউকে জানতে দেয় না।'

'হ্যাঁ, তাই তো, আমি জানি না, মাধুরী জানে কি? মনে হয় ও জানে না, তা হলে আমায় বলত।' বড় করে একটা ঢোক গিলল রামানন্দ।

'আম আতাফল মাছ বেগুন ঝিঙে আর সোজা সোজা ক'টা ডল্ আমি তৈরী করেছি। এর বেশ আমি পারি না। ঐ শফীর কাছেই একটু একটু শিখেছি। ভাল ভাল খেলনাগুলো যা' পরশু মেলায় দেখেছিলেন, স্টেশন-ঘরটা, লাইট-হাউসটা, হুঁকো টানছে দাড়িঅলা বুড়োটা, রেলগাড়ি, প্রজাপতি—সব ওর হাতের তৈরী।'

'আশ্চর্য!' যেন রাগ করে রামানন্দ একটা গরম নিশ্বাস ফেলল। মাথার ওপর দিয়ে আর এক ঝাঁক পানকৌড়ি শব্দ করে উড়ে গেল। রামানন্দ সেদিকে তাকাল না। মনতাজও আর আকাশে চোখ তুলল না। 'কিন্তু এত গুণ চেপে আছে কেন ছোঁড়া!' রুষ্ট ভুরু দুটো কুঁচকে রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে দূরের একটা তালগাছ দেখতে দেখতে রামানন্দ অনেকটা যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল।

'শফীদা বলে কি—'

'শফী তোর ক' বছরের বড়?' রামানন্দ এদিকে ঘাড় ফেরাল।

'বছর হবে কেন', মনতাজ অল্প শব্দ করে হাসল। 'ও আমার চেয়ে মোটে এক-দেড় মাসের বড়, আম্মা তাই বলে।'

'তা হলেও তো বড়—', রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। 'দাদা ডাকতেই হবে।'

একটু চুপ থেকে রামানন্দ হাঁটল। আবার থমকে দাঁড়াল।

'হুঁ, কি বলছিল যেন শফী তোকে, এইমাত্র বললি?'

'বলে কি, দূর-দূর, ডিমের ব্যবসা করি, ডিমের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে ঘুরি, এদিকে আবার পুতুল গড়বার নেশা, দুটো একত্তর করে ভাবতে গেলে আমার নিজেরই কেমন হাসি পায়—যে জন্য কাউকে কথাটা বলি না, শুনলে লোকে হাসবে।'

'হুঁ, তাই তো, ডিমের বেপারীর ছেলে, ডিম নিয়ে কারবার, আবার ওদিকে কিনা শিল্পী।' রামানন্দ জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'একটার সঙ্গে আর একটা খাপ খায় না। ওর বাপ জানে? ইয়াকুব মিঞা?' চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল রামানন্দ।

'হুঁ', মনতাজ ঘাড় বেঁকাল। 'ওই নিয়েই তো বুড়োর সঙ্গে যত গোলমাল। শফীদা মাটি নিয়ে রং নিয়ে বসেছে দেখলেই তার আব্বা খেপে যায়। মারধর আরম্ভ করে।'

রামানন্দ কথা বলল না। একদলা থুথু ছিটিয়ে জোরে হাঁটতে লাগল।

'আঁকাটাকার হাতও দারুণ শফীদার।' জোরে পা চালিয়ে মনতাজ রামানন্দর সঙ্গে হাঁটছিল। 'আগে রং তুলি দিয়ে কাগজে নকশাটা এঁকে নেয়, তারপর নকশা দেখে মাটি দিয়ে কাঠ দিয়ে কাগজ দিয়ে সব তৈরী করে, তারপর রং লাগায়; লাইট-হাউস, রেল-স্টেশন, হুঁকো-টানা দাড়িঅলা বুড়ো, ভাল ভাল পুতুলগুলো এভাবে তৈরী করেছে।'

'থাম থাম।' রামানন্দর আর শুনতে ভাল লাগছিল না।

মুখটা ভার করে হাঁটছিল। বাসে বসেও তার মাথায় একটা চিন্তা দাউ দাউ করে জ্বলছিল। অ্যাঁ, ওই শেয়ালের মতন দেখতে পাতলা ছিপছিপে কালো ছোঁড়া পুতুল গড়ে, ছবি আঁকে! শিল্পী। জগত মণ্ডলের দলের। মাধুরী কি সত্যি জানে না! যদি না জানে তবে কী সাংঘাতিক কথা! সাপ নিয়ে খেলছে অক্ষয়ের স্ত্রী। একটা শয়তানকে ঘরে জায়গা দিয়েছে। সকালে দুপুরে রাত্রে, যখন খুশি আড্ডা। বিপজ্জনক, খুব বিপজ্জনক।

॥ ৩৪ ॥

বিছানায় বসে ইয়াকুব মিঞা মাষ্টারবাবুকে সমাদর করল। 'বসুন বসুন!' মনতাজ একটা ছোট টুল এনে দিল। রামানন্দ কুলকুল করে ঘামছিল। ছ'হাত-আট হাত একটা অন্ধকার ঘর। একটাও জানালা নেই। রামানন্দর বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসে।

'মাস্টারবাবুকে হাতপাখা এনে দে—চা এনে দে।'

'না না, আমি খাব না।'

'গরীবের ডেরায় পায়ের ধুলো দিয়েছেন, একটু চা খাবেন না কর্তা!' ইয়াকুব করুণ চোখে তাকাল।

'বড়ো গরম লাগছে মিঞাসাহেব—চা খেতে ইচ্ছে করছে না।' রামানন্দকেই গলার স্বর নরম করতে হল।

'তবে ডাব!'

রামানন্দ আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে বুড়োর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে মনতাজ ডাব আনতে ছুটল।

'ছেলেকে দেখছি না?' এদিকে ওদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে রামানন্দ শফীকে খুঁজছিল।

'ওই কুত্তার কথা বলবেন না কর্তা, আমার হাড্ডি পুড়িয়ে খেল।'

'কেন, কি করেছে ছোঁড়া?'

'আসলে ও একটা ধাড়ি বজ্জাত—বুঝলেন মাষ্টারবাবু, কুকামের বাদশা আমার এই ছাওয়াল।'

মনতাজ ডাব নিয়ে ফিরে এলো।

'কেটে এনেছিস?' সেদিকে চোখ ঘুরিয়ে ইয়াকুব চেঁচিয়ে উঠল।

মনতাজ ঘাড় নাড়ল।

'দে, একটা কাঁচের গেলাসে ঢেলে দে।'

'গেলাসের দরকার পড়বে না, ওই তো চমৎকার ফুটো করে এনেছে।' খুশি হয়ে মনতাজের হাত থেকে ডাবটা তুলে নিল রামানন্দ।

'খান, যদি গলায় ঢেলে খেতে পছন্দ করেন সেভাবেই খান, গতর ঠাণ্ডা হবে—আমিও গেলাস-ফেলাসে ঢেলে ডাব খেয়ে মজা পাই না।' দাঁত পড়ার বয়স না হলেও ইয়াকুবের সব ক'টা দাঁত পড়ে গেছে, নোংরা মাড়ি ছড়িয়ে হাসল।

শূন্য খোলটা মনতাজের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রামানন্দ জামার হাতা দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল। থুঁতনি বেয়ে ক' ফোঁটা ডাবের জল জামায় পড়েছে। রামানন্দর গ্রাহ্য নেই। দরজায় দাঁড়িয়ে মনতাজ ডাবের খোলটা একদিকে ছুঁড়ে মারতে দড়াম করে আওয়াজ হল, যেন পাশের একটা টিনের বেড়ার ওপর গিয়ে পড়ল সেটা। এই জন্য কোনোদিক থেকে কেউ কোনোরকম প্রতিবাদ বা উচ্চবাচ্য করল না। তবে রাজাবাজারের এই বস্তির চারিদিকেই নানারকম শব্দ হচ্ছিল। কাদের বাচ্চা গলা ফাটিয়ে কাঁদছে, কে যেন হাতুড়ি দিয়ে কিছু পিটোচ্ছে, করাত দিয়ে কাঠ চিরছে কেউ, মনে হচ্ছিল কোন্ দিকে কারা ভারি ভারি ড্রাম গড়িয়ে দিচ্ছে। রামানন্দর পায়ের তলায় ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মেঝেটা থরথর করে কাঁপছিল। ওদিকে আবার একটা ঘরে রেডিও বাজছিল। কিন্তু এই সমস্ত শব্দটব্দকে টেক্কা দিল রকমারী গন্ধ। দশ মিনিট বসতে না বসতে কি সুবাস যে রামানন্দর নাকে লাগল! কোথায় রবার পোড়ানো হচ্ছে, রসুন পেঁয়াজের কড়া ফোঁড়ন দিয়ে কেউ কিছু রাঁধছে ঠিকই, হঠাৎ মনে হল গাদা গাদা আলকাতরা পুড়ছে—তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল এবং সেটা মিলিয়ে যেতে অতিরিক্ত পাকা বা পচা ফলের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে এক মুঠো বাতাস ঘোরপ্যাঁচ রাস্তা পার হয়ে কেমন করে যেন ইয়াকুব মিঞার এইটুকুন অন্ধকার ঘরে এসে ঢুকল। কেউ কি শুকনো মাছ রাঁধছিল? মাধুরী সেদিন ট্যাংরা শুটকি রান্না করেছিল। সেই গন্ধ। হুঁ, মাঝে মাঝে চমৎকার হিং-এর রান্নার গন্ধও আসছিল। ইয়াকুবের ঘরে যে ধূপ-কাঠি জেলেছে বেশ কিছুক্ষণ পর রামানন্দ সেটা টের পেল।

'শফী কি বাড়ি নেই?'

'গোসা করে কোথায় গিয়ে বসে আছে।'

'দুপুরে খাওয়াদাওয়া করেনি?'

ইয়াকুব মাথা নাড়ল।

'আহা! এইটুকুন ছেলে সারাদিন উপোস আছে—', রামানন্দ দুঃখ করল। কিন্তু ইয়াকুব সঙ্গে সঙ্গে নোংরা মাড়ি ছড়িয়ে হাসির মতো করে একটা ভেংচি কাটল।

'আপনিও যেমন, উপোস কি আর আছে! ট্যাঁকে পয়সা আছে বদমাশটার, আমি টের পাই। খোঁজ নিয়ে দেখুন গে হোটেলে-ফোটেলে ঢুকে খুব করে রুটিগোস্ত সেঁটিয়েছে।'

'তা গোসা করেছে কেন, আজ আবার মারধর করেছিলে বুঝি?'

'আমি একটু সেরে উঠি কর্তা, এখনো দুবলা, বেটাকে দেখবেন ঠিক খুন করেছি, ওকে আমি মেরে ফেলব।'

'কেন, এত রাগ কেন ছেলের ওপর।' রামানন্দ ভুরু কুঁচকাল। 'প্রায়ই তো শুনছি, মারধর করছ।'

'করব না মারধর!' উত্তেজনায় ইয়াকুব থরথর করে কাঁপছিল। 'মনতাজ!' মনতাজ বিছানার কাছে সরে যেতে বুড়ো আঙুল দিয়ে তক্তপোশের নিচেটা দেখাল। 'টেনে বের কর সব, বের করে মাস্টারবাবুকে দেখা উল্লুকটা পাজিটা দিনভর কেমন যাচ্ছেতাই কুকাম নিয়ে থাকে।'

এত এত তুলি, কৌটো ভরতি নানারকম গোলা রং, ছবি আঁকার কাগজ, পুতুল গড়বার মালমশলা, মাটির তাল, কাঠ, খড়, আরও কত কি টেনে টেনে বের করছিল মনতাজ। সেই সঙ্গে ক'টা রঙবেরঙের পুতুল। রামানন্দর মুখে শব্দ ছিল না। ভুঁরু দুটো কুঁচকে রেখে সব দেখছিল।

'বুয়েছেন, আপনি চোখ দিয়ে দেখে যান, আমি কেমন শয়তান নিয়ে ঘর করি। অ্যাঁ, কত খরচপত্তর করে আপনার ইস্কুলে দিয়েছিলাম বেটাকে। লেখাপড়া শিখে লায়েক হবে—কিচ্ছু না; আমার পয়সা ক'টাই লোকসান হল, পড়ালেখায় মন দেবে কি, এই কুকাম নিয়ে রাতদিন পড়ে আছে বেটা। আচ্ছা, না হয় পড়ালেখায় তোর মর্জি নেই, না কি মগজে কুলোল না, তবে এদিকটা দ্যাখ, আমার ডিমের কারবার। আমি শালা বুড়ো হয়েছি, এখন থেকে যদি কারবারের দিকে নজর না দিস তো দুদিন পরে তুই নিজেই পেট চালাবি কেমন করে? তোর জন্যে কি লাখ টাকা রেখে আমি চোখ বুজব? উহুঃ, সোনাচ্চাঁদের হুঁশ নেই। ঐ দু-চারদিন পর পর অক্ষয় সমাদ্দারের গিন্নীর কাছ থেকে ঝুড়ি করে ক'টা আণ্ডা এনে দিয়েই খালাস—ব্যস, আর কিছু করবার নেই। হাসপাতালে ক'দিন শুয়ে রইলাম, আপনি জানেন মাস্টারবাবু। লবাবের বেটা আজও বেপারীদের সঙ্গে কথা বলতে শিখল না। পয়সার লেনদেন বোঝে না, তিলজলা থেকে তার ফুফা এসে আমার কারবার দেখে. বুঝুন কি কাণ্ড—অ্যাঁ, বলি তোর কি বয়সটা কম হল রে!'

'না, খুব একটা কম হয়েছে কি বয়েস!' রামানন্দ ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'এই তো ব্যবসাট্যাবসা বুঝবার সময়, তোর বাপের যখন ডিমের কারবার, তোকেও তো তাই করতে হবে—'

মাস্টারবাবুর কথা শুনে ইয়াকুব মিঞা খুশি হল, যেন উৎসাহ পেল। রোগা শুকনো চোখ কিছুটা উজ্জ্বল হল। 'তা হলে বুঝুন কর্তা, আমি কেমন উজবুকের পাল্লায় পড়েছি—বেটাকে মারি কি খামকা, অ্যাঁ, এখন তুই গতরে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরিস আর আর্ট করিস, পুতুল বানাস, এই করে তোর দিন চলবে? ষাটের ওপর বয়স হল, কলকাতা শহর চষে খেলাম, ক' বেটা আর্টিস আর ক'টা পুতুল-গড়িয়ে

কারিগর গাড়ি-বাড়ি করেছে আমায় আঙুল দিয়ে দেখা—ওসব হল ছ্যাঁচড়া কাম, ফালতু জিনিস, ছেঁড়া জুতো পরে ছেঁড়া জামা গায়ে গোলদীঘির রেলিঙে, হাতীবাগানের ফুটপাথে ছবি টাঙিয়ে পুতুল সাজিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে গাছের পাতা গুণছে সব, একবার চোখ মেলে দেখে আয়—কারবার ছাড়া এদিনে কিছু আছে রে গর্দভ! আপনাকে বলছি কর্তা, বেটাকে পিটিয়ে আমি সিধা করতে পারছি না। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন—অক্ষয়ের বাড়ি আন্ডা আনতে যায়, আপনি বেটাকে এট্টু শাসন্ করুন।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলব।'

রামানন্দ ঘাড় বেঁকাল। 'আজ উঠি।'

'আপনি শফীর মাস্টার মশাই, গুরুব্যেক্তি—আপনার কথা ও ঠেলতে পারবে না।' বিছানায় বসে থেকে ইয়াকুব বলছিল।

রাস্তায় এসে রামানন্দ আর একবার থুথু ছিটোল। হুঁ, একদিন সে ঠিকই দেখেছিল, তার দেখার মধ্যে ভুল ছিল না। পড়া শিখে না আসার ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে শেয়ালের মতন চুপি চুপি ইয়াকুবের ছেলে ক্লাসে ঢুকেছে। স্কুলের পাঠ্য বই, টুল টেবিল চেয়ার বেঞ্চি, দপ্তরী, খাতা, কলম, মাস্টার মশায়ের হাতের বেত ও ঘণ্টার শব্দ নিয়ে চারটে দেওয়ালের মধ্যে ছোঁড়া হাঁপিয়ে উঠছিল। তার ভীরু চোখের ভিতর ফাল্গুনের আকাশভরা ঝকঝকে রোদ, মাঠভরা ধুলো, মাদার মনসার ঝোপ ও শালিক বুলবুলির নাচানাচি দেখে রামানন্দ এক একদিন শিউরে উঠত। না, তার দেখার মধ্যে ভুল ছিল না। আজ রামানন্দ পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কিন্তু গোলমাল করে দিল ইয়াকুবের ছেলের মাথার প্রকাণ্ড ডিমের ঝাঁকাটা। ওটাই রামানন্দকে বেশি ঠকিয়েছে। চাপা আক্রোশ নিয়ে লম্বা পা ফেলে সে বৈঠকখানা বাজারের দিকে এগোতে লাগল।

তাই বলো, আজ রামানন্দ বুঝতে পারল একটা রক্তরাঙা পলাশ গাছ মাথার কাছে মনোহর ছায়া ছড়িয়ে ছোঁড়াকে কেন এত হাতছানি দিয়ে ডাকাডাকি করত।

হুঁ, উজবুক শয়তান বজ্জাত। ইয়াকুবের সব ক'টা কথাই সত্য।

জগতের চোখে শফীউল্লা আহাম্মক, বেওকুফ ছাড়া আর কিছু না।

কিন্তু নিজের দিক থেকে ছোঁড়া সাপের চেয়েও দুষ্ট খল। একটি শিল্পী তাই হয়। কপট স্বার্থপর শয়তান। সময় মতন লাঠির ঘা না বসালে সর্প তোমাকে দংশন করবেই। মাধুরীকে জানিয়ে দিতে হয়; বেচারা আজও কিছু জানে না।

রাজাবাজার থেকে বেরিয়ে সার্কুলার রোডে এসে রামানন্দ দিশেহারা হয়ে শেয়ালদার দিকে ছুটছিল। বাসের জন্য অপেক্ষা করে পোষাবে না। তার চেয়ে এইটুকুন রাস্তা একটু পা চালিয়ে হেঁটে গেলেই বৈঠকখানা পৌঁছান যাবে। যেন সেটাই অধিকতর সহজ মনে হয় রামানন্দর। তা ছাড়া এসব ভিড়ের বাসে যে উঠতে পারবেই তার ভরসা কি! ওদিকে ননীমাধব দত্ত বসে আছে।

'আরে! রামানন্দবাবু যে।'

রামানন্দও কম বিস্মিত হল না—ঠিক এমন জায়গায় এমন সময় মানুষটার সঙ্গে দেখা হবে!

মোহন পালের ড্যাবডেবে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রামানন্দ তিন চার সেকেণ্ড কথাই বলতে পারল না। মোহন পালও রামানন্দর দুটো হাত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। রামানন্দর মনে হল আবেগে আনন্দে মোহনের চোখ দুটো যেন ছলছল করছে।

'আসুন আসুন, ঐ চায়ের দোকানটায় বসা যাক। আহা, কতকাল পরে দেখা।'

রামানন্দর হাত ধরে মোহন টানল।

'এই গরমে না হয় চা না-ই হল।'

রামানন্দ বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আপত্তি টিকল না। একরকম জোর করে রামানন্দকে নিয়ে মোহন রাস্তার পাশের ছোটখাট দোকানটায় ঢুকে পড়ল।

চায়ের দোকানের মালিক, তাই আর একটা চায়ের দোকানেই তাকে টেনে আনল। মনে মনে রামানন্দ না হেসে পারল না। কিন্তু মানুষটার আন্তরিকতা উচ্ছ্বাস সত্যি উপভোগ করার মতন। যেন রামানন্দকে এতকাল পর হঠাৎ দেখতে পেয়ে শিশুর মতন আত্মহারা হয়ে গেছে মোহন।

'কি খাবেন বলুন?'

'কি মুশকিল, এখন কি কিছু খাওয়ার সময়?' রামানন্দ হাসল।

'একটা ব্রেস্ট কাটলেট খান।'

'আচ্ছা আচ্ছা।' রামানন্দ ঘাড় কাত করল। 'যদি আপনি তাতে আনন্দ পান—'

'বলে কিনা কবি রামানন্দ সেনকে খাইয়ে আনন্দ পাওয়া—', মোহন পালের ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছিল। 'আপনি বুঝবেন না, আপনি জানবেন না রামানন্দবাবু, কতদিন আপনাকে মনে মনে খুঁজেছি—হুঁ, মনে মনেই আমার খোঁজা—মিথ্যা বলব কেন, দোকান ফেলে কোথাও নড়তে পারি না—কিন্তু ঐ দোকানে বসে থেকে চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তার দিকে চোখ দুটো ধরে রেখে ভাবতাম, আহা, এই জীবনে বুঝি রামানন্দবাবুর সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

'আপনি একটু রোগা হয়ে গেছেন।' মোহন পালের কপাল ও টেকো মাথাটার দিকে চোখ বুলিয়ে রামানন্দ অল্প অল্প হাসছিল।

'যদি সে কথা বলেন তো আমি বলব, আপনি আমার চেয়ে বেশি রোগা হয়েছেন।' মোহন পাল রামানন্দর হাতের কব্জি দেখছিল। 'বেশ রোগা হয়েছেন—রংটাও যেন ময়লা হয়ে গেছে।'

'আরে না না, আপনার দেখার ভুল।' রামানন্দ শব্দ করে হাসল। 'আমার তো রোগা হবার কারণ নেই, খাইদাই ঘুরে বেড়াই, ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছি, তেমন একটা খাটাখাটনিও আজকাল নেই। এ কী, আপনি শুধু চা—'

'খান, আপনি খান, এদের কাটলেটটা ভাল করে, আমি চিরকালই শুধু চা খাই, আপনি তো জানেন রামানন্দবাবু।' আদুরে গলায় মোহন বলল।

গরম কাটলেটের চেহারা দেখে এবং যেমন একটা সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল, রামানন্দ খুশি হল।

'তারপর আর খবর কি আপনার বলুন?' রামানন্দ মোহনের দিকে চোখ না তুলে কাটলেট ভেঙে মুখে পুরল।

'আমার আর খবর কি! আমার তো সেই চায়ের দোকান আর আমি,' মোহনের চোখের দৃষ্টি গাঢ় হয়ে উঠল, রামানন্দ দেখল না, কাটলেট নিয়ে সে খুব ব্যস্ত, তবে মোহনের গলার স্বরটা যে বেশ ধরা-ধরা সেটা তার কানে যাচ্ছিল। 'বুঝলেন রামানন্দবাবু, আমি আপনার খবর জানতে চাইছি, আপনার খবর শুনতে চাইছি, আপনি বিশ্বাস করবেন না, আপনার সব কিছু জানতে শুনতে আমার যে কত তৃষ্ণা, কত আকুলতা, আজ একটা মাস আপনার জন্য আমার ভেতরটা এত ভয়ানক ছটফট করছে—'

'আপনি আমায় খুব ভালবাসতেন।' এক সঙ্গে এতটা কাটলেট মুখে পুরে বোকা বোকা চোখ করে রামানন্দ মোহনের মুখটা দেখল। 'একেবারেই দেখছি আমাকে ভুলতে পারেননি।'

'আপনাকে ভুলব!' মোহন পালের চক্ষু বিস্ফারিত হল। 'কেন, চায়ের দোকান চালাই বলে, কবিতা-টবিতা পড়ি না বলে কি কবি রামানন্দ সেনের মর্যাদা আমি কোনদিনই বুঝিনি!' মোহনের গলায় আক্ষেপের সুর জাগল। যেন খুবই ব্যথা পেল মানুষটা। 'হয়তো আপনার ধারণা তাই, কিন্তু, কিন্তু আপনি জানেন না আমি কত বেশি মনে রেখেছি আপনাকে। যখনই দোকানের ভেতরটা দেখি আমার বুকের মধ্যে হায় হায় করে ওঠে, মনে হয় আমার দোকান অন্ধকার হয়ে আছে—'

'কেন, ওরা আসে না? শুভেন্দু বিকাশ অমলেন্দু—'

রামানন্দর কথা শেষ হল না। মুখটা বেঁকিয়ে মোহন পাল নাকের কেমন একটা শব্দ করল। ·

'বলে কিসে আর কিসে!' এক সেকেন্ড দেওয়ালের একটা ময়লা ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ রেখে মোহন পাল পরক্ষণে রামানন্দর দিকে তাকাল। 'বুঝলেন রামানন্দবাবু, আমি ওদের কুচো চিংড়ি আর চুনোপুঁটির মতন মনে করি, হুঁ, কেবল কবি হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও, ওদের আত্মা ছোট, মন ছোট—'

'মনে হয় আপনি ওদের ওপর খুবই চটে গেছেন?' কাটলেট শেষ করে রামানন্দ এবার চায়ে চুমুক দিল। 'কি ব্যাপার, ওরা আপনার সঙ্গে খুব ঝগড়াটগড়া করেছে বুঝি?'

মোহন পাল হঠাৎ কথা বলল না। মুখটা থমথম করছিল। হাত দিয়ে যখন দেখল চা-টা ঠান্ডা হয়েছে, এক চুমুকে সবটা গিলে শেষ করল। রামানন্দর মনে পড়ল মোহনবাবু চিরকাল ঠান্ডা চা খায়।

'সেই ভাঙ্গা পাখাটা নিয়ে আবার ঝগড়া হয়েছে, না কি দোকানে ভাল খাবার-দাবার করেন না বলে ওরা চটাচটি করে!' রামানন্দ পকেট থেকে একটা দুমড়ান সিগারেট বের করল।

'আমি ভাল সিগারেট এনে দিচ্ছি।' ব্যস্ত হয়ে মোহন নিজেই উঠে যাচ্ছিল, রামানন্দ দু'হাতে তার কাঁধ চেপে ধরে জোর করে বসিয়ে দিলে।

'আরে বসুন বসুন, আপাতত এই সিগারেটে আমার চলবে—হুঁ, শুভেন্দু ওরা কী বলছে, ওদের কাগজ বেরোচ্ছে?'

'কষ্টেসৃষ্টে বের করেছে একটা—মনে হয় আর বেরোবে না!'

'কেন!'

'বিকাশ চাটুয্যে চাকরি নিয়ে আসাম চলে যাচ্ছে।'

'সে কি!' রামানন্দর চোখ দুটো গোল হয়ে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু সে হেসে ফেলল। 'পদাবলী ছেড়ে দিলে আমাদের বিকাশচন্দ্র?'

'শুনুন শুনুন।' মাথাটা আস্তে একবার নেড়ে ধীর মন্থর গলায় মোহন বলল, 'ওদের হল শখের কাব্যচর্চা বা কবিতা লেখা যাই বলুন, ফ্যাশন করে কবিতাপত্র বের করা; রক্তের মধ্যে এ জিনিস নেই, আত্মার মধ্যে সে সাধনা নেই, টাকাপয়সার চিন্তা ওদের কাছে এক সময় বড় হয়ে ওঠে, উঠবেই। আজ একটা ভাল চাকরির সন্ধান পেয়ে বিকাশবাবু আসামের জঙ্গলে ছুটছেন, কাল শুভেন্দুবাবু কাব্যের পাট চুকিয়ে দিয়ে নিজেদের কাঠের কারবার দেখতে-শুনতে লেগে যাবেন। হুঁ, যাবেনই, এ আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তাই বলছিলাম, এক এক সময় কথাটা চিন্তাও করি। বুকের পাঁজরা ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে, টসটস করে হৃৎপিন্ডের রক্ত ঝরছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, আত্মীয় বন্ধু প্রিয়জন সবাই আমাকে ত্যাগ করল, কিন্তু হুঁশ নেই, আমি আমার চিন্তা আমার ধ্যান নিয়ে মত্ত, কাব্যের জগতে বুঁদ হয়ে আছি, এ একমাত্র একজনকে দিয়েই সম্ভব, একটি মানুষই তা পারে, সে রামানন্দ সেন।'

'ভুল ধারণা আপনার মোহনবাবু, আমাকে চিনতে আপনি ভয়ানক ভুল

করেছেন—', রামানন্দ বলতে যাচ্ছিল।

মোহন চিৎকার করে উঠল, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না, আমি ঠিক চিনেছি, আমায় আপনি ফাঁকি দিতে পারবেন না রামানন্দবাবু, উহুঁ, আপনি আজ যে মুখোশ পরেই লোকের সামনে ঘুরে বেড়ান, আমি আপনাকে ঠিক জেনেছি, একমাত্র আমিই চিনেছি আপনি কে, আপনি কী।' উত্তেজনায় মোহন পাল কাঁপছিল, ঠোঁট কাঁপছিল, এমন কি মোহন পালের ঠোঁট থেকে লালাও ঝরে পড়ছিল, চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। হাউ হাউ চিৎকার শুনে চায়ের দোকানের ক'টি খদ্দের ঘাড় ঘুরিয়ে মোহন পালকে দেখছিল এবং যেহেতু তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রামানন্দও ঠোঁট টিপে টিপে তখন হাসছে, দোকানের খদ্দেররা ভাবল, রংচটা ময়লা পশমির চাদর গায়ে জড়ানো খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মোটা মাথায় মানুষটা পাগল-টাগল হবে। কলেজ স্ট্রীটের বিখ্যাত মোহন-রেস্টুরেণ্টের মালিক যে ইনি, কেউ চিনতেই পারল না।

॥ ৩৫ ॥

ভীষণ খাইয়ে দিল ননীমাধব দত্ত। তবে কিনা চতুর লোক। বৈঠকখানার দোকানেই কাজটা সারল। হাড়কাটায় তার সেই মেয়েমানুষটার কাছে রামানন্দকে নিয়ে গেল না। কাল যদিও এমন একটা আভাসই দিয়েছিল আলুর আড়তদার। সেই জন্য অবশ্য রামানন্দর দুঃখ ছিল না।

সবাই কিছু জগত মণ্ডল না।

নিজের রক্ষিতার ঘরে বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে বসাবার উদারতা জগতের মতন সকলেরই যে থাকতে হবে তার কি কথা আছে!

তবে আড়তদার আজও বেশ খরচ করেছে। দুজনে মিলে দু'নম্বর দুটো কি আড়াইটে বোতল খাওয়া হল এখন আর তেমন ভাল মনে নেই রামানন্দর। না কি, তার পরেও একটা পাঁইট হয়েছিল। মানে, মনে করতে পারার মতন তার হুঁশ ছিল না। তবে সঙ্গে কাট্‌লেট এবং প্রচুর মাংস যে খাওয়া হয়েছে এটা রামানন্দর বেশ মনে আছে।

হুঁ, সঙ্গে পর্যাপ্ত সুখাদ্য থাকলে মালও একটু বেশি পরিমাণে পেটে ঢোকানো যায়। কেবল আদা ও ছোলা চিবিয়ে এই জিনিস অনেকক্ষণ টানা যায় না।

দোকান থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ টের পেল, বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে।

সেই পানের দোকান থেকে ননীমাধব পান কিনল, সিগারেট কিনল। রামানন্দ পান খেল না। ননীমাধবের হাত থেকে এক শলা সিগারেট তুলে নিল। ননীমাধব তাতে তৃপ্ত নয়।

'উহুঁ, প্যাকেটটাই রাখুন, পকেটে ঢোকান।'

'কেন!' রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'এই তো নিয়েছি এক শলা—কই দেশলাই দিন।'

আড়তদার তার হাতে দেশলাই দিল। সিগারেট ধরিয়ে রামানন্দ আবার মাথা ঝাঁকাল। 'চলি।'

'প্যাকেটটা নিয়ে নিন।'

'কি মুশকিল!' রামানন্দর গলায় বিরক্তি প্রকাশ পেল। 'অনেক খাইয়েছেন তো, আবার প্যাকেট শুদ্ধ সিগারেট ঘুষ দেওয়া কেন।'

ননীমাধব দাঁত দিয়ে জিভ কাটল।

'আহা, ওভাবে জিনিসটা নেবেন না কবি, দু' প্যাকেট কিনলাম। আমি এক প্যাকেট রেখেছি, আপনার কাছে এটা রাখুন। রাস্তায় খাবেন।'

রামানন্দ বড় রাস্তার দিকে মুখ ঘোরাল।

'আপনি বরং রাখুন, আপনি তো এখন আপনার মেয়েমানুষের ঘরে যাবেন— সেখানে বসে বসে টানবেন।'

'হ্যাঁ, তা যাব, একবার যেতে হবে সেখানে।' ঈষৎ লজ্জার ভাব নিয়ে আড়তদার ঘাড়টা কাত করল, এবং সিগারেটের দুটো প্যাকেটই পকেটে ঢোকাল। 'আপনাকে কিন্তু একদিন ইন্দুর ঘরে নিয়ে যাব। আপনাকে দেখলে ইন্দু খুশি হবে!'

আর তুমি নিয়ে গেছ শালা! হয় তোমার ইন্দু দেখতে বেজায় কেলেকুচ্ছিত, নয়তো তুমি নিজে একটা আস্ত ছোটলোক, এইটুকুন আত্মা নিয়ে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বেড়াও! রামানন্দর হঠাৎ বলতে ইচ্ছে করল। বলল না। বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগল। আড়তদারও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল।

'বুঝলেন, আজই আমরা এভাবে দোকানে আসর না বসিয়ে সোজা সেখানে চলে যেতাম, কিন্তু আপনি এমন দেরি করে ফেললেন—'

'ঠিক আছে ঠিক আছে', প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলবার জন্য রামানন্দ গলার স্বরটা হাল্কা করল। 'আর একদিন যাওয়া যাবে, তার জন্য কি—আপনি আর এগোচ্ছেন কেন।'

'আপনাকে বাসে তুলে দেবো।'

'ধুত্তোরি মশাই!' এবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে রামানন্দ ভাল করে একটা ভেংচি কাটল। 'আমি কি মেয়েমানুষ যে আমাকে বাসে তুলে দিতে হবে—বাসের জন্য আমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি ডেকে ওখানে চলে যান, দেরি করলে না আবার গিয়ে দেখেন, রাস্তার খদ্দের ঘরে ঢুকিয়ে দোরে খিল এঁটে দিয়েছে আপনার ইন্দুবালা।' ফ্যা ফ্যা করে হাসল রামানন্দ। ননীমাধবের মুখটা থমথমে হয়ে গেল, জালার মতন ভুঁড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন কথাটা শুনে খুবই আঘাত পেল আড়তদার। রামানন্দ খুশি হল। লোকটাকে আঘাত করতে চাইছিল সে।

'কি হল, আমার ওপর রাগ করলেন?' সিগারেটের টুকরোটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রামানন্দ আর হাসল না, ইচ্ছে করে হাসল না, কেননা এখন হাসলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতন জ্বালা ধরবে আড়তদারের, বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

হাওয়ার সঙ্গে এক ফোঁটা দুফোঁটা জলও যেন পড়ল দুজনের মাথায় ঘাড়ে।

'চলি, এই সময় বেলেঘাটার বাসে বেজায় ভিড় হয়।' রামানন্দ আবার ঘুরে দাঁড়াবার উদ্যোগ করল।

'কিন্তু আপনি যে কথাটা বললেন-না, নাবালকের মুখেই শোভা পায়।' আড়তদারের থুতনির চর্বিতে একটা ঢেউ খেলে গেল। বোঝা গেল ভিতরের রাগটা ওখানে আটকে আছে।

'কি রকম!' রামানন্দর লাল চোখ গোল হয়ে উঠল। 'নাবালকটার আপনি দেখলেন কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি নাবালক, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতন কথাবার্তা।' আড়তদার ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'বড় যে গরম হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে?' রামানন্দ কপাল কুঁচকোল।

'নিশ্চয় গরম হব। যে ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই তা নিয়ে কথা বলা আপনার অন্যায়।'

'অভিজ্ঞাতা নেই—হুঁ, তা তো নেইই, বেশ্যা পোষার অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু বেশ্যারা কেমন চরিত্রের তা আমার জানা আছে।'

'জানা আছে না হাতি আছে।' হাতের বুড়ো আঙুলটা বাঁকা করে আড়তদার রামানন্দর থুতনির সামনে নাড়ল। 'বলে কিনা মাসে পাঁচশ টাকা ইন্দুকে আজ তিন বছর সমানে দিয়ে আসছি, এক রাত্তির আমি না গেলে কান্নাকাটি করে, মন খারাপ করে গালে হাত দিয়ে জানালার ধারে বসে থাকে—আর সেই মেয়ে কিনা রাস্তার খদ্দের ঘরে ঢোকাবে!' আড়তদার চেঁচিয়ে বলছিল। রাস্তায় লোক জমে গেল। তারা হাসাহাসি করছিল।

'রাখো রাখো!' রামানন্দও আস্তে কথা বলছিল না। তার থ্যাবড়া নাক ফুলে উঠেছে। রেগে গেলে যা হয়। লাল ফোলা ফোলা চোখ দুটো ভুরুর নিচ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। 'বেশ্যার সতীত্ব বোঝাচ্ছে আমাকে! তা মাস মাস পাঁচশ টাকার লোভে রাতটা নাহয় তোমার জন্য রিজার্ভ রাখে—কিন্তু দিনের বেলা?' রামানন্দ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। 'খোঁজ নিয়ে দ্যাখো গে দুপুরে বিকেলে ক'গন্ডা মরদা ঘরে ঢোকে তোমার দুলালীর।'

'তুমি মুখ সামলে কথা বলবে আমি বলে দিচ্ছি।' আড়তদারের জালার মতন ভুঁড়িটা নেচে উঠল, হাতীর মতন এত বড় দেহটা থরথর করে কাঁপছিল। 'ভদ্র-লোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয়।'

'আহা রে ভদ্দরলোক, আলুর আড়তদার, তার সঙ্গে কিনা ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে।'

'ছোটলোক কোঁহাকার!' মোটা ভারি শরীরটা নিয়ে ননীমাধব খুব একটা হাতটাত ছুঁড়ে কথা বলতে পারছিল না, যে জন্য হাঁসফাঁস করছিল বেশি। 'ছোট-লোক আর কাকে বলে!'

'ছোটলোক তোমার বাবা।' রামানন্দও ছেড়ে কথা কইল না। 'বাপ কাকা মদ খেয়ে রাস্তায় নর্দমায় গড়াগড়ি যেত, সেদিন পাঁচটা লোকের সামনে স্বীকার করেছিলে মনে আছে? এখন এখানে ভদ্দরলোক সাজতে চাইছ!'

'ইতর কোথাকার!' অতিরিক্ত হাঁসফাঁস করার দরুন ননীমাধবের দেহটা আগের চেয়ে অনেক বেশি কাঁপছিল। চশমা জোড়া চোখ থেকে খুলে গিয়েছে, ঠোঁট বেয়ে পানের রস জামায় পড়ছিল। 'সাধে কি পাইকপাড়ার ওরা কিলিয়ে প্যান্ডেল থেকে বের করে দিয়েছিল, ঠিক করেছিল সোনালী বাসরের ছেলেরা, ইতরকে কেউ সহ্য করতে পারে না—'

'তবে রে শা—'

'আহা করেন কি করেন কি!' জামার আস্তিন গুটিয়ে রামানন্দ আড়তদারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, দুজন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলল। 'আপনিই বা কেমন, ননীবাবু, বলুন তো?'

একজন ননীমাধবকেও ধমক লাগাল। বোঝা গেল এরা স্থানীয় লোক। ননী-মাধবকে চেনে। 'না হয় মদ খেয়েছেন, এত বড় একটা কারবারী মানুষ, আপনাকে এখানে সবাই জানে, রাস্তায় নেমে এভাবে মাতলামি করা কি আপনার ঠিক!'

'আমি মাতলামি করছি, না আমার পয়সায় গলা পর্যন্ত গিলে দোকান থেকে বেরিয়ে ছোটলোকের মতন ব্যবহার করছেন ইনি!' রামানন্দকে দেখাল।

'কে, মানুষটাকে কিন্তু চিনলাম না।' ভিড়ের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল।

'হালে বৈঠকখানার দোকানে মদ খেতে আসছে, আমি যেন আগেও দু-চারদিন দেখেছি।' একজন গলা বাড়িয়ে উত্তর করল।

তখন রামানন্দর দিকে সকলের চোখ।

'মশাই, আপনি থাকেন কোথায়?'

'আমি অনেক দূরে থাকি।'

'তা কি নিয়ে ঝগড়াটা হচ্ছিল?'

'আপনাদের আড়তদারকে জিজ্ঞেস করুন।' রামানন্দ কপালের ঘাম মুছল।

'ননীবাবু, আপনার সঙ্গে এর কোথায় পরিচয়? চেহারা দেখে আপনাদের কারবারের লাইনের কেউ বলে তো মনে হয় না।'

'কারবারের লাইনের লোক, মানে বিজনেসম্যান যারা, তারা এমন ছোটলোক হয় না।' ননীমাধব গজ গজ করে উত্তর করল।

'দেখুন দেখুন, আবার গালিগালাজ করছে।' ড্যাবড্যাবে চোখে রামানন্দ লোকগুলির মুখের দিকে তাকাল।

'ননীবাবু, দুজনে এন্তার বসে খুব খেলেন-টেলেন, দোকান থেকে বেরিয়ে ঝগড়া করছেন, গালিগালাজ করছেন, কারণটা কি, বলি আপনার ও-পাড়ার সাকরেদ-টাকরেদ কেউ নিশ্চয় হবে?' ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন চোখ টিপল, হাসল। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ননীমাধব। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল।.

'ও-পাড়াব সাকরেদ হতে যাবে কোন্ দুঃখে। ও-পাড়ায় এমন বদমেজাজী লোককে কেউ পাত্তাই দেবে না। আমি হলপ করে বলতে পারি, হাড়কাটার কোনো মেয়ের ঘরে এই মানুষ ঢুকুক, পয়লা দিনই ঝগড়া বাধাবে, মারামারি শুরু করবে, তারপর সব ক'টা ছুঁড়ি একত্তর হয়ে বেটাকে ওপাড়া থেকে তাড়াবে।'

কথাটা শুনে একসঙ্গে দু-তিনজন হোহো করে হাসল।

'তা হলে এই বৈঠকখানার দোকানেই এর সঙ্গে পরিচয়, তাই না?' একজন সরু গলায় মন্তব্য করল।

'হুঁ, এককালে কবিতা-টবিতা লিখত, এই জন্যই খাতির করতে গিয়েছিলাম, এখন হাতিয়ে দেখি একেবারে ফাঁপা, কিসসু নেই ভেতরে।'

'ফাঁপা তোমার বাবা।'

'এই তো আবার আপনি মুখখিস্তি শুরু করলেন।' রামানন্দর দিকে মুখ ঘুরিয়ে একজন জোরে ধমক লাগাল। 'যান, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন চলে যান। ননীবাবু, আপনি আপনার আড়তে যান।'

'আমি এখন ইন্দুর ঘরে যাব।' ননীমাধব এতক্ষণ পর পকেট থেকে রুমাল বের করে ঠোঁটের পানের রস মুছল। 'একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও তো জয়রাম।'

জয়রাম নামের লোকটা তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি ডাকতে ছুটল।

'বুঝেছেন মশাই!' আর একজন হাত নেড়ে রামানন্দকে বোঝাল। 'আপনি ননীবাবুর গায়ে হাত তুলতে যাচ্ছিলেন, খুব খারাপ হতো ব্যাপারটা, আমাদের এই বৈঠকখানার বাজারে ননীমাধব খুব সম্মানের ব্যক্তি—খবরদার, এপাড়ায় মদ খেতে এসে মাতাল হয়ে এমন কাজ আর কোনোদিন করবেন না।'

'আচ্ছা, যার কাছে সম্মানের তার কাছে সম্মানের। একটা অশিক্ষিত ছোটলোক ছাড়া আমি ওটাকে আর কিছুই মনে করি না।' কিন্তু কথাগুলি চেঁচিয়ে বলতে পারল না রামানন্দ। এখানে ননীমাধবের দল ভারি। কাজেই একটা চাপা আক্রোশ নিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে তাকে এগোতে হল।

'রামানন্দবাবু!' যেন অতর্কিত একটা পাখি মিঠে গলায় ডেকে উঠল।

নিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে তাকে

ডাকল।

রামানন্দ হতভম্ব। থমকে দাঁড়াল। কেননা কালো চকচকে একটা সুন্দর ফিয়াট

গাড়ি তার প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

চোখ তুলতে সে একসঙ্গে দুটি মুখ দেখতে পেল। গাড়ির জানালা দিয়ে দুজন গলা বাড়িয়ে আছে। রেখা চক্রবর্তী আর অশ্লীল গল্প-লেখক নন্দদুলাল।

'কি ব্যাপার!' এবার রামানন্দর মুখে হাসি ফুটল।

'ভেতরে চলে আসুন।' নন্দ বলল, 'এখন আমরা পার্ক স্ট্রীটের একটা বার-এ যাচ্ছি। আপনাকে পেয়ে সেরিমনিটা খুব জোরদার হবে।'

রামানন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কিছু বুঝতে পারছিল না। রেখা মিটমিট করে হাসছে।

'বেলা দুটোয় ম্যারেজ-রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে দুজনে বেরিয়ে চৌরঙ্গীর দু-দুটো বার-এ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বসে উৎসব করেছি।' দাড়ি সমেত চোখা থুঁতনিটা নামিয়ে নন্দদুলাল হাসল। 'এখন যাচ্ছি ব্লু-ফক্সে। বন্ধু খুঁজছিলাম। এবার আপনাকে পেয়ে যে কী ভাল লাগল!'

'অ, তা হলে দুটিতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন, গ্রেট ডে সন্দেহ কী, সেরিমনি করার দিনই বটে।' খুশি হয়ে নিজেই দরজাটা টেনে খুলে রামানন্দ ভিতরে ঢুকে পড়ল। নন্দ গাড়ি চালিয়ে দিল।

॥ ৩৬ ॥

দু'জন পাশাপাশি একটা শোফায় বসে। রামানন্দ তাদের জমকালো সাজ-সজ্জাটা ভাল করে দেখছিল। চমৎকার একটা সুট পরেছে নন্দদুলাল। তা তো পরবেই, আজ তার বিয়ের দিন, হয়তো এই উপলক্ষেই নন্দ এমন দামী সুটটা তৈরী করিয়েছে। তেমনি তার জুতো। সুয়েডের জুতো না? কলেজে পড়ার সময় কেন জানি রামানন্দর একবার ভীষণ শখ হয়েছিল একটা সুয়েডের জুতো পরার, পয়সায় কুলোতে পারেনি বলে কেনা হয়নি। তারপর অবশ্য দু' একদিনের মধ্যেই শখটা মজে যায়। কথাটা হঠাৎ মনে হতে তার হাসি পেল।

নন্দ আজ টাই পরেছে। নিখুঁত নট দেওয়া টাই। সত্যি খুব কেতাদুরস্ত হয়ে চলতে জানে লোকটা। বাপের পয়সা আছে, বেশভূষার দিকে মনোযোগ দিতে আটকায় না। এখানে আসার সময় বলছিল গাড়িটা নতুন কিনেছে।

নন্দর পোশাক দেখা শেষ করে রামানন্দ রেখাকে দেখছিল। মেয়ের দিকে আজ আর তাকানো যাচ্ছিল না। তার মানে ওদিকে চোখ রাখতে গেলে বার বার চোখ আটকে যাচ্ছে। টাটকা গোলাপ ফুলের রং শাড়ির। ব্লাউজটাও তাই। সেদিন বউবাজার চায়ের দোকানে রামানন্দ দেখেছিল পেটকাটা ব্লাউজ। আজকের জামাটা আরও সংক্ষিপ্ত। কেবল বক্ষাবরণের জন্য যতটুকু জামার দরকার, তা ছাড়া সবটা পেট ও পিঠ খোলা, বুকের দু'দিকের পাঁজর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে। অর্থাৎ ফরসা তন্বী মেয়েদের বুকের পাঁজরের যে একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে, আকর্ষণ আছে, বুদ্ধিমতী রেখা তা জেনে গেছে, বুঝতে রামানন্দর মোটেই কষ্ট হল না। খোঁপাটাও সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের, সেদিনের সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। কাজল বুলোনোর নমুনাটাও অসাধারণ।

হবেই তো, আজ যে তাদের একটা সাংঘাতিক দিন, বিয়ের দিন, রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। অল থিঙস্ ব্রাইট অ্যাণ্ড বিউটিফুল। মাঝে মাঝে কাগজে পোশাক-আশাকের বিজ্ঞাপনে এই শব্দ ক'টা ব্যবহার করে। নন্দ ও রেখার বেশভূষা দেখে রামানন্দর এখন মনে পড়ল। রেখার পরনে নিশ্চয় ওটা

ভয়েল। সুইস ভয়েল? হতে পারে। ফেদারলাইট কলার ব্রাইট। বিজ্ঞাপনের আর দুটো ইংরেজী শব্দ রামানন্দর মনে পড়ে গেল—পালকের মতন হালকা উজ্জ্বল রং। তা পালকের মতন হালকা শাড়ি না হলে রেখার মতন হালকা ছিপছিপে মেয়েকে মানাবে কেন!

আর হালকা ছিপছিপে গড়নের মেয়ে দেখেই তো নন্দদুলালও ওকে বিয়ে করল। সে নিজে রোগা খিটখিটে। মহিষী ভারি হলে, মোটা হলে তার পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন হতো না?

মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে রামানন্দ রেখার ছেড়ে রাখা আশ্চর্য সুন্দর চটি জোড়া দেখল। নন্দর কাঁধে মাথাটা ঠেকিয়ে একটু কাত হয়ে শরীরটা বেঁকিয়ে সোফার ওপর পা তুলে বসেছে মেয়ে। আজ সোহাগের দিন, আজ এভাবে না বসলে আর কবে বসবে!

হুঁ, চটি জোড়া দেখা শেষ করে রামানন্দ যুবতীর রক্তাভ পদযুগল দেখল।

এখন ঐ সুন্দর চটি জোড়ার জন্য ঈশ্বর এমন অনবদ্য পা দুটো তৈরী করেছে, নাকি ঐ পায়ে উঠবে বলে জুতোর কোম্পানী যত্ন করে এমন অপরূপ চটি তৈরী করেছে, রামানন্দ হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। কেননা তার চোখ দুটো বার বার ঝাপসা হয়ে আসছিল। বৈঠকখানার দোকানে ছোটলোকটার সঙ্গে বসে এন্তার দেশী গিলে আসার পর এখন স্কচ চালাচ্ছে। খাবার-টাবারও প্রচুর আনিয়েছে নন্দ, রামানন্দ সেসব ছুঁয়েও দেখছে না। ইচ্ছাই করছিল না তার। সে জানে মদ ছাড়া অন্য কিছু মুখে তুললেই ভকভক বমি করে ফেলবে। দরকার কি তাদের বিয়ের দিনে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড করার। যতটা সম্ভব সংযত হয়ে সে গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল।

কিন্তু ঐ যে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসার দরুন একটা গোলমালের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভিতরে ভিতরে সে অস্বস্তিবোধ করছিল। রেখার নকশা-কাটা চটি আর পা—কোন্‌টার জন্য কোন্‌টা তৈরী ভেবে ভেবে সে প্রায় গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছিল।

'আপনি কিছুই শুনছেন না রামানন্দবাবু!'

'শুনছি শুনছি।' ঢুলুঢুলু চোখ দুটো রেখার মুখের দিকে তুলে দিয়ে রামানন্দ হাসল। 'আপনাকে সবাই মাইনাস করে দিয়েছিল—বাড়ির লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, পড়শী, এমন কি বন্ধুরাও—'.

'যেহেতু আর্টিস্ট দেখলেই আমি ছোঁকছোঁক করি, কবি গল্প-লেখক ছবি-আঁকিয়ে, ভাল গাইতে পারে কি বাজাতে পারে এমন কারো দেখা পেলেই চিরকাল আমি তার পেছনে ছুটেছি—'

'খুব সুন্দর কথা, আনন্দের কথা।' রামানন্দ গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু কথা হচ্ছে কি, আপনার আকাঙ্ক্ষা, আপনার এই তৃষ্ণা, এই শিল্পপ্রীতি, শিল্পীর প্রতি অনুরাগ, সাধারণ মানুষ—মানে ডাল চাল তেল নুন নিয়ে যাদের কারবার তারা বুঝত না, বুঝবার ক্ষমতা ছিল না।'

'যা তা বলছিল তারা, রাস্তার মেয়ে—এমনকি আমাকে বেশ্যা বলতেও কারো কারো মুখে আটকাচ্ছিল না।'

'খুব দুঃখের কথা, বেদনার কথা।' রামানন্দর গলার স্বর গমগম করে উঠল। নন্দ হিহি করে হাসল।

'তেমনি আমাকেও। আমি একটা লোফার স্কাউণ্ড্রেল—মেয়ে দেখলেই ছোঁক-ছোঁক করি, আমি যে গল্প লিখি, আর্টিস্ট, কথাটা তারা আমলই দিত না, আর যদি বা কেউ দিয়েছে, সারাক্ষণ নাক সিঁটকিয়েছে,—অশ্লীল লেখা ছাড়া আমার হাত দিয়ে কিছু বেরোয় না, অসুন্দর জিনিস ছাড়া কিছু আমার চোখে পড়ে না—'

'সব মাথা-মোটার দল,' রামানন্দ হুঙ্কার ছাড়ল। 'বাংলা দেশে শালা পড়ুয়া আছে নাকি—মানে এক লাইন গদ্য পদ্য বুঝবার মতন মগজ আছে কোনো বেটার?' গেলাসটা ঠক করে নামিয়ে রেখে রামানন্দ হাতের তেলো দিয়ে খুব করে নাকের ডগাটা ঘষল। 'যে কারণে যে দুঃখে আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি—বোম্ধার দলকে আমার চেনা হয়ে গেছে—বুঝলে রেখা, বুঝলেন নন্দবাবু, অনেক ঘা খেয়ে তবে আমি হাতের কলম ছেড়েছি।'

'না না, তা কেন করবেন, তা কেন হবে রামানন্দবাবু!' যেন কথাটা বলার জন্য রেখা তৈরী হয়ে ছিল। নন্দর গা ছেড়ে দিয়ে স্প্রীং-এর মতন নড়ে উঠে সোজা হয়ে বসল। 'আপনারা আর্টিস্ট—এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? সেদিন যে জন্য আমি নন্দকে খুব ধমক লাগিয়েছিলাম, গড়ের মাঠের একটা নিরালা কোণে ঘাষের ওপর শুয়ে আমার কোলে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কাঁদছিল ও ঃ আমার কিছুই হল না, সব দিক দিয়ে ব্যর্থ, পাব্লিশাররা আমাকে চাইছে না, পাঠকরা আমাকে চাইছে না, বাড়ির লোক আমাকে দেখতে পারে না, আত্মীয়-স্বজন যা-তা বলছে, কিছুই করতে পারছি না বলে বন্ধুরাও মুখ ঘুরিয়ে হাসে—'

'তার মানে আপনাকে যেমন সবাই মাইনাস করে দিয়েছে এই মাত্র বলছিলেন, তেমনি নন্দবাবুও ভাবছিলেন সব দিক থেকে তিনি মাইনাস হয়ে গেছেন, যে জন্য গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর শুয়ে আপনার কাছে উনি বিলাপ করছিলেন—তাই না নন্দবাবু?'

নন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি ঠিক ধরেছেন। দুঃখ যে পেয়েছে, সে-ই তো আর একজনের দুঃখ বুঝবে।'

'কিন্তু আমি তখন তাকে বোঝালাম, তা বলে তুমি যেমন ভেঙ্গে পড়েছ, ছেলেমানুষের মতন কাঁদছ, আমি তো কাঁদছি না, আমি একটুও ভেঙ্গে পড়িনি। লোকের কথায় কী এসে যায়, লোকে আমাকে কী বলছে আর না বলছে তার জন্য আমি থোড়াই পরোয়া করি—বেশ তো, তোমার কেউ যদি না থাকে আমি আছি, কেউ তোমাকে দেখতে পারছে না ভালবাসছে না, আমি তোমায় ভালবাসছি, আমি তোমাকে দেখছি—হুঁ, কোনো পাব্লিশার তোমার গল্পের বই ছাপছে না, আমি ছাপব, ব্যাঙ্কে আমার জমানো কিছু টাকা আছে, সেই টাকা দিয়ে তোমার বই ছাপব, কেউ তোমার লেখা পড়ছে না, আমি পড়ব, রাত জেগে তোমার লেখা সব গল্প পড়ব।' উত্তেজনায় রেখার দু' চোখ ভারি উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে উঠল।

'খুব দামী কথা, মূল্যবান কথা।' টেবিল থেকে রামানন্দ গেলাসটা তুলে নিল।

'এবং সেদিন ঐ মাঠে বসেই আমরা ঠিক করে ফেললাম, একটা রোদাল খটখটে দিন দেখে—যেহেতু ক'দিন ধরে বাদলা-টাদলা যাচ্ছিল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে কাজটা সেরে ফেলব।'

'খুব ভাল করেছেন, সুন্দর করেছেন—', রামানন্দও রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'তার মানে দুটো মাইনাস একত্র হয়ে আপনারা প্লাস হয়ে গেলেন—তাই না?' শরীরটা নাচিয়ে রামানন্দ এবার জোরে হাসল।

'একজ্যাক্টলি সো!' নন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি ঠিক বলেছেন—আজ আমি মনে যা জোর পাচ্ছি আপনাকে বোঝাতে পারব না রামানন্দবাবু—এখন থেকে এমন সবল শক্ত হাতে কলম ধরব, দেখি কোন্ বেটা পাব্লিশার—'

'এখন থেকে রাস্তায় ঘাটে আমিও বুক ফুলিয়ে চলব, দেখি কে আমাকে—'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' রামানন্দ এক সঙ্গে দুটি মুখের দিকে তাকাল। 'আপনার জোরে রেখা দেবী চলবেন, রেখার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে আপনি আপনার সৃষ্টি কার্য চালিয়ে যাবেন—দুটি প্রাণ একত্র হওয়ার এখানেই তো সুখ, এই সার্থকতা।'

'কিন্তু আপনি সৃষ্টি বন্ধ করবেন কেন রামানন্দবাবু! গলায় থমথমে অভিমান নিয়ে রেখা বলল, 'আপনার সম্পর্কে আমার ভীষণ অভিযোগ, আপনি লিখছেন না, এই দুঃখ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না—কত দিন হয়ে গেল, মনে হয় যেন একটা যুগ পার হতে চলেছে আপনার নতুন কবিতা পড়ি না।'

হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে থেকে পরে রামানন্দ শব্দ না করে হাসল। 'আমিও যে ব্যর্থ—সব দিক থেকে মাইনাস—আপনাকে পেয়ে নন্দবাবু নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছেন—এখন তিনি সবল হাতে কলম ধরবেন, নন্দবাবুর পাশে থেকে আপনার জীবন আগের চেয়ে অনেক বেশি মধুর উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে উঠল—কিন্তু আমার যে কোনো আশাই নেই, আমাকে প্লাস করবে কে?'

'আমি আমি আমি—', নন্দদুলালকে চমকে দিয়ে, রামানন্দকে প্রায় হতভম্ব করে দিয়ে রেখা সোফা থেকে ঝুঁকে পড়ে রামানন্দর দু' কাঁধ জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেল। 'সঞ্জীবনী সুধা হয়ে আমি আপনাকে প্রেরণা যোগাব, শিল্পীর প্রাণের উৎসাহ ফিরিয়ে আনার মধ্যেই আমার বেঁচে থাকার সার্থকতা, জীবনের সব আনন্দ; আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন রামানন্দবাবু?'

'একজ্যাক্টলি তাই।' হাতের গেলাসটা শূন্যে তুলে ধরে নন্দ রামানন্দর মুখের দিকে তাকাল। 'একটা দুটো রাত রেখার সঙ্গে কাটিয়ে দেখুন—অমৃত অমৃত, আপনার সব নৈরাশ্য চলে যাবে, সমস্ত গ্লানি মুছে যাবে, যেতেই হবে, আপনাকে নির্ঘাৎ আবার ও কলম ধরিয়ে ছাড়বে।'

নন্দর পাশে স্থির হয়ে বসে কোমরের ছোট্ট নীল রুমালটা টেনে নিয়ে রেখা কপাল মুছছিল। উত্তেজনায় একটু ঘেমে উঠেছে। বোকা বোকা চোখে রামানন্দ প্রথমে রেখা তারপর নন্দকে দেখছিল।

'উঁহু, আমার দিক থেকে আপনার সংকুচিত হবার কোনো কারণ নেই রামানন্দবাবু, রেজিস্ট্রি করে দু'জনে আজ গিঁট পরে এসেছি সত্য, কিন্তু পাখি হয়ে ওর ওড়ার আনন্দ, ঘুড়ি হয়ে আমার ওড়ার আনন্দ আমরা নষ্ট হতে দেবো না, নেভার, আমার এই শর্ত, বাঁধন পরেও আমরা স্বাধীন, তাই না রেখা?'

'নিশ্চয়, সারাজীবন আর পাঁচটা স্বামী-স্ত্রীর মতন দুটো এঁদো পুকুর হয়ে থাকতে আমরা একজন আর একজনকে বিয়ে করিনি—'

'বুঝেছেন, এদিক থেকে আমরা উদার মুক্ত।—বয়!' তিনটে গেলাসই খালি হয়ে গেছে লক্ষ্য করে নন্দ ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বয়কে ডাকল, তারপর আবার রামানন্দর চোখে চোখ রাখল। 'দু-এক রাত রেখার সঙ্গে শুয়ে দেখুন, সাংঘাতিক ইন্সপিরেশন পাবেন, ঐ ওর বিছানায় থাকতে থাকতেই কবিতার নতুন শব্দ, নতুন লাইন, নতুন ইমেজ আপনার মগজের মধ্যে খেলা করতে আরম্ভ করবে। হুঁ, করবেই।'

রেখা মিটিমিটি হাসছে। আলতোভাবে সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রামানন্দ ফের নন্দর দিকে তাকাল। 'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে।' নেশাচ্ছন্ন হলে হবে কি, লজ্জা জিনিসটাকে সে একেবারে ত্যাগ করতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা ঢাকা দেবার চেষ্টায় হঠাৎ বেশ বড় করে দু' গাল ছড়িয়ে হাসল। 'কিন্তু আজ এমন একটা উৎসবের দিন, কই, আপনার গ্রেট ফ্রেন্ড জগত মণ্ডলকে তো দেখছি না!'

'ওই রাস্কেলটার কথা বলবেন না।' নন্দ অতর্কিতে উত্তেজিত হয়ে উঠল, চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল। 'কাল তিন বার, আজ সকালেও দু'বার বুদ্ধু ওস্তাগর লেন থেকে ঘুরে এসেছি, নবাবের দেখা পাইনি।'

'কেন, বাড়ি নেই, না কি অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে?'

'হুঁ, হাঁটুতে হাইড্রোসিল হয়েছে, কনুইয়ে করোনারি অ্যাটাক।'

'যাঃ!' রেখা ভুরু কুঁচকোল, হাসল এবং নন্দকে সামান্য ধমকও লাগাল। 'কী যা-তা বলছ, আসল ব্যাপারটা রামানন্দবাবুকে বলে দাও।'

'বুঝলেন, একটা দজ্জাল বউ আছে জগতের, আপনি শুনেছেন নিশ্চয়!' বয় মদ দিয়ে গেছে, চোঁ করে নন্দ প্রায় অর্ধেক গেলাস সাবাড় করে ফেলল।

রামানন্দ হ্যাঁ ও না-এর মাঝামাঝি অবস্থায় থেকে থুতনিটা ঈষৎ নাড়ল।

নন্দ বলল, 'মণ্ডল যা আঁকাউঁকি করে, গিন্নী সব ঝাঁট দিয়ে নর্দমায় আঁস্তা-কুড়ে ঠেলে দেয়, এটা বোধ করি জানেন না?'

'হুঁ, একটু-আধটু শুনেছি, জগতবাবুর আঁকাটাকার ব্যাপারে তাঁর ওয়াইফ বিশেষ সন্তুষ্ট না।'

'বিশেষ কেন, একেবারেই নয়।' ভরা গেলাস হাতের সামনে রেখে দিয়ে রেখা লম্বা করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'তেমনি হয়েছে ছেলেমেয়ে দুটো—বাপ রং-তুলি নিয়ে বসলেই উৎপাত আরম্ভ করে।'

'হুঁ', রামানন্দ একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। 'তাও শুনেছি।'

'এটা হয়েছে ওই দজ্জাল বউটার জন্য, বুঝলেন, মা'র কাছে যেমন ট্রেনিং পেয়েছে—' রামানন্দর দেখাদেখি নন্দও সিগারেট ধরাল, তারপর আবার গেলাসটা তুলে নিল। 'ওফ, আপনি মিসেস মণ্ডলকে দেখেননি—যেমন কালো তেমনি মোটা, আমাদের বাঙাল দেশে যাকে মটকি বলে—মটকি চেনেন তো?'

'কেন চিনব না?' রামানন্দ অল্প হাসল। 'আমি কি বিলেত থেকে এসেছি!'

'এদিকে ভদ্রমহিলা খুব বাড়াবাড়ি করছিলেন, জগতবাবুকে প্রায় আঁকতে বসতেই দিচ্ছিলেন না, ছেলেমেয়ে দুটোও ভীষণ গোলমাল করছিল।' রেখা তার গেলাসে ছোট করে একটা চুমুক দিয়ে কোমরের নীল রুমাল টেনে নিয়ে ঠোঁট মুছল। চোখ দুটো বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছলছল করছিল। এখন আরও অপরূপ দেখাল।

'তারপর?' রামানন্দ সামনের দিকে ঝুঁকে বসল। মণ্ডলের কথা শুনে তার চোখে মুখে একটু উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'কিন্তু জগতবাবু ভয়ানক জেদী, শক্ত ধাতের মানুষ।' রেখা বলল, 'মচকাবে তবু ভাঙবে না।'

'হুঁ, তা আমি জানি। জাতশিল্পী। হাজারটা বাধা পেলেও ছবি আঁকা তিনি ছাড়বেন না। মানুষটার পরিচয় আমি অনেকদিন আগেই পেয়েছি।'

'কাজেই এদের উৎপাতে বাড়িতে আঁকতে পারছেন না বলে জগতবাবু ঠিক করেছেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।'

'বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন? কোথায় যাবেন!' রামানন্দর ঢুলুঢুলু চোখ বড় হয়ে উঠল।

'আফ্রিকার জঙ্গলে।' গেলাস নামিয়ে রেখে দু' হাত শূন্যে নাচিয়ে নন্দ বলল, 'মাথায় কেরা ঢুকেছে, ওকে এখন রুখবে কে বলুন!'

'আফ্রিকায় যাবে অর্থ কি?' রামানন্দ চট করে কথাটা বুঝতে পারল না।

এবং নন্দও সরাসরি এই প্রশ্নের জবাব দিল না, অন্য কথা বলল, 'অথচ দেখুন, আমি বার বার তাকে বললাম, বেশ তো, গিন্নীর জন্য তুমি ঘরে বসে আঁকতে পারছ না, আমাদের বাড়িতে চলো, একটা ঘর তোমাকে ছেড়ে দেবো—যত খুশি বসে সেখানে ছবি আঁকবে, যতদিন তোমার ইচ্ছে।'

'তারপর?' রামানন্দ ঢোক গিলল।

'কারো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে কি এই মানুষ থাকতে চায়!' রেখা অল্প করে মাথা দোলাল। 'জগতবাবুর বাড়ির মানুষ চাইছে না তিনি রং-তুলি নিয়ে থাকুন,

বরং এক্ষুনি সব ছেড়েছুড়ে অন্য একটা কাজে ঢুকে পড়ুক। কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা, ছবি আঁকা তিনি ছাড়বেন না, এবং জীবনে অন্য কিছু করবেনও না, মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত শুধু এঁকে যাবেন।'

'হুঁ,' রামানন্দ ঘাড় কাত করল। 'খুব শক্ত নার্ভ। আমি ওঁকে ভালভাবেই জানি।'

'কঙ্গো গভর্নমেণ্ট নাকি ওখানকার স্কুলের জন্য দু'জন বাঙ্গালী আর্টিস্ট চেয়েছে, কি একটা সোর্সে জগতবাবু খবর পেয়েছেন, তাই রাতদিন ছুটোছুটি করছেন, কখনো রাইটার্স বিল্ডিং, কখনো রাজভবন,—শুনলাম কঙ্গোর দিল্লীর ডিপ্লোমেটিক অফিসের এক ভদ্রলোক ছুটিতে কোলকাতা এসেছেন, মণ্ডল তাঁর সঙ্গেও ধরতে গেলে দু'বেলাই নাকি দেখা করছেন। বাড়িতে ওঁকে এখন পাওয়াই যাচ্ছে না।'

রেখা চুপ করতে নন্দ বলল, 'কিন্তু বড় কঠিন, কঠিন, বুঝেছেন রামানন্দবাবু, মামা কি শ্বশুরের জোর না থাকলে এখানে কিছুই হবে না, তা ছাড়া সরকারী ব্যাপার, শুনেছি বাঁ হাতের ঢালাও কারবার রয়েছে; আমি খবর পেয়েছি, অলরেডি দু'শো দরখাস্ত পড়েছে—আমাদের বেশির ভাগ শিল্পীই তো জগতের মতন উপোসী ছারপোকা—কাজেই বাঁধাধরা মাইনের একটা চাকরির নাম শুনে ওই জঙ্গলে যাবার জন্য কলকাতার আর্টিস্টের দল আদাজল খেয়ে লেগে গেছে।'

'আমার তো মনে হয় জগতবাবুর হয়ে যাবে, মডার্ন স্টাইলে ছবি আঁকায় ওঁর মতন মেরিট, এমন হাত ক'টা আর্টিস্টের আছে?'

'না গো না সোনা, মেরিট-ফেরিট এখন আর কেউ দেখছে না, তবে আর মামার জোর শ্বশুরের জোরের কথা বলছি কেন।'

রেখার দিকে চোখ ঘুরিয়ে নন্দ নাকের শব্দ করে হাসল। 'নয়তো ট্যাঁকের জোর থাকতে হবে—কি বলেন রামানন্দবাবু?'

রামানন্দ একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল।

'হুঁ, আপনার এই উৎসবের দিনে জগত মণ্ডল না থাকাতে ভারি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। কথাটা অনেকক্ষণ ধরে বলব বলব করছিলাম।'

'ঐ তো বললাম!' গেলাসটা একেবারে শেষ করে দিয়ে নন্দ ঠক করে সেটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। 'দজ্জাল বউটার জন্য কিছুতেই আর ওর ঘরে মন টিকছে না—তা না হলে মণ্ডল কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে চাইছে, ভাবতেও কেমন লাগে।'

॥ ৩৭ ॥

হাসপাতালে আকাশের চেহারাটা মেঘলা ছিল। এখানে এসে রামানন্দ দেখল মেঘের ভাবটা প্রায় বারো আনা কেটে গেছে, বিশেষ করে পশ্চিম দিকটা। সবে সূর্য অস্ত গেছে, ফলে ওদিক থেকে একটা গোলাপী হলদে আভা বালুর ওপর, গাছের ওপর, অক্ষয়ের টালির ছাদের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সাদা রঙের গরু চরছিল খালের ধারে। গরুটাকেও কেমন গোলাপী হলুদ-হলুদ দেখাচ্ছিল।

তেমনি রামানন্দর হাত, হাতের তেলো, পা, হাঁটতে হাঁটতে সে দেখছিল তার গায়ের চামড়াটা সম্পূর্ণ অন্য রং ধরেছে। পরনের ধুতি শার্ট দুটোই ময়লা, তা না হলে জামা-কাপড়েও এই হলদে গোলাপী আভা বেশ ফুটে উঠত।

সূর্যাস্তের এক একটা বিকেলে, যাকে আমরা গোধূলী বলি, আকাশে এমন আশ্চর্য রং ফুটে ওঠে, অবশ্য একটু মেঘ-টেঘ থাকা চাই, একেই বোধ করি কনে-

দেখা আলো বলে, রামানন্দ চিন্তা করল।

কলকাতায় তো আর এই জিনিস দেখার সুযোগ হয় না, দেখবেই বা কখন, এখন ছ'টা সোওয়া ছ'টা হবে, পাঁচটা বাজতে না বাজতে পট পট রাস্তার আলো জ্বলতে আরম্ভ করে, কিন্তু গাছের আগায়, ছাদের মাথায় রীতিমত রোদ থাকে তখনও। শীতের বিকেলের তো কথাই নেই। কাজেই কনে-দেখা আলো-টালোর বালাই সেখানে নেই।

অক্ষয়ের উঠোনের এপাশে মনসা গাছটার কাছে এসে রামানন্দ থমকে দাঁড়াল। হুঁ, এমন বিকেলে, এই মোহিনী আলো, মোটামুটি একটা সুন্দর ছবিই সে দেখবে আশা করেছিল, কিন্তু সেটা যে এত ভয়ঙ্কর সুন্দর হবে তার ধারণা ছিল না।

গাছটাকে আড়াল করে উঠোনের দিকে চোখ রেখে চোরের মতন রামানন্দ দাঁড়িয়ে রইল। সে যত বেশি মুগ্ধ হচ্ছিল, তত ভয় পাচ্ছিল, তার কপাল ঘামছিল, একবার উত্তেজিত, একবার রোমাঞ্চিত, কখনো তার মনে হচ্ছিল, ক্লান্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ছে সে, এখনি ভেঙে পড়বে।

শফী হলে তবু কথা ছিল। রংটা ময়লা। শরীরটা শুকনো। এই ছোঁড়ার গায়ের রং দুধে-আলতায়, দীপ্ত স্বাস্থ্য—তায় কিনা এখন একেবারে খালি খোলা গা। সবটা শরীর তরোয়ালের মতন ঝকমক করছিল। নাভি থেকে উরুর ওপর ভাগ পর্যন্ত একটুখানি অংশ মাত্র একটা সবুজ নীল ডোরাকাটা হাফ্-প্যান্টে ঢাকা, কাজেই শরীরে মেয়েলী লাবণ্য থাকা সত্ত্বেও সবল ঢেঙা দুটো পা, দুটো বলিষ্ঠ হাত, পুষ্ট ঘাড় গলা ও ঢালের মতন ছড়ানো চওড়া বুকটা নিয়ে মনতাজকে পুরোপুরি জোয়ান পুরুষের মতনই দেখাচ্ছিল। এই জন্যই না সেদিন মেলায় নন্দদুলাল হাসত হাসতে বলেছিল, বাঁশে বাঁশ কঞ্চিতে কঞ্চি—কথাটা রামানন্দ এখন অস্বীকার করতে পারল না। ছোঁড়ার সামনে মাজাঘষা নরম শরীরের মাধুরীকে একটা পুতুলের মতন ঠেকছে। খুব টেনেটুনে খোঁপা বেঁধেছে, চোখের কিনারে পুরু কাজলের প্রলেপ, পায়ে আলতা, আঁটসাট করে পরা একটা হলদে বুটিদার শাড়ি। শাড়িটা আর কোনো দিন দেখেনি রামানন্দ। হয়তো বাক্সে তোলা

সে যাই হোক, দুজনে এ কী খেলা খেলছে! বোঝা যায় মুরগি জবাই করা হয়েছে। জিনিসটা কিন্তু এই বাড়িতে নতুন। আর কোনোদিন অক্ষয়ের বাড়িতে মুরগি কাটা হয়নি বা মুরগির মাংসও রান্না হয়নি। অন্তত রামানন্দ এসে দেখেনি। অক্ষয়ের কত মুরগি! অক্ষয় বলতো, মুরগির মাংস তার ভাল লাগে না। খেতে কেমন ছিবড়ে ছিবড়ে লাগে। আসলে অবশ্য তা নয়। বাড়ির মুরগি বধ করতে তার প্রাণে লাগত। তা না হলে মুরগির মাংস যে তার খুব ভাল না লাগুক, একেবারে অপছন্দের জিনিস তা নয়। অক্ষয়ের অসাক্ষাতে কথাটা কবে জানি মাধুরীর মুখে শুনেছে রামানন্দ।

তা মাধুরীর যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, অক্ষয়ের অনুপস্থিতিতে একটা মুরগি কেটে খাবে, সেটা খুব একটা সাংঘাতিক ব্যাপার নয়, কিন্তু চোখের সামনের এই দৃশ্যটা!

বাঁ হাতে মুরগিটা ধরে রেখেছে মাধুরী। গলা বেয়ে টস টস করে রক্ত ঝরছে, বোঝা যায় এইমাত্র জবাই করা হয়েছে, একেবারে গলা আলাদা করা হয়নি, তাই হবে, কেননা মনতাজের হাতে যখন রক্তমাখা ছোরা রয়েছে। মনতাজ মুরগির গলা আলগা করবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই ছোরা কি অক্ষয়ের ঘরে ছিল? রামানন্দ সঠিক জানে না, কেননা কোনোদিন তার চোখে পড়েনি। হয়তো মাধুরীর বাক্স

পেঁটরায় তোলা ছিল, বা এমনও হতে পারে যে, ছোরাটা মনতাজের আমদানি।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ ভাবল, তা হলে এমনও হতে পারে, মুরগিও এ বাড়ির না, মনতাজই হয়তো রাজাবাজার কি শেয়ালদা থেকে কিনে এনেছে। যেমন কাল দিদির জন্য একটা বোয়াল মাছ নিয়ে এসেছিল। শফীর মতন দিদিকে এটা ওটা এনে খাওয়াবার নেশা মনতাজকেও যে পেয়ে বসবে তাতে আর আশ্চর্য কী। দু'দিনেই দিদির সঙ্গে তার যেমন ভাব জমে গেছে!

তা না হয় মুরগি এনে খাওয়াল, কিন্তু দুটিতে এমন খিলখিল হাসছে কেন। মনতাজ যত হাসছে, মাধুরী তার দ্বিগুণ হাসছে। হাসির ধমকে অক্ষয়ের গিন্নীর ছিপছিপে দেহ থরথর করে কাঁপছে। হাসতে হাসতে বেঁকে যাচ্ছে, নুয়ে পড়ছে, দেখলে মনে হবে সরু কোমরটা মট করে না ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গবে না যদিও। মেয়েদের শরীর বেতের মতন, রবারের মতন। মোহন পালের চায়ের দোকানে না কোথাকার একটা আড্ডায় কে যেন কবে রস করে কথাটা বলেছিল, রামানন্দ সঠিক মনে করতে পারছে না, এবং এটাও সত্য, মনে করতে তেমন একটা গ্রাহ্যও করছিল না সে, কেননা এখানে এই হাসিটা তার মোটেই ভাল লাগছিল না। কি নিয়ে হাসতে পারে, মুরগি জবাই করতে করতে এমন কি ব্যাপার ঘটল যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলে থেকে দুটিতে কেবল হেসেই চলেছে।

ভুরু কুঁচকে থেকে রামানন্দ অনর্গল ঘামছিল। তার ভাবনা ঠিকই হয়েছে। যেন পৃথিবীর সব কিছু ভুলে গিয়ে অক্ষয়ের স্ত্রী হাসছে, সুন্দর চেহারার ছেলেটা হাসছে। দুজনের একজন ভুলেও একবার এদিকে তাকাচ্ছে না। মনসা গাছের গুঁড়িটা খুব এমন মোটা না যে আড়ালে দাঁড়িয়েছে বলে রামানন্দকে একেবারেই দেখা যাবে না, মুখটা দেখা না যেতে পারে, কিন্তু একটু চোখ ফিরিয়ে এদিকে তাকালেই এটা অন্তত বোঝা যাবে, একটা মানুষ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখ ফেরাবে কে! মনতাজ যেমন তার দিদিকে দেখছিল আর হাসছিল তেমনি মাধুরীও কালো চোখের তারা নাচিয়ে নাচিয়ে মনতাজকে দেখে খিল-খিল করে হাসছিল। কেবল উঠোনের এধারের মনসা গাছ কেন, অন্য কোনোদিকেই তাদের চোখ ফেরাবার সময় ছিল না, ইচ্ছে ছিল না।

রামানন্দর ইচ্ছে হল একটু কেশে গলা খাঁকারি দিয়ে দুজনকে জানিয়ে দেয় এখানে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত। মাথার ওপর একটা স্তব্ধ আকাশ নিয়ে ফুটফুটে বিকেলের আলো গায়ে-মুখে মেখে নিরিবিলি মাদার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে উঠন্ত জোয়ান বয়সের একটি ছেলে ও এক যুবতী গিন্নী বেহুঁশ হয়ে যত খুশি হাসতে পারে, কিন্তু হাসির কারণটা মোটেই জানা যাচ্ছে না বলে তৃতীয় ব্যক্তির চোখে জিনিসটা খারাপ ঠেকতে পারে—এটা ওদের বুঝতে দেবার জন্যই যেন রামানন্দর শব্দ করে কাশতে ইচ্ছে হল; প্রায় কেশে উঠেছিল সে, নিজেকে সংযত করল, তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল, চোখ গোল হয়ে গেল। সত্যি তো, এ কী খেলা খেলছে ওরা, মাধুরীর বাঁ হাতে কাটা মুরগিটা ঝুলছে, রক্তমাখা ডান হাতটা সে ফস করে কিনা মনতাজের গালে থুতনিতে বুলিয়ে দিল, মনতাজও কিছু চুপ করে থাকল না, ছুরির গায়ে লেগে থাকা মুরগির খানিকটা তাজা গরম রক্ত হাতের তেলোয় নিয়ে তক্ষুনি মাধুরীর মুখে ভুরুতে কপালে আচ্ছা করে লেপে দিল। দিয়ে হাসতে লাগল। খোঁপা নাচিয়ে কোমর দুলিয়ে মাধুরীও হাসছিল। রক্তমাখা হয়ে সুন্দর দুটো মুখ গোধূলীর সোনালী হলদে আলোয় যে রূপ ধরল দেখে রামানন্দর ভয় করতে লাগল। শফীর সঙ্গেও অক্ষয়ের বউকে অনেক হাসি-ঠাট্টা ইয়ারকি করতে দেখা গেছে, কিন্তু মনতাজের সঙ্গে আজকের রঙ্গরসের যেন কোনো তুলনাই হয় না। অথচ এইমাত্র রামানন্দ হাসপাতাল থেকে

ফিরেছে, কাল শুক্রবার অক্ষয়ের অপারেশন হচ্ছে, কালকের তারিখের আর নড়চড় হয়নি, কাল সকাল সাড়ে নটায় অক্ষয়কে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হবে, সব ঠিকঠাক। অক্ষয়কে আজ আর তেমন হাসিখুশি দেখল না সে, বরং বেশ একটু বিষণ্ণ ক্লান্তই দেখল। অবশ্য নার্স তরলা বোস, নতুন নার্স সোহিনী তালুকদার এবং সোহিনীর আগে দিনের ডিউটিতে যে নার্সটি ছিল, সেই মোটা মেয়ে ফুলরেণু মজুমদারকে নিয়ে রামানন্দর সঙ্গে অন্যদিনের মতন দু-চারটে রসের গল্প যে না করল তা নয়, তা হলেও অক্ষয়কে চিন্তিত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। গল্পটল্প করার পর রামানন্দ উঠে আসবে, অক্ষয় তার হাতটা চেপে ধরল। 'শোনো মাস্টার, তুমি কিন্তু মাধুরীর কাছে জিনিসটা আর গোপন করবে না, আজ এখনি বাড়ি গিয়ে তাকে বলে দেবে কাল আমার অপারেশন হচ্ছে। আমি চিন্তা করে দেখলাম, ওর কাছে এত বড় ব্যাপারটা চেপে রাখা ঠিক না। আর কাল, সকালের দিকে দরকার নেই, আমি তো তখন থিয়েটারেই থাকব, বেড-এ ফিরতে ফিরতে বেলা হবে—বরং বিকালের দিকে ওকে একবার হাসপাতালে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসো।'

বলতে কি, রামানন্দ আর একটা কথাও বলতে পারছিল না। তার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠেছিল। অপারেশনের কথা মাধুরীকে জানাবে কি জানাবে না, এই নিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে এই ক'দিনে অনেক কথাই হয়েছে, কিন্তু আজ যেমন করুণভাবে অক্ষয় তাকে বলল, আর কোনোদিন বলেনি। তা ছাড়া আজই অক্ষয়ের মুখে সে প্রথম শুনলঃ 'তুমি সঙ্গে করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসবে।'

কাজেই সেই মুহূর্তে অক্ষয়ের চোখের দিকে রামানন্দর তাকাতে সাহস হচ্ছিল না, তার যেন মনে হল হাসপাতালে এসে মাধুরীর কথা ভেবে অক্ষয়ের দু' চোখ এই প্রথম ছলছল করছে।

'হুঁ, বলব, তা ছাড়া কাল ওকে সঙ্গে করে নিয়েও আসব।' মুখটা দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রেখে সংক্ষেপে কথা দুটো সেরে রামানন্দ কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তাই তো, সবটা দায়িত্ব রামানন্দ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। কোনো অর্থ হয় না। কান্নাকাটি করুক, মাথার চুল ছিঁড়ুক, উপোস থাকুক—অপারেশনের কথাটা মাধুরীকে বলে রাখাই ভাল, বলা যায় কি—

তার পরের ব্যাপারটা রামানন্দ অবশ্য খুব বেশি একটা ভাবতে চাইল না, তবে রাস্তায় আসতে আসতে সে ঠিক করল, বাড়ি গিয়ে এখনি অক্ষয়ের কথাটা মাধুরীকে জানিয়ে দেবে এবং কালই মাধুরীকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে চলে আসবে।

কিন্তু কাকে বলবে, কোথায় বলবে এসব কথা? মনসা গাছের এ পাশে দাঁড়িয়ে রামানন্দ বোকা হয়ে গেল। এত আনন্দ করছে অক্ষয়ের যুবতী গিন্নী, এই অবস্থায়

তা ছাড়া আর একটা জরুরী কথাও, যাকে বলে জিভের ডগায় নিয়ে রামানন্দ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে সোজা এখানে চলে এসেছে। তার পকেট আজ একেবারে ফাঁকা। ফাঁকা যাচ্ছে অবশ্য ক'দিন ধরেই। এবং এটা সে বেশি অনুভব করে, কেবল অনুভব কেন, রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে বিকেলের দিকে, যত অন্ধকার হতে থাকে অস্বস্তিটা কেমন যেন একটা ভয়ের আকার নিতে শুরু করে। তবে গতকাল এবং পরশু সন্ধ্যেটা তার ভাল কেটেছে, কেবল ভাল কেন, খুব ভাল কেটেছে—ছোটলোক হলেও আলুর আড়তদার ননীমাধব পর্যাপ্ত পরিমাণ তাকে নেশা করিয়ে ছেড়েছে, পয়সার তো অভাব নেই, দুদিনই দু'হাতে খরচ-টরচ

করল। কিন্তু ঐ যে, দোকান থেকে বেরিয়ে কাল একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল—অবশ্য রামানন্দ যদি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আজ হাঁটতে হাঁটতে ওদিকে চলে যেত এবং চোখ কান বুজে বৈঠকখানার দোকানে ঢুকে পড়ত, দেখা হলে ননীমাধব নিশ্চয় তাকে ডাকত, সমাদর করে পাশেও বসাত এবং তক্ষুনি নতুন পাঁইট আনিয়ে নিত। তা ছাড়া ওই দোকানে গেলে ওর সঙ্গে দেখা হতোই, মাঝখানে ক'দিন নাকি ওখানে একদম আসত না আড়তদার, কাল বলছিল, এখন আবার রোজ আসছে, দোকানে বসে কিছুক্ষণ খেয়ে-টেয়ে ইন্দুর কাছে চলে যায়। আর এও সত্য, নেশার ঝোঁকের ঝগড়াঝাটি কেউ মনে রাখে না। সেদিন মেলার মাঠে নন্দর সঙ্গে এত বড় ঝগড়াটা যে হয়ে গেল, কই, কাল তো নন্দ সেসব কিছুই মনে রাখেনি। কী চমৎকার ব্যবহারই না করল। এবং লোকটা যে খাঁটি আর্টিস্ট এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেশ্যা টাইপের মেয়ে হোক আর যাই হোক, রেখাকে তো সে বিয়ে করেছে, আইনত এখন তার স্ত্রী, কিন্তু কাল নন্দ কী কথাটা বলল? রেখার কাছ থেকে ইন্‌স্পিরেশান নিন রামানন্দবাবু, দু'রাত ওর সঙ্গে—মনটা খুব বড় না হলে, ভেতরটা সাংঘাতিক উদার না হলে নিজের বউকে নিয়ে কেউ এমন কথা বলে! আর ঐ যে ছোটলোক আলুর বেপারী—একটা সাধারণ রক্ষিতাকে নিয়ে তো হাবুডুবু খাচ্ছে, একেবারে হাড়কাটার খাতায় নাম লেখানো প্রস, তার ঘরে রামানন্দকে নিয়ে যাবার নামেই বেটার প্রাণ শুকিয়ে গেল—যাক গে, সেটা কিছু কথা না, তার সোহাগের জিনিস গলায় ঝুলিয়ে রাখুক কি পেটে বেঁধে রাখুক, এই নিয়ে কিছু বলার নেই। গলা পর্যন্ত রামনান্দকে খাইয়ে দিয়েছিল এই যথেষ্ট—হুঃ, পকেটে একটা বাসভাড়ার আধুলী ছাড়া আর কিছুই নেই, কাজেই একবার সে ঠিক করেছিল বৈঠকখানার দোকানে ঢুকে আজ আবার আড়ত-দারের পয়সায় খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবে, কিন্তু ওই যে ওখানে রাস্তায় কলা নিয়ে শশা নিয়ে আনাজ নিয়ে বসে থাকে, ননীমাধবের পা-চাটা সব সাকরেদ—লোকগুলির চেহারা মনে হতেই রামানন্দর মনটা খিঁচড়ে গেল। না, ননীমাধবের কাছে আব যাওয়া চলে না, আত্মসম্মান বলে একটা কথা আছে যে। এদিকে নন্দদুলালেরও আজ আর দেখা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সব দিক চিন্তা করে রামানন্দ ঠিক করেছিল মাধুবীর কাছে দুটো টাকা চাইবে। কোনোদিন তো চায়নি, চাইলে হয়তো না বলবে না।

কিন্তু কার কাছে চাইবে, চাওয়ার সময় কোথায়!

অথচ দুটোই জরুরী কথা। অক্ষয়ের অপারেশন এবং তার নিজের মদ খাওয়ার জন্য দুটো টাকা ধার চাওয়া। দুটোর মধ্যে কোন্ কথাটা আগে বলবে রামানন্দ তখন পর্যন্ত অবশ্য ঠিক করে উঠতে পারছিল না—যাই হোক, অবস্থা বুঝে আগে ও পরে যেটা বলার সে ঠিকই বলত, কিন্তু সুন্দর চেহারার ওই ছোঁড়াকে নিয়ে যেমন ফুর্তির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে অক্ষয় সমাদ্দারের ঘরনী!

যেন বেগতিক দেখে রামানন্দ আর একবার গলা খাঁকারি দিতে চেষ্টা করল। মাধুরীর বুকের আঁচলটা টেনে ধরেছে মনতাজ, আঁচল দিয়ে ছোঁড়া তার মুখের রক্তটা মুছে ফেলতে চাইছিল, মাধুরী কিছুতেই কাপড়ে রক্ত মুছতে দেবে না, বরং পাল্টা সে চেষ্টা করছিল লতার মতন শরীরটা ঝুঁকিয়ে বাঁকিয়ে কোনোরকমে গলাটা একটু লম্বা করে দিয়ে মনতাজের পরনের ঐ একরত্তি হাফ-প্যান্টে তার নিজের রক্তমাখা মুখখানা একবার ঘষে দিতে পারে কিনা। বেপরোয়া হয়ে মনতাজও তা হতে দিতে চাইছিল না, ফলে দুটিতে ধ্বস্তাধ্বস্তি। এদিকে দুজনের খিলখিল হাসির বিরাম নেই। সত্যিকার ঝগড়া তো না, সেভাবে কিছু হাতাহাতি মারামারিও না—খেলা, সুতরাং খেলার খাতিরে—

রামানন্দ কেশে উঠবার আগেই মনতাজ হঠাৎ কেন জানি এদিকে চোখ ফেরাল, সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কাজেই মাধুরীর দৃষ্টিও মনসাগাছের দিকে ঘুরে গেল। মুহূর্তের জন্য একটা চমক, স্তব্ধতা, একটা অপ্রস্তুতের ভাব। তারপর সেটা চলে গেল। চমৎকার স্বাভাবিক চেহারা করে মাধুরী এদিকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াল।

'ওখানে অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে মাস্টার?'

'না না, আমি এই তো এলাম।'

'যা, মুখটা ধুয়ে ফেল গে।' মাধুরী মনতাজের দিকে ঘাড় ফেরায়। মনতাজ আর দাঁড়ায় না, ছুটে খালের দিকে চলে গেল। লজ্জায় ছোঁড়া মুখ তুলতে পারছিল না। রামানন্দ বুঝল, মাধুরীর মতন চট করে স্বাভাবিক হতে আরও ক'বছর লাগবে ছেলের।

'কি হল, হাসপাতালে গিয়েছিলে?'

'হুঁ, এই তো হাসপাতাল থেকে ফিরলাম।' এক-পা দু-পা করে রামানন্দ মাধুরীর কাছে সরে গেল।

'দাঁড়াও, এটা রেখে মুখ হাতটা ধুয়ে আসছি।' মুরগি নিয়ে মাধুরী ঘরে গিয়ে ঢুকল। বালতির শব্দ জলের শব্দ রামানন্দর কানে এল। বোঝা গেল মুখের রক্ত ধুয়ে ফেলছে অক্ষয়ের স্ত্রী।

বাইরে দাঁড়িয়ে রামানন্দ ভাবনায় পড়ল, আগে মদের টাকাটা চাইবে, না কি অক্ষয়ের অপারেশনের কথাটা বলবে।

খালের জলে মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে মনতাজ ফিরে এল। মাধুরীও তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। গায়ের আঁচলটা ঠিক করে নিয়েছে, চিরুনি বুলিয়ে চুলটা ঠিক করেছে, ধ্বস্তাধ্বস্তির দরুন তার চুল শাড়ি কোনোটাই ঠিক ছিল না।

'যা, মুরগিটা চট করে ছুলে নে।' মনতাজকে, বোঝা গেল তখনও ছোঁড়ার লজ্জা কাটছিল না, সহজভাবে মাস্টারের দিকে তাকাতে পারছিল না বলে কৌশল করে একটা কাজের অছিলা দেখিয়ে মাধুরী অন্যত্র সরিয়ে দিল। 'তারপর কি খবর হাসপাতালের শুনি?' রামানন্দর দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'হুঁ, এই তো এলাম।' রামানন্দ ঢোক গিলল। মাধুরীর মতন রামানন্দ কিন্তু এত দ্রুত সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছিল না। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরের উঠোনটা দেখল, গাছের মাথাগুলো একবার দেখল। রোদটোদ মুছে গিয়ে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

'সে ভাল আছে?' রামানন্দ প্রশ্ন করল।

'হুঁ', রামানন্দ এদিকে চোখ ফেরাল। 'এমনি অক্ষয় ভালই আছে—কাল তার অপারেশন।'

'ও!' অস্ফুট একটা শব্দ করল মাধুরী, তারপর চুপ করে অন্ধকার আকাশটা দেখল। 'যাক গে, যদি অপারেশন করে অসুখটা সেরে যায় ভালই হবে।' একটু পরে রামানন্দর মুখের দিকে চোখ নামিয়ে মাধুরী যেন সামান্য হাসল। ফ্যাল-ফ্যাল করে রামানন্দ যুবতীর মুখটা দেখল। এই মাধুরীকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে কি! অক্ষয়ের অপারেশন হবে কি হবে না তখনও কিছু ঠিক ছিল না, কিন্তু একদিন কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন চেহারা হয়েছিল মেয়ের?

যাক গে, অবাক যেমন হল তেমনি মনে মনে একটু নিশ্চিন্তও হল রামানন্দ। তা হলে অক্ষয়ের স্ত্রী কান্নাকাটি করবে না। মুখ ভার করে থেকে তিনদিন উপোসও থাকবে না। এটা কম কথা কি।

'কাল তোমাকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

'না বাপু, ওটি হবে না। হাসপাতাল ভীষণ ঘেন্না করে আমার। শুনেছি কেবল বিচ্ছিরি ওষুধবিষুধের গন্ধ আর রাজ্যের রুগীর হাউমাউ চিৎকার ওখানে। রোজ তুমি যাচ্ছ, কালও তুমিই যাবে।'

ব্যস, এর পর আর কথা চলে না। অক্ষয় তোমাকে দেখতে চাইছে কথাটা বলতে রামানন্দর মুখে আটকে গেল। চুপ থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে অবার সে বাইরের অন্ধকার দেখল। আকাশে তারা ফুটেছে।

'দেখি, ওদিকে আবার রান্নাবান্না সব পড়ে আছে।' যেন এবার মাধুরী নিজের মনে কথা বলল। 'কত বড় একটা মুরগি নিয়ে এসেছে ছোঁড়া। দিদিকে মুরগির মাংস খাওয়াবে। আচ্ছা করে বকুনি লাগিয়েছি। রাত করে এসব মাংসটাংস সেদ্ধ করা আমার ভাল লাগে না।'

আবছা অন্ধকারেও রামানন্দ দেখল, মাধুরী তার সুন্দর মুখটা কেমন বিকৃত করে ফেলেছে।

'তুমি তো আবার বেরোচ্ছ মাস্টার, তাই না?'

'হুঁ', রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'একটু বেরোবার ইচ্ছে আছে।'

'যাও, গলা পর্যন্ত ঢেলে এসো গে।' শরীরে একটা ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে মাধুরী ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। 'তুমিই সুখী, এই সংসারে তোমার মতন নিশ্চিন্দি পুরুষ ক'টা আছে!'

গলার স্বরে বিশ্রী ঝাঁজ ছিল অক্ষয়ের স্ত্রীর, তা হলেও কেমন যেন বেহায়ার মতন রামানন্দ বলল, 'শোনো একটা কথা আছে।'

'কী?' মাধুরী ঘাড় ফেরাল।

'আমাকে দুটো টাকা দেবে।'

'মদ খাবার জন্যে তো!' আর একটা মোচড় দিয়ে মাধুরী ঘুরে দাঁড়াল।

একটু থমকে গেল রামানন্দ, তারপরে অল্প শব্দ করে হাসল। 'ধার চাইছি, পরে ফিরিয়ে দেবো।' অনুনয়ের গলায় বলল সে।

'কোথা থেকে তুমি ফিরিয়ে দেবে শুনি? যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল অক্ষয়ের স্ত্রী। এক লাফে তার গলার স্বর এতটা চড়ে যাবে রামানন্দর ধারণা ছিল না। 'টাকা ধার করে শোধ করার ক্ষমতা আছে তোমার যে, আমার কাছে ধার চাইছ? চাল নেই, চুলো নেই, চাকরি নেই, এই অবস্থায় আর একটা মেয়েছেলের কাছে মদ খাবার জন্য হাত পাতছ—তোমার লজ্জা ঘেন্না বলে কি কিছুই নেই!'

রামানন্দ অধোবদন হয়ে রইল। তার দু' কান গরম হয়ে গেছে।

'শোনো মাস্টার, অনেকদিন ভেবেছি কথাটা তোমাকে বলব বলব। আর একটা মানুষ আজ কতদিন হাসপাতালে পড়ে আছে, তার জন্য জলের মতন টাকা খরচ হচ্ছে—এদিকে একটা বাড়তি মুখ হয়ে তুমি এখানে জুটেছ, আমার কিছু রাজার সংসার না যে চিরকাল তোমাকে এভাবে বসে বসে খাওয়াতে পারব—বন্ধুবান্ধব নিয়ে তুমি মদ খাচ্ছ ফুর্তি করছ—তোমার এসব ভাবনা নেই, নিজের জন্যই ভাবনা নেই তো আর একটা সংসারের অভাব অসুবিধের কথা ভাববে কি—কিন্তু আমার মনে হয় তোমার এখন এখান থেকে সরে পড়াই ভাল।'

'যাব যাব, আর আমি এখানে বেশিদিন নেই।' যেন লজ্জা ঢাকতে, আগুনের হলকার মতন অপমানটা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে রামানন্দ একরকম করে হাসল। 'কাল অক্ষয়ের অপারেশনটা হয়ে যাক, ভালয় ভালয় সে বাড়ি ফিরুক, তারপর আমি চলে যাব—দু' টাকা না পার, অন্তত দেড়টা টাকা আজ দাও—ওতেই আমার

হয়ে যাবে, বাসে-টাসে আর যাওয়া হবে না, হে'টেই খালপোলের দোকানে চলে যাব, হে'টে বাড়ি ফিরব।'

'ইস, কী নির্লজ্জ তুমি, একটা পুরুষ এমন হয় আমার জানা ছিল না।' গজগজ করতে করতে মাধুরী ঘরে ঢুকল, এক মিনিট পর একটা দু' টাকার নোট এনে রামানন্দর পায়ের কাছে ছুংড়ে দিয়ে তখনি আবার ঘরে ফিরে গেল।

যেন তার চোখে মুখে কেউ নাইট্রিক অ্যাসিড ছুংড়ে দিয়েছে, চোখমুখ জ্বালা করছিল, আর এই জ্বালা ভুলতেই চেহারাটা বিকৃত করে রামানন্দ ফ্যা-ফ্যা করে হাসল। ঘরের পৈঠা ছেড়ে সে অন্ধকার উঠোনে নামল; তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে মনসাতলা পার হয়ে লবণহ্রদের বালুর ওপর দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। সাড়ে আটটায় মদের দোকান বন্ধ হয়ে যায়।

॥ ৩৮ ॥

সেই চোঙা প্যাণ্ট আঁটসাঁট জামা গায়ে, মস্তানের মতন চেহারা, তা হোক, আজকাল সব ছোঁড়ারই এমন পোশাক, চুল চেহারার এই ছিরি।

কিন্তু জায়গাটার নাম শুনেই রামানন্দর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কটমট করে ছেলে দুটিকে সে আর একবার দেখল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আবছা অন্ধকারে চোখের ভাষা, মুখের রঙ খুব একটা ভাল বোঝা যাচ্ছিল না; তা হলেও দুটিরই কথাবার্তার মধ্যে একটা বিনয়, দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মধ্যে খানিকটা নম্রতা শিষ্টতা ছিল—এটা অবশ্য রামানন্দর চোখে পড়ল।

কিন্তু তা বলে গলার স্বরটা সে একটুও সুন্দর করল না, রুক্ষ তিক্ত চেহারা করে কেমন যেন হই-হই করে কথা বলল।

'তা পাইকপাড়া তো বিখ্যাত জায়গা, খুব সম্মান পেয়ে এসেছি সেখান থেকে, আবার আমার কাছে কেন?'

ঘড় নিচু করে রেখে ছেলে দুটি চুপ করে থাকল। দুজনের হাতে দুটো বাণ্ডিল। যেন কাগজ দিয়ে মুড়ে কিছু এনেছে।

'ওগুলোর মধ্যে কি, বোমা পিস্তল?' খরখরে গলায় রামানন্দ বলল, 'আবার একটা ফাংশন-টাংশন জোড়া হয়েছে নাকি, এবারও চীফ-গেস্ট, না কি রামানন্দ সেনকে প্রেসিডেণ্ট করে নিয়ে যাবার জন্য ছুটে আসা হয়েছে, মতলবটা কি শুনি?'

'স্যার, আমরা এমনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'এমনি? খামকা? সন্দেহটা যে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছ হে।' বিকৃত স্বর করে রামানন্দ হাসল। 'পাইকপাড়ার ছেলেদের মধ্যে এত সততা এত মহত্ত্ব কবে থেকে জাগল?'

'আমরা আপনাকে ভালবাসি স্যার।' দুজন একসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল।

'আবার ভালবাসা, আবার প্রেম!' রামানন্দ চোখ তুলে দেখল পুব দিকে একটা হলুদ-পোড়া মাথাভাঙা চাঁদ উঁকি দিয়েছে। আকাশে যে দু'-চারটে তারা জ্বলছিল এবার দেখতে দেখতে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। রামানন্দ চোখ নামাল। 'দারুণ ভালবেসেছিলেন তোমাদের পাইকপাড়ার ক্লাবের হেনা দেবী, হুঁ, হেনা সেন, নিশ্চয় চেনো, আমাকে ভালবেসে নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন, আশা করি সে খবরও তোমাদের অজানা নেই।'

'আমরা সবই জানি স্যার।' একটি ছেলে কেমন যেন বেদনার্দ্র গলায় বলল, 'আমরা আর ওই ক্লাবে নেই, সোনালী বাসর ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'যে ক্লাব, যে সমিতি কবি রামানন্দ সেনকে অশ্রদ্ধা করে অপমান করে, সেই সমিতির সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্রব নেই।' দৃপ্ত গলায় আর একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, 'আপনি শুনলে সুখী হবেন, ফাংশনের পরদিনই আমরা ছ'জন সভ্যসভ্যা সোনালী বাসর থেকে বেরিয়ে আসি, আমাদের দেখাদেখি কাল আরও তিনজন বাসরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।'

'মানে আমাকে মারধোর করেছিল অপমান করেছিল তার প্রতিবাদস্বরূপ?' অন্ধকার মাঠে রামানন্দর গলা গমগম করে উঠল।

'নিশ্চয়,' দ্বিতীয় ছেলেটির গলা আর একটু চড়ে গেল। 'সংস্কৃতি কাকে বলে, প্রগতি শব্দের অর্থ কী যারা জানে না, একজন বিদগ্ধ মননশীল আধুনিক কবিকে যে তারা অসম্মান করবে, অপমান—এমন কি দরকার হলে পীড়ন পর্যন্ত করবে এ তো জানা কথা। চিরকালই এমন হয়ে এসেছে। রামানন্দ সেনের কবিতা বুঝবার মগজ তাদের কোনোদিনই হবে না।'

'কবিতা বলতে তারা জানে—জল পড়ে পাতা নড়ে, কবিতা বলতে তারা জানে—পাখি সব করে রব—' তেমনি গাঢ় বেদনার্দ্র গলায় প্রথম ছেলেটি বলল, 'কিছু মাথামোটা হুজুগে ছেলেমেয়ে নিয়ে ওই ক্লাব—ঘটা করে নাম দেওয়া হয়েছে সোনালী বাসর, আসলে রক্ষণশীল সেকেলে বুড়োর দল পেছন থেকে ওই ক্লাবটা চালাচ্ছে, সেদিনের ঘটনার পর আমরা ভাল করে বুঝলাম, ওই ক্লাব, ওই সমিতি পাইকপাড়ার কলঙ্ক, যে জন্য আমরা ক'জন ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম—'

'বেশ বেশ, ভাল কথা—' রামানন্দ আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না, অবশ্য সেটা প্রকাশ করল না, ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোমাদের হেনাদিটির খবর কি? তিনিও কি সোনালী বাসর ছেড়ে দিয়েছেন?'

'না,' চড়া গলার স্বর একটু নামিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'ইচ্ছে থাকলেও কলেজের চাকরির কথা ভেবে তিনি ক্লাব ছাড়বেন না, পাইকপাড়ার বুড়োর দল অসন্তুষ্ট হলে ওঁর পক্ষে অসুবিধা আছে।'

'মুশকিল, ভারি মুশকিল', রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'অথচ মহিলা আমাকে খুব ভালবাসেন, দেখলাম আমার কবিতা-টবিতা মুখস্থ।'

'আমরাও আপনার প্রত্যেকটা কবিতা মুখস্ত করেছি'—এবার আর বেদনা না, থমথম আবেগের স্বরে প্রথম ছেলেটি আবৃত্তি করে উঠলঃ

ভালবাসার গোলাপ-রাঙা দিনে
এক পশলা মেঘের কান্না কেঁদে নিও—

'থাক থাক,' রামানন্দ ব্যস্ত হয়ে একটা হাত শূন্যে তুলে ধরল। 'হেনা সেনের মতো আমার সব কবিতা তোমাদের কণ্ঠস্থ, আমি বুঝতে পেরেছি, বেশ বেশ, আর একদিন এসো দুটিতে, কথাটথা বলা যাবে, এখন আমি—' চট করে দূরের হলদে ভাঙা চাঁদটাকে একবার দেখে নিয়ে রামানন্দ দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে চোখ রাখল। 'এখন ক'টা বাজে হে, তোমাদের ঘড়িটড়ি আছে?'

'ঘড়ি নেই স্যার, তবে এখন সাতটা-সোওয়া সাতটার বেশি হবে না।'

'উঁহু,' প্রথম ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'পৌনে আটটা হবে।'

'অ্যাঁ!' রামানন্দর সবটা শরীর নেচে উঠল, তার মানে অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠল সে, অধৈর্য হয়ে উঠল। 'দ্যাখো দিকিনি—তোমাদের সঙ্গে আগড়-বাগড় বকতে গিয়ে যাচ্ছেতাই দেরি হয়ে গেল—নাও, এবার রাস্তা ছাড়, আমাকে যেতে দাও—'

'আপনি কি কলকাতা যাচ্ছেন স্যার?'

'না, কলকাতা যাব কোন্ দুঃখে,' দুজনকে হাত দিয়ে একরকম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রামানন্দ সামনের দিকে পা বাড়াল। 'আমাকে যেতে হবে এখন বেলেঘাটা খালপোলের ধারের মদের দোকানে—শালারা এপ্রিল মাস থেকে সাড়ে আটটায় দোকান বন্ধ করতে আরম্ভ করেছে।'

ছেলে দুটি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর একজন রামানন্দর দিকে তাকাল। 'আজ ওই দোকানে না-ই বা গেলেন স্যার।'

'বাঃ, না-ই বা গেলেন স্যার!' রামানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকোল, হাত নাড়ল। 'যেন তোমার খুশি মতন আমি মদ খেতে যাব আর যাব না—'

'আমরা আপনার জন্য সামান্য কিছু প্রেজেন্টেশন এনেছি স্যার।'

'আরে রেখে দাও তোমাদের প্রেজেন্টেশন, কি এনেছ আমার জন্য শুনি?' রামানন্দ ধমক লাগাল। 'বেশ তো, এনেছ, দাও—' রামানন্দ হাত বাড়াল। 'ওই নিয়েই এখন খালপোলের দোকানে ছুটতে হবে। বেটারা কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় দরজা বন্ধ করছে, দাও, দেখি কি উপহার।'

কথা না বলে প্রথম ছেলেটি তার হাতের বাণ্ডিলটা রামানন্দর হাতে তুলে দিল।

'অ্যাঁ, বই-টই আছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ স্যার, দুখানা ইংরেজী বই, আর একটা ভাল পেনও এনেছি আপনার জন্যে, এক সঙ্গেই বেঁধে এনেছি।'

'কি বই, কবিতার বই নয় তো?' স্বরটা বিকৃত করে ফেলল রামানন্দ।

ছেলেটি হাসল।

'না স্যার, ক্রাইম নভেল, কবিতার বই দেবো আপনাকে কোন্ দুঃখে—! কবি রামানন্দ সেনকে আর কারো লেখা কবিতা, এ-দেশের কি ও-দেশের, উপহার দেবার সাহস আমার নেই।'

'গুড্, কবিতা আমি লিখিও না, কারো কবিতা এখন আর পড়িও না—কবিতার বই এনেছ শুনলে প্যাকেটটা বালুর ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিতাম। বরং ক্রাইম নভেল এনে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ—দাও, তোমারটা দাও—' রামানন্দ দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে হাত বাড়াতে ছেলেটি কাগজে মোড়া একটা বড়সড় প্যাকেট রামানন্দর হাতে তুলে দিল।

'কি আছে এতে, অ্যাঁ!' রামানন্দ চমকে উঠল। প্যাকেটটা হাতে নিয়েই বুঝল, বোতল-টোতল কিছু। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের কাগজটা এক টানে ছিঁড়ে ফেলল।

'একটা হুইস্কি এনেছি আপনার জন্য।' ছেলেটি বিড়বিড় করে বলল।

'আরে, তাই তো দেখছি, তাই তো দেখছি!' ফিকে জ্যোৎস্নায় বোতলের মুখের রাংতাটা চিকচিক করছিল। রামানন্দ খুশিতে গদ্‌গদ হয়ে উঠল। 'অ্যাঁ, আসল কথা বলছ না, এতক্ষণ কেবল শিবের গীত গাওয়া হচ্ছিল।' বোতলটা আকাশের দিকে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল সে। 'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল! আজ আর খালপোলের দোকানে যায় কে, খুব ভাল কাজ করেছ হে, হুঁ, উপহারের মতন উপহার বটে। এসো, আমার ঘরে এসো, বসে গল্পটল্প করা যাবে—কর্ক খোলার প্যাঁচ-ট্যাঁচ সবই আমার আছে।' রামানন্দ সমাদর করে ভক্ত দুটিকে ডাকল। তারা খুশি হল।

দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে লম্বা পা ফেলে সে বাড়ির দিকে চলল।

হলুদপোড়া রঙটা কেটে গিয়ে চাঁদটা ক্রমে রুপো রুপো হয়ে উঠছিল। ফলে

জ্যোৎস্নাটাও খুলেছিল ভাল। প্রথম ছেলেটি ভাবালু গলায় আবার আবৃত্তি করে উঠল :

'ভালবাসার গোলাপ-রাঙা দিনে
এক পশলা মেঘের কান্না কেঁদে নিও—
মিলনের চরম ক্ষণে এক খাবলা
অভিমানও মন্দ হয় না।'

'কেন এই হাবিজাবি জিনিসগুলো উগরাচ্ছ!' রুষ্ট গলায় রামানন্দ ধমক লাগাল। 'এমন চমৎকার মাঠে চাঁদের আলোয় অন্য কথা অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা কর।'

ছেলেটি হাসল।

'এগুলো যদিও আপনার আগের দিকের রচনা, তাহলেও আমাদের ভাল লাগে।'

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'আপনার এ-দিকের এক-একটা কবিতার কোনো তুলনা হয় না, অসাধারণ কম্পোজিশন, সাধারণ পাঠক অবশ্য এক বর্ণও বোঝে না—এসব কবিতায় দাঁত ফোটানো সত্যি তাদের কর্ম নয়—তাদের কাছে কবিতা একটা এণ্টারটেনমেণ্টের মতন কিছু—মানে পড়ে যা ভাল লাগবে।'

'এই, তুমি আবার বকবক শুরু করলে।' রামানন্দ এই ছেলেটির দিকে ঘাড় ফেরায়। 'চুপ কর দিকিনি।'

ছেলেটি চুপ করল না। রামানন্দর সঙ্গে হাঁটছিল এবং অনেকটা যেন নিজের মনে বকে যাচ্ছিল : 'শিল্পী তার বিচিত্র বোধ ও বেদনাকে কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চায়, এখানে ভাল লাগা মন্দ লাগার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কবিতা হল কবির আত্মবিশ্লেষণের শাণিত অস্ত্র—অবশ্য সবাই কিছু কবি নয়—'

'চুপ কর চুপ কর, আমরা এসে গেছি।' দু'জনকে নিয়ে রামানন্দ একটা চমৎকার তকতকে ঝকঝকে উঠোনে ঢুকল। দেখে ছেলে দুটির ভাল লাগল। কিছু গাছগাছালি নিয়ে ছবির মতন টালির ঘর। নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ।

'মনতাজ!' রামানন্দ চেঁচিয়ে ডাকল। কেননা সে দেখছিল তার ঘর অন্ধকার, দরজাটা হা-খোলা হয়ে আছে।

অবশ্য মাধুরীর শোবার ঘরটাও অন্ধকার। তবে দোরটা ভেজানো। কেবল রান্নাঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। তাই বলো, এখন তো রান্নাবান্নার সময়, হুঁ, আজ মুরগি রান্না হচ্ছে—কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাংসের গন্ধ সে টের পেল, বেশ মিষ্টি মতন একটা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। দুটিতে তবে এখন ওখানেই বসে আছে। শফীও দিদির রান্নার সময় উনুনের পাশে বসে গল্প করত। 'মাধুরী!' চড়া গলায় রামানন্দ ডাকল।

কিন্তু মাধুরী বেরোল না, একটা কেরোসিনের ডিবি নিয়ে মনতাজ ছোঁড়াই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। রামানন্দ ছোঁ মেরে হাত থেকে বাতিটা তুলে নিল। 'যাঃ, আবার গিয়ে দিদির সাথে বসে রসের গল্প কর।' বড় করে সে একটা ভেংচি কাটল। ঘাড় নিচু করে মনতাজ রান্নাঘরের দিকে ফিরে গেল। রামানন্দ ঘাড় ফিরিয়ে ছেলে দুটিকে ডাকল, 'এসো, তোমরা ঘরে এসো।'

রামানন্দর সঙ্গে তারা ছোট ঘরটায় ঢুকে পড়ল। আলোটা নামিয়ে রেখে রামানন্দ বইয়ের প্যাকেট এবং বোতলটা এক পাশে রাখল, তারপর তার ছেঁড়া মতন মাদুরটা মেঝেয় বিছিয়ে দিল। 'বসো, বসে পড়।' একমুখ হাসি নিয়ে এবার সে ভক্তদের দিকে তাকাল। 'এই হল আমার আস্তানা, এখানেই ওঠা-বসা বিশ্রাম করা ঘুমোনো মদ খাওয়া বমি করা, বাকি সময়টুকু বাইরের দিকে চোখ রেখে গাছগাছালি শালিক বুলবুলি আকাশ রোদ মেঘ লবণহ্রদের বালু—এইসব দেখা।'

'বুঝতে পেরেছি।' প্রথম ছেলেটি বিজ্ঞের মতো হাসল। 'কলকাতা আপনার ভাল লাগছিল না, শহরের আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠছিলেন।'

'হুঁ, তা কতকটা সত্য।' গায়ের জামাটা রামানন্দ একটানে খুলে ফেলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখল।

ছেলে দুটি জুতো ছেড়ে মাদুরের ওপর পা গুটিয়ে বসল। তারা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখল।

'এটা অবিশ্যি আপনার কয়েকটা কবিতার মধ্যেই পরিষ্কার ধরা পড়েছে—' ভাব-গদ্‌গদ গলায় দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'স্যার, সভ্যতা আপনাকে পীড়া দেয়, অবক্ষয়ী সভ্যতা—চোখ মেললেই আজ কলকাতা শহরের সর্বত্র যা চোখে পড়ছে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হিংসা-হতাশা বিষণ্ণতায় কলুষিত এই শতাব্দী মানুষকে, মানুষের সভ্যতাকে জীর্ণ করে দিচ্ছে—কোনো কবি কোনো শিল্পীই এই অন্ধকার, এই অবক্ষয় মেনে নিতে পারে না, যদিও এককালে ধরে নেওয়া হতো শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে রিয়ালিজম ও ন্যাশনালিজম একসূত্রে বাঁধা আছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানভাবনা যুক্ত হয়ে—'

'উফ্, এ যে কলেজী লেকচার শুরু করে দিলে।' ভাঙা ফাইবারের সুটকেসটা হাতড়ে রামানন্দ ততক্ষণে বোতলের ছিপি খোলার প্যাঁচ ও কাচের গেলাস বের করে নিয়ে দুজনের মাঝখানে মাদুরের ওপর এসে চেপে বসল। 'শিল্প সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে কলেজে পড়াও নাকি হে ছোকরা?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে ছেলেটি মাথা নাড়ল। 'না স্যার, আমি সায়ান্স কলেজে রিসার্চ করছি!'

'তুমি!' রামানন্দ অন্য ছেলেটির চোখে চোখ রাখল।

'আমি অল্প ক'দিন হল একটা ব্যাঙ্কে ঢুকেছি স্যার—'

'বাঃ', চমৎকার। খুব ভাল লাইন বেছে নিয়েছ দু'জনেই।' প্যাঁচ ও বোতলটা প্রথম ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে দিল রামানন্দ। 'খোল, হুঁ, খুব ভাল লাইন—তবে আর এসব শিল্প-সাহিত্য কাব্যভাবনা নিয়ে এত মাথা কোটাকুটি কেন তোমাদের?'

ছেলে দু'টি একসঙ্গে হেসে ফেলল।

'বিজ্ঞানের ছাত্র, ব্যাঙ্কের চাকুরে, তা হলেও কবিতা আমাদের ভাল লাগে, বিশেষ করে রামানন্দ সেনের কবিতার আমরা দারুণ ভক্ত।'

'নাও, নাও, এবার ঢেলে ফেল।' ছিপি খোলা হয়ে গেছে। রামানন্দ কাচের গেলাসটা বাড়িয়ে দিল। 'সোডা-ফোডা নেই, আমার অবশ্য র-ই চলে, তোমরা একটু একটু জল মিশিয়ে খাও—ওই যে কুঁজোয় জল রয়েছে।' আঙুল দিয়ে সে কোণার দিকে দাঁড় করানো মাথাভাঙা মাটির কুঁজোটা দেখাল। 'কুজোর মুখের অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটায় করে জল গড়িয়ে নিলেই হবে— আচ্ছা। দাঁড়াও, ওটা বরং এখানেই নিয়ে আসা যাক।'

'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন স্যার, আপনি খান, আমরা খাব না।'

'ধেৎ, তা কি হয়—', রামানন্দ উঠে গিয়ে কুঁজোটা তুলে নিয়ে এল।

'আমরা ড্রিঙ্ক করি না স্যার।'

'কর না—একদিন করলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হবে না—বেশ তো, আমার প্রসাদ খাবে—আমার ঠাকুর্দা বাবা কাকা কোনোদিনই মদ খেতেন না, কিন্তু কালী-পুজোর রাত্রে প্রসাদী কারণ, অবশ্য সেটা দেশী মদই, সকলকেই একটু খেতে হতো।'

'আচ্ছা তাই হবে—আপনি খেয়ে প্রসাদ করে দিন—' প্রথম ছেলেটি এক সঙ্গে অর্ধেক গেলাস হুইস্কি ঢেলে রামানন্দর হাতে তুলে দিল। রামানন্দ সবটা একবারে

গলায় ঢালল। মুখটা বিকৃত করল। 'সিগারেট আছে?'

'আছে বইকি', দ্বিতীয় ছেলেটি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও একটা সুদৃশ্য লাইটার বের করে রামানন্দর হাতে তুলে দিল। রামানন্দ সিগারেট ধরাল। দেখতে দেখতে তার চোখ লাল হয়ে উঠল, মুখে একটা প্রশান্তির ভাব দেখা দিল।

'খাও, এইবেলা তোমরা খাও।' রামানন্দর কথা মতন কুঁজোর জল মিশিয়ে দুজনেই খানিকটা করে হুইস্কি খেয়ে নিল। তারাও সিগারেট ধরাল।

'দেখি কি বই আনলে।' বইয়ের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলল রামানন্দ। 'কিস্ ইন মুনলাইট—মানে চাঁদের আলোয় চুম্বন? চমৎকার নাম বইয়ের, আর এটা? সার্পেণ্ট ইন দি বেড। শয্যায় সর্পিণী না কি সর্পিণী শয্যাসঙ্গিনী?' রামানন্দ হো-হো করে হাসল। 'অদ্ভুত নাম ক্লাইম বইয়ের। বেশ, দুখানা বই-ই পড়ে ফেলব।'

'কলমটা দেখুন স্যার, একটা ভাল কলম এনেছি আপনার জন্য।'

'দেখছি।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। বইয়ের মোড়কের ভিতর একটা দামী ফাউণ্টেন পেন রয়েছে, কিন্তু এটা সম্পর্কে তার তত যেন উৎসাহ ছিল না। 'নাও ঢেলে ফেল, আর এক রাউণ্ড হোক।' বোতলের দিকে চোখ রাখল সে।

এবার দ্বিতীয় ছেলেটি অনেকটা মদ কাঁচের গেলাসে ঢেলে রামানন্দর হাতে তুলে দিল, এক-চুমুকে রামানন্দ শেষ করল। 'তোমরা খাও, তোমরা খাও।' রামানন্দ আর একবার মুখ বেঁকাল।

'আমরা আর খাব না স্যার।'

'আলবাৎ খাবে।' রামানন্দ ধমক লাগাল। 'একট বোতল নিয়ে এয়েছ, ইয়ার্কি! এক ফোঁটা সোডাজল আননি।' তার লাল চোখ গোল হয়ে উঠল। 'সবটা আমায় গিলিয়ে মাতাল করে দিয়ে চলে যাবে, উঁহু, সেটি হবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা আর একটু নিচ্ছি।' দুজনে খানিকটা খানিকটা করে গেলাসে ঢেলে নিয়ে গলায় ঢালল। এবার তারা নির্জলা হুইস্কি খেল।

'দাও, এখন আমার কাছে দাও।' বলতে বলতে রামানন্দ ছোঁ মেরে বোতলটা নিজের কাছে নিয়ে গেল। গেলাসটা টেনে নিল। তারপর গপগপ করে প্রায় সবটাই ঢেলে ফেলল।

'আমরা কিন্তু আর একটু করে প্রসাদ চাই স্যার।' দুটি ছেলের চোখই তখন চমৎকার লাল।

'নেবে নেবে, আমার সেবাটা তো পুরোপুরি হোক।' রামানন্দ তাদের মুখের দিকে তাকাল না।

'না স্যার, আপনি খান।' বিনয়ে গদ্‌গদ হয়ে দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'আপনার ফুল্ স্যাটিসফ্যাকশন হয়ে গিয়ে তারপর যদি এক-আধটু তলায় লেগে থাকে—'

'সে দেখা যাবে, সিগারেট দাও।'

'মনে হয় বাড়িতে মেয়েছেলে আছে।' প্রথম ছেলেটি বিড়বিড় করে উঠল। রামানন্দ শুনল। ঢুলুঢুলু চোখ করে সিগারেট ধরাচ্ছিল, কথাটা শুনেই সে চোখ দুটো আবার গোল করে ফেলল।

'আছে বইকি। গেরস্থবাড়ি, মেয়েছেলে থাকবে না!'

'খেঁকখেঁক করছে, তবু গলাটা ভারি মিষ্টি।'

'হুঁ মিষ্টি!' এক নম্বর ছেলেটির দিকে চোখ তুলে রামানন্দ ভেংচি কাটল। 'ওদিকে এত কান দেবার দরকারটা কি শুনি?'

'না, ওদিকে আমরা কান দেবো না।' যেন কানমলা খাওয়ার ভঙ্গিতে দু' নম্বর ছেলেটি বিনয়ে ঘাড় কাত করল।

রান্নাঘরে মাধুরী সত্যি খুব চেঁচাচ্ছিল। 'এই মাস্তর পায়ে ধরে দুটো টাকা চেয়ে নিয়ে গেল'। এখনি আবার কোথা থেকে দুই সাকরেদ জুটিয়ে বাড়িতে মদের আসর জমিয়েছে। সে আসুক, বুঝলি মনতাজ, অপারেশন করিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরুক, আমি সব কথা বলব, বলে কিনা বন্ধু, কোথাকার হাড়-হাভাতে বাউন্ডুলে, মেরে না তাড়ালে এখান থেকে কিছুতেই নড়বে না...'

'আজ যেন তুমি একটু বেশি চটে গেছ মাধুরী। আমাকে মেরে তাড়াবার কথা তোমার মুখে এই প্রথম শুনছি।' রামানন্দ মনে মনে বলল, 'তোমার ধারের দু' টাকা কাল সকালেই আমি ফিরিয়ে দেবো। টাকাটা আমি খরচ করিনি, খরচ করতে হয়নি।'

'মুরগির মাংস রান্না হচ্ছে যেন স্যার!' এক নম্বর হঠাৎ বাতাসে গন্ধ শোঁকার মতন নাকের চেহারা করল। 'ভারি মিষ্টি গন্ধ।'

'আচ্ছা মানুষ তো! মুরগি রান্না হোক বা হাঁস রান্না হোক, তাতে তোমার কি, তুমি ওদিকে এত মন দিচ্ছ কেন আমায় বলতে পার?' রামানন্দ দাঁত খিঁচলো। 'আমি আবার বলছি, তোমার ফ্রেন্ডকে সাবধান করে দাও হে।' রামানন্দ দু'নম্বরের দিকে ঘাড় ফেরাল।

'না স্যার, ওদিকে আমরা মন দেবো না। ওদিকে আমাদের মন দেবার কান দেবার কিছু দরকারই পড়ে না।—অসিত!' বন্ধুকে সাবধান করে দিতে দু' নম্বর এক নম্বরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের ইশারা করল।

'মিষ্টি গন্ধ, তাই বলছিলাম।' এক নম্বর আস্তে বলল, 'মাংসের এমন চমৎকার ঘ্রাণ আমি আর কোথাও পাইনি।'

'মিষ্টি মাংস মিষ্টি গলা!' চেহারা এবং গলার স্বর আগের চেয়েও বেশি বিকৃত করে তুলল রামানন্দ। 'একটু সোডা না, একটু খাবার-দাবার সঙ্গে আনবে তা-ও না, এক বোতল হুইস্কি দিয়ে উনি আমার মন ভোলাচ্ছেন। খবরদার, আমার ফ্রেন্ডের ওয়াইফ সম্পর্কে, হুঁ, কি ওর রান্না—কি ওর গলার স্বর নিয়ে কোনোরকম রিসার্চ এখানে চলবে না!' ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে রামানন্দ মাথাটা কেমন করে যেন দুলিয়ে দুলিয়ে অসিত নামের ছেলেটিকে দেখল। অসিত আর কথা বলছে না। বোতলটা শেষ করে রামানন্দ এক দিকে ছুঁড়ে দিতে গড়াতে গড়াতে সেটা ছেঁড়া ফাইবারের সুটকেস্‌টার গায়ে ঠেকেছে।

'ঠিক আছে স্যার।' দু' নম্বর ছেলেটি মিহি নরম গলায় বলল, 'কাল আবার একটা হুইস্কি আপনার জন্যে নিয়ে আসব, সঙ্গে সোডা ও খাবার নিয়ে আসব।'

'ভা-ল খাবার আনবে।' রামানন্দর জিভ জড়িয়ে আসছিল। 'টিফিন ক্যারিয়ারে করে ব্রেস্ট কাটলেট, ফাউলকারী, ফিস্‌-ফ্রাই—স-ব নিয়ে আসবে। বাড়ির রান্না চাই বুঝলে। হোটেল-রেস্তোঁরার মাল চলবে না।'

'না, তা আনব না।' ছেলেটি মাথা ঝাঁকাল। 'বাড়ির রান্না করা খাবারই আনব।'

'আর শোনো!' পা দুটি ছড়িয়ে বসল রামানন্দ, যেন আলস্য এসেছে, পিঠটা বেঁকে গেছে। 'তোমার নাম কি?'

'রণেন।'

'হুঁ, রণেন, শোনো—তোমার জানাশোনা মেয়েটেয়ে আছে? উঁহু, তোমার প্রেমিকা না, বান্ধবী না—কেউ না, এমনি মেয়েছেলে, মানে ব্যবহার করা যায়?'

'আছে স্যার।' অসিত নামের ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'শাট আপ।' রামানন্দর আধবোজা চোখ বড় হয়ে গেল। 'তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে না।—রণেন!' রামানন্দ দু' নম্বরের দিকে চোখ রাখল।

'আছে স্যার, আপনার চাই?' রণেন ঝুঁকে বসল।

রামানন্দ আবার চোখ বুজল। একটু পরে চোখ খুলল।

'আপনার চাই স্যার?' রণেন আর একটু ঝুঁকে বসল।

'এখনও অবশ্য কিছু ঠিক করতে পারছি না, কাল—কাল বলব, তুমি তো আসছ?'

'নিশ্চয়, হুইস্কি, সোডা এবং বাড়ির রান্না করা খাবার নিয়ে আসব।'

'হুঁ,' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'সিগারেট দাও।'

রণেন চটপট হাতের প্যাকেট থেকে সিগারেট খুলে রামানন্দর হাতে না, সরাসরি মুখে গুঁজে দিল এবং লইটার জেবলে ধরিয়েও দিল।

'গুড্।' খুশি গলায় রামানন্দ বলল, 'বুঝেছ, কাল, কালকে এমন সময় আমরা ডিসাইড করব মেয়েটির কাছে যাওয়া হবে কি হবে না।'

'সেই ভাল হবে।' রণেন সোজা হয়ে বসল।

'অবশ্য আজ রাত্রেই আমি জিনিসটা চিন্তা করে দেখব—যদি দরকার মনে করি, কাল এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে বেরিয়ে পড়ব, বেলেঘাটার রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে—'

'তাই ভাল হবে স্যার, চমৎকার হবে।'

'আমি এমন ছিলাম না, মেয়েছেলের চিন্তা একদম আমার মাথায় ছিল না।' রামানন্দ জোরে জোরে সিগারেট টানল। ধোঁয়ায় মুখটা ঢেকে গেল। 'বুঝেছ রণেন, ওই শালা আলুর আড়তদার এই বদখেয়াল আমার মগজে ঢুকিয়েছে, হাড়কাটায় ওর রক্ষিতার ঘরে আমায় নিয়ে যেতে চাইছিল।'

'তারপর?'

'যায়নি, ছোটলোক কথা রাখেনি, একপেট ধেনো খাইয়ে বৈঠকখানার দোকান থেকে আমায় রাস্তায় নামিয়ে দিলে। ঘুঁষি মেরে—'

'ঠিক আছে স্যার, আপনাকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাব।'

'ঘুষি মেরে শুয়োরটার নাক ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল আমার, বুঝেছ রণেন—'

'যাক গে, ওসব হাড়কাটা-ফারকাটা যাওয়া আপনার মতন শিল্পীর এমনিও শোভা পেত না, ছোটলোকদের ভিড়, খুব সুন্দর জায়গায় আপনাকে আমি নিয়ে যাব, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আর দারুণ অ্যাট্রাকটিভ সেই মহিলা, যেমন আলাপ-ব্যবহার, তেমনি—।'

'মহিলা!' রামানন্দ গুজগুজ করে হাসল। 'আমি তো ভাবলাম খুব কাঁচাকচি মেয়েটেয়ের সঙ্গে তোমার জানাশোনা।'

অল্প হেসে রণেন মাথা ঝাঁকাল। 'ডাঁশা ফলই ভাল, একটু বয়েস হলেই রমণীর দেহের আস্বাদ বাড়ে, মনের দিক থেকেও তাপ-টাপটা একটু বেশি দেয়!'

'সুন্দর কথা, খুব ভাল বলেছ, শুনেছি বাৎসায়নের কামসূত্রেও এমন একটা ইঙ্গিত রয়েছে।'

'তা হবে স্যার, আমি বাৎসায়ন পড়িনি, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—' চোখ টেরা করে রণেন তার বন্ধুকে দেখল, সেই যে ধমক খেয়ে অসিত চুপ, আর কথা বলছে না। রণেন আবার রামানন্দর দিকে তাকাল। 'কলমটা একবার হাতে নিয়ে দেখুন—খাঁটি বিলিতি জিনিস।'

'তাই নাকি!' খুব একটা ইচ্ছে না থাকলেও রামানন্দ পেন্‌টা হাতে তুলে নিল। 'হুঁ, দেখতে খুব ফ্যান্সি।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সে।

'লেখাও চমৎকার আসে—কালি ভরা আছে—একটু আঁক কেটে দেখুন।'

'আমার ঘরে এক টুকরো সাদা কাগজ নেই—', রামানন্দ মাথা নাড়ল।

'কাগজ-কলমের পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি।'

'আমার কাছে আছে—এই নিন।' ফস্ করে পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য ছোট বাঁধানো খাতা বের করে রণেন রামানন্দর সামনে মেলে ধরল। 'এখানে আঁক কাটুন।'

তৎক্ষণাৎ ছেলেটির চোখের দিকে তাকাল রামানন্দ, একটা চাপা দুষ্টামির হাসি সে সেখানে আবিষ্কার করল।

'বুঝেছি, বুঝেছি', কলমটা ধরে রেখে গম্ভীর হয়ে রামানন্দ থুতনি নাড়ল। 'এক্ষুনি বলবে, একটা অটোগ্রাফ দিন স্যার—তাই ঘটা করে কলম উপহার, এই তো?'

'আপনি সব বোঝেন, তা না হলে এতবড় শিল্পী!' রণেন মিষ্টি করে হাসল। 'কিন্তু রামানন্দ সেনের শুধু অটোগ্রাফ নিয়েই মন ভরবে না, একটা ছোট্ট কবিতা, দু' লাইন, চার লাইন, যা আপনার মনে আসে, লিখে দিন।'

প্রচণ্ড শব্দ করে রামানন্দ হাসল। এত জোরে হাসল যেন রান্নাঘরে মাধুরীর চেঁচামেচিটা হঠাৎ থেমে গেল। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছিল। ঘরের চালের ওপর গাছের পাতার সরসর শব্দ শোনা গেল। নেশাচ্ছন্ন শিথিল দেহটা মাদুরের ওপর প্রায় আধখানা ছড়িয়ে দিয়ে ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে কি যেন একটু ভাবল, তারপর রণেনের দিকে তাকাল।

'আচ্ছা দাও, তুমি যখন বলছ, তোমার মতন ভক্তকে একটু তুষ্ট করা যাক'. হাত বাড়িয়ে সে খাতাটা নিল। 'কিন্তু খবরদার! আর কোনোদিন কবিতার জন্য আবদার করবে না—বহুকাল আমি এই নোংরা কাজ ছেড়ে দিয়েছি।'

'আর কোনোদিন চাইব না।' রণেন বিনয়ে ভেঙে পড়ল।

মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রামানন্দ লিখলঃ

গোধূলি বেলায় গাছের তলায়
রমণী এক
সুন্দর কিশোর নিয়ে
খেলা করে, খেলা করে—
রমণীর চোখে অরণ্য আদিম
কিশোরের চোখে লোভী সূর্য,
খেলা করে, দুটিতে খেলা করে—
রক্ত নিয়ে খেলা?
অন্ধকার বিদ্ধ করার দুরন্ত
উল্লাসে সূর্য
ধুক ধুক জ্বলে, দানবী মানবী
সিংহ-শিশু নাচাবার মতন
চপল নধর কিশোর নিয়ে খেলা করে—

লেখা হয়ে গেলে হাত থেকে কলম আর খাতা ফেলে দিয়ে গভীর আলস্য নিয়ে রামানন্দ মাদুরের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রায় চোরের মতন নিঃশব্দে খাতাটা তুলে নিয়ে ছেলে দুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের মুখে রাজ্য-জয়ের আনন্দ। ঝিঁঝি ডাকছিল। গাছের পাতার সরসর শব্দ হচ্ছিল। বোধহয় তেল না থাকার দরুন কেরোসিনের ডিবিটা একবার দপদপ করে জ্বলে উঠে নিবে গেল।

নেশার ঘোরের মধ্যেও এক সময় রামানন্দ টের পেল, মনতাজকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে আলো নিবিয়ে মাধুরী যেন শুয়ে পড়েছে। এমন আর কোনোদিন হয়নি। তাকে খেতে ডাকা হল না।

ঠিক বলা যায় না, রামানন্দর মনে হল, নেশা না করলে তার দু' চোখ একটা চাপা অভিমান নিয়ে আজ হয়তো ছলছল করত, কিন্তু এখন একটা বাঁকা হাসি ঠোঁটে নিয়ে শোয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে সে উঠে বসল। হাতড়ে হাতড়ে মেঝে থেকে একটা পোড়া সিগারেট তুলে নিয়ে মুখে গুঁজল। তারপর দেশলাই খুঁজতে লাগল।

॥ ৩৯ ॥

সেই নরম হলদে রোদ, ডালিম ঝোপে শালিক চড়ুইয়ের নাচানাচি কিচির-মিচির, অন্যাদিনের মতোই ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন একটা আকাশ নিয়ে সকাল হয়েছিল, সূর্য উঠেছিল। মাধুরীর খাঁচার মুরগিগুলি ক্কক্ ক্কক্ ডাকছিল। প্যাঁকপ্যাঁক শব্দ করে সার বেঁধে হাঁসের দল খালের দিকে ছুটে গেছে।

অর্থাৎ আজ যে একটা অন্যরকম দিন, অক্ষয়ের অপারেশন হবে, একটা বিশেষ দিন, ঘুম থেকে জেগে উঠে বাইরের দিকে চোখ রেখে রামানন্দ তার কোনো লক্ষণ দেখেনি।

যেন সব আগের মতন আছে। কিছুই বদলায়নি। যে কারণে কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে, স্তব্ধ হয়ে থেকে অক্ষয়ের উঠোনের রৌদ্র-ঝলমল নধর ডালিম গাছটার দিকে সে ফ্যালফ্যাল করে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল।

অথচ মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে গায়ে জামা চড়িয়ে হাসপাতালে বেরোবার জন্য সে তৈরী হয়েছিল।

মাধুরী নিজে আসেনি, মনতাজকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সেটা অবশ্য তেমন কিছু না। এই সময়টায় মাধুরীর খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। একদিকে তার হাঁস মুরগি ছাগল, অন্যদিকে ধোয়ামোছা, ঘর-দুয়ার নিকানো। শফী থাকলে শফীকে দিয়ে কতদিন চা পাঠিয়ে দিয়েছে।

তা নয়, আসলে অন্যাদিনেব মতোই একটা নিশ্চিন্ততা নির্ভাবনা এই ছোট্ট শান্ত সংসারটাকে ঘিরে রয়েছে. চোখের সামনে দেখে রামানন্দ আজ আবার মাধুরীকে কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সাহস পাচ্ছিল না। অর্থাৎ বেলা সাড়ে ন'টায় অক্ষয়ের অপারেশন হয়ে যাচ্ছে, দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ তাকে কেবিনে ফিরিয়ে আনা হবে—বিকেলের দিকে মাধুরী অক্ষয়কে একবার দেখতে যাবে কিনা। যদি কালকের মতোই মাধুবী আজ আবার নাক সিঁটকায়—হাসপাতালে গেলে ঘেন্না করে, বমি আসে, এসব বলে?

যে কারণে রামানন্দ চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

তাতে বেশ একটা মজা হয়েছিল। এভাবে রামানন্দর চুপচাপ বেরিয়ে আসাতে, অন্তত রামানন্দর যা অনুমান, মাধুরী নিশ্চয় ঘাবড়ে গিয়েছিল। ও তখন ভেবেছে তার কালকের জবাবটা মোটেই ভালু হয়নি—স্বামী হাসপাতালে আছে, সেখানে ঘেন্নার প্রশ্ন ওঠে না, মাস্টার রেগে গেছে। যে কারণে ঘুম থেকে উঠে মাধুরীকে কিছুই না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কেননা বাড়ির চৌহদ্দি পার হয়ে রামানন্দ যখন বালুর ওপর দিয়ে হাঁটছে তখন পিছনে ছোট্ট একটা কাশির শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাতেই দেখে, বড় বড় পা ফেলে মনতাজ তার দিকে ছুটে আসছে। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। 'কি ব্যাপার?' কাছে আসতে মনতাজকে সে প্রশ্ন করেছিল। ছোঁড়া হাসছিল। রামানন্দ অবাক হয়নি। কাল বিকেলের অপ্রস্তুত ভাবটা, এত বড় একটা রাত গেল মাঝখানে, কাটিয়ে ওঠার মতন যে যথেষ্ট সেয়ানা হয়েছে শফীর মামাতো ভাইটি, তা সে চোখের ওপরই দেখছিল। আর এদিকের

ব্যাপার, অর্থাৎ অক্ষয়ের আজ অপারেশন, যে জন্য সাত-সকালে রামানন্দকে হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে, মাধুরীরও একবার সেখানে যাওয়া দরকার—এসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামানোর কথা নয় এই ছেলের; শফী হলে কথা ছিল, গোড়া থেকে এ বাড়িতে যাতায়াত। অক্ষয়ের হাসপাতাল যাওয়ার প্রথম অবস্থায় মাধুরীর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, এমন কি কিছু কিছু কান্নাকাটিও শফী দেখেছে। মনতাজ এসব কিছুই দেখেনি। খুব হালে এখানে তার আসা। বরং মাধুরীর হাসিখুশি চেহারাটাই সে দেখছে বেশি। 'হুঁ, কি হয়েছে মনতাজ?' রামানন্দ ভুরু কুঁচকে ছোঁড়ার সুন্দর মুখের হাসিটা লক্ষ্য করছিল। 'আজ বিকেলে শফীদা আসবে, শফীদার সঙ্গে দিদি কি হাসপাতালে যাবে?' রামানন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে মনতাজ প্রশ্ন করেছিল। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ কিছু উত্তর দিতে পারেনি। মনতাজের দিক থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে বালুর ওপর ছড়িয়ে পড়া সকালের লাল রোদ দেখছিল। একটু ভেবে নিয়ে পরে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'হুঁ যেতে পারে, আপত্তি কি!' খুবই সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল সে। জবাব শুনে এক গাল হাসি নিয়ে মনতাজ তক্ষুনি সেটা মাধুরীর কাছে পেঁাছে দিতে সাঁই সাঁই করে আবার বাড়ির দিকে ছুটে গেছে। একটু মুচকি হেসে রামানন্দও বেলেঘাটার রাস্তায় বাস ধরতে আবার হাঁটা আরম্ভ করেছিল। গম্ভীর হয়ে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসায় অন্তত একটু কাজ হয়েছে, রাস্তায় আসতে আসতে সে ভাবছিল, শফীকে নিয়ে মাধুরী আজ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অক্ষয়কে দেখতে আসছে।

কাজেই অপারেশন-ঘরের লাগোয়া মাঠটায় একটা আম গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে প্রায় সারাটা সকালই রামানন্দ ঘুরে ফিরে মাধুরীর ছবিটা দেখেছে। সেই ছবিতে কখনও মনতাজ কখনও শফীর মুখটা ভেসে উঠেছে, এমন কি অক্ষয়ের উঠোনের রোদ-লাগা ডালিম ঝোপ, হাঁস-মুরগি, একটু দূরেই মনসা গাছ—কখনও স্পষ্ট কখনও ঝাপসা হয়ে চোখের সামনে ক'বারই ফুটে উঠতে দেখল রামানন্দ।

ঘাসের ওপর বসে থাকতে থাকতে তার হাই উঠছিল। নতুন কিছু তো দেখবার ছিল না। এক মাস হতে চলল, ধরতে গেলে প্রায় রোজই দু'বেলা অক্ষয়কে সে এখানে দেখতে আসছে। হাসপাতালের এত বড় কম্পাউণ্ডের ভিতর কোথায় কি আছে না আছে তার একরকম মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। যে জন্য গাছের ছায়ায় দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থেকেও অন্য কোনোদিকেই তার তাকাতে ইচ্ছে করছিল না, ভালও লাগছিল না। কেবল হাই তুলেছে, আর বেশির ভাগ সময় চোখ বুজে থেকে সময় কাটিয়েছে, মাঝে মাঝে এক-আধটা সিগারেট ধরিয়ে টেনেছে। তাও কি আজ সিগারেট খাওয়া হতো! কাল ঐ ছেলে দুটো উঠে চলে যাবার সময় তার জন্য একটা প্যাকেট রেখে গিয়েছিল। খুব একটা হুঁশ ছিল না, তা হলেও রামানন্দর এটুকু মনে আছে, বেশ চালাকি করে দুটিতে মিলে তাকে দিয়ে একটা কবিতা লিখিয়ে নিয়ে সটকে পড়েছিল। আজও আবার একটির আসবার কথা না? হুইস্কি আর খাবার-দাবার নিয়ে? ঐ যে মিহি মাজা গলায় বেশ বিনয় করে করে দু' নম্বর ছেলেটা বার বার তাকে শোনাচ্ছিল? কিন্তু রামানন্দ নিশ্চিত, বদমাশ দুটো আর এ-মুখো হবে না। লেখা আদায় করেছে, ব্যস হয়ে গেছে।

হুঁ, অপারেশন-ঘরের লাগোয়া মাঠটায় আম গাছের ছায়ায় বসে ফচকে ছেলে দুটোর মুখও রামানন্দর কয়েকবারই মনে পড়ছিল। একটা ভাল কলম উপহার দিয়ে গেছে তাকে। এই কলমটাই আজ তার সম্বল। মাধুরীর টাকা দুটো ইচ্ছে করেই সে ফিরিয়ে দেয়নি। কেননা মাধুরীও জানে মাস্টারের হাতে পয়সা নেই। ঐ দু' টাকা থেকেই হাসপাতালে যেতে কি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতে তাকে

বাস ভাড়া দিতে হবে। কাজেই অক্ষয়ের স্ত্রীকে টাকাটা ফেরত দেওয়া হল না বলে রামানন্দর নিজের দিক থেকে আর একটুও খারাপ লাগছিল না।

না, যে কথাটা সে বেশি করে ভাবছিল। কলমটা। অক্ষয়ের অপারেশন হচ্ছে ঠিকই। এবং ভালয় ভালয় যাতে কাজটা হয়ে যায় এই জন্য সে বার বার ঈশ্বরকেও ডাকছিল। কিন্তু এটাও তো সে অস্বীকার করতে পারছিল না, বিকেল পড়তে তার মদের দোকানে ঢুকতে ইচ্ছে করবে। করবেই। ঈশ্বর না করুন, অক্ষয়ের অবস্থা খুব একটা খারাপের দিকে না গেলে রামানন্দ ঠিক করেছে, সন্ধ্যে নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা ধর্মতলার দিকে চলে যাবে। দামী ফাউন্টেন পেন। বিলিতি জিনিস। মোড়েটোড়ে কোথাও দাঁড়িয়ে বেচে দিতে একটুও কষ্ট হবে না। চোরাই মাল ভেবে উচিত দাম কেউ দেবে না, অর্ধেকও হয়তো দেবে না। তাহলেও একটা দাম পাওয়া যাবে। কুড়ি-পঁচিশ বারো-চৌদ্দ পাঁচ-সাত—যা পাওয়া যায় কলমটা সে ছেড়ে দেবে। অন্তত দু'দিনের খেনোর খরচটা হাতে এলেই হল।

বলে কিনা দু'দিন পরে আবার কোথায় তুমি টাকা পাবে মদ খাবার!

কথাটা মনে হতে রামানন্দ একা একা ঘাসের ওপর বসে নাকের নিচে হেসেছিল। দোতলার অপারেশন রুমের প্রকাণ্ড কাচের জানালাটা রোদ লেগে ঝকমক করছিল। সেদিকে চোখ রেখে সে মনে মনে বলেছিল, সামনে একটা মেজর অপারেশন হচ্ছে—এক সেকেণ্ডের এদিক-ওদিকেও কিছু বিশ্বাস নেই—অস্থির, দুরন্ত চঞ্চল এই প্রাণগঙ্গা, আরও বিশদ করে বললে বলতে হয়, পদ্মপত্রে নীড় আমাদের এই জীবন। সেখানে দু'দিন তো অনেক বেশি। দু'দিনের মদের খরচ অনেক—তারপরে কি হবে, অন্তত আজকের দিনে কথাটা চিন্তা করাও মূর্খতা।

এগারোটা বেজে গিয়েছিল। গাছের ছায়াটা ছোট হতে হতে আর বিশেষ কিছুই ছিল না। মাথায় রোদ লাগতে সে ঘাস ছেড়ে উঠে পড়ে। একটু চা খেতে ইচ্ছে করছিল তার। লোহার গেটটা পার হয়ে বাইরে রাস্তার ওপারে ছোটখাট একটা চায়ের দোকান আছে। হাসপাতালে ঢোকার মুখে বা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাস ধরার আগে মাঝে মাঝে রামানন্দ ওই দোকানে বসেই চা খায়। বাইরে যাবার আগে আর একবার অপারেশন-রুমের একতলার বারান্দায় গিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি। জায়গাটা কেমন খাঁ খাঁ করছিল, অন্ধকার লাগছিল। হঠাৎ রোদ ছেড়ে ওখানে ঢোকার দরুন অবশ্য অন্ধকারটা চোখে বেশি লাগছিল।

যাই হোক, তখন আর দারোয়ানকে সে সেখানে দেখতে পায়নি। তা না হলে এর আগে দু'বার দারোয়ানকে সে ওপরের খবরটা জিজ্ঞেস করেছিল। জিজ্ঞেস করে বিশেষ কিছু ফল হয়নি। দারোয়ান বেচারাই বা কি করে জানবে দোতলায় ডাক্তারবাবুরা ছুরি কাঁচি চালিয়ে অক্ষয় সমাদ্দারের পেট নিয়ে তখন কি সব কাণ্ডকারখানা করছেন। লিফটের পাশে একটা বেঞ্চির ওপর বসে সেই সকাল থেকে তো বেটা খৈনি টিপছে। তবে হ্যাঁ, বাহারের একটা গোঁফ আছে, ভুঁড়িখানাও চমৎকার। বোধ করি এই ভুঁড়ি ও গোঁফের গর্বেই নিজেকে সে একজন কেউকেটা মনে করছিল। কেননা, যতবার রামানন্দ তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, রামানন্দকে নিতান্তই একটা গেঁয়ো চাষাভুষা ভেবে ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবার মতন ভঙ্গি করে রুখে উঠেছে। 'তুম্ আদমী বহুৎ ঝামেলা করতা হ্যায়, হট্ যাও, যব্ অপ্রেশন ফিনিশ হোগা পেসেন্ট আপসে উস্‌কো কেবিন মে চলা যায়গা। তুম্ কাঁহে বেহুদা ইধার মে ধুরধুর করতা হ্যায়—'

তবে লিফট্‌ম্যান লোকটা ভাল। বাংলা জানে। কে জানে বাঙ্গালী কিনা, এখানকার রকমসকম দেখে রামানন্দর অবশ্য বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না, দারোয়ান লিফট্‌ম্যান জমাদার আর্দালী বেয়ারাদেব মধ্যে বাঙ্গালী কেউ আছে। লিফট্‌ম্যান দুবারই বেশ সম্মান করে তার সঙ্গে কথা বলেছে, কথাবার্তাও মিষ্টি—'খুব বড় অপারেশন হচ্ছে তো বাবু, বেলা বারোটা-একটা হয়ে যেতে পারে। আপনি বাইরে বসে কোথাও বিশ্রাম করুন। অপারেশন হয়ে গেলে ঠিক জানতে পারবেন।'

কিন্তু চা খেতে যাবার আগে আর একবার একতলার বারান্দায় উঠে রামানন্দ দারোয়ান বা লিফট্‌ম্যান কাউকে দেখতে না পেয়ে খুবই অবাক হয়েছিল, যেন আশান্বিতও হয়েছিল কিছুটা। কেননা লিফট ওপরে চলে গেছে। তা হলে বোধ করি অক্ষয়ের অপারেশন শেষ হল, এবার স্ট্রেচারে শোয়ানো অক্ষয়কে নিয়ে লিফট নিচে নামবে, দারোয়ানও এই জন্য আর নিচে বসে নেই, নিশ্চয় ওপরে তার ডাক পড়েছে। এসব ভেবে হাঁ করে ওপরের দিকে তাকিয়ে লিফট-এর ঝুলন্ত ফিতেটার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে রামানন্দ দশ মিনিট, আরও বেশি, পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেছিল, এই বুঝি ফিতেটা নড়ে ওঠে। হুঁ, ফিতে যখন ওপরের দিকে উঠবে তখনই বুঝতে হবে গড়গড় করে লিফট নামছে—কিন্তু রামানন্দ দেখছিল ফিতেটা একভাবে ঝুলছে, নড়বার কোনো লক্ষণই নেই।

ঘাড়ের শিরা টনটন আরম্ভ করতে হতাশ হয়ে ঘাড় সোজা করে সে তখনই বারান্দা থেকে নেমে এল। কত কারণেই লিফট্ ওপরে যেতে পারে, অন্য কোনো কাজে দারোয়ানটাও হয়তো কোথাও গিয়েছে—চিন্তা করে রামানন্দ হাসপাতালের কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে সোজা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েছিল। কেবল চা না, ক্ষুধা পেয়েছিল, অতিরিক্ত আট আনা খরচ করে চায়ের সঙ্গে আলুর দম ও পাউরুটি খেতে হল তাকে। তার ধারণা ছিল বেলা দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই অক্ষয়ের অপারেশন হয়ে যাবে। অক্ষয়কে একবার দেখে অবস্থা ভালর দিকে বুঝলে দুপুরে না হয় বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাত খাবে, ভাত খেয়ে তারপর আবার হাসপাতালে চলে আসবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত অক্ষয়ের নিচে আসার কোনো লক্ষণই সে দেখতে পাচ্ছিল না। কাজেই সে ধরে নিয়েছিল দুপুরে আজ আর বাড়ি যাওয়া হবে না। তাছাড়া এখন আবার হাসপাতালে ঢুকলে কখন সেখান থেকে বেরোতে পারবে বা পারবে না, চিন্তা করেও চায়ের দোকানে বসেই যাহোক কিছু সে খেয়ে নেয়।

মিনিট কুড়ি ছিল রামানন্দ চায়ের দোকানে। দোকান থেকে বেরিয়ে পাশের সিগারেটের দোকানে একটা সিগারেট কিনে সেখানেই সেটা ধরিয়ে নিয়ে অপারেশন রুমের কাছে ফিরে যেতে দেখল, লিফট্‌ম্যান বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে দাঁত বের করে হাসছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে তার মুখেই শুনল পেশেণ্ট এইমাত্র কেবিনে ফিরে গেছে।

রামানন্দ তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে অক্ষয়ের কেবিনের দিকে ছুটল।

হুঁ, সোহিনী তালুকদার। অক্ষয়ের কথাটা মনে পড়ল রামানন্দর।—বুঝেছ মাস্টার, যাকে বলে মোহিনী মূর্তি, যে-কোনো পুরুষ, যতবড় বিশ্বামিত্র হোক, ঐ ছুঁড়িকে দেখলে—

না, মাত্র দু'দিন হয় অক্ষয়ের কেবিনে তিনি এসেছেন, মোহিনী সোহিনীর পরিচয়টা তেমন ভাল করে পায়নি রামানন্দ। কিন্তু আজ বুঝল এমন একটা বদমেজাজী মেয়েছেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে কিনা সন্দেহ।

ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া স্পেশাল পাশ সঙ্গে ছিল তার।

আজ সারাদিন সারারাত অক্ষয়ের কেবিনে সে থাকতে পারবে।

কিন্তু তাতে কাজ হল কি! যেন ওটা কিছুই নয়, ছেলে ভোলানো খেলনা, সোহিনী এই দেখে ভুলবে না, রামানন্দর হাতের কাগজটার দিকে ভাল করে তাকালই না।

'দেখুন—' রামানন্দ ভিতরে ঢুকতে যাবে, রণচণ্ডী মূর্তি ধরে মহিলা কেবিনের দরজা আগলে দাঁড়াল। 'এই মাত্র পেশেণ্ট অপারেশন থিয়েটার থেকে ফিরছে, এখনই আপনি কেবিনে ঢুকতে চাইছেন কোন্ সাহসে আমি বুঝতে পারছি না!'

অক্ষয়কে দেখতে এসে রামানন্দ এই পর্যন্ত কারো কাছে বাধা পায়নি। সকাল দুপুর বিকেল, যখন খুশি, যেদিন খুশি অক্ষয়ের কেবিনে সে ঢুকে পড়েছে। এবং তার বেলা ভিজিটিং আওয়ারের কোনো বালাই ছিল না। দারোয়ান জমাদার ওয়ার্ডবয় থেকে আরম্ভ করে সব ক'জন ডাক্তার-নার্সের সঙ্গে তার কেবল জানাশোনা না, বেশ একটা প্রীতির সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। যতক্ষণ খুশি কেবিনে বসে অক্ষয়ের সঙ্গে গল্পটল্প করে কাটিয়ে গেছে। আজ হঠাৎ এভাবে বাধা পেয়ে রামানন্দ থমকে গেল, অপ্রস্তুত হল।

'দেখুন, অক্ষয় আমার বন্ধু, আমি কালও এসেছিলাম, আপনি নিশ্চয় দেখেছেন।'

'কি জানি, ভাল করে লক্ষ্য করিনি।' ভুরু কুঁচকে হাঁড়ির মতন চেহারা করে সোহিনী মাথা নাড়ল। 'তা বন্ধুই হোন আর যাই হোন, পেশেণ্টকে এখন দেখতে দেওয়া হবে না।'

রামানন্দ রুষ্ট হল। তা হলেও ভদ্রতা করে একটু হাসতে চেষ্টা করল। 'আমি তার সঙ্গে কথা বলব না, একবার শুধু চুপি চুপি দেখে যাব।'

'কথা বলবেন কার সঙ্গে!' ফর্সা হাতের তেলো দুটো উল্টে দিয়ে মেয়েটা এমন করে রামানন্দর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল, যেন নিতান্তই বোকা মূর্খসুখ্য একটা লোক এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। 'আচ্ছা মানুষ তো! পেশেণ্টের কি সেন্স্ আছে যে আপনি এখন কথা বললেও তিনি শুনবেন?'

'হুঁ, সে আমি খুব জানি।' রামানন্দর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠল। 'মেজর অপারেশন হয়েছে, রুগীর সেন্স্ আসতে এখনো দেরি আছে, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি তার ফ্রেন্ড, এই অবস্থায় পেশেণ্টকে দেখবার রাইট আমার আছে।'

'ফ্রেন্ড—রাইট!' যেন একটা পায়রা বকবকম করে উঠল। বিড়বিড় করে উঠতে সুন্দরীর গলার তুলতুলে নরম মাংস সেভাবেই ওঠানামা করল। কিন্তু তারপর এমন কুৎসিতভাবে ঠোঁট উল্টে দিল—দেখে রামানন্দর প্রায় থুথু ছিটোতে ইচ্ছে করল। আর মহিলার মুখের ভাষাও তেমনি। 'ঐ ফ্রেন্ডের পেটের বারোটা বাজিয়েছেন, একেবারে ঘা করিয়ে ছেড়েছেন—এক সঙ্গে বসে খুব বোতল-টোতল চলত নিশ্চয়!'

স্তম্ভিত হয়ে রামানন্দ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এর উত্তরে কী বলা যেতে পারে সে ভেবে পাচ্ছিল না।

'এখন এখান থেকে সরে যান। ফ্রেন্ডকে দেখতে হয় দু ঘণ্টা পরে আসবেন।' কোমর ও পাছায়, বোঝা গেল ইচ্ছে করেই ওটা করল, একটা বিশ্রী কামোদ্দীপক ঢেউ তুলে অক্ষয়ের মোহিনী সোহিনী কেবিনের দরজা ছেড়ে ভিতরে চলে গেল। চাপা রাগে উত্তেজনায় এবং কতকটা দুঃখে রামানন্দর কপালের রগ টিপটিপ করছিল। তাই তো, সিঁড়ি কটা ডিঙিয়ে নিচে নামতে নামতে সে চিন্তা করল, তরলা হলে কথা ছিল, ফুলরেণু হলে কথা ছিল, তারা ঢের বেশি শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, কথাবার্তায়ও মার্জিত ভদ্র—তাদের কাছে বললে তারা বুঝতো এবং বিশ্বাসও করতো, অক্ষয় কোনোদিনই মদ খেত না, অতিরিক্ত চা খেত। মদ ছাড়াও যে আরও কত

কারণে মানুষের পেটে ঘা হতে পারে নার্স হয়ে এই বজ্জাত ছুঁড়ি কি জানে না? নিশ্চয় জানে, রামানন্দ আর একবার ভাবল, নেহাত বদমায়েসী করে কথাটা তাকে শুনিয়ে দিল।

হঠাৎ তার খুব খারাপ লাগছিল। হাসপাতালের আবহাওয়াটা অসহ্য ঠেকছিল। ভিতরে কোথাও বসতে ইচ্ছে করল না। ব্লাডব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে হেঁটে লোহার গেট পার হয়ে আবার রাস্তার সেই চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল। ঢুকল এবং তখনি তাকে বেরিয়েও আসতে হল। এখন আর চা পাওয়া যাবে না। সব ক'টা চেয়ার উল্টে রাখা হয়েছে। জল ঢেলে মেঝেটা ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। রামানন্দর মনে পড়ল, এই সময়টায় মোহনবাবুর চায়ের দোকানেরও এই চেহারা হয়। সব ক'টা চেয়ার উল্টে রাখা হয়, মেঝেয় জল ঢেলে দেওয়া হয়। মোহনবাবুর কর্মচারী রমেশ রাস্তার কলে চান করে এসে ছোট একটা আরশি নিয়ে চুল আঁচড়াতে লেগে যেত। এখানেও দেখা গেল চানটান সেরে এসে কর্মচারীটি আরশি চিরুনি হাতে নিয়ে ঘটা করে মাথার চুল ঠিক করছে। তফাতের মধ্যে এই—মোহনবাবু দোকানেই থাকেন, দুপুরে বাড়ি যান না, ওখানেই খাওয়া-দাওয়া সারেন। কিন্তু এই দোকানের বাবুটিকে আর দেখা গেল না, সম্ভবত ভাত খেতে বাড়ি চলে গেছে, চিন্তা করে রামানন্দ ফুটপাত ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল। হুঁ, হ্যারিসন রোডের দিকে না বউবাজারের দিকে, হ্যারিসন রোডের দিকে শুভেন্দুদের আড্ডা। সেদিকে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। কোনো ফুটপাথেই ছায়া ছিল না। রামানন্দ ঘামছিল। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের মুখে এসে হঠাৎ জগৎ মণ্ডলকে তার মনে পড়ল। কেননা আর একদিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জগৎ মণ্ডলের সঙ্গে রিকশায় চড়ে ঐ বিখ্যাত গলিটার কথা চিন্তা করতে করতে সে বউবাজারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিক, মণ্ডল আফ্রিকা চলে যাচ্ছে, এ যেন ভাবাও যায় না। পরশু নন্দদুলাল ও রেখার মুখে খবরটা শোনার পর থেকে কথাটা মাঝে মাঝেই সে ভাবছে। একদিন তা হলে বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে গিয়ে মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে আসতে হয়। নন্দ অবশ্য বলেছে জগতের এই চাকরি হবে না, হতে পারে না। রেখা বলেছে হবেই, জগতবাবুর যেমন মেরিট, আঁকার যেমন হাত এবং দু-এক-দিনের মধ্যেই নাকি খবরটা পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো দরখাস্তের উত্তর ইতিমধ্যে এসেও গেছে। সরকারী মহলে ঘোরাঘুরি করে রেখাও তলে তলে একটু খোঁজ-খবর নিচ্ছে। 'তুমি একটু বেশি অপ্‌টিমিষ্ট', নন্দ ঠাট্টার ভঙ্গিতে রেখাকে বলেছিল,—'হুঁ, যদি চাকরি হয়ে যায় খুব ভাল কথা, আমরা এই ব্লু-ফক্সে জগতকে নিয়ে এসে দারুণ করে একটা ফেয়ারওয়েল দেবো—কি বলেন রামানন্দবাবু?' রামানন্দ হেসে ঘাড় কাত করেছিল—'নিশ্চয়, দেওয়া উচিত, মানুষটা যখন আমাদের ছেড়ে এত দূরে চলে যাচ্ছে।'

অক্ষয়কে নিয়ে এই ঝামেলার জন্য রামানন্দ সময় পাচ্ছে না, তাহলেও, মনে মনে সে ঠিক করল, অক্ষয় একটু ভাল থাকলে কাল বা পরশু একবার বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে যাওয়া যাবে। নন্দ অবশ্য বলছে ব্লু-ফক্সে সকলে একদিন একত্র হয়ে মণ্ডলকে ঘটা করে ফেয়ারওয়েল জানাবে—কাজেকর্মে সেটা আদৌ হবে কিনা তার ঠিক কি। নেশার ঝোঁকে নন্দ কথাটা বলেছিল। নেশার ঝোঁকে বলা কথার ক'টাই বা আমরা রাখি। হাঁটতে হাঁটতে রামানন্দ বউবাজারের মোড়ে চলে এল।

দু' ঘণ্টা এভাবে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে, তাও এই চড়া রোদে দু' ঘণ্টা সময় কাটানো কি মুখের কথা! ছুঁড়ির চেহারাটা মনে পড়তে রামানন্দ নতুন করে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। যদি কোনোদিন সুযোগ পায়, নবাবের বেটিকে—নবাবের

বৌটি কি বাসন-মাজা ঝিয়ের সন্তান কে বলবে, নার্স হয়ে এখন ফুটানি তেল-তেলানি—হুঃ, যদি সুযোগ পায় এমন জব্দ করবে রামানন্দ!

দাঁতে দাঁতে ঘষে চুপ করে দাঁড়িয়ে ট্রামটাকে দেখছিল সে। না, এখন কোনো চায়ের দোকানে ঢুকে বিশ্রাম করা যাবে না। সব দোকানেই এক অবস্থা, মাছি ময়লা দূর করতে মেঝেয় জল ঢালা হয়েছে, চেয়ার টুল উল্টে দেওয়া হয়েছে, বরং—

অক্ষয়ের চিন্তার মতন সন্ধ্যাবেলার চিন্তাটাও তাকে কম বিব্রত করছিল কি! এখন একটু ফাঁক পাওয়া গেছে। ধর্মতলা ছুটে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। শেয়ালদা-বৈঠকখানার মোড়ে দশ বিশ মিনিট দাঁড়ালেই কলমটা অনায়াসে সে বেচে দিতে পারে। এভাবে হরদম সেখানে ঘড়ি, পেন, টর্চ, ট্রানজিস্টার, হুঃ, প্রচুর শার্ট প্যাণ্টের কাপড়ও বেচাকেনা হচ্ছে—রোজ দেখছে সে। লাফিয়ে রামানন্দ শেয়ালদামুখো একটা ট্রামে উঠে পড়ল। কাল রাত্রের চাঁদের টুকরো ছেলে দুটোর কথা ভেবে মনে মনে সে হাসল। কত সাধ বাছাদের! দামী পেন উপহার পেয়েছে, রামানন্দ সেন খুশি হয়ে নাইয়ের কাপড় ঢিলে করে দিয়ে নতুন করে পদ্য লিখতে লেগে গেছে।

আহ্, পাঁচ টাকা? বাস্তবজ্ঞান বলতে তোমার কিছু নেই, অরণ্যে গিয়ে তোমার বাস করা উচিত। কথাটা কিন্তু ক'দিনই বলেছিল পূরবী। পূরবী? রামানন্দর স্ত্রী? এতদিনের ছাড়াছাড়ির পর এখন ভাবতেও কেমন লাগে। হাজরার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে। টালিগঞ্জে আরও ভাল দামী ফ্ল্যাটে উঠে গেছে। বেশ কিছু ফার্নিচার-টার্নিচার যেন কিনেছে। দরজা জানলায় দারুণ সব পর্দা খাটানো হয়েছে। কত ফুলের টব এখন বারান্দায় ব্যালকনিতে! আচ্ছা—রামানন্দ হঠাৎ মনে করতে পারল না, হাজরার বাড়িতে, নাকি টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে মহিলা তার মুখে থুথু ছিটাতে চেয়েছিল? যাই হোক, একদিন—মানে যখন একত্র ছিল, গলা বড় করে রামানন্দকে বলেছিল, আমি না থাকলে দুবেলা দু-মুঠো ভাতও জুটবে না তোমার, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইস্কুলে পাঠাচ্ছি, যদি আমি কোথাও চলে যাই, আমার তো মনে হয় চাকরিটাও তুমি রাখতে পারবে না।

কথাটা ফলেছে। খুবই ফলেছে। অবশ্য এই জগতে খারাপ কথাটাই বেশি ফলে। যদি অক্ষয়ের স্ত্রী আর একটু বেশি অ্যাডামেণ্ট হয়ে ওঠে রামানন্দকে স্রেফ রাস্তার কলের জল খেয়ে—

যাক, সেটা কথা না, অক্ষয় সেন্সলেস হয়ে তার কেবিনে পড়ে আছে, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে সে কী করবে না করবে পরে দেখা যাবে, এখন তো রামানন্দ তার ডিউটি করে যাচ্ছে, এই নিয়ে আজই মাথা গরম করার কোনো মানে হয় না। তবে, হ্যাঁ, পূরবীর চোখ আছে, মানুষ চেনে। রামানন্দকে দারুণ চিনতে পেরেছিল। বাস্তববুদ্ধি তার ছিটেফোঁটা নেই, প্র্যাক্টিক্যাল জগত সম্পর্কে কোনো-রকম আইডিয়া রামানন্দর নেই। কোথায় পাঁচ, আর কোথায় কিনা কুড়ি—করকরে দুটো দশ টাকার নোট। অবশ্য দশ পনেরো মিনিটেই কাজটা সারতে পারেনি। ঘণ্টাখানেক বৈঠকখানার একটা গলির মুখে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এই সময় আর কলমের খদ্দের কোথায়। কলম কিনিয়ে বাবুরা তো অফিসে অফিসে কলম পিষছে। এখন এই বেলা বারোটা-একটায় সস্তার শাকসবজি, মাছ, মাছের কাঁটা কিনতে ফেরিওয়ালা, রিকশাওয়ালা, দোকানের গোমস্তা ও মর্নিং সিফট্-এত কাজ সেরে ঘরমুখো ট্রাম-বাসের কণ্ডাক্টারের দল বাজারে ভিড় করছে, রামানন্দর হাতের কলমের দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। কলমে তাদের দরকার নেই। হতাশ হয়ে চলে আসত সে, এমন সময় পাশের আর একটা গলি থেকে হুট্ করে একটা লোক বেরিয়ে এসে রামানন্দর হাত থেকে কলমটা তুলে নিয়ে

নেড়েচেড়ে দেখল। পরনে একটা জ্যালজেলে লুঙি, গায়ে ময়লা গামছা জড়ানো, বাবরি চুল, মুখে ফুটফুট বসন্তের দাগ, খালি খোলা পা—এই লোক কলম কিনবে কি, দর জিজ্ঞেস করতে রামানন্দ অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিল —চল্লিশ। ইচ্ছে করে, মানে লোকটাকে তাড়াবার জন্য সে এই দর হেঁকেছিল। না বাবু সাব, বিলিতি জিনিস হলে হবে কি, নিবটা কমজোরী, কালি টানা স্প্রীংটাও খুব একটা সুবিধের না, তবে কিনা ফ্যান্সী, জিনিসটা ভাল, আমি এই দিতে পারব। অবাক কান্ড, রামানন্দ চোখ ঘুরিয়ে ভাল করে লোকটার মুখের দিকে তাকাতে না তাকাতে ট্যাক থেকে দুটো দশ টাকার নোট খুলে সে রামানন্দর হাতে গুঁজে দিল। রামানন্দ একটা শব্দ করতে পারল না। কলমটা নিয়ে মাথার বাবরি নাচাতে নাচাতে লোকটা তক্ষুনি আবার গলির ভিতর অদৃশ্য হল। রামানন্দ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। ঝপ করে কুড়িটা টাকা তার হাতে এসে গেছে। একটু পরেই অবশ্য তার আফসোস হল, আরও বেশি দর চাওয়া উচিত ছিল, খুবই দামী কলম যে—এই লোকও কলম দিয়ে কিছু করবে না, লেখাপড়া করার চেহারাই নয়, বিকেল পড়তে অফিস-ফেরতা বাবুর দল যখন রাস্তায় ভিড় করবে, নির্ঘাৎ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় কারো না কারো কাছে জিনিসটা বেচে দেবে, তাই এত গরজ করে কুড়িটা টাকা ফেলে দিয়ে রমানন্দর হাত থেকে একরকম ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিয়ে গেল।

যাক গে, এই নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই, নোট দুটো ভাঁজ করে পকেটে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে রীতিমত গরম হয়ে উঠল। সন্ধ্যার জন্য আর ভাবনা কি! রয়ে-সয়ে খেলে অন্তত তিন-চার দিন খুব খেতে পারবে। চোখ তুলে দেখল, গীর্জার ঘড়িতে একটা বেজে পনেরো। হাসতে হাসতে রামানন্দ পাশের হালুই-করের দোকানটায় ঢুকে পড়ে বেশ করে কচুরি আর জিলিপি খেয়ে নিল। ঠান্ডা জল খেল। খানিকক্ষণ বসে বিশ্রামও করা হল। মাথার ওপর একটা চকচকে পাখা ঘুরছিল। দেখে রামানন্দ ভাবল, মোহন রেস্টুরেন্টের মোহন পাল এমন পাখা জীবনে দেখেনি।

কাঁটায় কাঁটায় সে হাসপাতালে পেঁছোল। অক্ষয়ের কেবিনে ঢোকার পথে এবার কেউ তাকে বাধা দিল না। কিন্তু ওই কি অক্ষয়! রামানন্দ শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল, চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল। একদৃষ্টে লোহার খাটটার দিকে তাকিয়ে রইল।

॥ ৪০ ॥

পশ্চিম দিকটা অসম্ভব লাল হয়ে আছে। আজকের দিনে আকাশের এই চড়া রং না হলেই যেন ভাল হতো। অক্ষয়ের কেবিনের বাইরে বারান্দায় একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চির ওপর পিঠ এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রামানন্দ হাই তুলতে তুলতে চিন্তা করল। এত ঘটা করে সূর্যাস্ত না হয়ে মেঘে মেঘে বিকেল হয়ে কোনোরকমে সন্ধ্যাটা নেমে আসলে ক্ষতি ছিল কি! কতদিনই তো এমন হয়।

সন্ধ্যার অবশ্য একটু দেরি আছে। এখন পাঁচটা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। এই মাত্র তরলার ঘড়িতে রামানন্দ দেখে এসেছে। তরলা একটু সকাল সকাল চলে এসেছে। তিনটে বাজতেই চলে এসেছে। অক্ষয়ের জন্য নিশ্চয় ডিউটির সময় বদলে গেছে। বেলা তিনটে থেকে রাত ক'টা অবধি থাকবে ও, কে জানে। সোহিনী সন্ধ্যা সাতটায় চলে যাচ্ছে। তরলাকে তখন বলছিল। রাত্রের জন্য আর একজন নার্স

আসছে, দুজনের কথাবার্তা শুনে রামানন্দ বুঝতে পেরেছে। তা তো আসবেই, এমন সীরিয়াস কেস। একা তরলার পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল হতে পারে। এখনও অক্ষয়ের জ্ঞান ফেরেনি যে।

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে রামানন্দ বিদ্ঘুটে লাল আকাশটা দেখতে লাগল।

কেবিনের ভিতরে যেতে আর যেন তার ইচ্ছে করছিল না। ক'বারই পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে এসেছে। দেখার পর ক্লান্ত বিষণ্ন চেহারা করে বেরিয়ে এসে এই বেঞ্চিতেই বসেছে। দেখার আছেই বা কি।

এক দৃশ্য এক ছবি। কাগজের মতন সাদা ফ্যাকাশে হয়ে আছে অক্ষয়ের মুখটা পা ও হাতের তেলোর কেমন যেন একটা কালচে তামাটে রং ধরেছে। পা দুটো খাটের রেলিঙের সঙ্গে বাঁধা। একটা টকটকে লাল কম্বল দিয়ে শরীরটা ঢেকে রাখা হয়েছে।

হুঁ, যে কারণে বিকেলের পশ্চিম আকাশের এই চড়া লাল রং রামানন্দর চোখকে পীড়া দিচ্ছিল—অক্ষয়ের গায়ের লাল কম্বলটাই বার বার মনে পড়ছে।

নাকের ছিদ্র দিয়ে এত বড় একটা টিউব ঢুকিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, বিশ্বাস কি, অচৈতন্য থাকতে থাকতে যদি দম ফুরিয়ে যায়! অক্সিজেন, তার সঙ্গে রক্ত, প্রচুর রক্ত এখন অক্ষয়ের শরীরে ঢোকানো দরকার। বাঁ-পায়ের চামড়ায় সূঁচ বিঁধিয়ে সেই সঙ্গে একটা রবারের নল জুড়ে পায়ের কাছে ঝুলানো কাচের বয়ামটার সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়েছে। বয়াম থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতন টিপটিপ করে রক্ত ঝরছে, নল বেয়ে সেই রক্ত অক্ষয়ের নিস্তেজ স্তিমিত শরীরে এসে জমা হচ্ছে। চোখের সামনে হাতঘড়ি তুলে ধরে তরলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ছোট্ট শরীর, মিষ্টি মুখ, কালো চক্ষু। ছবির মতন দেখাচ্ছিল তরলাকে। হুঁ, সেই তরলা, যার গলার স্বর অক্ষয়ের কানে পাখির ডাকের মতন ঠেকত। রামানন্দর মনে হল অক্ষয় এখন আর শুনতে পাবে না বলে তরলার মুখেও শব্দ নেই, মুখ বুজে আছে। মুখখানাও বিষণ্ন। কালো চোখ দুটো ঘড়ির ডায়ালের ওপর অপলক ধরে রেখে মিনিট গুনছে, মিনিটে ক'ফোঁটা রক্ত রামানন্দর শরীরে ঢুকছে তার হিসাব রাখছে? তাই হবে, আজ এটাই তরলার কাছে সবচেয়ে জরুরী, অক্ষয়ের পক্ষেও মূল্যবান। তরলার পাখির-ডাক গলা সে অনেক শুনেছে।

কেবিনের ভিতরটা ভীষণ রকম স্তব্ধ মনে হচ্ছিল। কোণার দিকে একটা টেবিলে কাগজপত্র নিয়ে সোহিনী ঘাড় গুঁজে কি যেন সব লিখছে। না, রামানন্দ যা ভেবেছিল, মেয়েটা খুব খারাপ না। অপারেশন থিয়েটার থেকে অক্ষয়কে এখানে আনার পর এইসব রক্ত-টক্ত স্যালাইন অক্সিজেন দেবার তোড়জোড় চলছিল, রামানন্দ পরে বুঝেছে, যে কারণে ঠিক তখনই তাকে কেবিনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কই, আর তো সোহিনী তাকে বাধা দেয়নি। অক্ষয়ের চোখ আছে। সোহিনী মোহিনীই বটে। রামানন্দর ক'বারই মনে হয়েছে, কোণার দিকে টেবিলে একটা সূর্যমুখী ফুটে রয়েছে, আর অক্ষয়ের কাছে দাঁড়িয়ে বর্ষার চোখ জুড়ানো নীল অপরাজিতা। একটা রূপ জ্বালা ধরায়, আর একটা জ্বালা জুড়োয়। এক সঙ্গে আজ দু'জন তার কেবিনে। দুটি রূপ। অক্ষয় দেখতে পাচ্ছে না। লোহার খাটটার দিকে যতবার চোখ গেছে রামানন্দর, বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। 'মাস্টার, নতুন খবর, একটা দারুণ মজার সংবাদ নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

হয় ফুলরেণুর কথা, নয়তো তরলার অথবা সোহিনীর। কথাটা বলেই ফ্যা-ফ্যা করে হেসেছে। কত রাগারাগি করেছে রামানন্দ। আজ সেই মানুষ নীরব, চেতনা-হীন। তার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই, তরলার হাতের ঘড়ির টিকটিক শব্দ, টিপ টিপ রক্তের ফোঁটা, লম্বা লম্বা টিউব, স্যালাইন-ওয়াটার, অক্সিজেন-এর সঙ্গে

অক্ষয়ের সত্তা মিশে গেছে।

'কখন সেন্স আসবে?' ফিসফিস করে রামানন্দ একবার প্রশ্ন করেছিল।

তরলা ঘাড় ফেরায়নি। ঘড়ির দিকে চোখ রেখে অল্প মাথা নেড়েছিল। 'মনে হয় না রাত বারোটার আগে, পালস্-টেম্পারেচার যতক্ষণ না নর্মাল হয়ে—' বলতে বলতে তরলা থেমে যায়, অক্ষয়ের ডান কব্জির শিরায় বেঁধানো সূঁচটা নড়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি ওদিকে ঝুঁকে তরলা সেটা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর কিছু প্রশ্ন না করে রামানন্দ আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে এই বেঞ্চিতে বসেছে। একটু পরে আবার ভিতরে গেছে। আবার বেরিয়ে এসেছে।

এখন আর বেঞ্চি ছেড়ে তার উঠতে ইচ্ছে করছিল না, আকাশের টকটকে লালটা খানিকটা ফিকে হয়ে হলুদ রং ধরেছে, কিন্তু অল্প সময়ের জন্য। দেখতে দেখতে হলুদটা কালচে হয়ে গেল। তার মানে অন্ধকার হচ্ছে। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের দিক থেকে একটি শিশুর কান্নার চিৎকার ভেসে এল। সেদিকে ঘাড় ফেরাতে গিয়ে রামানন্দ নিরস্ত হল। তরলা কেবিন থেকে বেরিয়ে পা পা করে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'এখানে বসে আছেন?'

'হুঁ', রামানন্দ পিঠ সোজা করে বসল।

অন্ধকার হয়ে আসা বাইরেটা দেখল তরলা। হাসপাতালের সব আলো এখন জ্বলে উঠবে।

'শুনুন', রামানন্দর দিকে তরলা ঘাড় ফেরাল, 'আপনি কি জানেন অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর আজ হাসপাতালে আসার কথা ছিল?'

'হুঁ, জানি বইকি।' খুব চমকে উঠল রামানন্দ, যদিও তখনি সামলে নিল, তরলার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল। 'বিকেলে তাঁর আসার কথা।'

'কই, এলেন না তো?'

'তাই তো দেখছি।' বোকা বোকা চোখ করে রামানন্দ বাইরের দিকে তাকাল। আশ্চর্য, মাধুরীর কথাটা এতটা সময়ের মধ্যে আর একবারও ভাবেনি সে। তখন বাইরে মাঠে বসে খুবই মনে হয়েছে। শফীকে নিয়ে আজ অক্ষয়ের স্ত্রী অক্ষয়কে দেখতে আসছে। কিন্তু কেবিনে এসে অক্ষয়ের এই অবস্থা দেখার পর কথাটা সে একেবারে ভুলে গেছে।

'উনি আপনাকে কিছু বলেননি?' তরলা আবার প্রশ্ন করল। 'আজ অক্ষয়-বাবুর অপারেশন উনি জানেন নিশ্চয়?'

'হুঁ, জানেন বইকি, খুব জানেন, এত বড় কথাটা কি বন্ধুপত্নী মানে অক্ষয়ের ওয়াইফের কাছে আমি গোপন রাখব ভেবেছেন?' বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল রামানন্দ। 'আগে বলিনি, কিন্তু পরশু বলেছি, কাল রাতেও। দু'বার বলেছি, বিশেষ করে কাল অক্ষয় নিজে যখন আমায় বলে দিলে স্ত্রীকে তার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'আজ সকালেও শুনলাম থিয়েটারে যাবার আগে অক্ষয়বাবু মিস তালুকদারকে বলেছিলেন।'

'কি বলেছিল অক্ষয়?' রামানন্দর গলাটা উঁচু করে ধরল।

'তাঁর স্ত্রী বিকেলের দিকে এখানে আসবেন।'

'হুঁ, আমি তো খুব সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, অক্ষয়ের ওয়াইফ আমায় তখন বললে বিকেলে একটি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে চলে আসবে।'

তরলা চুপ করে রইল। হাসপাতালের ভিতর ও বাইরের সব ক'টা আলো জ্বলে উঠেছে।

'আপনি কি মনে করেন, ওঁর মানে আমার বন্ধুর স্ত্রীর আসার জরুরী দরকার?'

'আপনি একটা ফোন করে দিতে পারেন?'

'মানে তাঁর স্ত্রী যাতে চলে আসে?'

কথা না বলে তরলা আস্তে থুতনিটা নাড়ল।

'কিন্তু অক্ষয়ের বাড়িতে টেলিফোন নেই, ওই তল্লাটে টেলিফোনের লাইনই যায়নি, লবণ হ্রদ, চারদিকে ধুধু বালি, বুঝতে পারছেন?' বেঞ্চি ছেড়ে রামানন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল।

তরলা আর কিছু বলছিল না।

'তা হলে কি আমিই এখন চলে যাব, গিয়ে ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব, এখনো যখন এসে পেঁাছোল না?'

'দেখুন যা ভাল বোঝেন।' সংক্ষেপে কথাটা সেরে তরলা কেবিনের দরজার দিকে ঘুরে গেল।

'অক্ষয় এখন কেমন? নিশ্চয় সেন্স ফেরেনি?'

'না, একই রকম আছেন।' এদিকে আর তাকাল না তরলা, ভিতরে ঢুকে পড়ল। রামানন্দ আর ভিতরে গেল না। কপাল কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে তিন-চার সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নিচে চলে এল। বউবাজারের মোড়ে পেঁাছে কপালগুণে তখনই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। সেই ভাল, চিন্তা করল সে, বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলে দেরি হবে, ট্যাক্সি নিয়ে সে লবন হ্রদের দিকে ছুটল। ক'টা টাকা বেরিয়ে যাবে সত্য, এত ভাবতে গেলে চলবে না এখন। এখন ট্যাক্সি ভাড়াটা সেই দেবে—যদি মাধুরী হাসপাতালে আসে এই ট্যাক্সি নিয়েই আসতে হবে—তখন না হয় মাধুরীর কাছ থেকে ভাড়াটা চেয়ে নেওয়া হবে। এখন অক্ষয়ের বাড়ি পর্যন্ত যেতে ছ-সাত টাকার কম নেবে না বেটা। হালুইকরের দোকানে একটা টাকা খরচ হয়েছে, কাজেই, রামানন্দ মনে মনে হিসাব করে দেখল—বারো টাকার মতন তার থেকে যাচ্ছে। না, কলমের কুড়ি টাকা বাদ দিয়ে আগের কিছু খুচরো ছিল। সুতরাং সব মিলিয়ে যা থাকছে যথেষ্ট, মদ খাওয়া তার আটকাবে না। আজ খেতে পারবে, কাল খেতে পারবে, পরশুও খেতে পারবে। পরশুর পরে কি হবে সে ভাবতে চায় না। হালুইকরের দোকান থেকে বেরিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিল, নিশ্চিন্ত হয়ে সে সিগারেট ধরাল। যদি মাধুরী আসে তো তাকে হাসপাতালে পেঁাছে দিয়ে একটু চা খেতে যাচ্ছি বলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা মদের দোকানে চলে যাবে। যা হোক একটু গলায় ঢেলে আবার হাসপাতালে ফিরে গেলেই চলবে। হুঁ, সময় থাকবে, ট্যাক্সি করেই তো যাচ্ছে, যেতে চল্লিশ প'য়তাল্লিশ মিনিট—আবার লবণ হ্রদ থেকে মেডিকেল কলেজে ফিরতে চল্লিশ প'য়তাল্লিশ মিনিট। স্পীডে নিয়ে গেলে আরও কম লাগবে। এখন সওয়া ছ'টা। কাজেই পৌনে সাতটা আটটার মধ্যেই হাসপাতাল থেকে আবার সে বেরিয়ে আসতে পারবে খুব। মোটের ওপর গলা না ভিজিয়ে সে থাকতে পারবে না, যে যতই বলুক। কিন্তু অবাক লাগছিল তার অক্ষয়ের স্ত্রীর কথা ভেবে। কেমন আক্কেল! স্বামী হাসপাতালে মরছে, তিনি আসবেন না—কেন? না, হাসপাতাল আমার ঘেন্না করে, ভয় করে।

রামানন্দ জোরে জোরে সিগারেটটা টেনে শেষ করে গাড়ির জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিল। রেল-ব্রীজের পর থেকে বেশ স্পীড নিয়ে ছুটছিল ট্যাক্সি। মনে মনে লোকটার ওপর সে খুশি হল।

হ্ঁ, রামানন্দ আবার চিন্তা করল, যদি শফী আজ অক্ষয়ের বাড়ি না গিয়ে থাকে? সেটাও একটা কথা হতে পারে। কেননা শফীকে নিয়ে অক্ষয়ের স্ত্রীর হাসপাতালে আসার কথা ছিল। শফী না গেলে একলা তার হাসপাতালে আসা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কিন্তু তা মনে হয় না। কাল যখন যায়নি, আজ ছোঁড়া দিদির কাছে যাবেই। তবে কিনা ইয়াকুব যেমন চটে গেছে, চটবারই কথা, ইয়াকুবের ভাষায় 'আর্ট' করছে ছোঁড়া, ছবি আঁকছে, পুতুল গড়ছে, কারবারীর সন্তান কার-বারের দিকে মন নেই। শুনে রামানন্দরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে রামানন্দর যদি ছেলে হতো তো শেয়ালটার হাড়গোড় অনেকদিন আগেই সে চুরমার করে দিত। কাজেই বুড়ো যে তার গুণধর লেড়কাকে পরে আরও মারধর করেনি, গালিগালাজ করেনি, নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। যদি রাগ করে, অভিমান করে বেটা বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হয়তো বেলেঘাটা আর গেলই না।

রামানন্দ আর একটা সিগারেট ধরাল। ঐ তার দোষ। সিগারেটের যে খুব একটা ভক্ত সে তাও নয়। কিন্তু পকেটে যতক্ষণ আছে টেনে যাবেই।

তাই তো, রামানন্দ এবার ভাবল, মনতাজকে নিয়ে মাধুরী চলে আসতে পারত। কিন্তু মনতাজ যদি আজ বেলেঘাটা না গিয়ে থাকে? মেটিয়াবুরুজের ছেলে মেটিয়াবুরুজ ফিরে যেতে পারে।

মাধুরীর হাসপাতালে না আসা নিয়ে নিজে নিজে কয়েকটা প্রশ্নই করল রামানন্দ। কিন্তু একটারও সদুত্তর না পেয়ে মুখটা গম্ভীর করে সিগারেট টানতে লাগল।

'আর যাবে না গাড়ি।'

'না, আর যাবে না।' ট্যাক্সিওয়ালার কথায় সায় দিল রামানন্দ। 'এর পরে শুধু বালি—বালির ওপর দিয়ে গাড়ি চলবে না, চাকা বসে যাবে।' ভাড়া মিটিয়ে দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল। ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে লোকটা চলে গেল। রামানন্দ হাঁটতে আরম্ভ করল। ফাঁকায় এসে হাওয়াটা চমৎকার লাগল।

কালকের সেই হলুদপোড়া চাঁদটা আজ আবার উঁকি দিয়েছে। আজ আরও চমৎকার চেহারা ধরেছে। যেন কোথা থেকে মুখে এক পোঁচ কালি লাগিয়ে এসেছে। নিশ্চয় কারো হাঁড়িতে মুখ ঢোকাতে গিয়েছিল বেটা! কথাটা চিন্তা করে রামানন্দ নিজের মনে একটু হাসল। বালুর রাস্তাটা শেষ করতে বেশি সময় লাগল না তার, বড় বড় পা ফেলে হাঁটছিল। কিন্তু অক্ষয়ের বাড়ির সীমানায় পেঁছে থমকে দাঁড়াল। মনসা গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে এক থোকা জোনাকি নাচানাচি করছে। অক্ষয়ের ঘরদোর বড় বেশি নিরিবিলি, বেশি চুপচাপ। কেমন যেন একটা ঝিমোনির ভাব।

তা চুপচাপ তো থাকবেই। অক্ষয়ের কি গণ্ডা দেড়েক আণ্ডাবাচ্চা আছে যে চেঁচামেচি করবে, রামানন্দ সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করল; মাধুরীর শ্বশুর শাশুড়ি দেওর কি ঝগড়াটে একটি ননদ থাকলেও কথা ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা হাঁকডাক, কথাবার্তা চেল্লাচেল্লির ঠেলায় কানে তালা লাগত। একেবারে ঝাড়া হাত-পা নিয়ে মাধুরীর সংসার। তাও আবার কর্তাটি হাসপাতালে।

লক্ষণ দেখে রামানন্দর মনে হল না শফী বা মনতাজ কেউ বাড়ি আছে। কাজেই একা একা সন্ধ্যাবাতি লাগতেই অক্ষয়ের স্ত্রী যদি ঝিমোতে থাকে, বলার কিছু নেই। ঈশ্বর জানে মেয়েটার কপালে কি আছে! অর্থাৎ অক্ষয়ের কথা চিন্তা করে রামানন্দ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

হুঁ, এই পর্যন্ত রামানন্দর চিন্তা-ভাবনাটা সুন্দর ছিল। স্বাভাবিক ছিল।

মনে কোনোরকম গোলমাল ঘোরপ্যাচ ছিল না। হঠাৎ যে তার মাথায় কেন দুর্বুদ্ধি এল!

অন্যদিন মনসা গাছটার কাছে থাকতেই সে হাঁকডাক আরম্ভ করে বা কেশে গলা খাঁকার দিয়ে জানান দেয় যে সে বাড়ি ফিরেছে। আজ সেসব কিছুই করল না।

মাধুরীর শোবার ঘরে আলো জ্বলছে অথচ দোরটা ভিতর থেকে বন্ধ। এই দেখে কি চোরের মতন পা টিপে টিপে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সে উঁকি দিতে গিয়েছিল! তা কতদিনই তো মাধুরীর ঘরে এভাবে আলো জ্বলে, ভিতর থেকে দোরও বন্ধ থাকে। সেটা কথা না।

আসলে চিরকালের যেটা সত্য—সেই বহু-কথিত বহু-পঠিত উক্তি রামানন্দ ভুলে গিয়েছিল। স্ত্রী জাতিকে উঁকি দিয়ে দেখতে নেই। উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে পুরুষ বার বার ঠকেছে, হোঁচট খেয়েছে। মেয়েদের দেখে তোমরা পুরুষ কেবল মুগ্ধ হবে পুলকিত হবে। কৌতূহলেব চোখ নিয়ে আড়াল থেকে তাদের একটির দিকেও তাকাতে গিয়েছ কি মরেছ!

রামানন্দর অবস্থা তাই হল। বন্ধ জানালার কাছে বেড়ার একটা ফুটোর গায়ে বাঁ-চোখটা চেপে ধরে সে শিউরে উঠল। একটা বেশ বড় আলো জ্বলছে ভিতরে। হ্যাজাক লণ্ঠন। রামানন্দ চিনল। এই জিনিস অক্ষয়ের ঘরে ছিল না। বোঝা গেল বাইরে থেকে আমদানী। তাই তো, দিনের আলোর মতন ঝকঝকে আলো না হলে এখন চলত কি করে। ইলেকট্রিক আলো নেই, অক্ষয়ের টিমটিমে হ্যারিকেনে সব কিছু এত উজ্জ্বল প্রখর হয়ে ফুটে উঠত না যে। সুতোগাছাও নেই মাধুরীর অঙ্গে। একেবারে বিবসনা। উঁহু, করালবদনা কালী নয়। তা হলে পিঠময় চুল ছড়িয়ে দিত, লাল টুকটুকে জিভ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরত। বা নওলকিশোর অ্যাডনিসের সামনে একগলা কামনা-বাসনা নিয়ে গনগনে কয়লার মতন লাল উত্তপ্ত হয়ে দেবী ভিনাসেব জ্বলন্ত থাকার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিও এ নয়—এমন কিছু দেখলেও যেন রামানন্দ শান্তি পেত, নিজেকে সান্তনা দিত। এ যে মোহিনী মডেল হয়ে অক্ষয়-গিন্নী দাঁড়িয়ে আছে গো। মুখে পলাশরাঙ্গা হাসি। বোঝা গেল বিকেলে পান খেয়ে খুব করে ঠোঁট রাঙিগয়েছিল। টান করে খোঁপা বাঁধা। এভাবে খোঁপা না বাঁধলে ঘাড় গলার সব ক'টা রেখা নিখুঁত হয়ে তুলির আগায় ধরা পড়বে কেন। সামনে এত বড় ইজেল দাঁড় করিয়ে রাজাবাজারের শেয়ালটা ঘাড় গুঁজে পাগলের মতন উলঙ্গ মাধুরীকে এঁকে চলেছে।

রাগ করল না রামানন্দ। রাগ করত সে কার ওপর! একজনের শিল্প-ভাবনার ওপর আর একজনের হাত নেই। আমার ছবি, কল্পনা, আমার রূপতৃষ্ণা, আমার কান্না, আমার গান আব কেউ বুঝবে না, বোঝা উচিত নয়—এই জিনিসই সেদিন পাইকপাড়ার সভায় গলা বড় করে রামানন্দ বলে এসেছিল না?

বেড়াটা ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে সে উঠোনের মাঝখানে সরে এল।

তার দুঃখ হচ্ছিল জগত মণ্ডলের জন্য, নন্দদুলালের জন্য। অক্ষয়ের রূপসী স্ত্রীকে নিয়ে গল্প লিখতে ছবি আঁকতে চেয়েছিল তারা, আর এই নিয়ে সেদিন মেলার মাঠে কত রূঢ় কথাই না দুজনকে শোনাল, নন্দর সঙ্গে তো রীতিমত যুদ্ধ লেগে গেল।

উঁহু, হাঁটু ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল না রামানন্দ। আস্তে আস্তে মনসা গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। তার মনে হচ্ছিল তার বুকের ভিতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। অনেক কিছু হারিয়ে, অনেক কিছু ছেড়েছুড়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে একটা মূল্যবান পুঁজি বুকে নিয়ে প্রকাণ্ড আকাশের

নিচে বিস্তৃত বালুর মাঠের এক প্রান্তে মাদার ঝোপে ঘেরা ছোট্ট এই টালির বাড়িটায় বড় প্রসন্ন মনে দিন কাটাচ্ছিল সে। ইয়াকুবের ছেলে দু' হাতে তার পুঁজিটুকু কেড়ে নিল।

॥ ৪১ ॥

'আমরা এসে গেছি স্যার।'

রামানন্দ চমকে উঠল। মনসা গাছের নিচে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। তাই তো, কালকের সেই ছেলে দুটি না? 'কি খবর!' গলার স্বরটা সে হালকা করতে চেষ্টা করল।

'বলেছিলাম আজ আবার আসব।' দু'জন এক সঙ্গে রামানন্দর সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমরা কথা রেখেছি।'

'চমৎকার, চমৎকার—এদিনে ক'টা মানুষ কথা দিয়ে কথা রাখে!' রামানন্দ হাসল, হাসতে পারল। 'তারপর?'

'আজ আবার আপনার জন্য উপহার এনেছি।' দুজনের কাঁধে দুটো থলে ঝুলছিল। দেখে খুশি হয়ে রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল।

'বেশ বেশ, বোতল এনেছ? আসল জিনিস?'

'নিশ্চয়। তাই তো আনব বলে গিয়েছিলাম স্যার।'

'বাড়ির রান্না করা ভাল খাবার?'

'তা-ও এনেছি।'

'গুড। চলো আমরা একটু এগিয়ে যাই। ওই যে চাঁদের আলোয় খালের জল চিকচিক করছে।' রামানন্দ আঙুল তুলে দেখাল। 'ওখানে ঘাসের ওপর আসর জমবে ভাল।'

'কেন, আপনার ঘরে বসা যায় না! চমৎকার ঘর—কালকের মতো মাটিতে মাদুর বিছিয়ে তিনজন গোল হয়ে বসব!' এক নম্বর ছেলেটি বলল।

'উহুঁ', ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে একবার দেখে রামানন্দ বড় করে নিশ্বাস ফেলল। 'ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই, এখন ঘরে গিয়ে বসলেই দেরি হয়ে যাবে।'

'আপনি কি কোথাও বেরোচ্ছেন স্যার?' অবাক হওয়ার মতন গলার সুর করল দু' নম্বর ছেলেটি। থলেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল।

দেখাদেখি এক নম্বরও কাঁধের থলে হাতে নিল। 'তাই মনে হচ্ছে। আপনার যেন কোথাও যাবার তাড়া আছে স্যার?'

'হুঁ।' চোখ তুলে রামানন্দ আকাশ দেখল। কালকের মতনই কালচে হলদে রং কাটিয়ে চাঁদটা রুপো রুপো চেহারা ধরছে। একটু দেরি হচ্ছিল যদিও। 'তাড়া আছে', রামানন্দ চোখ নামিয়ে দু'জনের মুখের দিকে তাকাল। 'আমাকে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে, আমার বন্ধুটির আজ অপারেশন হয়েছে।'

'হাইড্রোসিল?' এক নম্বর প্রশ্ন করল।

'অ্যাপেণ্ডিসাইটিস!' দু নম্বর বিড়বিড় করে উঠল!

রামানন্দ মাথা নাড়ল।

'গ্যাসট্রিক আল্‌সার—পেট অপারেশন হয়েছে।'

'তাই বলুন।' ছেলে দুটি হালকা নিশ্বাস ফেলল, হালকা গলায় হাসল। 'অর্ডিনারী কেস, গ্যাসট্রিক আলসার, রাতদিন এই ব্যারাম হচ্ছে লোকের, অপারেশনও হচ্ছে খুব—এর জন্য আপনি ঘাবড়াচ্ছেন!'

'এখনো সেন্স ফেরেনি।' গম্ভীর গলায় রামানন্দ বলল।

'ফেরেনি, ফিরতে কতক্ষণ!' এক নম্বর চোখ আড় করে দু' নম্বরের দিকে তাকাল। দু' নম্বর রামানন্দর মুখের ওপর চোখ রাখল। 'বরং আপনি একটু খেয়েটেয়ে নিন, দেখে মনে হচ্ছে ভারি টায়ার্ড আপনি, বন্ধুর জন্যে খুব ছুটো-ছুটি করতে হচ্ছে বুঝি?'

'খুব।' রামানন্দ এক সেকেন্ড কিছু চিন্তা করল। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'তাই ভাল, বোতলটা বের কর, একটু গলায় ঢেলে নি—হুঁ, বেজায় ছুটোছুটি করতে হচ্ছে অক্ষয়ের ব্যাপারে, আর এই দুশ্চিন্তা, আমি আর পারছি না।'

'আপনি একদম চিন্তা করবেন না স্যার।' এক নম্বর তার থলে থেকে বোতল বের করে রামানন্দর হাতে তুলে দিল। 'এসব অপারেশন কেস্ কিছু না—'

দু' নম্বর তার থলে থেকে এত বড় টিফিন ক্যারিয়ার বের করল। 'আপনার জন্য বাড়ি থেকে রান্না করিয়ে এনেছি, মুর্গির মাংস, ব্রেস্ট কাটলেট, ফিশ ফ্রাই।'

'ও-সব এখন থাক।' হুইস্কির বোতলটা জ্যোৎস্নার মধ্যে তুলে ধরে রামানন্দ দেখছিল। বোতলের মুখের রাংতা চিকচিক করছে। 'প্যাঁচটা ঘরে রেখে এসেছি, এটা এখন খুলি কি করে, মুখটা?'

'আপনি বরং এক কাজ করুন স্যার—ঘরে গিয়ে যখন বসতে চাইছেন না, আমাদের গাড়িতে চলে আসুন—প্যাঁচ গ্লাস সোডা সবই সেখানে পাবেন। গাড়িতে বসে একটু খেয়ে নেবেন।'

'সে কি! তোমরা গাড়ি নিয়ে এসেছ!' রামানন্দ খুশি হল। 'তবে তো কথাই নেই, তোমাদের গাড়িতে করে আমি হাসপাতালে চলে যেতে পারব।'

'হুঁ, তা যাবেন।' দু' নম্বর ঘাড় কাত করল। 'কিন্তু আমরা ভেবেছি কি, তার আগে আপনাকে ওখান থেকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। খুব একটা সময় লাগবে না।'

'কোথায়!' রামানন্দ অবাক হবার চেহারা করল। 'কোথায় ঘুরতে যাব শুনি?' ধমকের মতন শোনাল তার গলা।

'আপনি ভুলে গেছেন স্যার।' দু' নম্বর চাপা গলায় হাসল। 'এখানে ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি হুটহাট পাওয়া যায় না, যে জন্য বাবার ল্যান্ডমাস্টারটা চেয়ে নিয়ে এলাম—আপনাকে নিয়ে একজনের কাছে যাব, কাল সেরকম কথা ছিল যে।'

'মাই গড্।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। এখন বুঝল। 'হুঁ, হুঁ, মনে আছে।' অল্প হাসল সে। 'কিন্তু কিন্তু—' সঙ্গে সঙ্গে সে গম্ভীর হয়ে গেল। 'অক্ষয়কে এই অবস্থায় ফেলে এসেছি—হাসপাতালে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু দেরি হবে না—শহরের বাইরে তো আর আমরা যাব না, যার কাছে যাচ্ছি কলকাতার ভেতরেই সুন্দর একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে।'

'কতক্ষণের আর ব্যাপার!' এক নম্বর বলল, 'ওখান থেকে বেরিয়ে এই গাড়ি করে আমরা আপনাকে মেডিকেল কলেজে পৌঁছে দেবো।'

'তা ছাড়া বললাম তো, খুব একটা ভাববার কিছু নেই, রাতদিন হচ্ছে এ সব অপারেশন।' দু' নম্বর তার হাতের থলে আবার কাঁধে তুলে নিল। 'বরং যেমন একটা স্ট্রেন যাচ্ছে আপনার শরীরের ওপর, মনের ওপর—একটু রিলাকসেশনের দরকার—একটু হুইস্কি খেতে খেতে ওখানে চলে যাওয়া যাবে—দরকার হলে ওখানে বসে আর একটু খাবেন, সব ব্যবস্থাই আছে তার কাছে—ফাইন লেডি—হুঁ, আমি লেডিই বলব, যেমন চমৎকার আলাপ-ব্যবহার—ব্যস্, একটু বিশ্রাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে ফিরে এলেই চলবে।'

'ক'টা বাজে এখন তোমার ঘড়িতে?' রামানন্দ এক নম্বর ছেলেটির দিকে তাকাল, তার হাত-ঘড়ির কাঁটা জোনাকীর মতন জ্বলছে।

'সাতটা চল্লিশ।' ছেলেটি ঘড়ি দেখল।

'কিছুই রাত হয়নি', দু' নম্বর সামান্য কাশল। 'ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা ফিরে আসতে পারব—রাস্তায় আপনাকে হাসপাতালে নামিয়ে দিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হবে না।'

'হুঁ', এক নম্বর মাথা ঝাঁকাল। 'এসে দেখবেন আপনার বন্ধুর সেন্স ঠিক ফিরে এসেছে।'

'কোথায়, গাড়ি কোথায় তোমাদের?' রামানন্দ এদিক-ওদিক তাকায়।

'ওই তো!' এক নম্বর আঙুল দিয়ে দেখাল। 'একেবারে বালুর কাছে আমরা গাড়িটা নিয়ে এসেছি।'

রামানন্দ দেখল ফণিমনসার একটা ঝোপের কাছে বিরাট ল্যান্ডমাস্টার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। 'এটা খুব ভাল করেছ—ট্যাক্সি নিয়ে বেটারা এতটা রাস্তা আসে না।'

'আমরা এসেছি স্যার, আসতে পেরেছি। চলুন আর দেরি না।'

কথা না বলে রামানন্দ দুজনের সঙ্গে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

'তোমরা বলছ অক্ষয়ের সেন্স শীগগির ফিরে আসবে?'

'নিশ্চয়ই। আসতেই হবে, গ্যাসট্রিক কেস, পেট অপারেশন হয়েছে—এই নিয়ে আজকাল কেউ একটা মাথা ঘামায় না।' এক নম্বর পিছনের দরজা খুলে দিল। রামানন্দ দু' নম্বর ছেলেটিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। এক নম্বর সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে স্টীয়ারিং-এ বসল।

'এই যে স্যার স্ক্রু, গেলাস।' দু' নম্বর এক সঙ্গে দুটো জিনিস রামানন্দর হাতে তুলে দিল।

'সত্যি, তোমাদের মতন ভক্ত আর আমি পাইনি।' ছিপিটা খুলে ফেলে রামানন্দ আর গেলাসে ঢালল না। মুখের কাছে বোতল তুলে ধরে গলায় ঢালল।

'সোডা আছে স্যার।'

'দরকার নেই।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল।

'কাল সোডা ছাড়াই খেয়েছেন—আজও স্যার র খাবেন।' এক নম্বর একটু একটু করে গাড়ির স্পীড বাড়াতে লাগল।

'সিগারেট দাও।'

এক নম্বর বাঁ হাতে একটা সিগারেটের প্যাকেট তুলে এদিকে চালান দিল।

'তোমরা একটু খাবে না?' বোতলটা কোলের কাছে কেমন কায়দা করে যেন দাঁড় করিয়ে রেখে রামানন্দ সিগারেট ধরাল।

'আমরা আসবার সময় একটু খেয়েছি স্যার—এই বোতলটা আপনি একলা খান—আপনার এখানে আসতে আসতে গাড়িতে বসে একটা পাঁইট দুজনে শেষ করেছি।'

'সে আমি বুঝতে পেরেছি। গোড়াতেই তোমাদের মুখে গন্ধ পেয়েছি।' রামানন্দ গলার নিচে হাসল। 'তা না হলে আর গাড়িতে বোতল গেলাস ছিপি-খোলার যন্ত্রপাতি রাখার ঘটা!'

'আপনার জন্য ভাল প্যাস্ট্রি এনেছিলাম—একটা কামড় দিয়ে দেখবেন স্যার?'

'ধ্যেৎ, এখন পানীয় ছাড়া কিছুই চলবে না।' সিগারেট ফেলে দিয়ে রামানন্দ আবার মুখের কাছে বোতল তুলে ধরল।

'হুঁ, খাবার-দাবার যা সেখানে গিয়েই হবে।' সামনে লাল বাতি দেখে এক

নম্বর গাড়িটা দাঁড় করালো।

'আর সিগারেট দেবো স্যার!' দু' নম্বর আস্তে বলল। বোতলটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে রামানন্দ চেহারাটা বিকৃত করে জোরে মাথা ঝাঁকাল।

'এইবেলা একটু সোডা মিশিয়ে খেলে পারতেন।'

'চুপ কর, দেখছ সোডা ছাড়াই আমি দিব্যি খেয়ে যাচ্ছি—এখন কথা বলো না।'

দুজন কথা বলল না। গাড়ি ফুল স্পীড নিয়ে ছুটছিল।

'এটা কোন্ রাস্তা!' রামানন্দর জিভ একটু জড়িয়ে এল।

'লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে আমরা থিয়েটার রোডে ঢুকলাম!'

'আমরা সাউথে যাচ্ছি, তাই না?' রামানন্দ জানালার বাইরে চোখ রাখল।

'সাউথে যাচ্ছি স্যার।' এক নম্বর উত্তর করল। এবং মনে মনে হাসল। কেননা এতক্ষণ পর কবি রামানন্দ সেনের খেয়াল হয়েছে তিনি সাউথে যাচ্ছেন।

'হুঁ, এখনো সাউথেই বেশির ভাগ বনেদী মানুষ থাকে। কি বলো?' রামানন্দ গলার স্বর বাড়িয়ে দিল।

'তা ছাড়া আর কি।' দু' নম্বর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, 'যার কাছে যাচ্ছি সে-ও বনেদী ঘরের মেয়ে—বা বউ, অন্তত এককালে ছিল।'

'দাও, সিগারেট দাও।' সিগারেটের জন্য রামানন্দ হাত বাড়াল, কিন্তু তখনি আবার বোতলটা মুখের কাছে তুলে ধরল। 'দাঁড়াও, এটুকু ঢেলে শেষ করে দি।'

'আর একটা বোতল আছে স্যার।'

'এখন আর না।' খালি বোতলটা পায়ের কাছে ফেলে রেখে রামানন্দ সিগারেটের জন্য হাত বাড়াল। 'ওখানে পেঁাছোবার আগেই দেখছি আমার নেশা লেগে যাচ্ছে।'

'তাই তো লাগবে স্যার, নেশার চোখ নিয়ে আমরা তার কাছে যাচ্ছি।' দু' নম্বর গলা ছড়িয়ে হেসে রামানন্দর হাতে সিগারেট তুলে দিল।

'ঠিক হল না হে বন্ধু!' সামনের সীট থেকে এক নম্বর বলল, 'বরং বলো চোখে রং নিয়ে আমরা একটি রঙিন মানুষের কাছে যাচ্ছি।'

'হুঁ, এটা বলেছ ভাল।' পিঠ এলিয়ে দিয়ে রামানন্দ আধ-বোজা চোখে সিগারেট ধরাল। 'আহা, রঙিন মানুষ—মনে হয় খুবই এক সুন্দরীর কাছে আজ আমরা যাচ্ছি।'

'বা-রে, সুন্দরের সাধক আপনি, কবি রামানন্দ সেনকে কি আমরা পেঁচি-খেঁদি মানে কেলেকুচ্ছিত কারো কাছে নিয়ে যাব! বলেছি তো, ও-সব হাড়কাটা-ফাড়কাটার মাল না।'

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আধ-বোজা চোখেই রামানন্দ হাসল।

'তোমরা যেমন বলছ, মনে হয় আমার ফ্রেন্ড অক্ষয়ের বউ-এর চেয়েও সুন্দরী কোনো মেয়েমানুষের কাছে আমাকে নিয়ে চলেছ।'

'তাই তো, স্যার।' দু' নম্বর পিঠ টান করে বসল। 'আপনার ফ্রেন্ডের ওয়াইফের চেয়ে সে অনেক বেশি সুন্দরী।'

'চুপ কর!' টকটকে লাল চোখ নিয়ে রামানন্দ দু' নম্বরের দিকে তাকাল, ধমক লাগাল। 'তোমরা কি অক্ষয়ের বউকে কাল দেখেছিলে?'

'কেন বাজে বকছিস তুই।' ওদিক থেকে এক নম্বর নরম গলায় বলল, 'না স্যার, আপনার ফ্রেন্ডের গিন্নীকে কাল আমরা দেখিনি, দেখার কোনো স্কোপ ছিল না, তিনি রান্নাঘরে মুর্গির মাংস পাক করছিলেন—তবে তাঁর গলার আওয়াজ শুনেছি, খুব মিষ্টি গলা।'

'হুঁ, তাই বলো।' যেন রামানন্দ তুষ্ট হল। দাঁত বের করে হাসল। 'মিষ্টি গলা—যাকে বলে মধুক্ষরা গলা মাধুরীর।'

গাড়িটা একটা বাঁক ঘুরল।

'কিন্তু মনে হয় অক্ষয়ের সেন্স আর ফিরবে না।' রামানন্দ তখনি আবার গম্ভীর হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ওকথা বলবেন না স্যার।' এবার যথেষ্ট বিনয় নিয়ে দু' নম্বর বলল, 'আকছার এখন পেট অপারেশন হচ্ছে—'

'হুঁ,' ওপাশ থেকে এক নম্বর বলল, 'আপনি হসপিটালে ফিরে গিয়ে দেখবেন অক্ষয়বাবু চোখ মেলে তাকিয়েছেন।'

'না না না।' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'তখন নার্সের কথায় বুঝলাম অক্ষয়ের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। সন্ধ্যা ছ'টায়ও পাল্‌সের স্বাভাবিক গতি ফিরে আসেনি।'

গাড়ির ভিতরটা একটু সময়ের জন্য থমথমে হয়ে রইল। বাইরে রাস্তায় আলোর ছড়াছড়ি, শব্দের ছড়াছড়ি। ট্র্যাফিক জ্যাম্‌। গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল।

'আমার মনে হয় অক্ষয় বাঁচবে না, তোমরা যত কথাই বলো, ঠিক মরবে।'

'যদি তাই বলেন স্যার', এক নম্বর ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাল, 'জীবন যেমন সুন্দর তেমনি মৃত্যুকে তো কবি রামানন্দ কম সুন্দর করে দেখেননি, আঁকেননি!'

'চুপ কর।' ধমকের গলায় রামানন্দ গজগজ করে উঠল। 'সে তোমাদের রবিঠাকুর—মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' হাত নেড়ে ভেংচি কেটে রামানন্দ আবৃত্তি করল। ছেলে দুটির এত হাসি পেল, তা হলেও ধমক খাবার ভয়ে চেপে রাখল।

'আমাদের রবিঠাকুর হতে যাবে কোন্‌ দুঃখে, স্যার।' ভালমানুষী গলায় দু' নম্বর বলল, 'আমাদের বাপ-কাকাদের রবিঠাকুর, আমাদের হল গিয়ে কবি রামানন্দ সেন—'

'হুঁ,' ওপাশ থেকে এক নম্বর আবৃত্তি করলঃ

'কেউ না থাক আমার
মৃত্যু আছে
অবহেলিত প্রেয়সী,
কালো বটে, কুরূপাও খুব
তবু ভাল
ঠান্ডার রাতে
মোহময়ী বালাপোশ।'

'তোমার মুণ্ডু তোমার মস্তক!' রামানন্দ আগের চেয়েও বড় করে ভেংচি কাটল। 'মস্ত এক কবিতা বুঝনেঅলা আদমী তুমি।' উত্তেজনায় রামানন্দ কাঁপছিল, লাল চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতন অবস্থা। 'আরে গর্দভ', হাত নেড়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'এই মৃত্যু আমার জন্যে, মৃত্যুর মোহ রামানন্দ সেনের, চোদ্দ বছর আগে যে মরতে চেয়েছিল—তা বলে অক্ষয় মরবে কেন, কোন্‌ দুঃখে—যার ঘরে এত সুন্দর মাধুরী আছে!'

ছেলে দুটি কথা বলছিল না। গাড়ি ছুটছিল।

'হুঁ,' রামানন্দ চুপ ছিল না, যেন একটা চাপা কান্নায় তার গলার স্বর এবার বিকৃত হয়ে উঠল। 'অক্ষয় হাসপাতালে মরছে, এক শয়তান তার মাধুরীকে ন্যুড্‌ করে মডেল করে ছবি আঁকছে—অহো-হো-হো—'

'এখানেই তো ট্র্যাজেডী, স্যার।' এক নম্বর ছেলেটি বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়ল। 'এই জন্যই বলে কিনা শিল্প নিষ্ঠুর, শিল্পীর কাছে দয়া মায়া মমতা

বলে কিছু—'

'এই উল্লুক!' রামানন্দ আবার গর্জন করে উঠল। 'আমায় তত্ত্ব শোনাবে না। শিল্প—এমন শিল্পের মাথায় লাথি মারি, শিল্পীর মুখে পেচ্ছাব করি—'

'এই অসিত, চুপ! বড় বেশি বকছিস।' দু' নম্বর রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'স্যার, এ-সব নিয়ে আপনি আর একদম ভাববেন না, আপনার মনের ওপর শরীরের ওপর ভয়ানক স্ট্রেন্ যাচ্ছে, রিলাকসেশনের দরকার এখন আপনার, একটু আনন্দ—'

'হুঁ', ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গী নিয়ে রামানন্দ আবার পিঠ এলিয়ে বসল। 'তাই আমি বলতে চেয়েছিলাম, যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমি আনন্দ করতে ফুর্তি করতে যাচ্ছি, সেখানে আমি একবারের জায়গায় দশ বার ন্যুড দেখব, মেয়েছেলের উলঙ্গ শরীর দেখব—কেননা অক্ষয় নেই সেখানে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ফ্যাকাশে চোখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকা নেই।'

'না, সেসব কিছুই নেই, সেখানে সবটাই আনন্দ সবটাই উপভোগ। স্যার, আর একটা সিগারেট খান।' দু' নম্বর এবার নিজের হাতে রামানন্দর মুখে সিগারেট গুঁজে দিয়ে লাইটার জেলে সেটা ধরিয়েও দিল। 'হুঁ, ন্যুড কাকে বলে, নগ্ন নারীদেহের আসল রূপ কি করে ফুটিয়ে তুলতে হয় তা ওর, মানে আমরা যার কাছে যাচ্ছি, এত বেশি জানা আছে, ওটাও একটা উঁচুদরের আর্ট কিনা, আপনি দেখবেন। যেমন তার বাটক, যেমন তার ব্রেস্ট—উরু—'

'থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।' রামানন্দ থুথু ফেলল, সিগারেট যত না টানছিল থুথু ছিটোচ্ছিল তার চতুর্গুণ, ঢুলুঢুলু চোখ, যেন শরীরটা ক্রমেই নুয়ে ভেঙ্গে পড়ছিল। 'যাচ্ছি যখন সেখানে—চোখেই দেখা যাবে।' জড়িয়ে জড়িয়ে তার শেষের কথা ক'টা অস্পষ্ট হয়ে গেল। তারপর চুপ থেকে রামানন্দ কেবল ঢুলতে লাগল, হাত থেকে সিগারেট খসে পড়ল।

'শেষ পর্যন্ত সামাল দেওয়া মুশকিল হবে অসিত।' দু' নম্বর সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল।

'আমার ইচ্ছে ছিল না গাড়িতে বসে সবটা খেতে দেওয়া।' নিচু গলায় এক নম্বর বলল, 'দেখছি অবস্থা যেন কাহিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'মানে আমি চাইছিলাম কোনোরকমে সেখানে নিয়ে গিয়ে ওর ঘরে বসিয়ে আর একটা কবিতা লিখিয়ে নেওয়া—'

'তা তো বুঝলাম।' এক নম্বর ঘাড় বেঁকাল। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার হলে হয়—'

'কিছু বলছ তোমরা!' রামানন্দর বোজা চোখ খুলে গেল, যেন কিছু একটা শুনেছে।

'না, স্যার—' এক নম্বর ওদিক থেকে চট করে বলল, 'বলছিলাম আমরা আমাদের জায়গায় এসে গেছি।'

'তাই নাকি!' ড্যাবড্যাবে চোখে রামানন্দ বাইরেটা দেখল, তারপর তক্ষুনি ঘাড় নিচু করে, মনে হল যেন হাত থেকে পড়ে যাওয়া সিগারেটটা খুঁজল।

'থাক স্যার', দু' নম্বর রামানন্দর কাঁধে হাত রাখল। 'ওটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি নতুন সিগারেট দিচ্ছি—'

'থাক বাবা, আর নতুন ধরিয়ে কাজ নেই—', ঘাড় তুলে রামানন্দ সামনের সীটের দিকে তাকাল। 'কি হে ছোকরা, এসে গেছি আমরা?'

কথা না বলে অসিত বাঁ-দিকের পেভমেণ্ট ঘেঁষে গাড়িটা বেঁধে ফেলল। রণেন দরজা খুলে দিয়ে রামানন্দর হাত ধরল। 'আসুন স্যার, নামা যাক।'

চমৎকার হাস্নুহানার গন্ধ নাকে লাগল। শান্ত নিরিবিলি পাড়া। জ্যোৎস্নাটা টলটল করছে। কাদের একটা কুকুর একবার ঘেউ ঘেউ করে উঠেই আবার থেমে গেল।

রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। 'মনে হয় জায়গাটা আমার চেনা চেনা।'

'কলকাতা শহরে এমন অনেক জায়গাই হঠাৎ চেনা চেনা লাগে স্যার।' রণেন রামানন্দর একটা হাত ধরল। পা খুব বেশি টলছিল, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে, যেন রামানন্দ নিজে নিজে চলতে পারছিল না। এপাশ থেকে অসিত রামানন্দর আর একটা হাত ধরল।

'হুঁ তাই।' রণেনের কথায় সে সায় দিয়ে বলল, 'আবার এই শহরেই অনেক জায়গা হঠাৎ অচেনা অচেনাও ঠেকে।'

রামানন্দ শব্দ করল না। তার মাথাটা আবার ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। দুটো বাড়ি পিছনে রেখে তাকে ধরে ধরে দুজনে একটা বেশ বড় ফটকের সামনে চলে এল। বোঝা গেল প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট বাড়ি।

'হুঁ, হুঁ', আধবোজা চোখ নিয়ে রামানন্দ ওপরের দিকে তাকাল। 'মনে হচ্ছে বাড়িটা আমার চেনা চেনা, যেন কবে একদিন এসেওছিলাম।'

'কলকাতায় এসব ধোঁকা লাগে স্যার, অচেনা বাড়ি হঠাৎ চেনা মনে হয়।'

রামানন্দকে নিয়ে তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। একতলা শেষ করে দোতলায়, দোতলার সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় উঠতে লাগল।

'ধুত্তুরি আনন্দ!' একদলা থুথু ছিটিয়ে রামানন্দ গজগজ করে উঠল। 'রাবণের সিঁড়ি, আমার ঘুম পাচ্ছে, এত সিঁড়ি ভাঙা যায়!' মোটা শরীর নিয়ে সে হাঁপাচ্ছিল।

'এসে গেছি স্যার।' দুজনের একজন বেল টিপতে আচমকা অন্ধকার বারান্দা ঝলমল করে উঠল। নানারকম ফুল নিয়ে অর্কিড নিয়ে থরে-বিথরে সাজানো টব। দরজা জানালায় শোভন পর্দা। ভিতর থেকে হালকা মেয়েলী নিশ্বাসের মতন ল্যাভেন্ডার ডিউ বা ঐ জাতীয় একটা সেন্টের গন্ধ ভেসে এল। রামানন্দর চোখ খুলে ভাল করে তাকাতে ইচ্ছে হল, কেননা সেই মুহূর্তে দুর্দান্তরকম সংক্ষিপ্ত বেশবাস ও হালের যা ফ্যাশন, প্রসাধন না, চুলে মুখে প্রসাধনের একটা ইশারা মাত্র নিয়ে মানুষটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মতন একটা কিছু বয়ে গেল। রামানন্দ কি ওকে চেনে? ও রামানন্দকে চেনে?

'দূর দূর—এ তোমরা কাকে ধরে নিয়ে এলে—সরিয়ে নাও সরিয়ে নাও' যেন কদাকার একটা পশু দেখে আর্তনাদের মতন চিৎকার করে উঠে স্ত্রীলোকটি সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। ছেলে দুটি বোকা হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল। 'স্কাউন্ড্রেল, ইডিয়ট' কেবল দুটো শব্দই রামানন্দ উচ্চারণ করতে পারল। যেন তার সব নেশা টুটে গেছে। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল না। আহত পশুর মতোই গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে সব ক'টা সিঁড়ি ডিঙিয়ে নিচে নেমে এল। না, পশুটশু না, নিজের শরীরটাকে একটা প্রকাণ্ড উপহাসের বস্তার মতন ঠেকছিল তার, কোনোরকমে সেটা হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। উহুঁ, এই মুখ রামানন্দ আর কোনোদিন দেখেনি, এই মেয়েছেলেকে সে চেনে না, চেনা উচিত নয়—শালা তুমি কবি, লোকে তাই বলে না? কবির জাত চিরকালই আলুকে বেগুন দেখে, বেগুনকে আনারস—বলে কিনা ওটাই আর্ট! ইয়াকুবের ভাষায় 'আর্ট'—চেনা জিনিস চিনতে না পারা, অচেনা কিছু দেখলে 'চিনেছি' বলে বেঅকুফের মতন মাথা নাড়া। 'আমি চিনি' কথাটা বুকে টোকা

দিয়ে বলতে পারে একমাত্র ডাক্তার—কোন্‌টা পাঁচড়ার ঘা, কোন্‌টা সিফিলিসের। এক নজর দেখে বলে দেওয়ার এলেম রাখে ওরা, বলতে পারে ছুতোর—কাঠের রং দেখে বলে দেবে আম গাছ কি সুন্দরী বৃক্ষ—তাই বলো, কোন্‌ আক্কেলে যে রামানন্দ সেন 'চেনার' বড়াই করে! মাধুরীকে সে চিনেছিল না! বেগুন দিয়ে পাবদা শুঁটকি রাঁধে, মডেল হয়ে ছবি আঁকায়—কাজেই তোমার উচিত চোখ বুজে থাকা, রামানন্দ, মুখ বুজে থাকা। 'ট্যাক্সি! ট্যাক্সি! হেই ট্যাক্সি!' রামানন্দ ছুটতে লাগল। ছুটতে গিয়ে দেখল তার পা দুটো আবার টলছে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। 'রিকশা—হেই রিকশাঅলা!'

হুঁ, রিকশাই অগতির গতি। রিকশা না থাকলে কলকাতার মানুষ কবে অরণ্যে চলে যেত।

'মেডিকেল কলেজ, মালুম হ্যায়? মিটিয়া কলেজ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবুসাব, সিধা হোকে বৈঠিয়ে—কিত্‌না সরাব পিয়া!' বিড়বিড় করতে করতে ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশাঅলা ছুটল। রিকশার ঝাঁকুনি খেয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে অনর্গল থুথু ছিটোচ্ছিল রামানন্দ।

॥ ৪২ ॥

এটা কি অক্ষয়ের বাড়ির কাছের সেই খাল? খালের জলের তো এই রং না।

রামানন্দ আবার চোখ বুজল। চোখে-মুখে রোদ লাগছে। চোখ বুজে থেকে অক্ষয়দের খালের চেহারাটা সে মনে আনতে চেষ্টা করল। চকচক করছে জল, সাদা সাদা হাঁস সাঁতার কাটছে, এখানে-ওখানে কচুরিপানা আর কলমীর দাম, জলের বুকে আকাশের ঝকঝকে নীল ছায়া।

সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দর চোখ দুটো আবার খুলে গেল। এই জল ঘোলাটে সবুজ, বিবর্ণ, হাঁসের ঝাঁক নেই, কচুরিপানা কলমীদাম নেই। রবারের টুপি পরে কান-মাথা ঢেকে হাত-পা ছুঁড়ে ক'টা ফ্যাকাশে চেহারার ছেলেমেয়ে সাঁতার কাটছে। তার বিস্ময়ের ভাবটা কাটছিল না। মিটমিটি চোখ, যেহেতু কপালে রোদ লাগছে, ভাল করে তাকাতে পারছে না, জলের দিকে চেয়ে দু' কান খাড়া করে রাখল। উঁহু, পাখির কিচির-মিচির শুনছে না, দেখছে না অক্ষয়ের ঘরের পিছনে মান্দার ঝোপে শালিক-বুলবুলির খেলা। কেবল গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, ট্রামের ঘণ্টা, বাসের ঝরঝর, রিকশার ঠুনঠুন। শোয়া ছেড়ে রীতিমত লাফিয়ে উঠে বসল সে। এটা গোলদীঘি, কলেজ স্কোয়ার। লাঠি হাতে বুড়োর দল সকালে বেড়ানো সেরে রোদ মাথায় ঘরে ফিরছে, খবরের কাগজ নিয়ে হকারদের ছুটোছুটি।

রাত্রের সব কিছু মনে পড়ল তার।

তবে কি রিকশাওয়ালাটা শেষ পর্যন্ত দয়া করে তাকে গোলদীঘির পার্কের এই বেঞ্চের ওপর শুইয়ে রেখে গিয়েছিল?

বড় অদ্ভুত তো! ফুটপাথে কোথাও যে ফেলে রেখে যায়নি! পকেটে হাত ঢুকিয়ে রামানন্দ দেখল কাগজের নোট ক'টা গেছে, খুচরো কিছু পয়সা হাতে উঠে এল। সন্ধ্যেবেলা বেলেঘাটা পর্যন্ত ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বারো-তেরো টাকার মতন ছিল না? তারপর তার এক পয়সা খরচ হয়নি। সেই কলম বেচার টাকা।

না না, রিকশাওয়ালাটা এমন কাজ করবে না, হয়তো তার যা ভাড়া পাওনা হয়েছিল, কম রাস্তা তো নয়, কোথায় টালিগঞ্জ, কোথায় কলেজ স্ট্রীট—দু'-চারটে টাকা সে নিতে পারে, তা ব'লে সব টাকা—

উঁহু, রামানন্দ এত বেইমান নয়। মাতালকে রাত্রে রিকশাওয়ালা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই সাহস পায়নি। তাই এখানে, তা-ও যেমন-তেমন করে ফেলে রেখে যাওয়া নয়, যত্ন করে বেঞ্চিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, বোঝা যায় লোকটার প্রাণ আছে—কাজেই এমন মানুষ সম্পর্কে পকেট থেকে সব টাকা তুলে নেওয়ার ধারণাটা রামানন্দ একেবারেই আমল দিল না। সুযোগ পেয়ে মাতালের পকেট ফাঁক করে দেবার মতন ঢের মাস্তান এই শহরে, কি দিন কি রাত, হরদম ঘোরাফেরা করছে। যাক গে, টাকার কথা ভাবতে বসেনি সে এখন।

অনুশোচনায় তার বুক ভরে উঠল। রাগে দুঃখে, হুঁ, সবটাই নিজের ওপর, কাউকে দায়ী করছে না সে, হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করল। কোথায় কাল সন্ধ্যায় তার হাসপাতালে ফিরে আসার কথা—আর এখন? মহাবোধি সোসাইটি হল-এ মাথার ওপর সূর্য উঠে গেছে—

লোকে শুনলে তার মুখে থুথু ছিটোবে না? এই জন্যই খুব কম মানুষই কবি-টবি জাতের লোকগুলিকে পছন্দ করে—পাগল-টাগলের সঙ্গে যে তুলনা দেয় তাও খামকা নয়।

নিজের ওপর ঘেন্নায় রামানন্দর মুখের ভিতরটা বিস্বাদ ঠেকল। পার্ক থেকে বেরিয়ে সে রীতিমত ছুটতে লাগল। বলে কিনা এখান থেকে দু' মিনিটের রাস্তাও না মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল—আর এই পর্যন্ত এসেও সে সারাটা রাত কিনা ঘুমিয়ে কাটাল!

নেশা ভাঙ যে কত দিক দিয়ে মানুষের সর্বনাশ করে, মানুষকে কত নিচে টেনে নিয়ে যায়, মানুষকে কেমন পশু করে ছেড়ে দেয়—আজ রামানন্দ টের পেল।

ছি ছি ছি! অক্ষয়ের আর আছে কে! সে ছাড়া কে আর ওই বেচারাকে দেখছিল। প্রথম থেকে রামানন্দই তো হাসপাতালে ছুটে ছুটে আসছে। খুবই নিরীহ গোবেচারা ধরনের একটি মানুষ। মনটা ভাল, কোনরকম খাঁজ নেই। স্কুল-কলেজের দরজা কোনোদিন দেখেনি। আগে ছিল মাছের ভেড়ি, এখন হাঁস-মুর্গির কারবার—সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাওয়া জীবন। কিন্তু ওই যে—মন, অক্ষয়ের নির্মল আত্মার মাধুর্য, যা রামানন্দকে প্রথম থেকে মুগ্ধ করেছিল, যে জন্য নিজে সে এত লেখাপড়া জানা মানুষ হয়েও অক্ষয় সমাদ্দারের সঙ্গে এমন মিশতে পেরেছিল। সেই অক্ষয়কে কিনা এমন একটা সংকটজনক অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে—

খুবই দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিল বটে শিক্ষিত সভ্যসমাজের মানুষ রামানন্দ সেন!

যদি অক্ষয় শোনে, নিশ্চয় এখন তার সেন্স ফিরে এসেছে, হয়তো রাত্রেই ফিরেছে—হুঁ, যদি নার্সদের মুখে সে জানতে পারে যে, তার অকৃত্রিম সুহৃদটি অর্থাৎ মাস্টার সন্ধ্যা থেকেই পলাতক তো তার মনের অবস্থাটা কেমন হবে! রামানন্দই বা কি করে তাকে মুখ দেখাবে।

এতক্ষণ সে ছুটছিল, কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কের গা ঘেঁষে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার সময় তার পা দুটো আটকে যাচ্ছিল, ভয়ে নয়, ভয় কিছুটা থাকলেও, লজ্জা অনুশোচনা আত্মগ্লানির ভাবটাই তাকে বেশি বাধা দিচ্ছিল। অন্য দিনের মতন বুক টান করে মুখে হাসি নিয়ে অক্ষয়ের সামনে ছুটে যেতে পারছিল না।

দোতলার করিডোর পার হবার সময় জেনারেল ওয়ার্ডের রুগীদের চোখে পড়ল। বোঝা গেল, তাদের মুখ-হাত ধোয়া, গরমজল দিয়ে গা স্পঞ্জ করার ভারি ভারি কাজগুলি অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে। যেন দুধটুধও খাওয়া হয়ে গেছে। নার্সরা ঘুরে ঘুরে এক-একটা বেড-এর কাছে গিয়ে টেম্পারেচার নিচ্ছে,

ইনজেকশন দিচ্ছে, ওষুধ খাওয়াচ্ছে। যেমন রোজ করে—বেলা তো কম হয়নি। এই বেড-এ সেই বেড-এ গালগল্পও চলছিল।

করিডোরের শেষ মাথায় পৌঁছে রামানন্দ থমকে দাঁড়ায়। কোথায়, অক্ষয়ের ভেজা লুঙি গামছা তো দেখা যাচ্ছে না। এই সময় অক্ষয়েরও গা মোছা, মাথাটাথা ধোয়া শেষ হয়ে যায়। জমাদারটা তার লুঙি গামছা ধুয়ে পরিষ্কার করে কেবিনের সামনে বারান্দার রেলিঙের গায়ে রোদ্রে ছড়িয়ে দেয়।

রামানন্দ দেখল, খালি রেলিঙের মাথায় একটা ধাড়ি কাক চুপ করে বসে আছে, খরখরে গলায় ডাকছে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। হৃৎপিণ্ডে মোচড় দিয়ে উঠল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে তার গলাটা শুকিয়ে কাঠ হবার উপক্রম। অবশ্য তখনি সে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। অক্ষয়ের যে অপারেশন হয়েছে সে ভুলে যাচ্ছে কেন। এখনও হয়তো রক্ত, স্যালাইন-ট্যালাইন চলেছে। এই অবস্থায় কিসের মাথা ধোয়ানো, গা স্পঞ্জ করানো! নির্জীব ক্লান্ত হয়ে পেশেণ্ট এখনও বিছানায় শোয়া। বারান্দার এক কোনায় জমাদারটা বসে বিড়ি টানছে। রামানন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। অল্প বয়সের ছোকরা, রামানন্দর সামনে বিড়িটিড়ি বড় একটা খায় না, এই জন্যই বোধ করি সুখনলাল চট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল, রামানন্দ চিন্তা করল।

ভিতরে ঢুকল সে। কেউ নেই। কেবিন ফাঁকা। অবাক হল সে। অক্ষয়ের খাট? যদি পেশেণ্টকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার বিছানাটা তো থাকবে!

কিন্তু দু-এক সেকেণ্ড পরেই রামানন্দর ভুল ভাঙল। বাইরের আলো থেকে সে এসেছে, অক্ষয়ের কেবিনের ভিতরটা দিনের বেলায়ও অন্ধকার অন্ধকার—যে জন্য অধিকাংশ সময় আলো জেবলে রাখতে হয়—আলোটা এখন নেবানো. কাজেই অন্ধকারটা চোখে সয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল, খাটের জায়গায় খাট ঠিকই রয়েছে—লাল পার্টিশন দিয়ে সেটা ঘিরে রাখা হয়েছে।

রামানন্দ যেমন দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে রইল, স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে থেকে পর্দা ঘেরা বিছানাটা যেমন দেখছিল দেখতে লাগল।

পুরো এক মিনিট এভাবে কাটল। দোরের কাছে পায়ের শব্দ হতে সে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। ওয়ার্ড-বয় ঢুকছে।

'দেখুন স্যার, আপনাকে এখুনি লাশ বের করে নিতে হবে। সিস্টার ভয়ানক তাড়া দিচ্ছে।' ওয়ার্ড-বয় আলোটা জেবলে দিল।

লাশ! অক্ষয়ের মৃতদেহ! রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'ললিত!' গম্ভীর গলায় সে ডাকল। ওয়ার্ড-বয়ের নাম ললিত। কিন্তু ললিত তার দিকে তাকাল না, ভিতরে ঢুকেই কোণার দিকের টেবিলটা গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হুঁ, যে টেবিলে সোহিনী বসে, তরলা বসে, ফুলরেণু বসত।

'ললিত!' রামানন্দ আবার ডাকল।

'কি বলছেন আপনি?' এবার ললিত এমন চোখমুখ করে তাকালো যেন রামানন্দকে সে চেনে না, অথবা রামানন্দ এভাবে চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে খুব বিরক্তিবোধ করছে। অথচ যখনই রামানন্দ এখানে এসেছে, ললিতের হাসিমুখ ছাড়া একদিনও সে দেখত না। মাস্টারবাবুকে ভিতরের প্যাণ্ট্রি থেকে চা তৈরী করে এনে খাওয়াতে ললিত ব্যস্ত হয়ে পড়ত। রামানন্দ অক্ষয়ের সঙ্গে গল্প করত, ললিতও কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অক্ষয়ের বেড-এর কাছে ছুটে এসে গল্প করেছে। বিশেষ করে অক্ষয়বাবুর বন্ধু এম-এ পাশ শুনে তার ওপর এই ওয়ার্ড-বয়টির ভক্তি-শ্রদ্ধার যেন আর শেষ ছিল না। কেননা, সে নিজে স্কুল

ফাইন্যাল ফেল। টাকা-পয়সার অভাবে আর পড়া হয়নি। ঘরে বিধবা বুড়ি মা আছে, বিয়ের উপযুক্ত একটা বোন আছে, তার ওপর বছর দুই আগে নিজে বিয়ে করেছে—ঘাড়ের ওপর খুব বেশি চাপ—তা হলেও ললিতের ইচ্ছে আর একবার প্রাইভেট পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে, পাশ করতে পারলে হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দেবে—কত গল্প! রামানন্দ বিশ্বাস করতে পারছিল না এই সেই ললিত।

আর একটা শব্দ হতে রামানন্দ দরজার দিকে চোখ ফেরাল। সোহিনী ভিতরে ঢুকল। পোশাকে চেহারায় আজ যেন আরও বেশি সুন্দর জমকালো লাগছে মেয়েটিকে। কিন্তু রামানন্দর দিকে তাকাল না। জুতোর খুটখুট শব্দ করে সোজা টেবিলটার কাছে সরে গেল।

'কি হল ললিত, ডেড্‌বডি কখন সরানো হচ্ছে?'

'আমি ভদ্রলোককে তাই বলছিলাম দিদিমণি। সিস্টার রাগারাগি করছে। এদিকে—'

ললিতের কথা শেষ হবার আগেই সোহিনী রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। ভুরু কোঁচকালো।

'দেখুন, আপনাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে লাশ বের করে নিতে হবে। কেবিন ভাড়া হয়ে গেছে। এখনি নতুন পেশেণ্ট আসবে।'

'হুঁ, বুঝেছি।' রামানন্দ ঘাড় কাত করল। 'কিন্তু আমাকে তো সময় দিতে হবে সিস্টার। লোকজন জোগাড় হবে, তবে তো মড়া এখান থেকে নিয়ে যেতে পারব। একা আমার পক্ষে কি—মানে বলছিলাম, মানুষটাকে তো শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহটাহ করতে হবে।'

'হুঁ, তা তো করবেনই, সবাই করে, মড়া নিয়ে কি আর বাড়িতে জিইয়ে রাখে কেউ।' কালকের মতন যুবতীর চোখমুখের চেহারা কদর্য হয়ে উঠল। 'ছ' ঘণ্টা হতে চলল ডেড্‌বডি পড়ে আছে—আর তো আমরা কেবিনে রাখতে পাবি না, একটু পরেই মর্গে চলে যাবে। ডেথ-সার্টিফিকেট এখানে রয়েছে। এক্ষুনি আপনি বডি সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন।'

স্থির স্তব্ধ হয়ে রামানন্দ দাঁড়িয়ে থেকে শুনল। সোহিনী তৎক্ষণাৎ ললিতের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ললিতের চেহারা হাসিখুশি হয়ে উঠেছে। যেন সেই আগের ললিত। সোহিনীরও আর কুঁচকোনো ভুরু কুঁচকোনো কপাল নেই। দেখতে দেখতে চমৎকার হাসির গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে। কত সহজে না মানুষের চেহারা বদলায়, রামানন্দ চিন্তা করল।

'দিদিমণির কাঁধের সেফ্‌টিপিনটা আজ সোজা করে লাগানো হয়নি।' ললিত বলছিল।

'তাই নাকি।' সোহিনী চোখ বেঁকিয়ে নিজের কাঁধ দেখল। 'যা তাড়াহুড়ো করে ডিউটিতে ছুটে আসতে হয়!'

'নাইট ওয়ার্ড বলছিল, কাল তরলাদিদিমণির খুব কষ্ট হয়েছে।'

'কষ্ট তো হবেই। ঐ তো খিটখিটে হেলথ মেয়ের। তার ওপর এমন স্ট্রেন!' আড়চোখে লাল পর্দা-ঘেরা খাটটা একবার দেখল সোহিনী, তারপর আবার ললিতের দিকে চোখ দুটো ঘুরিয়ে ধরল। 'আমি তো ভেবেছিলাম কাল বিকেল চারটে নাগাদই শেষ হয়ে যাবে।'

'এক একটা পেশেণ্ট এমন ভোগায় দিদিমণি।' হেসে ললিতও আড়চোখে পর্দা-ঘেরা খাটটা দেখল। 'এসে নাইট ওয়ার্ডবয়ের মুখে শুনলাম, সমাদ্দার রাত সোওয়া তিনটেয় গেছে।'

'হুঁ, তিনটে দশে।' সোহিনী কাঁধের সেফ্‌টিপিন সোজা করে আটকায়।

'ওদিকের জানালাটা খুলে দে তো ললিত।'

জানালা খুলতে খুলতে ললিত বলল, 'তরলা দিদিমণি বেঁচে গেছে, আজ যদি আবার সারারাত জেগে ঘড়ি ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে এভাবে স্যালাইন অক্সিজেন দিতে হতো—'

'আশ্চর্য, আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন!' আচমকা এদিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল সোহিনী, রামানন্দ কেঁপে উঠল, এমন বিশ্রী চোখ-মুখের চেহারা করল লাবণ্যে ঢলঢল সুন্দর চেহারার ঐ মেয়ে যে, রামানন্দ ভয় পেল। 'এখানে দাঁড়িয়ে কী শুনছেন, কী দেখছেন?'

'না না, আমি যাচ্ছি, আমাকে লোকজন জোগাড় করতে হবে।' বিড়বিড় করে রামানন্দ কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

'উজবুক।' ললিতের উঁচু গলার হাসি রামানন্দর কানে এল। 'এমন এক একটি মাল মাঝে মাঝে হাসপাতালে এসে জোটে—'

'হাসপাতাল একটা চিড়িয়াখানা—জানিস তো, কত রকমের জীবজন্তু আমাদের চোখে দেখতে হয়।' মোহিনী সোহিনীর মধুক্ষরা গলার হাসিও রামানন্দর কানে এল।

না, এই জন্য সে মন খারাপ করল না। এসব আঘাত আর কি, অতি তুচ্ছ। বলে কিনা কাল সন্ধ্যা থেকে কতবড় এক একটা পেরেক তার বুকে এসে বিঁধছে—তবু কেমন চমৎকার মাথা ঠিক রাখতে পারছে সে, আর এখন কিনা নার্স ওয়ার্ড-বয়ের একটা দুটো অপমানের কথা শুনে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে!

নিচে রাস্তায় এসে রামানন্দর প্রথম চিন্তা হলো টাকা। অক্ষয়কে নিমতলা নিয়ে যাক কি কেওড়াতলা—শ্মশান ঘাটের একটা বেশ ভাল খরচ আছে, রামানন্দর পকেটে আনা দশ-বারোর বেশি নেই। হুঁ, তার পরের চিন্তা হল লোকজন। অক্ষয়কে কাঁধে করে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্তত চার পাঁচজন না হলে চলবে না, রামানন্দ একজন আছে—কিন্তু আর চারজন? অন্তত আরও তিনটি মানুষের তো দরকার বটেই।

রামানন্দর কপাল ঘামতে লাগল। গ্রীষ্মের রোদ মিনিটে মিনিটে চড়ছে। এখন বেলা ন'টা বাজে। ওদিকে দেরি করলেও চলবে না। অক্ষয়কে ঠাণ্ডা ঘরে মড়ার গাদার মধ্যে ঠেলে দেবে—রামানন্দ এই জিনিস চায় না।

কাজেই এখন সকলের আগে যেটার দরকার—টাকা। একে ওকে বলে-কয়ে শ্মশানবন্ধু হয়তো জোগাড় করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মড়া পোড়াবার জন্য পকেট থেকে কেউ কড়ি বের করে দেবে না। বরং যারা কষ্ট করে মড়া কাঁধে বয়ে নিয়ে যাবে, উল্টে তাদের চা জলখাবার বাবদ কমবেশি যা হোক খরচ করতে হবে। তা না হলে মুখ থাকে না।

না না না, কথাটা মনে এলে হবে কি, টাকার জন্য রামানন্দ অক্ষয়-গিন্নীর কাছে যাবে না, কিছুতেই না, যদি অক্ষয়ের লাশ সাতদিনও মর্গে পড়ে থেকে পচে, তবু না। টাকা অবশ্য অক্ষয়েরই, কিন্তু ঐ মেয়ের হাত ছুঁয়ে তো টাকাটা আসছে। অনেক কিছুর বিশ্বাস রামানন্দর ভেঙেছে। কিন্তু তার এই বিশ্বাস এখনও অটুট অভগ্ন আছে। মাধুরীর হাতের স্পর্শ যে-টাকায় লাগবে তা দিয়ে দাহ করলে অক্ষয়ের আত্মার সদ্‌গতি হবে না—হতে পারে না।

তবে? কে এমন বন্ধু আছে যে এখন চাওয়া মাত্র কুড়ি পঁচিশ টাকা বের করে দেবে!

নন্দদুলালকে মনে পড়ল রামানন্দর। বড়লোকের ছেলে। কুড়ি পঁচিশ টাকা তার কাছে কিছু না। কিন্তু নন্দর বাড়ির ঠিকানা রামানন্দ জানে কি? জানে না।

তাই তো লোকে বলে এবং নিজেও সে এখন চিন্তা করে, কত দিক দিয়ে যে রামানন্দ সেনের বাস্তববুদ্ধির অভাব। কেবল পরিচয় না, ক'দিনই নন্দদুলালের সঙ্গে বসে সে মদটদও খেল, অথচ একটা দিন তার বাড়ির ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করে জেনে রাখলে না। কত কিছু ব্যাপারে লোকটাকে তার দরকার হতে পারে। কেননা, সবচেয়ে যেটা বড় কথা, পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে।

না, নন্দর ঠিকানা তার জানা নেই। তবে আর কার কাছে যাওয়া যেতে পারে?

নন্দর পরেই আর একটা মুখ রামানন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠল। জগত মণ্ডল। হুঁ, জগতের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম তার জানা আছে। এই একটা মানুষ যার মধ্যে কোনোরকম ভেজাল নেই। খাঁটি সোনা। চোখ বুজে যে-কোনো সাহায্যের জন্য এই মানুষের কাছে ছুটে যাওয়া চলে।

তবে এর মধ্যে কথা আছে। জগত মণ্ডলের চেহারা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ আশ্বস্ত হল ঠিকই। কিন্তু তার সম্পর্কে হতাশ হবারও কারণ ছিল। মানুষটির তেমন রুজিরোজগার নেই। চাইলেই যে এতগুলো টাকা ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে সেই সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তাছাড়া, মণ্ডলকে গিয়ে যে বাড়িতে পাওয়া যাবে তারও খুব একটা নিশ্চয়তা নেই। ঐ যে পরশু রাত্রে ব্লু-ফক্সে বসে নন্দ ও রেখা বলল, আফ্রিকায় চাকরি নিয়ে চলে যাবার জন্য মণ্ডল উঠে পড়ে লেগেছে। রাতদিন সরকারের এই মহলে সেই মহলে ধরনা দিয়ে ফিরছে। তাহলে, এখন কি করা যায়, কার কাছে সে যেতে পারে! বন্ধুত্ব দূরে থাক, এদিকে কারো সঙ্গে সে পরিচয় পর্যন্ত রাখেনি। সব দিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে লবণ হ্রদে গিয়ে কোন্ এক অক্ষয় সমাদ্দারের ডেরায় আস্তানা গেড়েছিল।

রামানন্দ ভাবতে লাগল। তার কপাল ঘামছিল, সেই সঙ্গে মাথাও কম গরম হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত জগতের কাছে যাওয়াই সে ঠিক করল। একবার তো চেষ্টা করতে হবে। হয়তো, কপাল ভাল থাকলে বাড়িতে গিয়ে আর্টিস্টকে পেয়েও যেতে পারে।

এটা সত্য কথা, রামানন্দ এই সম্পর্কে নিশ্চিত, যদি মণ্ডলের নিজের কাছে টাকা না-ও থাকে, এই বিপদের কথা শুনলে অন্তত কারো কাছ থেকে চেয়ে হলেও মোটামুটি শ্মশানঘাটের খরচটা যাতে রামানন্দর হাতে তুলে দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করবে। মণ্ডলের এই চেষ্টার মধ্যে কেনোরকম কৃত্রিমতা থাকবে না।

তাছাড়া, দু' চার পাঁচটি শ্মশানযাত্রী জোগাড় করাও মণ্ডলের পক্ষে মোটেই কষ্ট হবে না। অনেকদিন নাকি ও-পাড়ায় আছে। ডাকলে চার পাঁচটি ছেলে যে এগিয়ে না আসবে, সে একটা কথাই নয়।

আর একটা বিষয়েও রামানন্দ নিশ্চিত ছিল। নন্দদুলালের ঠিকানা জগত মণ্ডল জানবেই। ভয়ানক বন্ধুত্ব যে দুজনের। কাজেই টাকাটা যদি মণ্ডল জোগাড় করতে নাও পারে, রামানন্দকে নিয়ে নির্ঘাৎ নন্দর কাছে ছুটবে। রামানন্দকে কিছুতেই এমন একটা বিপদের মধ্যে ফেলে রাখবে না।

॥ ৪৩ ॥

কেবল বাড়ির নম্বর না, 'বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে ঢুকেই বাঁ-হাতি একটা পুরোনো ভাঙ্গা মতন মসজিদ, মসজিদের উল্টোদিকে 'মহামায়া কেবিন' অর্থাৎ একটা চায়ের দোকান—চায়ের দোকানের সঙ্গেই দেখবেন একটা দর্জি-দোকান, দর্জি-দোকানের গা-ঘেঁষে একটা খুব সরু রাস্তা পাবেন, এক পাশে টিউব-ওয়েল—

টিউব-ওয়েল পার হয়ে গুণে ঠিক পাঁচটা স্টেপ এগিয়ে গেলেই আমার বাড়ি। পুরোনো বাড়ি, কাঠের গেট। সদরের কড়া নাড়লেই আমি বেরিয়ে আসব।' একদিন না দু'দিনই জগত তার বন্ধু ওস্তাগর লেনের আস্তানাটা যাতে সহজে খুঁজে বের করা যায় তার একটা জীবন্ত মানচিত্র রামানন্দর চোখের সামনে তুলে ধরেছিল।

কাজেই রামানন্দ অতি সহজেই সরু গলির ভিতরের সেই টিউবওয়েল-এর পাশ কাটিয়ে পাঁচ পা এগোতেই কাঠের গেটওয়ালা পুরোনো বাড়ি দেখতে পেল। কিন্তু বাড়ির সামনে একটা ভিড় জমে আছে কেন! মনে হয় যেন সবই প্রায় পাড়ার মানুষ, পরনে লুঙ্গি, কারো পায়জামা, খালি গা খালি পা, গেঞ্জি গায়ে কতজনকে রামানন্দর চোখে পড়ল। কাঠের গেট্-এর সামনে সব জড়ো হয়েছে। গুজগুজ করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। কি ব্যাপার! কি হয়েছে ওখানে! ঠিক বুঝতে পারল না রামানন্দ। থমকে দাঁড়াল। 'কি হয়েছে দাদা?'

'আপনি কোথা থেকে এয়েছেন?' বড় বড় চোখ করে একজন রামানন্দব মুখটা দেখল।

'আমি এখান থেকে এসেছি', রামানন্দ ঢোক গিলল, 'মানে কলকাতায় থাকি আমি।'

'কাকে খুঁজছেন আপনি?'

'আর্টিস্ট জগত মণ্ডলকে।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেখানে এসে উঁকি দিল।

'কি ব্যাপার, কি চাইছেন দাদা?'

'আমি জগত মণ্ডলের কাছে এসেছিলাম।'

'জগত মণ্ডল কি আর আছে!'

লোকটা এমন একটা ভঙ্গি করে মাথা ঝাঁকাল, রামানন্দ বিরক্ত হল।

'কোথায় গেছেন তিনি? রুষ্ট হয়ে রামানন্দ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

'কোথাও যাননি তিনি, ঘরেই আছেন।' আগের লোকটি আঙুল দিয়ে কাঠের গেটওয়ালা বাড়িটা দেখিয়ে বড় বড় চোখ করে আর একবার রামানন্দকে দেখল। 'কি দরকারে তাকে খুঁজছিলেন জানতে পারি কি?'

আচ্ছা ঝামেলা তো! এই অবস্থায় কার না মেজাজ খারাপ হয়। দবকারটা কি আমি এখানে এদের কাছে বলব?

'হুঁ, দরকার আছে বইকি, একটা জরুরী ব্যাপারে তাঁর কাছে এসেছি।' রামানন্দ গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর করল।

'তিনি যে দাদা স্বর্গে চলে গেছেন, তিনি আর এই জগতে নেই, বুঝেছেন, দেখাটা করবেন আপনি কার সঙ্গে?' ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল দ্বিতীয় লোকটি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল রামানন্দ। তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে দুজনকে দেখতে লাগল।

'তাই বলছিলাম দাদা', চোখ বড় করে তাকানো প্রথম লোকটি হাত নেড়ে রামানন্দকে বোঝাল, 'যদি আপনার জরুরী দরকারটা জানা যেত, মণ্ডলের বাড়িতে, মানে তার পরিবারকে না হয় খবরটা পাঠিয়ে দেওয়া যেত।'

'কি হয়েছিল জগতবাবুর?' রামানন্দ অতি কষ্টে একটা ঢোক গিলতে পারল।

'কিছুই হয়নি', দ্বিতীয় লোকটি আবার চেহারাটা বিকৃত করল। 'কাল রাত্তিরে তিনি গলায় দড়ি দিয়েছেন, তাই তো বলছিলাম, তিনি এখনো ঘরেই আছেন মানে দেহখানা কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে—তবে কিনা আপনার সঙ্গে কথা বলার মতন অবস্থায় নেই।'

'হঠাৎ তিনি এমন করলেন—!' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। তা হলেও তার কথা তাদের কানে গেল।

'সংসারে অভাব অনটন চলতে থাকলে যা হয়', ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো আকাশের দিকে তুলে দিয়ে প্রথম লোকটি বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'অভাবের ফলে অশান্তি—পরিবারের সঙ্গে নিত্য খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি—এর রেজাল্ট কি কখনো ভাল হতে পারে মশাই!'

'তবে যে শুনেছিলাম জগতবাবু আফ্রিকায় একটা চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছেন—খুবই উঠে পড়ে লেগেছিলেন।'

'আরে মশাই, উঠে পড়ে চাকরির জন্য চেষ্টা করা আর চাকরি পাওয়া কি এক কথা হল—আচ্ছা মজার লোক তো আপনি!' দ্বিতীয় লোকটি এবার বড় করে রামানন্দকে ভেংচি কাটল। 'না, সেই চাকরি মণ্ডলের হয়নি, কালই খবরটা পেয়েছে—কোন্ এক মিনিস্টারের শালা আর্টিস্ট নাকি সিলেকটেড হয়েছে, ঐ খবর পেয়েই তো ঘরে এসে রাত্তিরে এই কুকম্মটা করল।'

'কি হে সতীশ, কি হে বিমল—' বলতে বলতে বেশ মোটাসোটা উঁচু শরীরের ভাল পোশাক-টোশাক পরা একটি মানুষ জুতোর মসমস শব্দ করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সেখানে এসে দাঁড়াল। রামানন্দর দিকে একবার তাকাল। 'ইনি কে?'

'ইনি অন্য পাড়া থেকে এসেছেন—জগত মণ্ডলকে খুঁজছিলেন।' দুজনের একজন উত্তর করল।

'আর জগত মণ্ডল!' ছড়িটা মাটিতে ঠুকে ভদ্রলোক নাকের একটা শব্দ করল। 'ছ্যা ছ্যা—কি একটা কেলেঙ্কারী করে গেল লোকটা পাড়ার ভেতর, তোমরা বল দিকিনি!' বলে ভদ্রলোক বিমল ও সতীশের দিকে চোখ রাখল।

'হবে না!' যেন ভিতরে অনেক রাগ জমা হয়ে আছে, এতক্ষণ প্রকাশ করার সুযোগ হচ্ছিল না, প্রথম ব্যক্তি হাত দুটো শূন্যে নাচিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝাঁকাল। 'কতদিন বলেছি, জগত ভাই, আর্টফার্ট করে কিছু হবে না—একটা কিছুতে লেগে পড়—এভাবে উপোস থেকে—'

'আমি বলিনি?' দ্বিতীয় ব্যক্তিও শূন্যে হাত নাচাল। 'অনেকদিন বলেছি, মণ্ডল, ধাপা থেকে বেগুন এনে ফুলকপি এনে হাতিবাগান বাজারে কি ছাতুবাবুর বাজারে বিক্রী কর, বরং তাতে দুটো পয়সার মুখ দেখবে—কিন্তু ঐ এক গোঁ, তুলিটি তিনি হাত থেকে ছাড়বেন না, যার ফলে—'

'তা-ই হয়।' হাতের ছড়ি শূন্যে তুলে ধরে দামী পোশাক-পরা ভারি চেহারার মানুষটি দার্শনিকের মতন হাসল। 'মানুষের কাঁধে যখন শনি চাপে ভূত চাপে, তখন কারো উপদেশ কোনোরকম সৎপরামর্শ সে কানে তোলে না—কত দেখলাম।'

রামানন্দ আর দাঁড়াল না। পা পা করে সেখান থেকে সরে এসে বড় রাস্তায় বাসস্টপে দাঁড়াল।

তারপর রামানন্দ! সবশুদ্ধ ক'টা পেরেক, পেরেক বলছ কি, বলো গজাল, তোমার বুকের মধ্যে ঠোকা হল? চমৎকার একটা ফাঁকা বাস পেয়ে আরাম করে পা ছড়িয়ে গদিতে বসে রামানন্দ চোখ বুজে হিসাব করল। সব মিলিয়ে চারটে। একটা গজাল কাল সন্ধ্যেবেলা লবণ হ্রদে অক্ষয়ের টালির বাড়িতে মাধুরী ঠুকেছে, একটা ঠুকেছে রাত্রে আর একজন টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে, একটা আজ সকালে হাসপাতালে অক্ষয় ঠুকে দিলে, আর একটা ঠুকল এখন বৃন্ধু ওস্তাগর লেনের জগত মণ্ডল। আশ্চর্য! একদিন এই মণ্ডলকে দেখে রামানন্দর কী মনে হয়েছিল! রেললাইনে গলা পেতে দিয়ে যেদিন রামানন্দ মরতে যায়? এক দুর্ধর্ষ প্রাণবান শিল্পী—সংসারে সব কিছু হারিয়ে, সব দিকে হেরে গিয়েও যে কোনোদিন মৃত্যুচিন্তা

করবে না, কাপুরুষের মতন রামানন্দ লাইনের ধারে ছুটে এসেছিল শুনলে হুগত হাসত। চিরকাল তালগাছের মতন মাথা উঁচু করে চলার মানুষ সে। সেই ব্যক্তি কিনা গলায় দড়ি দেয়! রামানন্দ লম্বা নিশ্বাস ফেলল। এক একটা জীবন নিয়ে নিয়তি সময় সময় এমন সব ঠাট্টা-মস্করা করে না! দেখে তাজ্জব বনতে হয়।

যাই হোক, রামানন্দ চিন্তা করছিল চারটে বড় বড় গজাল তার ফুসফুসের চার কোণায় ঠোকা হয়ে যাবার পর ফুসফুসটা কেমন টানটান হয়ে উঠেছে না? অনেকটা সিনেমার পর্দার মতন। পর্দার চার কোণায় চারটে গজাল পুঁতে পর্দাটাকে আর হাওয়ায় মোটেই নড়তে দেবে না কাঁপতে দেবে না, এতটুকু ভাঁজ পড়বে না কোথাও, যেন সেখানে এখন অনেক মুখ ফুটবে, অনেক ইমেজ খেলা করবে, কত রকমের যে অভিনয় হবে তা লেখাজোখা থাকবে না। ভাল, মন্দ কি, রামানন্দ নিজের মনে হাসল। অমূল্য মাস্টার কি বলত?

তখন রামানন্দ স্কুলে পড়ায়, তাদের আর এক মাস্টার অমূল্যধন বিশ্বাস একদিন নিজের বুকের ফটোটা রামানন্দকে এনে দেখিয়েছিল। ক'দিন প্লুরিসিতে ভোগার পর ডাক্তারের পরামর্শ মতন এক্স-রে ক্লিনিকে গিয়ে ছবিটা সে তুলিয়ে আনে। এই দেখুন রামানন্দবাবু, আঙুল দিয়ে ফুসফুসের ছবিটা দেখিয়ে অমূল্য বলেছিল—ডাক্তার বলেছে মোটে একটা দাগ পড়েছে সেখানে, একটুখানি স্পট, এত বড় ফুসফুসের বাকি সবটা জমি কিন্তু এখনও পরিষ্কার রয়ে গেছে, একটা আঁচড় পড়েনি, কাজেই যক্ষ্মারোগে মরতে আমার ঢের ঢের দেরি। বলে অমূল্য বীরদর্পে আবার মদ ধরেছিল, শরীরের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেছিল।

তেমনি রামানন্দও আজ ঘাবড়াল না। মোটে চার-কোণায় তো চারটে পেরেক পোঁতা হয়েছে, তার এত বড় ফুসফুসটা এখনও পুরোদমে রক্ত চালাচালি করছে, হাওয়া টানতে পারছে—এখনি ভয় পাবার, থেমে যাওয়ার হয়েছে কি!

কলেজ স্ট্রীটে বাস ধরতে সে নেমে পড়ল। তার এখনও অনেক কাজ বাকি। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড় কাজ আগের কাজ, তা হলো টাকা জোগাড় করে ক'জন শ্মশানবন্ধু জুটিয়ে অক্ষয়কে নিয়ে শ্মশানঘাটে যাওয়া।

একটা দোকানের ঘড়ি দেখে সে চমকে উঠল। দশটা বেজে গেছে। কিন্তু করার কিছু নেই। অক্ষয়ের লাশ এতক্ষণে ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেছে। তাতেও বলার কিছু নেই। ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেলেও মড়া পোড়াতে হবে এবং পুড়বেও, ক'খানা কাঠ বেশি লাগবে এই যা।

হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রীট জংশন পার হয়ে রামানন্দ মোহন রেস্টুরেণ্টের দিকে ছুটল। এখন তার একমাত্র ভরসা মোহন পাল, একমাত্র বন্ধু মোহন রেস্টুরেণ্টের মোহনবাবু।

কিন্তু কোথায় সেই চায়ের দোকান? থমকে দাঁড়াল রামানন্দ। ভারি মজা তো! এতকালের চেনা জায়গায় এসে একটা চেনা দোকান খুঁজে বের করতে পারছে না? দোকানে রাস্তায় গোলমাল করে ফেলছে? তাই বা কি করে সে বিশ্বাস করে। ওই তো ওদিকে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, এদিকটায় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট—হুঁ, এটাই কলেজ রো—একটু এগিয়ে গেলেই তুমি নবীন কুণ্ডু লেন পাচ্ছ, আর একটু এগোলে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট পাবে। তবে?

চোখ দুটো হাত দিয়ে রগড়ে নিল রামানন্দ। না না, ভুল হবার কথা নয়। মোহনবাবুর দোকান থেকে ডাস্টবিনটা চোখে পড়ত, রাস্তার এপাশে সেটাও রামানন্দ পরিষ্কার দেখতে পেল। পরিবর্তনের মধ্যে ড্রামটা একটু বেশি দুমড়ে গেছে, তলার দিকটা ভেঙে গেছে, ফলে কিছু ছাইপাঁশ আবর্জনা, কিছু চিংড়ির খোসা ডিমের খোসা রাস্তার অ্যাসফল্টের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

না না, ভুল হবে কেন, ঐ তো ওপাশে জিলিপি গজার দোকান, এপাশে মুদি দোকান, হালুইকরের দোকানটার পাশেই ইলেকট্রিক গুড্স-এর দোকানটা যেমন ছিল ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। মুদিখানার গা ঘেঁষে মনোহারী দোকানটাও রামানন্দর চোখে পড়ল।

কিন্তু মোহন পালের সেই বিখ্যাত মোহন রেস্টুরেন্ট! উড়ে গেল? কেমন যেন ভয় পেল রামানন্দ, ঘাবড়ে গেল, বুকে এত বড় চারটে ঘাই নিয়ে সে যতটা কাবু হয়নি, দুর্বলবোধ করেনি, এখন মোহন পালের চায়ের দোকানটা দেখতে না পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়ার অবস্থা হল তার, মুখটা শুকিয়ে গেল, গলার ভিতরটা শুকনো ঠেকল।

কাউকে জিজ্ঞেস করবে? কি জিজ্ঞেস করবে? একটা দোকান উড়ে গেল? দোকানের পাখা আছে নাকি মশাই যে উড়ে যাবে—দোকান নেই, দোকান ঘরটা তো থাকবে। আচ্ছা লোক তো আপনি!

তাই বলো, রামানন্দ এখন ঘরটা দেখতে পেল। মোহনবাবুর চায়ের দোকানের সেই চমৎকার ঘর। কিন্তু ভিতরের ভাঙা চেয়ার, চায়ের দাগধরা মাছি ভনভন ময়লা টেবিলগুলো কি হল, নড়বড়ে পাখাটাও তো দেখা যাচ্ছে না। পদাবলী গোষ্ঠীর কবির দলই বা গেল কোথায়! বিকাশ না হয় চাকরি করতে আসাম চলে গেছে, কিন্তু শুভেন্দু, অমলেন্দু, উৎপল, নবকিশোর, অরুণাভ, রজত, রাকেশ, পলাশ—এরা তো চেয়ার জুড়ে বসে থেকে কবিতা নিয়ে কাব্য নিয়ে গরম গরম আলোচনা করবে। কেউ নেই। বেশ তো, না থাক, ওরা হয়তো এখনো এসে পৌঁছোয়নি, কিন্তু এই গরমেও রোঁয়া-ওঠা ময়লা পশমী চাদর গলায়, হিসাবের খাতা সামনে নিয়ে মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় টাক, সেই আদি ও অকৃত্রিম মোহন পালের মূর্তিটা রামানন্দর চোখে পড়ছে না কেন! দোকানের অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে চেহারাটা গেল কোথায়! মোহনবাবুর কর্মচারী রমেশের কি হল?

একেবারে বেকুব বনে গিয়ে পুরো দু' মিনিট দোকানঘরটার দিকে সে চেয়ে রইল। ভিতরে আলমারী শো-কেস ঝকঝক করছে। দেওয়ালের কলি ফেরান হয়েছে, নতুন রং লাগান হয়েছে, একটার জায়গায় চারটে চকচকে পাখা এক ফোঁটা শব্দ না করে বনবন ঘুরছে।

তাই বলো, দোকানের মাথায় ঝুলানো রংদার অক্ষরে লেখা জমকালো সাইনবোর্ডটাই সব গোলমাল করে দিয়েছিল! মোহন বস্ত্রালয়। সকল প্রকার সিল্ক, তাঁত, পশমী ও সুতী বস্ত্র সুলভ মূল্যে এখানে পাবেন।

হুঁ, ঐ তো মোহনবাবু। দাড়ি গোঁফ কামানো মুখটা চকচক করছে। একথা বিশ্বাস করবে কেউ? মোহন পালের গায়ে ময়লা পশমী আলোয়ানটা নেই, খাটো শার্ট ও হাঁটুতক ধুতির বদলে স্যুটবুট পরে আছে!

শুকনো গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য রামানন্দ চেষ্টা করে পর পর দুটো ঢোক গিলল। তারপর এক পা দু' পা করে মোহন বস্ত্রালয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

'নমস্কার মোহনবাবু!'

'কে আপনি?'

'দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।'

'ও হ্যাঁ, রামানন্দবাবু না? কি ব্যাপার, কি খবর? তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে এক জোড়া চশমা তুলে মোহন নাকে পরল। 'মুশকিল, এটা ছাড়া চোখে এখন সব কিছু ঝাপ্সা দেখি।'

'বয়েস হচ্ছে তো।' রামানন্দ হাসতে চেষ্টা করল।

'হুঁ, তা হচ্ছে, কিন্তু আপনি যে দেখছি মশাই আমার চেয়েও আগে বুড়িয়ে

গেলেন। সেদিন যা দেখলাম, আজ যেন আরো বেশি বুড়ো বুড়ো ঠেকছে।'

'হুঁ, মন শরীর দুটোই খারাপ।'

'কেন, কি হল আপনার মনের, শরীরই বা খারাপ হবে কেন, আপনি কবি শিল্পী—আপনার তো শরীর-মন খারাপ হলে চলবে না মশাই!'

রামানন্দ চুপ করে রইল। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে মোহন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছে। রামানন্দ দাঁড়িয়ে রইল। শো-কেস্ খুলে মোহন খদ্দেরকে জামা-কাপড় দেখাচ্ছে।

'কি হল রামানন্দবাবু!' মোহন পাল ফিরে এল। 'কিছু কেনাকাটা করার ইচ্ছে আছে নাকি! ভাল তাঁতের ধুতি এসেছে।'

'না না।' রামানন্দ সজোরে মাথা নাড়ল। 'এই মাত্র আমি হাসপাতাল থেকে এসেছি।'

'কেন, চোখ দেখাতে, কান দেখাতে? আউটডোরে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'উহুঁ, আমার একটি বন্ধু মারা গেছে, গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগছিল, দু' মাসের বেশি মেডিকেল কলেজে থাকার পর কাল অপারেশন হয়—টিকল না।'

'আপনার কোথাকার বন্ধু মশাই? কবি শিল্পী কেউ?' মোহন পাল ভুরু কুঁচকোল। 'আমি দেখেছি কি?'

'না, না, আপনি দেখবেন কোথা থেকে, আমার সল্ট লেকের বন্ধু, পোলট্রি মানে হাঁস-মুরগির কারবার করত।'

মোহন পাল সরে গিয়ে একটা পাখা বন্ধ করে দিল। কাউণ্টার এখন ফাঁকা। আপাতত খদ্দের নেই।

'হুঁ, তা হলে ঐ বন্ধুর ব্যাপারেই ছুটোছুটি ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে আপনাকে?'

'এখনো ছুটোছুটি শেষ হয়নি মোহনবাবু, কিছু টাকার দরকার, লোকজনও জোগাড় করা যাচ্ছে না, ডেডবডি হাসপাতালে পড়ে আছে, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আপনিও তো আচ্ছা লোক মশাই—বন্ধুর বাড়িতে খবর দেননি? হাসপাতাল থেকে ওরা খবর পাঠায়নি?'

রমানন্দ মাথা নাড়ল।

'বাড়িতে কেউ নেই, মানে কাঁধে করে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাবার মতন কেউ নেই, পোড়াবার টাকাও কেউ দেবে না—এখানে আমিই সব, বন্ধুর সব দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিয়েছি।'

'আপনি আমাকে অবাক করছেন রামানন্দবাবু, আপনি কবি, কবিতা লিখবেন, আপনি কেন এসব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন! আজেবাজে ব্যাপারে মাথা গলাবার তো আপনার কথা নয়।'

বড় বড় চোখ করে রামানন্দ মোহন পালকে দেখছিল। মোহন মিটিমিটি হাসছে। যেন দাঁতের কোণ দিয়ে কেটে কেটে কথা বলছে। মোহন রেস্টুরেন্টের মোহন আর মোহন বস্ত্রালয়ের মোহনে অনেক তফাত। আগের সেই গালভরা হাসি নেই, গালভরা কথা নেই, মানুষটা এখন অনেক বেশি মাজাঘষা, বুদ্ধিমান।

'ঠিক কথা বলছি কিনা বলুন!' রামানন্দ চুপ করে আছে দেখে মোহন মাথা ঝাঁকাল। খদ্দের ঢুকেছে। মোহন কাউণ্টারে চলে গেল।

'কি হল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ঠিক বলেছি কিনা, আপনি কবি শিল্পী।' খদ্দের বিদেয় করে মোহন পাল ফিরে এল।

'না, আপনি ঠিক বলেননি।' রামানন্দ ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'অক্ষয় কেমন মানুষ ছিল, কত সুন্দর মন কত মহৎ আত্মা ছিল আমার বন্ধুটির,

যদি আপনি জানতেন, তাকে দেখতেন, এমন কথা আমাকে কক্খনো বলতেন না।'

'আস্তে রামানন্দবাবু, এত চেঁচাবেন না।' উত্তেজিত হয়ে রামানন্দ চেঁচিয়ে কথা বলছিল। মোহন চোখ টিপল। 'এটা আপনাদের সেই চায়ের দোকান না, বুঝতেই পারছেন।'

'না থাক চায়ের দোকান, আপনি তো মোহনবাবু রয়েছেন, আপনার কাছে আমার আবদার খাটে, কিছু টাকা দিন, আর—আর আপনার ঐ কর্মচারীদের কাউকে বলুন দু'চারজন শ্মশানবন্ধু জোগাড় করে দিক—বন্ধুর সৎকারটা সেরে আসি।'

'আমি টাকা দেবো!' চোখ গোল করে মোহন পাল আকাশ থেকে পড়ার মত চেহারা করল। 'আমার হাতে টাকা কোথায়—দেশের জমিজমা বেচে কিছু ধারকর্জ করে সবে এই দোকান স্টার্ট দিয়েছি—এখন কি কাউকে আমার এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করার সময়!'

'না না, ওকথা বলবেন না, খুবই বিপদে পড়ে গেছি, এমন আর একটি লোক আমার জানাশোনা নেই যার কাছে গিয়ে টাকা চাইতে পারি—খুব একটা আশা নিয়ে বিশ্বাস নিয়ে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'আপনিও যেমন পাগল—', মোহন হাতের তেলো শূন্যে ঘুরিয়ে অস্পষ্ট শব্দ করে হাসল। 'টাকা নেই লোকজন নেই—সৎকার সমিতিকে একটা ফোন করে দিন—এক্ষুনি গাড়ি এসে আপনার বন্ধুকে নিমতলা নিয়ে যাবে—তারাই পোড়াবার ব্যবস্থা করবে।'

'না না, তা কি হয় কখনো মোহনবাবু—', রামানন্দ জোরে মাথা নাড়ল। 'সৎকার সমিতির গাড়ি এসে অক্ষয়ের মড়া শ্মশানে নিয়ে যাবে, আর—আর তাদের মাইনে করা ডোম দিয়ে তাকে পোড়াবে, এ জিনিস আমি হতে দেবো কেন—এটা খুবই দুঃখের, খুবই বেদনার বিষয় হবে।'

'ঐ তো মশাই আপনার দোষ।' মোহন আবার দাঁতে কেটে কথা আরম্ভ করল। 'সব বেদনা সব দুঃখের ঊর্ধ্বে আপনাকে থাকতে হবে—বলেছি আপনি কবি শিল্পী—সংসারে আমাদের চারদিকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কতরকম দুঃখ বেদনা পরিতাপের ব্যাপার ঘটছে—আমরা সাধারণ লোক কাতর হব বিচলিত হব মাথা গরম করব—কিন্তু আপনাকে চোখ বুজে থাকতে হবে। আপনাকে তো কাতর হলে অস্থির হলে চলবে না, আপনি শুধু আপনার সৃষ্টির কথা ভাববেন, কবিতার কথা চিন্তা করবেন—'

'আপনি কি ঠাট্টা করছেন মোহনবাবু?' রামানন্দর চোখ লাল হয়ে উঠল। 'এসব কথা অনেক শোনা হয়েছে—আপাতত ক্যাশবাক্সটা খুলে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিন—একটা খাট কিনতে হবে, ফুল কিনতে হবে, কিছু ধূপ-চন্দনও চাই—কবি শিল্পী বলে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে আমাকে বিদায় করলে চলবে না—'

'এসব কথা তো আপনাদের মুখ থেকেই শোনা রামানন্দবাবু, আপনাদের কবিদের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখেছি—না হলে লেখাপড়া শিখিনি, আমার সাধ্য কি এত সুন্দর করে গুছিয়ে এসব ভাল ভাল কথা বলি—এ কি! আপনি আমার ক্যাশের দিকে এগোচ্ছেন কি—' মোহন ক্যাশবাক্স আগলে দাঁড়াল।

'কিছু টাকা আমাকে দিতেই হবে—আপনার বাক্স থেকে, বেশি না, পঞ্চাশটা টাকা তুলে নেওয়ার রাইট আমার আছে—আপনি আমার অনেক দিনের জানাশোনা পরিচিত মানুষ—আপনি আমার বন্ধু—'

'দেখুন রামানন্দবাবু, এভাবে আমাকে বিরক্ত করবেন না।' মোহনের ড্যাবড্যাবে

ফোলা ফোলা চোখ ছোট হয়ে গেল। 'আপনাদের অনেক অত্যাচার উপদ্রব আমি ... করেছি—যে জন্য এত বড় চায়ের দোকানটা আমার ফেল পড়ল—আপনি ...নি—আমার ক্যাশে একটা আধলাও নেই—'

'আছে, আছে—এইমাত্র একটা শাল বিক্রী করে একটা একশ' টাকার নোট আপনি ক্যাশবাক্সে ঢুকিয়েছেন—দিন তো চাবিটা—' যেন মরীয়া হয়ে ক্যাশ-বাক্সের দিকে ঝুঁকে পড়ল রামানন্দ। মোহন পাল ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল ও সেই সঙ্গে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলঃ 'সনাতন! অনুকূল!'

মোহনের দুই কর্মচারী ওদিক থেকে ছুটে এল। 'কি হচ্ছে মশাই, আপনি ...রছেন কি!' তারা আস্তিন গুটিয়ে ফেলল।

'আপনাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে না—মোহনবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলছি, মোহনবাবুর কাছে আমি টাকা চাইছি।'

'না, হবে না, এখান থেকে বেরিয়ে যান!'

'টাকা না নিয়ে আমি বেরোব না—আমার বন্ধুর ডেডবডি হাসপাতালে পড়ে আছে—তাকে পোড়াবার—' রামানন্দ কথা শেষ করার আগে অনুকূল নামের ছেলেটি জোরে ধাক্কা দিতে রামানন্দ চৌকাঠের ওপর গিয়ে ছিটকে পড়ল। তার ঠোঁট কেটে গেল। 'মোহনবাবু!' বাঁ-হাতের পিঠে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে রামানন্দ আবার ক্যাশবাক্সের দিকে এগোতে চেষ্টা করল।

'দুজনে ধরে দোকান থেকে বেটাকে বের করে দাও না!' মোহন পাল উত্তেজনায় কাঁপছিল ঘামছিল। এবার অনুকূল ও সনাতন এক সঙ্গে রামানন্দর গলা ধরে তাকে ফুটপাথের দিকে ঠেলে দিল। রামানন্দ বাইরে সিমেণ্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার কপাল কেটে গেল, রাস্তায় লোক জমে গেল। কপালের রক্ত মুছতে মুছতে রামানন্দ উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল তার চোখে জল এসে গেছে। চোখে জল ও ঠোঁটে কপালে রক্ত নিয়ে সে মোহন বস্ত্রালয়ের কাউণ্টারে দাঁড়ানো মোহনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'মোহনবাবু, আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন—অথচ সেদিন রাজাবাজারে একটা চায়ের দোকানে বসিয়ে আমাকে পেট ভরে কত খাবার খাওয়া-লেন।' করুণ কাতর গলায় রামানন্দ বলল।

'হুঁ, খাইয়েছিলাম বইকি, কবি রামানন্দ সেনকে খাইয়েছিলাম।' মোহন পাল পকেট থেকে রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছছিল। 'পাগল রামানন্দকে নয়—আবার আপনি কবিতা লিখুন—আবার কাব্যভাবনা নিয়ে মেতে থাকুন—পেট ভরে আপনাকে খাওয়াব—'

রামানন্দ আর মোহনের দিকে তাকাল না। আকাশটা দেখল, কিছু যেন ভাবল, তারপর চোখে জল ও ঠোঁটে কপালে রক্ত নিয়ে রাস্তার ভিড়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'হুঁ, তাই ভাল, কবিতা লিখব, মোহন পাল খুশি হবে— স্যার আপনার কাছে পেন আছে?' রামানন্দ একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'ও কি, দিলেন না! স্যার আপনার কলমটা দিন—নেই? ওই তো আপনার পকেটে একটা পেন দেখা যাচ্ছে—দিন দিন, কি হল দেবেন না? একটা চমৎকার কবিতা আমি এখনি লিখে ফেলব, আপনি এক দুই গুনতে গুনতে লেখা হয়ে যাবে—বিশ্বাস করছেন না? মুখে মুখে শুনবেন? শুনুন—চারটে গজাল বুকে নিয়ে আমি হাসি, এখন আর একটা ঢুকল, হল পাঁচটা—হা-হা, তাতে কি, বাইরের সূর্য নিবে গেছে, আমার অন্তর আলোকিত—দিন স্যার আপনার পেনটা দিন, আমার পকেটে কাগজ আছে, এখনি লিখে না ফেললে ভুলে যাব—আপনারটা দিন, ও কি ঘাড় ফেরাচ্ছেন কেন, তবে আপনারটা দিন মশাই, দেবেন না! ইস্

কেউ আমাকে একটা কলম ধার দেবেন না? আমার একটা পেন ছিল যে, বন্ধু মশাইরা, খুব দামী পেন, খাঁটি বিলিতি জিনিস—ঐ, ঐ যে, ঐ লোকটা পালিয়েছে, মুখে ফুটফুট বসন্তের দাগ, মাথায় বাবরি—ঐ যে শালা কলম নিয়ে পালাচ্ছে—হেই হেই—হ্যারিসন রোড পার হয়ে রামানন্দ কলেজ ধরে ছুটতে লাগল—

'পাগল, পাগল নাকি লোকটা?' রাস্তার ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলল

'মনে হয় যেন কবি, কবিতার কথা বলছে, শুনলেন না?' একজন উক্তি করল।

'ঐ একই কথা, কবিই পাগল, পাগলই কবি।'

॥ ৪৪ ॥

দু' হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে নন্দদুলাল রামানন্দর পথ আটকাল, তাকে ধরে ফেলল। 'রামানন্দবাবু, কোথায় ছুটছেন?'

যেন রামানন্দ নন্দদুলালকে চিনতে পারল না, হাঁপাচ্ছে, তার কপালে রক্ত ঠোঁটে রক্ত, চোখ দুটো পাষাণের মতন স্থির করে নন্দর দিকে তাকিয়ে রইল মুখে কথা নেই।

'তুমি ওঁকে গাড়িতে নিয়ে এস—', রেখা তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিল

আজ নন্দর জন্মদিন। তাকে একটা ভাল উপহার কিনে দেবে বলে নন্দকে নিয়ে তার গাড়ি করে রেখা বউবাজারে একটা জুয়েলারী দোকানে এসেছিল। বউবাজারের রাস্তা ধরে পাগলের মতন রামানন্দ ছুটে আসছে দেখে নন্দ চট করে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে দু' হাত ছড়িয়ে রামানন্দকে ধরে ফেলে।

'রামানন্দবাবু, কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি?' রেখার চোখে মুখে উদ্বেগ 'ইস, ঠোঁটে রক্ত কপালে রক্ত, কি হয়েছে আপনার বলুন তো?'

রেখার পাশে বসে রামানন্দ স্থির চোখে তাকে দেখল, তারপর রেখার কোলে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল, কান্নাভরা গলায় সব বলল।

'তুমি এক্ষুনি গাড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে চলো।' রেখা নন্দর দিকে তাকাল।

নন্দ ঘাড় কাত করে স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসল।

'আমি সব ব্যবস্থা করব রামানন্দবাবু, খুব ভাল করে আপনার বন্ধুর সৎকারের ব্যবস্থা করছি', রামানন্দকে সান্ত্বনা দিয়ে নন্দ তৎক্ষণাৎ গাড়ি চালিয়ে দিল। 'আপনি একটুও ভাববেন না।'

হাতের ছোট্ট নীল রুমাল দিয়ে রেখা রামানন্দর কপালের রক্ত ঠোঁটের রক্ত মুছে দিল।

এবার রামানন্দ অনেকটা স্থির হল শান্ত হল, যেন একটা পাথর সরে গিয়ে তার বুকটা হালকা লাগছিল।

'হঠাৎ আপনাদের সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতে পারিনি।' রেখার চোখে চোখ রেখে রামানন্দ গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। রেখা মিষ্টি করে হাসল।

'নন্দর জন্মদিনের উপহার কিনতে ওকে নিয়ে ওই জুয়েলারী দোকানটা এসেছিলাম। দেখুন, ওর জন্য কেমন চমৎকার আঙটি ও বোতাম কিনেছি। রেখা ছোট্ট একটা বাক্স খুলে উপহার দুটো দেখাল।

'সুন্দর!' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল।